বেদের কবিতা

গৌরী ধর্মপাল

ব্রহ্মরূপ অহি ব্রহ্মবিৎ, তাকি বাণী বেদ।
ভাষা অথবা সংস্কৃত, করত ভেদভ্রমছেদ॥
নিশ্চলদাস

নবপত্র প্রকাশন/কলিকাতা-৯

সর্বভূঃ সর্বসংলীনা যার্ধনারীশ্বরাত্মিকা। (স্বরাত্মিকা)
আত্মনে ব্রহ্মণে তস্মৈ বাচে বচ্মি নমো নমঃ ॥১

ব্রহ্মণা তপসা যাভ্যাং বেদঃ পুনর্ণবীকৃতঃ।
তদ্-রবীন্দ্রারবিন্দাখ্যৌ নমামি বেদপুরুষৌ ॥২

অনির্বাণং প্রণমামি বাগ্ যস্মৈ বিসস্রে তনূম্।
গণ্ডূষীকৃত্য শাস্ত্রাণি বেদরত্নং জহার যঃ ॥৩

ঋষয়ে যজ্ঞকথায়া রামেন্দ্রায় ত্রিবেদিনে।
নমঃ সাক্ষাত কৃতে শব্দং প্রত্যগাত্মমহর্ষয়ে ॥৪

প্রণৌমি শাব্দিকোত্তমং যাস্কং চ পাণিনিং তথা।
যদ্ধস্তে গুচ্ছিতা ভান্তি বেদশব্দার্থকুঞ্চিকাঃ ॥৫

প্রাচ্যা যে চ প্রতীচ্যাশ্চ বেদার্থাবিষ্কিকীর্ষবঃ।
সায়ণাচার্যপ্রমুখাঃ পণ্ডিতা অনসূয়কাঃ ॥৬

মহাজীবনবেদস্য শৃণ্বন্তি বিচিত্রং শ্রবঃ।
দ্রষ্টারস্তে স্রষ্টারশ্চ জয়ন্তু কবয়ো ভুবি ॥৭

অস্বহং যেন মিত্রেণ আবিত্রা সবিত্রাঞ্জসা।
পূষ্ণা সন্দিশ্যতে পন্থাস্তস্মৈ সোমস্বরূপিণে ॥৮

বেদের কবিতা প্রসঙ্গে

লেখিকা আমার সুপরিচিতা। বিদুষী মহিলা, বাংলার সাহিত্য ও শিক্ষা জগতে সুপ্রতিষ্ঠিতা। অশেষ গুণের মধ্যে তাঁর যে পরিচয় আমার মনের মধ্যে আছে, তার মধ্যে বিশিষ্ট পরিচয়—সংস্কৃত সাহিত্যে···বিশেষ করে বৈদিক সাহিত্যে তাঁর প্রতিভা ও মনীষা।

তিন বছর আগে যখন তাঁর বেদের কবিতার পাণ্ডুলিপি আমার হাতে এল, তখন থেকেই বইখানি প্রকাশ ও প্রচারের জন্যে মনে আকুল আগ্রহ ছিল। তাঁর বইখানি প্রকাশ হতে চলেছে দেখে পরম আনন্দ অনুভব করছি। লেখিকাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁর প্রতিভা বাংলা সাহিত্যকে নূতন নূতন পর্যায়ে উন্নীত করুক।···

নবপত্র প্রকাশনের অক্লান্তকর্মী কর্ণধার এ বই প্রকাশের ভার নিয়ে আমাকে পরম পরিতৃপ্ত করেছেন। বাংলা সাহিত্য জগতে নবপত্র প্রকাশনের প্রতিষ্ঠা একটা বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। তার আদর্শ লুপ্তপ্রায় ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার। বৈদিক সাহিত্যরূপ জ্ঞানসমুদ্রের লুপ্তরত্নাবলী পুনরুদ্ধার আমাকে আশা ও আনন্দে পরম পুলকিত করেছে। শ্রীযুক্ত প্রসূন কুমার বসু এই জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। বর্তমান গ্রন্থে এই প্রকাশনা সংস্থাটির নাম সার্থক হতে চলেছে বলে আমি মনে করি। তাঁর এই প্রচেষ্টা শুধু 'নব' নয়, অভিনব।

বৈদিক সাহিত্যের চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য যদি হয় ভারতাত্মার মর্মবাণী, রবীন্দ্র সাহিত্যের মধ্যে দিয়েও সেই একই চিরন্তন সুরের অনুবর্তন···। লেখিকার এটি নতুন অনুভব এবং এই অনুভূতি তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে এইটি লক্ষ্য করে প্রাণে বড় তৃপ্তি পেয়েছি। এই ধরণের বই আমাদের দেশে এখন যত প্রকাশিত হয়, ততই ভাল।

গ্রন্থের গৌরচন্দ্রিকা অংশে লেখিকার অনবদ্য রচনাশৈলী বারবার মনে করিয়ে দেয় স্বামীজির সেই অতুলনীয় উক্তি—United we stand, divided we fall. জীবনসমস্যার সকল সমাধান এই চিরস্মরণীয় কথাটির

মধ্যে আছে। ভারতাত্মার এই বাণী ভারত কখনও ভোলেনি, ভুলতে পারে না। হারানিধি কে না ফিরে পেতে চায়? ভারতবর্ষ আজ তার হারানো সুরের অভাবে দুর্বল হয়ে আছে। কিন্তু অনাদিকাল থেকে ভারত ঐতিহ্যের আত্মা যে ঐক্যের সুরটি একমনে তাঁর একতারাতে অবিশ্রাম বাজিয়ে চলেছেন, এই সুরের সাধনায় যাঁরা ব্যাপৃত সেই সকল লেখক, প্রকাশক, সাহিত্য-সাধক সকলেই আমার নমস্য। তাঁদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। রুগ্ন ভারতকে আবার সুস্থ করে তুলতে এঁদের প্রতিটি প্রচেষ্টায় ভগবান শক্তি দিন এই প্রার্থনা। দেখতে পাচ্ছি, আমার এই প্রার্থনা দিনে দিনে সফল হতে চলেছে। বিশেষ করে এই বইখানি সেই হারান ঐক্যের সুরের প্রমাণ। বাংলা সাহিত্যে বেদের কবিতার মতো বই আর আমার চোখে পড়ে নি। বইখানির প্রকাশ ও প্রচার চিরন্তন হোক··· সমস্ত অন্তর দিয়ে কামনা করি।

লেখিকার অন্যান্য বই

স্রোতোবহা মালিনী

বেদ ও শ্রীঅরবিন্দ

কাদম্বরী [সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার—৮ম খণ্ড]

পঞ্চতন্ত্র [,, ,, ,, —১৫শ খণ্ড]

Linguistic Atom

মালশ্রীর পঞ্চতন্ত্র

আটটি আপেল

ঘোড়া বায়

চাঁদনি

আশ্চর্য কৌটো

চোদ্দপিদিম

উষাস-উষা উচ্ছাত্-চ নু

ব্রহ্ম মানে বৃহৎ—বিরাট অসীম চেতনা। আর বাক্ হল তার স্পন্দন, প্রকাশ, উচ্চারণ। দুয়ে মিলে একাকার, অদ্বৈত। প্রতি মানুষেরই অন্তরে নিহিত রয়েছেন এই কবি, এই স্রষ্টা, এই ব্রহ্মী বাক্। তিনি যখন যার মধ্যে জেগে ওঠেন, তখন সে হয় কবি। তার নতুন জন্ম হয়। নিবিড় আনন্দবেদনার ঝোড়ো ধাক্কায় একটার পর একটা ভাঙতে থাকে তার মনের প্রাণের হৃদয়ের দরজাগুলি। পিঞ্জরাবদ্ধ চেতনা হয় নীল আকাশের আলোর পাখি, ছন্দ, দিব্যঃ সুপর্ণো গরুত্মান্।

অন্তর্জগতের এই যে জ্যোতির্ময় অভিজ্ঞতাগুলি, বেদের ভাষায় এই হল দেবতার জন্ম মানুষের মধ্যে। দেবতা মানে আলো। দেবতা মানে লীলা। আলোর আশ্চর্য ঐশ্বর্যময় লীলা। বেদ ঐ আলোর বাঁশি। দেবকাম দেবাবিষ্ট দেবীভূত নানান ঋষির মধ্যে দিয়ে ঐ বাঁশি বেজেছে নানান সুরে, এক সুরে, যে আলো 'অসংখ্য এক', তার সুরে।

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব কোন অবাস্তব ধর্মান্ধ বিশ্বাসের কথা নয়। এ হল এককথায় কাব্যজন্মের অতিসত্য বিবৃতি। মহৎ কবিতা মাত্রেই অপৌরুষেয়। চরম পৌরুষেয় আর চরম অপৌরুষেয়ে মেশামিশি। এ অভিজ্ঞতা কবিমাত্রেরই হয়ে থাকে। অপৌরুষেয়তার একটুকু ছোঁয়ায় যা সৃষ্টি হয় তাকে বলি কাব্য। আর এর নিত্য নিরন্তর প্রগাঢ় অনুভবে সাক্ষাতে তন্ময়ীভাবে কবি হয়ে ওঠেন ঋষি, তখন তিনি যা উচ্চারণ করেন, তারি নাম বেদ। কোন কবিতা কতখানি অপৌরুষেয় বেদ, তার বিচারক বোধহয় একমাত্র মহাকাল।

মূল বেদমন্ত্রগুলি বেদের যে অংশে সঙ্কলিত হয়েছে তার নাম সংহিতা। অপর অংশের নাম ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ আরণ্যক এবং উপনিষদ্ এই তিনভাগে বিভক্ত। ব্রাহ্মণ সংহিতারই অনুবৃত্তি বিস্তার ব্যাখ্যান।

রামমোহন রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের কল্যাণে বেদের উপনিষদ্ অংশ আমাদের কাছে বহুল পরিচিত। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর যজ্ঞকথা,

ক্ষিতিমোহন সেনের বাংলার বাউল, শ্রীঅরবিন্দের on the Veda, স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীর বেদ ও বিজ্ঞান, ও জপসূত্রম্ এবং শ্রীমৎ অনির্বাণের বেদমীমাংসা—এই মহাগ্রন্থগুলি থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ এবং সংহিতা অংশের পরিচয় সাধারণের কাছে অজ্ঞাত বা স্বল্পজ্ঞাত থেকে গেছে। শুধু সাধারণ কেন, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে আমাদের পণ্ডিত জ্ঞানী গুণী মনীষীরাও দুই সহস্রাব্দীরও বেশী সময় ধরে বেদের সংহিতা অংশ নিয়ে বিশেষ নাড়াচাড়া করেন নি। যেহেতু সংহিতার মন্ত্রগুলি যজ্ঞে প্রযুক্ত হত, এবং যেহেতু যজ্ঞ তার মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়ে ক্রমে ক্রমে একটা উদ্দেশ্যহীন জটিলতায় এবং যজ্ঞব্যবসায়ী যাজ্ঞিকদের কায়েমী স্বার্থে পরিণত হয়েছিল, সেইহেতু যজ্ঞের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি বিতৃষ্ণা মন্ত্র-সংহিতার ওপরেই বিতৃষ্ণ করে তুলেছিল সবাইকে। আমাদের আস্তিক দর্শনের সূত্র-ভাষ্যকারেরা যে শ্রুতি বা বেদের ওপরে তাঁদের দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছেন সে শ্রুতি সংহিতা নয়, উপনিষদ্ এবং কোনো ক্ষেত্রে [মীমাংসা] ব্রাহ্মণ। গীতাও কটাক্ষ করলেন 'বেদবাদরত'দের 'ক্রিয়াবিশেষবহুলা ভোগৈশ্বর্যগতির' প্রতি। ঐ কটাক্ষ ব্রাহ্মণাংশের সম্পর্কে কিছুটা খাটে। কিন্তু যজ্ঞে প্রযুক্ত হত বলে সংহিতাও ঐ অপযশের ভাগী হল। মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্য পর্যন্ত কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড আলাদা করে ফেলে কর্মকাণ্ডকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষদের ওপরেই জোর দিলেন। ফলে কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে সংহিতা-অংশও পরিত্যক্ত হল।

অথচ সংহিতা—বিশেষ করে আদি-সংহিতা ঋগ্বেদের মধ্যেই রয়েছে আমাদের ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতির সমস্ত বীজগুলি। উপনিষদ্ সংহিতারই 'সন্তান'। এবং বিদ্রোহী সন্তান নয়। উপনিষদ্ যদি গীতাদুগ্ধের গাভী হয়, তাহলে সে গাভীরা এসেছে সংহিতারই গোষ্ঠ থেকে।

সংহিতা সম্পর্কে ভুলবোঝাবুঝির আর একটা কারণ হল তার ভাষা। সে ভাষা এত প্রাচীন, এবং প্রাচীন বলেই এত দুর্বোধ, যে স্বয়ং মহাভাষ্যকার বৈয়াকরণচূড়ামণি পতঞ্জলি পর্যন্ত সে ভাষা বুঝতে ভুল করেছেন [যথা, বহুবচন তক্ষতি পদটিকে একবচন ধরেছেন ৩।১।৮৫]। বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে বহু মতভেদ অনেক প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। তার ওপর সে ভাষায় পদে পদে শ্লেষ, মুহূর্তে মুহূর্তে উপমানের রং-বদল, রূপকের

আলোকাবগুণ্ঠন। অথচ সে অবগুণ্ঠন একবার সরে গেলেই দেখা যায় কবিহৃদয়ের বীণাতন্ত্রীগুলি কি গভীর কাঁপনে তিরতির করে কাঁপছে, কি নিবিড় প্রাণের গন্ধে মাটির গন্ধে আলোর গন্ধে ম ম করছে এক একটি শব্দ, এক একটি স্তবক, এক একটি কবিতা।

এইসব মন্ত্রের গভীর তাৎপর্য ও পূর্ণ দার্শনিক মর্যাদা এযুগে তুলে ধরেছেন শ্রীঅরবিন্দ (দ্র. বেদ ও শ্রীঅরবিন্দ) এবং শ্রীমৎ অনির্বাণ অনুবাদ আলোচনা এবং জীবনদর্শনের মাধ্যমে। আর এদের ভাবসম্পদ্ কাব্যসম্পদের উত্তরাধিকার বহু যুগের ওপার হতে এসে পৌঁছেছে একজন অনন্য পুরুষে। তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে গানে নাটকে প্রকাশ্যে আড়ালে আনাচে কানাচে বাঁকে বাঁকে বৈদিক কবির সত্তা অনুভূতি এবং উচ্চারণ ছড়িয়ে রয়েছে আকাশের মতো, বাতাসের মতো, বৃষ্টির মতো, রোদের মতো, ইন্দ্রধনুর মতো। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দিয়ে আধুনিক সহৃদয় পাঠক-শ্রোতা অজান্তেই যুক্ত হয়ে আছেন কয়েক সহস্রাব্দী আগেকার সেই মহাকবিদের সঙ্গে, যাঁরা শুনেছিলেন সেই মহাবিহঙ্গের আলোর পাখার গুঞ্জন, যার মধ্যে বিশ্ব হয়ে আছে একনীড়। সেই অন্তরের মিলের সন্ধান সহৃদয় পাঠক পাবেন পূর্বোক্ত এবং বর্তমান গ্রন্থে।

এ-বই-এর তিনটি অংশ। প্রথম—ভূমিকা। দ্বিতীয়—মন্ত্র ও অনুবাদ। তৃতীয়—ভাষ্য। ঋক্-সংহিতার ১০২৮ এবং অথর্ব-সংহিতার ৭৩১ সূক্তের মধ্যে মাত্র ২৪টি সূক্তের (দুটির আংশিক) ও কিছু বিবাহমন্ত্রের অনুবাদ দ্বিতীয় অংশে সন্নিবিষ্ট হয়েছে—সবশুদ্ধ প্রায় ৩০০ ঋক্। প্রসঙ্গত উপনিষদের কিছু মন্ত্র এবং সংহিতার প্রায় ১০০ ঋক্ ভূমিকায় ও ভাষ্যে উল্লিখিত ও অনূদিত হয়েছে। সমুদ্রে গোষ্পদ। তবু······

আমার লক্ষ্য শুধু বিদগ্ধজন নয়, সাধারণ পাঠকসমাজ। এইজন্য অনুবাদে যথাসম্ভব বহুজনপরিচিত সরল আধুনিক ভাষা ও কথ্যভঙ্গি ব্যবহার করেছি, যদিও 'মোরা' 'মোদের' সময় সময় এড়াতে পারিনি। ছন্দে-অনুবাদ করার কারণও কতকটা তাই। তাছাড়া বেদের প্রথম পরিচয়—সে হল কাব্য। অনুবাদে অন্তত তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনিটুকু ফোটাবার চেষ্টাও ছন্দের আশ্রয় ছাড়া কিছুতেই সফল হতে পারে না। সাধারণ পাঠকের কান মিল বা অন্ত্যানুপ্রাস ভালবাসে বলে অনেক জায়গায় তাও ব্যবহার করেছি, যদিও

বেদে অনুপ্রাস যমক এবং অন্যান্য শব্দালঙ্কারের ছড়াছড়ি থাকলেও অন্ত্যানুপ্রাসের রেওয়াজ নেই। অনুবাদে শব্দের আনুগত্য কিছুটা অস্বীকার করলে স্থানে স্থানে মর্মকে আরো স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করা যেত হয়ত (দ্র. পৃ ১০৬ ও ৪০১), তবু স্বচ্ছন্দ অনুবাদের লোভ সংবরণ করে শব্দানুগত্য বজায় রেখে চলেছি নানা কারণে।

মূলসূক্তের পাঠে (বাঁদিকের পৃষ্ঠায়) সন্ধিবদ্ধ সংহিতা-পাঠ ও বিশ্লিষ্টসন্ধি পদপাঠের মাঝামাঝি একটা পাঠ বেছে নিয়েছি, ছন্দ এবং অল্পসংস্কৃতজ্ঞদের কাছে বোধগম্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখে। পদ্যের মধ্যে সন্ধি করতেই হবে এরকম অদ্ভুত দাসত্ব-শৃঙ্খল বেদের কবিরা পরেন নি, দরকার মতো সন্ধি করেছেন এবং করেননি। মূল ছন্দের দোলাটাই তাঁদের কাছে মুখ্য, সন্ধি-টন্ধি গৌণ। তার জন্য দরকার হলে তৈরী শব্দকেও ভেঙে তাঁরা এক অক্ষর বাড়িয়ে নেন—স্বর্গকে করেন সুবর্গ।

কিছু আধুনিক বাংলা কবিতা ও মরমীয়া ইংরিজি কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি বক্তব্যের সমর্থনে। এছাড়াও অসংখ্য গভীর কবিতা রয়ে গেল যাদের মধ্যে খুঁজলেই পাওয়া যাবে বেদের সমধ্বনি।

স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত হালিসহর মঠের অধ্যক্ষ ৺স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীর অনুরোধে আর্যদর্পণ পত্রিকার জন্য বেদমন্ত্রের অনুবাদ ও ভাষ্য লিখতে আরম্ভ করি ১৯৭২ সালে। বর্তমান সম্পাদক স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতীও 'স্বাগ্রহে' প্রতিমাসে লেখাগুলি প্রকাশ করে চলেছেন। শ্রদ্ধেয় স্বামী করুণানন্দ সরস্বতী ও কল্যাণীয় ব্রহ্মচারী বিমলচৈতন্য এগুলি সংগ্রহ ও মুদ্রিত করার ভার নিয়েছেন। এঁদের প্রতিমাসের তাগাদা না থাকলে এ লেখা কোনদিন হত কিনা সন্দেহ। সবাইকে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। ভূমিকাটি ১৯৬৩-৬৪ সালে লেখা আমার Linguistic Atom নিবন্ধের একাংশের পল্লবন।

এইরকম অব্যবসায়িক গ্রন্থের প্রকাশন-ভার স্বীকার করে শ্রীপ্রসূন বসু আমাকে বাধিত করেছেন। শ্রীগোপাল প্রেস সুদীর্ঘ চার বছর ধরে নানা বাধাবিঘ্নের মধ্যে দিয়ে মুদ্রণকার্য সম্পন্ন করে আমাকে চিরঋণী করেছেন। কল্যাণীয়া শ্রীমতী কৃষ্ণা রায়মহাশয় আগাগোড়া সর্বতোভাবে এ বইয়ের সক্রিয় সঙ্গিনী। তাকে এবং সুমিতা নীলা আনন্দ রোহিণী ও অন্যান্য

স্নেহভাজনদের সাদর স্নেহ জানাই। দরদী শুভানুধ্যায়ী বিমলশঙ্কর ধর এ-বইয়ের প্রকাশনার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন প্রথম দিকে। তারপর রোগশয্যায় দীর্ঘদিন ধরে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন এর প্রকাশের। এইমাত্র খবর এল, তিনি আর ইহজগতে নেই। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাই বিষণ্নচিত্তে।

ইতি
গৌরী ধর্মপাল

সূচী

বেদের কবিতা / ভূমিকা

উপক্রম

বেদ একটি বিশাল সাহিত্য। একটি অপূর্ব বিশ্বাত্মযোগ-সাধনার সাধক-কবিদের—কয়েক শতাব্দী শুধু নয়, কয়েক সহস্রাব্দীব্যাপী—সাধনা ও সিদ্ধির ফসল। সংহিতা ব্রাহ্মণ আরণ্যক এবং উপনিষদ্—বৈদিক সাহিত্যের এই চারটি পর্ব। তার মধ্যে যেটি সংহিতা অংশ—যাকে আমরা সাধারণ ভাবে ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ ও অথর্ববেদ বলে থাকি—সেইটিই বেশী প্রাচীন। তার মধ্যেও আবার ঋগ্বেদ হল প্রাচীনতম, শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন lyrical epic of the soul in its immortal ascension, মানবাত্মার অমৃতে উত্তরণের মহাগীতিকাব্য।

ভাষা ছন্দ অলঙ্কার রূপক কবিকর্ম ঋষি দেবতা ইত্যাদি যে কোন দিক ধরেই এই মহাগীতিকাব্য ঋগ্বেদের অফুরন্ত আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এ-নিবন্ধে যে দিকটি ধরে আলোচনা করা হচ্ছে, তা হল বেদের অপৌরুষেয়বাদ। কেননা এরই সাহায্যে বেদের মূল ভাবটি, বৈদিক সাধনার মূল সুরটি, বেদের ঋষিকবিদের প্রাণের কথাটি বুঝতে পারা সহজ হবে।

॥ ১ ॥

বেদ অপৌরুষেয়, পুরুষের অর্থাৎ মানুষের লেখা নয়। ঋষিরা বেদের দ্রষ্টামাত্র, স্রষ্টা নন। কথাটা অনেকদিন ধরে আমাদের দেশে চলে আসছে। আমাদের দর্শনে কথাটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। এখন কথাটা একটু অন্য দিক দিয়ে ভেবে দেখা যাক।

ঋষিকবির মনীষাদীপ্ত হৃদয় বেদের জন্মভূমি। তার প্রথম পরিচয়, সে হল ছন্দঃ, কাব্য। পূর্ণদৃষ্টির, পূর্ণজীবনের সর্বচ্ছন্দা কাব্য।

তার দ্বিতীয় পরিচয়, সে হল শাস্ত্র। ঋষিকবির উদার অনির্বাণ প্রজ্ঞাদৃষ্টির সামনে যে সত্য ফুটে উঠেছিল, তা এত গভীর ব্যাপক বিশাল পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং অস্তম, যে মানুষ তাকে শাস্ত্রের মর্যাদা না দিয়ে পারে নি।

তাই বেদ একাধারে প্রভু সুহৃদ্ এবং কান্তা। সে সত্য এবং সেই সঙ্গে সুন্দরও। যদিও তার এই কান্তা-রূপ সুন্দর-রূপ তার শাস্তা-রূপের আড়ালে অনেকাংশে ঢাকা পড়ে গেছে। অথচ এই রূপটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে বেদের অপৌরুষেয়তার রহস্য।

যেহেতু বেদ শাস্ত্র, তথা আমাদের সমস্ত আস্তিক দর্শনগুলির আকর এবং প্রমাণ, সেহেতু তার পৌরুষেয়ত্ব অপৌরুষেয়ত্ব নিয়ে দর্শনকারেরা স্বভাবতই প্রশ্ন তুলেছেন। কেননা শাস্ত্রকে, প্রমাণকে হতে হবে সমস্ত রকমের ভ্রম-প্রমাদশূন্য, একেবারে ষোল-আনা খাঁটি। মানুষের রচনায় কোথায় সে সম্ভাবনা? তাই মীমাংসক বললেন, বেদ নিত্য, তাকে কেউ রচনা করে নি। পাতঞ্জল নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক বললেন, বেদ পুরুষের রচিত বটে, কিন্তু সে পুরুষ মানুষ নয়, স্বয়ং ঈশ্বর। নাস্তিক দার্শনিকেরা এসব কথা হেসে উড়িয়ে দিলেও এদেশে প্রাচীন-পন্থী বেদাধ্যায়ীরা বেদের অপৌরুষেয়ত্বেই দৃঢ়বিশ্বাসী।

কিন্তু অপৌরুষেয় বলতে ঠিক কী বোঝায়?

ভগবান বেদপুরুষ বা ব্রহ্মা বা সর্বজ্ঞ ঈশ্বর বেদ উচ্চারণ করে চলেছেন আর ঋষিরা নীরব দর্শক হয়ে তা দর্শন করে যাচ্ছেন, শ্রদ্ধাজড়েরা এটা অনায়াসে মেনে নিলেও যুক্তিবাদী মন এধরণের অপৌরুষেয়ত্বে কোনদিনই বিশ্বাস করে নি, আজও করবে না। স্বয়ং বেদের ঋষিদের সাক্ষ্যই এর বিরুদ্ধে যায়।

তা-ই যদি হবে, তা হলে বেদের অন্তর্নিহিত ঐক্য সত্ত্বেও ঋষি অনুসারে তার ভাব-ভাষা-ভঙ্গির এত বৈচিত্র্য কোথা থেকে এল? দীর্ঘতমা ঔচথ্য কথা কইছেন মরমিয়া ঠারে, মেধাতিথি কাণ্বের মধ্যে রয়েছে সুরেলা স্বচ্ছতা, বিশ্বামিত্রের বাণী ওজোদীপ্ত বেগবান্, বসিষ্ঠের মধ্যে দেখছি শান্ত স্নিগ্ধ সুষমা।[১] পুনরাবৃত্তি দিয়ে বাণীকে জোরালো করা ঋষি পরুচ্ছেপ দৈবোদাসির শৈলী[২], অতিচ্ছন্দের ব্যবহারও তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য। দেবতার প্রতি ঋষির একান্ত ব্যক্তিগত ভাব-ভালবাসার প্রকাশ ঋগ্বেদের বহু সূক্তে। যেমন ৭।৮৬, ৮৮-তে বসিষ্ঠের আর্তি বিশেষ করে বরুণের জন্যে, ১০।৯১তে ঋষি অরুণ প্রিয়া জায়ার মতোই উতলা প্রিয়তম অগ্নির জন্যে,[৩] ১০।১২০তে ইন্দ্রের সঙ্গে একদেহ হবার গৌরবে গরীয়ান্ ঋষি বৃহদ্দিব অথর্বা।[৪]

ঋগ্বেদের বহুজায়গায় রয়েছে **কবির ভণিতা**, যেখানে পাই তাঁর অথবা তাঁর কুলের মন্ত্রকর্তৃত্বের সংশয়াতীত শিলমোহর।

গায়ত্রীমন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র সগৌরবে ঘোষণা করছেন—

> **বিশ্বামিত্রস্য** রক্ষতি ব্রহ্মেদং ভারতং জনম্[৫],
>
> **বিশ্বামিত্রের** এই বাণী রক্ষা
> করছে ভারত জনকে অর্থাৎ ভরত কুলকে।

সবাইকার থেকে উজ্জ্বল করে, বিশিষ্ট করে, আপন পুত্রদের রচিত স্তোমের গৌরব গাইছেন ঋষি বসিষ্ঠ—

> সূর্যস্যেব বক্ষথো জ্যোতির্ এষাং
> সমুদ্রস্যেব মহিমা গভীরঃ।
> বাতস্যেব প্রজবো নান্যেন
> স্তোমো বসিষ্ঠা অন্ব্-এতবে বঃ[৬]
>
> সূর্যের মতো এদের জ্যোতি, বাড়ছে তো বাড়ছেই,
> সমুদ্রের মতো গভীর মহিমা, বায়ুর মতো বেগ।
> বসিষ্ঠের পুত্রেরা,
> কার সাধ্য **তোমাদের** গানের অনুকরণ করে?

কাঠকে কেটে-কুটে চেঁচে ছুলে কুঁদে শিল্পবস্তু তৈরি করে তক্ষা। এই প্রক্রিয়াটির নাম তক্ষণ। বেদে বহুজায়গায় মন্ত্ররচনা প্রসঙ্গে পাই এই √তক্ষ্

ধাতুর ব্যবহার। অর্থাৎ ঋষিকবি যেন কাটাকুটি গ্রহণ বর্জন করতে করতে গড়ে তুলছেন একটা নিটোল মন্ত্র বা সূক্ত বা স্তোম। এই ধাতুটির মধ্যে ঋষির শিল্পীসত্তার সক্রিয় সতেজ অক্লান্ত অনিমেষ উপস্থিতি টের পাই।

এবা তে **গৃত্‌সমদাঃ** শূর মন্ম···তক্ষুঃ[৭]

এমনি করেই **গৃত্‌সমদেরা,** ওগো শূর (ইন্দ্র),
তোমার উদ্দেশে তক্ষণ করেছে মন্ত্র।

অগ্নয়ে ব্রহ্ম **ঋভবস্‌** ততক্ষুঃ[৮]
অগ্নির উদ্দেশে **ঋভুরা** তক্ষণ করেছেন বাণী।

সনায়তে **গোতম** ইন্দ্র নব্যম্ অতক্ষদ্ ব্রহ্ম···**নোধাঃ**[৯]

সনাতন তুমি, তোমার জন্যে
নূতন মন্ত্রবাণী, হে ইন্দ্র,
তক্ষণ করে **নোধা গৌতম**।

ইমং স্ব-অস্মৈ হৃদ আ **সুতষ্টং**
মন্ত্রং বোচেম কুবিদ্ অস্য বেদত্[১০]
হৃদয় থেকে সুন্দর করে **তক্ষণ করা** এই মন্ত্র
আমি উচ্চারণ করব এই দেবতার উদ্দেশে,
ইনি সে মন্ত্রকে নিশ্চয় জানবেন।

ঋষির নিঃসংশয় মন্ত্রকর্তৃত্বের প্রমাণ মেলে √জন্ ধাতুর ব্যবহারেও—

আ ত্বায়ম্ অর্ক উতয়ে ববর্ততি যং **গোতমা অজীজনত্**[১১]

আমাদের রক্ষা করতে তোমাকে এদিকে ফেরাক এই গান,
যাকে জন্ম দিয়েছে গোতমেরা।

বংশানুক্রমিকভাবে মন্ত্রস্বত্ব কিভাবে সংক্রামিত এবং রক্ষিত হচ্ছে, তারো পরিচয় পাচ্ছি বামদেবের একটি মন্ত্রে, যেখানে তিনি বলছেন, যে-বাক্ দিয়ে আমি বলবানকে ধ্বংস করি, তা আমি পেয়েছি **আমার পিতা গোতমের**

কাছ থেকে। হে অগ্নি, আমাদের এই বচনকে তুমি জানো—

মহো রুজামি বন্ধুতা বচোভিস্
তন্ **মা পিতুর্ গোতমাদ্ অন্বিয়ায়**।
ত্বং নো অস্য বচসশ্ চিকিদ্ধি
হোতর্ যবিষ্ঠ সুক্রতো দমূনাঃ[১২]

মহাকবি অগস্ত্য মৈত্রাবরুণি নিজের সূক্তগুলিকে বারবার **মান-পুত্র কবি অগস্ত্যের রচনা** বলে চিহ্নিত করছেন—

অবোচাম নিবচনানি-অস্মিন্
মানস্য সূনুঃ সহসানে অগ্নৌ[১৩]

মানের পুত্র আমি
বিশ্ববিজয়ী **অগ্নিকে** শোনালাম এ গোপন বাণী।

যুবাং চিদ্ হি ষ্ম-অশ্বিনৌ অনু দ্যূন্
বিরুদ্রস্য প্রস্রবণস্য সাতৌ।
অগস্ত্যো নরাং নৃষু প্রশস্তঃ
কারাধুনীব চিতয়ত্ সহস্রৈঃ[১৪]

রুদ্রনিনাদে ঝরঝর ঝরে বিপুল প্রস্রবণ—
তাকে জিনে নিতে, ওগো **অশ্বীরা**, অনুদিন **অনুখণ**
জাগিয়ে তুলতে তোমাদের ডাক দিয়েছে শঙ্খস্বনে
লোকবিশ্রুত **এই অগস্ত্য** শত সহস্র গানে।

এই প্রস্রবণ হল বিশ্বকাব্যের অফুরন্ত নির্ঝর, যাকে ঋষি বিশ্বামিত্র বলেছেন 'অক্ষীয়মাণম্ উত্‌সং শতধারম্···' শতধার অফুরাণ ফোয়ারা' যেখানে পৌঁছলে সর্বদৃক সর্বজ্ঞ সর্বভূ হওয়া যায়। সেই নিত্যসুরের ধারায় পৌঁছন যায় সুরেরই পথ দিয়ে, যার বৈদিক নাম হল গাতু, গানের পথ (√গম্ ও গৈ-এর আশ্লিষ্ট রূপ)। তাই ঋষি অগস্ত্য দিনের পর দিন অজস্র গান গেয়ে চলেছেন, ঘুমন্ত দেবতার কানের কাছে ঘুম-ভাঙানি গান, বোধন-সঙ্গীত। বলছেন, জাগো হে অশ্বিদ্বয়, জাগো হে সত্যের যুগল মূর্তি, ছোটাও তোমাদের সৃষ্টিমাতাল পাগলা ঘোড়া পক্ষীরাজ, নিয়ে চল আমাকে সেই দেখা-না-দেখায় মেশা অনাহত জলপ্রপাতের

একান্ত নির্জন ধূ ধূ সৈকতে। আমি তাকে চোখ ভরে দেখব, কান ভরে শুনব। আমি ডুবতে চাই, মরতে চাই, বাঁচতে চাই তার আলো-ঝিকমিক কালো জলে।

বেদকে মানুষেরই রচনা বলে স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করছেন আর একজন মহাকবি মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ। তিনি বলছেন—

কা তে অস্তি-অরংকৃতিঃ সূক্তৈঃ
কদা নূনং তে মঘবন্ দাশেম।
বিশ্বা মতীর্ আ ততনে ত্বায়া-
অধা মে-ইন্দ্র শৃণবো হবেম
উতো ঘা তে পুরুষ্যা ইদ্ আসন্
যেষাং পূর্বেষাম্ অশৃণোর্ ঋষীণাম্।
অধাহং ত্বা মঘবন্ জোহবীমি
ত্বং ন ইন্দ্রাসি প্রমতিঃ পিতেব।[১৫]

সূক্তে তোমার কী বা হবে প্রসাধন ?
সত্যিই দিতে পারব তোমায় কবে বল মঘবন্।
তোমাকেই চেয়ে মন্ত্রে মন্ত্রে বিস্তার করি তান,
শোনো হে ইন্দ্র, শোনো শোনো শোনো আমার এ আহ্বান।
যেসব পূর্ব ঋষি কবিদের আহ্বান শুনেছিলে
মানুষই তো তারা ছিল গো সকলে, ছিল মানুষেরই ছেলে।
তাই বারে বারে ডাকছি তোমাকে, শোনো শোনো মঘবন্
ইন্দ্র, তুমি যে আমাদের পিতা, বন্ধু, আপনজন।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, বেদবাণী যে-অর্থেই অপৌরুষেয় হোক না কেন, পুরুষের ব্যক্তিগত শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ তার সর্বাঙ্গে মাখানো। এবং এ-পৌরুষ যে দেবতা বেশ পছন্দ করেন, শুধু তাই নয়, এই পৌরুষই যে দেবতার জনক পালক পোষক বর্ধক, তার প্রমাণও বেদময় ছড়ানো। ঋষি বসিষ্ঠ বলছেন, অকবি মানুষের মধ্যে নিহিত রয়েছেন এই অমৃতকবি অগ্নি। মানুষ ধরেছে এঁকে। ইনিও ধরা দিয়েছেন, মেনে নিয়েছেন এই **'পৌরুষেয়ী গৃভ্', মানুষের এই ধরা।**[১৬] যে-অগ্নি থেকে আসছে মানুষের কাব্য, মানুষের মনীষা[১৭], তিনিই আবার মানুষের 'সহসঃ সূনুঃ', 'ঊর্জো নপাত', অর্থাৎ বীর্যসম্ভব পুত্র।[১৮] যে-

ইন্দ্র কবিদের সেরা কবি[১৯], তিনি বেড়ে উঠছেন মানুষেরই গানে—পুরোন, নতুন, এবং এ-দুয়ের মাঝামাঝি সেই সব গান[২০]। যে-সবিতা আমাদের ধীকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দেন[২১], সেই কবির কবিকে ঠেলে তুলছে মানুষই[২২]। যে সোম ঋষিকৃত্[২৩], দুলিয়ে দেন ঋষির হৃদয়ে বাক্‌সমুদ্রকে[২৪], মানুষেরই নিয়ন্ত্রণে যজ্ঞভূমিতে তাঁর জন্ম এবং বৃদ্ধি।[২৫]

ঋষির **মন্ত্রকর্তৃত্ব** স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছেন ব্রাহ্মণও। তাণ্ড্যব্রাহ্মণ বলছেন, শিশু আঙ্গিরস ছিলেন মন্ত্রকৃত্‌দের মধ্যে মন্ত্রকৃত্, তিনি পিতৃগণকে আহ্বান করেছিলেন 'পুত্রক' অর্থাৎ 'খোকা' ব'লে! তাঁরা দেবতাদের জিজ্ঞেস করলে দেবতারা বললেন, যে মন্ত্রকৃত্ সে-ই তো পিতা।[২৬]

পূর্বোক্ত ধরণের অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাসী নন বেদাঙ্গকাররাও। যাস্ক বলছেন, 'এইরকম নানাধরণের অভিপ্রায় অনুসারে ঋষিদের মন্ত্রদর্শন হয়'।[২৭] দর্শন একটা অলৌকিক ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু অভিপ্রায় তো মানুষেরই। তাহলে মন্ত্রদর্শনের ব্যাপারে ঋষির ভূমিকা শুধু নিষ্ক্রিয় দর্শকের নয়। তাঁর আরো স্পষ্ট উক্তি হল, 'যে-কামনা নিয়ে যে-দেবতাতে অর্থপতিত্ব ইচ্ছা করে ঋষি স্তুতিপ্রয়োগ করেন, সেই মন্ত্র সেই দেবতার হয়।[২৮] এ মন্তব্যটিতে মন্ত্রের রচনাস্বত্ব যাস্ক পুরোপুরি ঋষিকেই দিচ্ছেন, অথচ তিনি একথাও ভোলেন নি যে যিনি দর্শন করেন, তিনিই ঋষি[২৯]; স্বয়ম্ভূ বেদ তপস্যারত ঋষিদের কাছে 'অর্ষণ' করেছিলেন অর্থাৎ 'এসেছিলেন' বলেই তাঁরা ঋষি[৩০]; এবং ঋষিরা ধর্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছিলেন।[৩১] অর্থাৎ এখানেও সেই বিরোধাভাস! অর্থাৎ **বেদের সৃষ্টি পৌরুষে-অপৌরুষে মানুষে-দেবতায় মেশামেশি একটা যুগ্মব্যাপার! joint authorship!**

পাণিনি তাঁর সূত্রে **মন্ত্রকার** পদটিকে স্বীকার করে মন্ত্রের পৌরুষেয়তা নির্দ্বিধায় মেনে নিচ্ছেন।[৩২] এবং তাঁর এ স্বীকৃতি বেদের ঋষিদের দ্বারা পুরোপুরি সমর্থিত।[৩৩]

অনুক্রমণিকা-কারও ঋষির লক্ষণ দিতে গিয়ে বলছেন, যাঁর বাক্য, তিনিই ঋষি।[৩৪] সেই ঋষি অথবা ঋষিবাক্যের দ্বারা যিনি উক্ত হন, তিনিই দেবতা।[৩৫] এই বাক্য যেখান থেকেই আসুক না কেন, তা যে একান্তভাবে ঋষিরই বাক্য, এ বিষয়ে তাঁর তিলমাত্র সন্দেহ নেই। লক্ষণ দেওয়ার সময় তিনি আগে ঋষিকে, পরে দেবতাকে এনেছেন, এ-ও লক্ষ্য করার বিষয়।

যাজ্ঞিকরা যখন উহ করেন, অর্থাৎ যজ্ঞের প্রয়োজনে মন্ত্রের বচনে-লিঙ্গে-বিভক্তিতে নানারকম অদলবদল করেন, তখন তাঁদেরও গলা কাঁপে না, অর্থাৎ তাঁরাও মেনে নিচ্ছেন যে একটু-আধটু পৌরুষেয় আঁচড়ে মন্ত্রের অপৌরুষেয়ত্ব ক্ষুন্ন হয় না।

তাহলে 'বেদ অপৌরুষেয়'—এ কথার অর্থ কী?

॥ ২ ॥

কবির হৃদয়ে কাব্যের জন্ম কি করে হয়? —এই প্রশ্নের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে বেদের অপৌরুষেয়ত্বের প্রশ্ন। যে অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য রহস্যময় প্রক্রিয়ায় মহৎ কবিতার জন্ম হয়, যখন কবির হৃদয়-মনীষা-মন-প্রাণ-সত্তা পরিপূর্ণতমভাবে সক্রিয় থেকেও যেন নিষ্ক্রিয়বত্ (passive), যে-সময় কবি সৃষ্টির মধ্যে পুরোপুরি জড়িত থাকা সত্ত্বেও মনে হয় সৃষ্টি যেন আপনা-আপনি হয়ে চলেছে, প্রেরণায় আর পরিশ্রমে, আবেশে আর আয়াসে, inspiration আর perspiration-এ অচিন্ত্যভেদাভেদ সেই সৃষ্টিক্রিয়ার নবজাতক-কাব্যকে আর কী নাম দেওয়া দেতে পারে 'অপৌরুষেয়' ছাড়া, যদিও তা চূড়ান্তভাবে পৌরুষেয়ও বটে?

এই সময় কবির হৃদয়সমুদ্রে চলে বিপুল আলোড়ন, যেন প্রলয়পয়োধির জলোচ্ছ্বাস, যেন দেবাসুরে মিলে সমুদ্রমন্থন। আর তার ভেতর থেকে কবি জেগে উঠতে থাকেন হিমালয়ের মতো বিশাল উত্তুঙ্গ মহিমায়। ওপর থেকে নেমে আসে বাণীর বিপুল প্লাবন,[৩৬] ভাসিয়ে দেয় ডুবিয়ে দেয় ভেঙে চুরমার করে দেয় তাঁর আগের জীবন, আগের ভাষা, আগের পৃথিবী। সেই নিমগ্ন চরাচরে দাউ দাউ উত্তাল জলরাশির মধ্যে কি এক প্রেমের স্বপ্ন বুকে নিয়ে হিরণ্যগর্ভের মতো ভেসে বেড়ান কবি। সেই বিপুল আনন্দ-বেদনার মধ্যেই মহৎ কাব্যের জন্ম হয়। এই হল মহৎ কাব্যের অপৌরুষেয় জন্মকথা, immaculate conception[৩৭].

কবি তখন একটি রম্য রুদ্র বীণা[৩৮], তাতে 'যখন তুমি বাঁধছিলে তার সে যে বিষম ব্যথা'। এমন কি যখন 'কোলে তুলে নিলে সেতার', তখনও 'মিড় দিলে নিষ্ঠুর করে।' এই দেহবীণা নিঙড়ে নিঙড়ে সুর বার করছেন এক অদৃশ্য

সুরকার। বীণা বাজছে। কর্মকর্তৃবাচ্য। বাঁশি বাজছে। বাউল বলছেন, ধন্য আমি বাঁশিতে তোর আপন মুখের ফুঁক। যে বাজাচ্ছে তার সঙ্গে বীণা বাঁশি প্রায় একাকার। মহা-কাব্য যখন মহা-কবির লেখনী দিয়ে নিঃসৃত বা জিহ্বায় উচ্চারিত হতে থাকে, তখন সে-লেখনী, সে-হাত, সে-জিভ হয়ে যায় যেন বিশ্বস্রষ্টারই লেখনী, হাত, জিভ। কবি হয়ে যান তাঁর যন্ত্র। যন্ত্র নয়, সচেতন মাধ্যম। মাধ্যম নয়, বন্ধু বঁধু প্রাণসখা দোসর আত্মার-আত্মীয় আত্মা।

ক্রৌঞ্চীর ব্যথায় কারুণ্যাবিষ্ট হয়ে বাল্মীকি 'মা নিষাদ' শ্লোকটি উচ্চারণ করেই বলেছিলেন, 'কিম্ ইদং ব্যাহৃতং ময়া।' এর দুটি অর্থ, এ আমি কী বললাম! আর, এ কি আমি বললাম! দুই-ই সত্য। আমিই বলেছি, অথচ, আমি যেন বলি নি, এ যেন এক অন্য আমি, নতুন আমি। এই আমার দিকে, আমার যেন এই প্রথম জন্মানো বাণীর[৩৯] দিকে চেয়ে আমার বিস্ময়ের অন্ত নেই। এ কি আশ্চর্য আবির্ভাব আমার মধ্যে আমার!

এই অর্থেই অপৌরুষেয় বেদ। এই অর্থেই অপৌরুষেয় কালজয়ী মহৎ কবিতা মাত্রই। এমন কি কবি যেখানে ঋষি হয়ে ওঠেন নি, সেখানেও কবিতা তার স্বভাবধর্মেই পৌরুষেয়ে-অপৌরুষেয়ে মেশামেশি হয়ে থাকে। অপৌরুষেয়-তার পরিমাণে তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু মূল বস্তুতে তফাৎ নেই। এ তারতম্য বেদের কবিতার মধ্যেও আছে। কেউ বলছেন, এ বাণী এ মনীষা আমি পেয়েছি দেবতার কাছ থেকে।[৪০] কেউ বলছেন, এই-আমিই সেই মহাশূন্য যেখান থেকে নামে বাকের নির্ঝর।[৪১] দেবতাকে কেউ বলছেন সে বা তিনি, কেউ বলছেন তুমি, কেউ বলছেন আমি। পরোক্ষকৃত, প্রত্যক্ষকৃত ও আধ্যাত্মিক—বৈদিক রচনার এই তিনটি স্তরে[৪২] ক্রমশ ক্ষীয়মাণ পৌরুষেয়তা, ক্রমশ বর্ধমান অপৌরুষেয়তা। বেদ—তথা যে কোন রচনার—মহত্ত্ব অপৌরুষেয়-তার অস্তিত্বে নয়, অপৌরুষেয়তার প্রগাঢ়তায়।

এ সিদ্ধান্তের অনুকূলে সাক্ষী স্বয়ং বেদের ঋষিরা। সাক্ষী রবীন্দ্রনাথ—পূর্বপশ্চিমসমুদ্রাবগাহী সেই দেবতাত্মা কবি, যাঁর কাব্য বৈদিক ভাবের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ, এবং সেইজন্যেই এই নিবন্ধে যাঁকে বিশেষ করে করতে চাই বেদের কবিতার মানদণ্ড। সাক্ষী সর্বদেশের সর্বকালের কবিচিত্ত।

॥ ৩ ॥

কবি কে ?

যিনি সবার সঙ্গে প্রায়-এক, এবং এই সর্বমিলনের আনন্দপুলক, পুরোপুরি-মিলতে-না-পারার বেদনার সঙ্গে মেশামেশি হয়ে, যাঁর হৃদয় থেকে, আত্মার, সত্তার গভীরতম প্রদেশ থেকে এক আশ্চর্য অ-লৌকিক তরঙ্গিত ভাষা হয়ে বেরিয়ে আসে। বেদের ভাষায় যিনি 'সর্বতাতি' অর্থাৎ সর্বাত্মভাবকে[৪৩] পেয়েছেন, অর্থাৎ সবার মধ্যে ছড়িয়ে চলেছেন, একবার নয়, বারবার, শুধু আজকে নয়, কালকেও, শুধু এখনকার মতো নয়, বরাবরের মতো। যত গভীর হয় তাঁর কবিধর্মে স্থিতি, তাঁর এই ছড়িয়ে যাওয়া এবং ছড়িয়ে যাওয়ার কামনা তত গভীর হতে থাকে। 'অদ্যা চ সর্বতাতয়ে শ্বশ্ চ সর্বতাতয়ে'[৪৪], আজও সর্বতাতি চাই, কালও সর্বতাতি চাই, বলছেন ঋষি বার্হস্পত্য ভরদ্বাজ। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বারবার ধ্বনিত হচ্ছে এই একই আকৃতি—ওগো মা মৃন্ময়ী, তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই, ইচ্ছা করে, আপনার করি যেখানে যা কিছু আছে···ইচ্ছা করে মনে মনে, স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোকসনে দেশে দেশান্তরে, সকলের ঘরে ঘরে জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে, নিখিলের সেই বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্তেই একত্রে করিব আস্বাদন, এক হয়ে সকলের সনে।[৪৫]

কবি কীট্সের দৃষ্ট কবি-স্বরূপ পাশাপাশি রাখি—

'Tis the man who with a man
Is an equal, be he king,
Or poorest of the beggar-clan,
Or any other wondrous thing
A man may be 'twixt ape and Plato ;
'Tis the man who with a bird,
Wren or Eagle, finds his way to
All its instincts ; he hath heard
The Lion's roaring, and can tell
What his horny throat expresseth,
And to him the Tiger's yell

Comes articulate and presseth
On his ear like mother-tongue[46]

সার্বভৌম সম্রাট্ থেকে দীনতম ভিখারি পর্যন্ত, পশু থেকে প্লেটো পর্যন্ত সবার সঙ্গে এক যে মানুষ, সেই কবি। সে জানে ছোট্ট নিরীহ রেন থেকে সুরু করে মস্ত হিংস্র ঈগল পর্যন্ত যে কোন পাখির মর্মরহস্য, সিংহের গর্জনের মানে তার কাছে দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার, বাঘের ক্রুদ্ধ চীৎকার তার কানে এসে লাগে ঠিক বর্ণধ্বনিময় মাতৃভাষারই মতো।

অর্থাৎ পশু-পাখি মানুষ সবারই সঙ্গে কবি একাত্ম। এরই জন্যে কবিচিত্ত সর্বদা লুব্ধ মধুলোভী ভ্রমরের মতো, 'আহা সেই একাকার,'[47], এবং না পেলে ক্ষুব্ধ—

জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।[48]

রবীন্দ্রনাথের মতো মহাকবিও কোন ব্যর্থতার মুহূর্তে একথা বলেছেন।

এখনো মেলে নি সেই ওতপ্রোত লয়[49]

স্বীকার করছেন একালের কবি।

এই একাকারের অনুভব কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে, তার নিদর্শন হিসেবে উদ্ধৃত করছি স্বামী রামতীর্থের একটি উর্দু কবিতার ইংরিজি অনুবাদ—

Lo! the trees of the wood are my next of kin,
And the rocks alive with what beats in Me;
The clay is My flesh, and the fox My skin,
I am fierce with the gadfly, and sweet with the bee.
The flower is but the bloom of My love,
And the waters run down in the tune I dream.
The Sun is my flower up hung above,
I flash with the lightning, with falcons scream,

I cannot die though for ever death
Weave back and fro in the warp of Me,
I was never born, yet my births of breath
Are as many as waves on the sleepless sea.
My breath doth make the flowers fragrant,
My eyebeams cause the Sun's bright light.
The sunset mirrors My cheek's rose blushes,
My aching love holds stars so tight,
Sweet streams and rivers My veins and arteries,
My beauteous hair the fresh green trees.
What giant strength ! My bones are mountains,
O joy ! the fairy world My bride.
Nay, talk no difference, wonder of wonders,
Myself the bridegroom, I the bride ![৫০]

বনে বনে ঐ বনস্পতিরা আমার স্বজন সব,
পাহাড়ের বুক করে ধুকধুক আমার হৃদয়স্পন্দে,
আমার মাংস এই মৃত্তিকা, শৃগাল আমার ত্বক,
ডাঁশের সঙ্গে আমিও হিংস্র, মধুর ভ্রমর-সঙ্গে।
গাছে গাছে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে আমারি তো ভালবাসা,
গান গেয়ে নদী বয় সে আমারি স্বপ্নস্বরের ভাষা।
ঊর্ধ্বে তুলিয়ে দিয়েছি সূর্য—আমারি সূর্যমুখী
বিদ্যুৎ হয়ে ঝলক দি আমি বাজ হয়ে ডেকে উঠি।
আমি তো মরতে পারি না, যদিও মৃত্যু সে চিরদিন
আমারি টানায় পোড়েন চলেছে বুনে বুনে যতিহীন।
আমি তো কখনো জন্ম নিই নি, তবু মোর শ্বাসে শ্বাসে
জাগর সাগরে ঢেউয়ের মতন অগণ জন্ম ভাসে।
আমার নিশ্বাসে সুরভি হয়েছে যত ফুল আছে যেখানে,
ঝলমলে ঐ রবি-আলো গড়া আমারি নয়নকিরণে।

আমারি গালের লাজারুণ রঙে গোধূলি-গগন রাঙে,
ঐ তারাদের
আমার আর্ত প্রেম বেঁধেছে কী নিবিড় আলিঙ্গনে।
মধু স্রোতোধারা ঝরণা নদীরা আমারি ধমনী শিরা,
আমারি তো মনোহর কেশদাম নব শ্যাম বৃক্ষেরা।
কি মহা বীর্য! অস্থি আমার পর্বত—হিমালয়,
কি আনন্দ! এ অপ্সরা ধরা আমারি পিয়ারী বধূ!
না, না, রাখো, রাখো, ঘুচে গেল ভেদ, এ কি মহা বিস্ময়!
আমিই তো বর, আমিই আবার বধূ!

ইনিই কবি। আত্মার বাণী-মূর্তি। সত্তার তন্তুতে তন্তুতে প্রেমিক। সর্বানুভূ। সর্বভূ। 'যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি-আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ'[৫১] সমস্ত ভূত যাঁর আত্মাই হয়ে গেছে, সেই বিজ্ঞানী। কবিত্বের পরাকাষ্ঠা বলে যদি কিছু থাকে, তাহলে তা এ-ই। কবিতে আর ঋষিতে তখন কিছু তফাৎ থাকে না। তখন তিনি একাধারে দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা, নিজেরই প্রাণের গভীর গোপনে দেখতে থাকেন সেই মহা-আপনকে, যাঁর মধ্যে সমস্ত বিশ্ব একনীড়—

বেনস্ তত্ পশ্যন্ নিহিতং গুহা সদ্
যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।[৫২]

কবিকর্মের অনন্ত বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু কবিধর্মের মূল সুর এইটিই। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই কবি-ত্ব লাভের জন্যই নিরন্তর প্রয়াসশীল, অন্তরে-বাইরে সমস্ত অমিলের সঙ্গে অক্লান্ত সংগ্রামে রত বিশ্বের কবিকুল—

হারানো ছড়ানো পাগল খুঁজছে
ফিরে সে আপন হবে।[৫৩]

অমিল অনেক, সে কি আমিও জানি না?
এ প্রায় ছাত্রের কাছে পৃথিবীর কমলালেবুকে
আধাআধি ভাঙার প্রয়াস।
অথচ গভীর প্রেমে আকাশের বুকে বাঁধা তবু
সূর্য থেকে ঘাস।
আমি সে মিলের স্পর্ধা নিয়ে

> সবারি বুকের মাটি সরিয়ে দেখেছি প্রবাহিত
> ভালোবাসা ! একবার সে অঞ্জলি ভরে যদি, আর
> জীবন থাকে না কারো মৃত।[৫৪]

এই অমৃতেরই ক্ষুধার্ত কাঙাল ভিখারী, অদম্য পিপাসু, অশ্রান্ত তপস্বী, সন্ধানী দস্যু হানাদার কবিরা। একে ছিনিয়ে নেওয়া চাই, এই তার স্পর্ধা, এই তার দুর্জয় সঙ্কল্প। শত মৃত্যুতেও মরে না এই রক্তবীজ, এই অমৃত-বিহঙ্গ। 'তরুণ গরুড় সম কি মহৎ ক্ষুধার আবেশ পীড়ন করিছে তারে, কি তাহার দুরন্ত প্রার্থনা। অমর বিহঙ্গশিশু কোন বিশ্বে করিবে রচনা আপন বিরাট নীড়'—অনুভব করেছেন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ। ঋগ্বেদের ঋষি ঐন্দ্র বসুক্রও অনুভব করেছেন, তাঁর প্রজ্বলন্ত স্তোম যেন একটি বিহঙ্গ-শিশুর মতো নীড়ে বসে বিপুল কামনা নিয়ে তাকিয়ে দেখছে চারিদিক—বনে ন বায়ো ন্যধায়ি চাকন্ শুচির্ বাং স্তোমঃ।[৫৫] কবির ছন্দের পাখি সর্বনাশের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে জয় করে আনবে এই অমৃতসোমকে— এই হল একজন সত্যিকার কবির সারাজীবনের সাধনা।

কাব্যসাধনা--

আত্মসাধনা তথা প্রেমসাধনা তথা জীবনসাধনারই নামান্তর।

॥ ৪ ॥

এ যুগের কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একজন, যিনি নিজের রচনার অপৌরুষেয়ত্ব স্পষ্টভাবে অনুভব ও অকুণ্ঠভাবে উচ্চারণ করেছেন, একবার নয়, বারবার। তাঁর আত্মপরিচয় গ্রন্থে তিনি বলছেন—

আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই— এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে **আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না**। যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি, আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে।··· সে-সকল লেখা উপলক্ষ্য মাত্র—তাহারা যে-অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে **আর-একজন কে রচনাকারী আছেন**, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান। ফুৎকার বাঁশির এক-একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়া এক-একটা সুর জাগাইয়া তুলিতেছে, এবং নিজের কর্তৃত্ব উচ্চস্বরে প্রচার করিতেছে, কিন্তু কে সেই বিচ্ছিন্ন সুরগুলিকে রাগিণীতে

বাঁধিয়া তুলিতেছে? ফুঁ সুর জাগাইতেছে বটে, কিন্তু ফুঁ তো বাঁশি বাজাইতেছে না।

চিত্রার অন্তর্যামী কবিতায় এই অপৌরুষেয়-তত্ত্ব, তাঁর কাব্যের এই অপৌরুষেয় জন্মকথা আরো হৃদয়গ্রাহী করে বলেছেন কবি—

এ কী কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।

অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সংগীতস্রোতে কূল নাহি পাই,
কোথা ভেসে যাই দূরে।
... ...
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মতো।
আমি কি গো বীণাযন্ত্র তোমার,
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্ছনাভরে গীতঝঙ্কার
ধ্বনিছ মর্মমাঝে?

একটি গানের মধ্যে বলছেন তাঁর গানের জন্ম-রহস্য—

কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে,
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে॥

যে কথাটি বলব তোমায় ব'লে
কাটল জীবন নীরব চোখের জলে
সেই কথাটি **সুরের হোমানলে**
উঠল জ্বলে একটি আঁধার ক্ষণে—
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে ॥

ভেবেছিলেম আজকে সকাল হলে
সেই কথাটি তোমায় যাব বলে

ফুলের উদাস সুবাস বেড়ায় ঘুরে
পাখির গানে আকাশ গেল পূরে
সেই কথাটি লাগল না সেই সুরে
যতই প্রয়াস করি পরাণপণে
যখন তুমি আছ আমার সনে।[৫৬]

বিরহের শূন্যতার মধ্যে যখন কিছু নেই, 'আমি' নেই, 'পুরুষ' নেই, তখন সেই আত্ম-হারা শূন্যপটে অপৌরুষেয় সুরের আকস্মিক আবির্ভাব অগ্নিশিখার মতো, বিদ্যুতের মতো, সূর্যের মতো, অন্ধকার আকাশে চন্দ্রকলার মতো। ব্যক্তির সচেতন প্রয়াসে সে-সুর ধরা দিল না।

একজন ইংরেজ কবির অনুরূপ অভিজ্ঞতা—

When the quick stir of thought is stayed
And, as a dream of yesterday,
The bonds of striving fall away :
There dawns sometimes a point of fire
Burning the utter dark.[৫৭]

অতি অন্তরঙ্গ রচনা ছিন্নপত্রেও কবি বলছেন,—

আশ্চর্য এই যে, আজকাল আমার কবিতার প্রশংসা শুনলে আমার মনে সেরকম একটা পুলক সঞ্চার হয় না। আসলে, তার কারণ, যে-আমাকে লোকে প্রশংসা করছে সেই-আমিই যে কবিতা লিখে থাকে এ আমার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমি জানি, যে সমস্ত ভালো কবিতা আমি লিখেছি সে

আমি ইচ্ছে করলেই লিখতে পারি নে—তার একটা লাইন হারিয়ে গেলেও বহু চেষ্টায় সে লাইন গড়তে পারি কিনা সন্দেহ।...যে-শক্তি আমাকে লেখায় সে আমার ক্ষমতার বাইরে।[৫৮]

অর্থাৎ গদ্যে পদ্যে গানে প্রকাশ্যে জনান্তিকে মহাকবি বারবার এই স্বীকারোক্তিই করছেন যে **আমার রচনা আমার নয়,** আমার প্রাণপণ চেষ্টা দিয়েও আমি সে-কথা, সে-সুর, সে-গান রচনা করতে পারি না, যা আমার অন্তরস্থ রচয়িতা বা রচয়িত্রীর একটি ইঙ্গিতে আপনি জ্বলে ওঠে। অর্থাৎ তিনি অনুভব করছেন তাঁর কাব্যের অপৌরুষেয়ত্ব এবং স্বয়ম্ভূত্ব, যা বেদের কবিতারও স্বরূপলক্ষণ। সেই সঙ্গে একথাও ভুললে চলবে না যে তাঁর জীবন-ব্যাপী তপস্যা তথা পৌরুষেয় প্রয়াসের উপলবন্ধুর ভূমি বেয়েই নেমেছে এই ছন্দ-স্বরের প্রপাত। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ঠিক এই কথাটিই বলছেন, তপস্যারত অজ পৃশ্নিদের কাছে স্বয়ম্ভূ বেদ এলেন, তাইতে তাঁরা ঋষি হলেন।[৫৯]

কাব্যের এই অলৌকিক জন্ম-রহস্য সম্পর্কে বাংলার আর একজন কবিপ্রধান জীবনানন্দ দাশ মৃদু অথচ সুস্পষ্টস্বরে বলছেন—

যাঁরা বলেন সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে—পৃথিবীর কিংবা স্বকীয় দেশের বিগত ও বর্তমান কাব্যবেষ্টনীর ভিতর চমৎকার রূপে দীক্ষিত হয়ে নিয়ে, কবিতা রচনা করতে হবে, তাঁদের এ দাবির সম্পূর্ণ মর্ম আমি অন্তত উপলব্ধি করতে পারলাম না। কারণ আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে, খণ্ডবিখণ্ডিত এই পৃথিবী মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও[৬০] এক এক সময় যেন থেমে যায়—একটি পৃথিবীর-অন্ধকার-ও-স্তব্ধতায় একটি মোমের মত যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে ধীরে কবিতা-জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়। এই চমৎকার অভিজ্ঞতা যে-সময় আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে যায়, সে-সব মুহূর্তে কবিতার জন্ম হয় না, পদ্য রচিত হয়, যার ভিতর সমাজশিক্ষা, লোকশিক্ষা, নানারকম চিন্তার ব্যায়াম ও মতবাদের প্রাচুর্যই চিত্তকে খোঁচা দেয় সবচেয়ে আগে এবং সবচেয়ে বেশি করে।[৬১]

অতুলপ্রসাদের অভিজ্ঞতাও একই রকম—

যখন তুমি গাওয়াও গান
তখন আমি গাই।

তুমি গাও তুমি গাও গো
গাহ মম জীবনে বসি,
বেদনে বাঁধা জীবন-বীণা
ঝঙ্কারি বাজাও।

কবিতার জন্ম সম্পর্কে আরো কয়েকজন একালের কবির অভিজ্ঞতা শোনা যাক—

এককালে কবিতার সঙ্গে আমার সরল একটি ভালোবাসা ছিল। মনে একটা ভাব জাগে বা অস্পষ্ট কোন কল্পনা, বা এমন-কিছু ঘটে যার অভিঘাত আমার উপর তীব্র; আমি খাতা খুলে বসি, লাইনগুলো ঝরঝর করে বেরিয়ে আসে। ভাবতে হয় না, কাটাকুটি অদলবদলের বালাই নেই; এত স্বচ্ছন্দে আমার কলম চলে যে এক ঘণ্টার মধ্যে একটি পঞ্চাশ লাইনের কবিতাও লিখে উঠতে পারি—অনায়াসে ও নিষ্কণ্টক ভাবে। ...যা লিখছি তা ভালো হবে কি হবে না, **তা পুরোপুরি দৈবের ওপর নির্ভর করছে...যেটা উৎরে গেল সেটার জন্য আমার কোন দায়িত্ব নেই,** সত্যি বলতে। তারপর আমার বিশ্বাস জন্মাল যে **কবিতা লেখাও একটা কাজ**—খাটুনির অর্থে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলার অর্থে কাজ—আর তার জন্যে নানা ধরণের প্রস্তুতিরও প্রয়োজন হয়।...অনেক সময় কবির কিছুই করার থাকে না, অপেক্ষাই তাঁর কাজ হয়ে ওঠে।...কবিতা আমাদের সচেতন ও অচেতন মনের সন্ধিস্থল; **আমাদের সব মনন ও পরিশ্রম সত্ত্বেও আমরা তার শেষ রহস্যের দ্বার এতটুকু ফাঁক করতেও পারি না।**[৬২]

ক্রমে নেশার মত পেয়ে বসল শব্দ। নিরাকার নিরবয়ব নয়। রূপরসগন্ধ-স্পর্শশব্দ দিয়ে আমি তাদের যেন ধরতে ছুঁতে পারি। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে, মাঠে খেলতে খেলতে, মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে **হঠাৎ তারা ধরা দেয়।**[৬৩]

বক্তব্য এখানে (অর্থাৎ কবিতায়) অনেকটা **উপলব্ধির** মতো। কিম্বা বলা যায় **উদ্ভাসন**—যা চেষ্টা করে পাওয়া যায় না, ছক বেঁধেও নয়—কেমন করে আসে আমি অন্তত তার ফর্মুলা আবিষ্কার করতে পারি নি।[৬৪]

কে ইনি, যাঁর স্বতন্ত্র স্বাধীন বিদ্যুৎবৎ শক্তিভরপূর অস্তিত্ব এমন কি অবয়ব পর্যন্ত অনুভব করছেন কবিরা, যিনি কখনো ধরা দেন, কখনো দেন না, আর ধরা দিলেও থাকেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে?

॥ ৫ ॥

ইনিই বৈদিক ঋষির বাক্‌। ব্রহ্ম স্বয়ম্ভূ, আপনি হওয়া বৃহৎ। দিব্য সুপর্ণ, আলোর পাখি। আত্মা।

কবির অন্তরে ইনি কবি। রবীন্দ্রনাথ এঁকে বলেছেন আদিকবি, কবিগুরু।[৬৫] বেদ এঁকে বলছেন, প্রতি অকবির অন্তরে নিহিত কবি[৬৬], কবিদের মধ্যে কবি[৬৭], কবি-তর[৬৮], কবি-তম[৬৯], মহাকবি।[৭০]

এঁকে নানান নামে ডেকেছেন নানান রূপে উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্রনাথ—মানসসুন্দরী, প্রিয়া, আজন্মসাধনধন সুন্দরী কবিতা কল্পনালতা, মর্মের গেহিনী, প্রণয়বিধুরা সীমন্তিনী, জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী[৭১], দেবতা, জীবনদেবতা, মোহিনী নিষ্ঠুরা রক্তলোভাতুরা কঠোর স্বামিনী[৭৩], প্রভু, স্বামী, নাথ, ত্রিভুবনেশ্বর, মহারাজ, প্রিয়তম, অন্তরতর, অন্তরতম, আমার প্রাণে গভীর গোপন মহা-আপন,[৭৪] **আমার প্রেয়সী আমার দেবতা আমার বিশ্বরূপী।**[৭৫]

এঁকে নানারূপে উপলব্ধি করেছেন বেদের ঋষি—প্রেমিকা, জায়া, প্রেমিক, সখা, পতি, পিতা, মাতা, পুত্র, প্রভু, রাজা, আপন, আমি। এঁকে ডেকেছেন নানান নামে—অগ্নি সোম ইন্দ্র মিত্র বরুণ সূর্য সবিতা বিশ্বদেব।

> ইন্দ্র; মিত্র, বরুণ, অগ্নি—সবি তার ডাক-নাম
> সেই তো আবার স্বর্ণপক্ষ আলোকবিহঙ্গম।
> সেই একই আছে, নানা নামে তাকে ডাকছে আবেগে কবিরা
> কখনো অগ্নি, মাতরিশ্বন্‌, কখনো বলছে যম।[৭৬]

একই দিব্য-পার্থিব মর্ত্য-অমৃত অনুভবের অনন্ত স্তর, অনন্ত রূপ, অনন্ত নাম। এই বিশ্বচরাচরজোড়া বাক্‌-বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে হৃদয়ে অনুভব করে ঋষি বৈরূপ সধ্রি বলছেন—

> সহস্রধা পঞ্চদশানি-উক্‌থা
> যাবদ্‌ দ্যাবাপৃথিবী তাবদ্‌ ইত্‌ তত্‌।
> সহস্রধা মহিমানঃ সহস্রং
> যাবদ্‌ ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্‌[৭৭]

> পনেরটি স্তুতি আছে অনন্ত ঠাঁই
> আকাশ পৃথিবী সমস্ত আছে পূরে',

আছে অনন্তে অনন্ত মহিমায়,
ততদূর আছে বাক্, যতদূর ব্রহ্ম রয়েছে জুড়ে।

বাক্ এবং ব্রহ্ম, শব্দ এবং সব, এই নিত্যসম্পৃক্ত যুগলমূর্তি দর্শন করে সেই দর্শনের স্বাক্ষর রেখে গেছেন ঋষি ত্রিত আপ্ত্য একটি অর্ধনারীশ্বর শব্দে—ব্রহ্মী![৭৮]

সর্বব্যাপিনী সর্বদেবতাময়ী[৭৯] সর্বময়ী—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বিশ্বরূপী'—এই ব্রহ্মী বাকের সঙ্গেই অভিন্নাত্মা অভিন্ননামা হয়ে অম্ভৃণ-কন্যা ঋষিকা বাক্ দর্শন করেছিলেন সমস্ত বেদের সার বাক্-বা দেবী-সূক্ত[৮০], যেখানে দেখতে পাই প্রচণ্ড প্রেমে বিশ্বভুবনকে আত্মসাৎ করে জগন্মাতা রাজরাজেশ্বরী সর্বাত্মভূতা হয়ে বিপুল মহিমায় বিরাজ করছে এক মানুষের মেয়ে, এক মহাকবি কবিতমা মানুষী।

॥ ৬ ॥

এই আশ্চর্য প্রেমিকা বাক্ কবিকে কামনা করেন, বরণ করেন, নিজে যেচে এসে ধরা দেন, প্রেমে অধিকার করেন তার সর্বস্ব—রহস্যময় অপৌরুষেয়-তত্ত্বের এ হল গোড়ার কথা। এঁকে কামনা করা, এঁর জন্য সাধনা করা কবির স্বভাব, কিন্তু শুধু সেই কামনা-সাধনা দিয়ে এঁকে পাওয়া যায় না, যতক্ষণ-না যদি-না ইনি নিজে এসে ধরা দেন। বাক্সূক্তের কবির মুখ দিয়ে ইনি নিজেই বলছেন—

যং কাময়ে তং তম্ উগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তম্ ঋষিং তং সুমেধাম্[৮১]

আমি যাকে চেয়ে বসি,
তাকে তাকে করি ওজস্বী, তাকে
ব্রহ্ম, মেধাবী, ঋষি।

জ্ঞানসূক্তের ঋষি বৃহস্পতিও সায় দিচ্ছেন—

উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্
উত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোতি-এনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে
জায়েব পত্যে-উশতী সুবাসাঃ[৮২]

দেখেও দেখে না বাক্‌কে অনেকে,
শুনেও শোনে না কেউ কেউ এঁকে,[৮৩]
আবার এমনও কেউ কেউ আছে,
অনাবৃত করে দেন যার কাছে
তনুটি, যেন সে হৃদয়ের রাজা,
তিনি জায়া অপরূপ-সাজে-সাজা
উতলা অধীরা কামিনী।

রবীন্দ্রনাথের অনুভব প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়—

কী উৎসব হয়েছিল আমার জগতে
যেদিন প্রথম তুমি পুষ্পফুল্ল পথে
লজ্জামুকুলিত মুখে রক্তিম অম্বরে   **সুবাসাঃ**
বধূ হয়ে প্রবেশিলে চিরদিন-তরে   **জায়া**
আমার অন্তর-গৃহে···
ছিলে খেলার সঙ্গিনী।
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

... .

কী বলিতে চাও মোরে প্রণয়বিধুরা   **উশতী**
সীমন্তিনী মোর, কী কথা বুঝাতে চাও।
কিছু বলে কাজ নাই—শুধু ঢেকে দাও
আমার সর্বাঙ্গমন তোমার অঞ্চলে,
সম্পূর্ণ হরণ করি লহ গো সবলে
আমার আমারে, নগ্ন বক্ষে বক্ষ দিয়া   **তন্বং বি সস্রে**
অন্তর-রহস্য তব শুনে নিই প্রিয়া।[৮৪]

এই প্রিয়ারই আর এক রূপ রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা। বাক্ যেন নর্তকীর মতো একটি একটি করে আবরণ উন্মোচন করছেন আর দেখা দিচ্ছেন নয়ন-ভুলানো ভুবনমোহন নব নব রূপে—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ

আসি অন্তরে মম।
আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে
না জানি কিসের আশে।
... ...
যে-সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়ে নামিয়া গেছে বারবার—
হে কবি, তোমার রচিত রাগিণী
আমি কি গাহিতে পারি।[৮৫]

এই অন্তরতমকে বেদের কবি বলেছেন 'অন্তম আপি', নিকটতম আপন—

উত ত্বা-অবধিরং বয়ং শ্রুৎকর্ণং সন্তম্ উতয়ে।
দূরাদ্ ইহ হবামহে।
যত্-শুশ্রূয়া ইমং হবং দুর্মর্ষং চক্রিয়া উত।
ভবের্ আপির্ নো অন্তমঃ[৮৬]

বহু দূর হতে ডাকছি তোমায়, রাখো রাখো আগলাও,
তুমি তো বধির নও, হে দেবতা, কানে তো শুনতে পাও।
ভুলো না এ ডাক—ভোলা কি সহজ—শুনবে যদি-যখন
হয়ো আমাদের নিকটতম আপন।

আর রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার মতো বেদের দেবতারও তিয়াষের অন্ত নেই উপাসকের জন্যে। ঋষিকবি যেমন দেবতার জন্যে তিয়াষী, পিয়াসী, উশতী, উশন্, দেবয়ু অর্থাৎ দেবকাম, দেবতাও তেমনি তাঁর জন্যে তিয়াষী, পিয়াসী, উশতী, উশন্, অস্ময়ু অর্থাৎ 'আমাদের চান'।

সুরগুরু বীতোফেনের অলৌকিক প্রতিভার উৎস-সন্ধানে বেরিয়ে তাঁর জীবনীকার শ্রীসুলিভ্যান বলছেন—

He found that his genius···was really a mighty force using him as a channel or servant. It is probable that every genius of the first order becomes aware of this curious relation towards his own genius. Even the most fully conscious type of genius, the scientific genius, as Clark

Maxwell and Einstein, reveal this feeling of being possessed.[৮৭]

অর্থাৎ, 'তিনি অনুভব করেছিলেন, তাঁর প্রতিভা আসলে এক মহাশক্তি, সে তাঁকে ব্যবহার করছে তার মাধ্যমের মতো, দাসের মতো। বোধহয় প্রথম শ্রেণীর সব প্রতিভাবানই আপন প্রতিভার সঙ্গে এই একটা অদ্ভুত সম্পর্ক অনুভব করেন। পুরোপুরি সচেতন যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভা—ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল বা আইনস্টাইন—তাঁদের মধ্যেও দেখি এই আবিষ্ট হওয়ার অনুভূতি।'

শুধু দাস নয়, ক্রীতদাস, সারা জীবনের জন্য কেনা। এই অনুভবের যন্ত্রণায় কবি বলেন—

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চাস হরে
আমার যামিনী ?[৮৮]

আবার এই দাসত্বের বন্ধনই মুক্তি হয়ে যায়, যন্ত্রণাই আনন্দ হয়ে ওঠে, তখন স্বেচ্ছায় সেধে সানন্দে দাসত্ব স্বীকার—

ম্যয় নে চাকর রাখো জী
আমায় চাকর রাখো হে

নিত্যসভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে
তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না।[৮৯]

অরং দাসো ন মীল্‌হুষে করাণি
অহং দেবায় ভূর্ণয়ে অনাগাঃ।
অচেতয়দ্‌ অচিতো দেবো অর্যো
গৃত্‌সং রায়ে কবিতরো জুনাতি[৯০]

ঢেলে তুমি দেব দিয়েছ আমায়, আমি হব তব ভৃত্য,
হবে না কো ত্রুটি, রুদ্র, সাজাব তোমার সেবায় চিত্ত।
চেতনা ছিল না, তাদের চেতনা দিয়েছ উদার স্বামী,
কবিগুরু, নিয়ে চলেছ তোমার কবিকে
কী ধনে করতে ধনী।

তখন ঋষি হন 'অ-মহীয়ু', নিজের গৌরব চান না। ঐ আসনতলে মাটির পরে লুটিয়ে রব। আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে। প্রমথ চৌধুরীর বিখ্যাত 'মন্ত্রশক্তি' গল্পের উপসংহারটিও এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য—

ঈশ্বর হাতজোড় করে বললে, 'হুজুর, আমি মন্তর-তন্তর কিছুই জানি নে। তবে সড়কি-লাঠি ধরবামাত্র আমার শরীরে কি যেন ভর করে। শক্তি আমার কিছুই নেই, যিনি আমার উপর ভর করেন, সব শক্তি তাঁরই।'

আমি বুঝলুম লেঠেলদের কথা ঠিক। ঈশ্বরের গায়ে যিনি ভর করেন তাঁরই নাম মন্ত্রশক্তি অর্থাৎ দেবতা। শুধু লাঠিখেলাতে নয়, পৃথিবীর সব খেলাতেই—যথা সাহিত্যের খেলাতে, পলিটিক্সের খেলাতে তিনিই দিগ্বিজয়ী হন যাঁর শরীরে এই দৈবশক্তি ভর করে।[২১]

॥ ৭ ॥

ভর। দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থকে একই আশ্লেষে জড়িয়ে রেখেছে যে-সব শব্দ, যে-সব শব্দের কৌটোয় কান পাতলে শোনা যায় বেদের প্রাণভোমরার গুন-গুনানি, এই ভর শব্দটি তাদেরই একজন। 'অপৌরুষেয়' শব্দটি বেদের সংহিতায় নেই, তার বদলে আছে পূর্ণতর স্পষ্টতর রহস্যকম্প্র এই শব্দ 'ভর'। অপৌরুষেয় রচনার যথার্থ প্রকৃতি বুঝতে হলে এই 'ভর'-শব্দটিকে দু-আধখানা করতে হবে। ভর মানে আবেশ, আবার ভর মানে সংগ্রাম।[২২] অর্থাৎ এই ভরকে অনুভব করা মানে possessed হওয়া, channel হওয়া, দাস হওয়া, যন্ত্র হওয়া, বাণীর-বিদ্যুৎদীপ্ত-ছন্দোবাণ-বিদ্ধ হওয়া এবং সেই সঙ্গে অন্তরে-বাইরে এক মহা-সংগ্রামের নায়ক হওয়া। যে-আবেশের প্রতিটি সূচ্যগ্রে বিঁধে থাকে এক সুতীব্র আপোষহীন সংগ্রাম—মিলের সঙ্গে অমিলের, প্রেমের সঙ্গে অপ্রেমের, বন্ধনের সঙ্গে মুক্তির, দাসত্বের সঙ্গে স্বাধীনতার, আমার সঙ্গে অন্যের, আমার সঙ্গে আমার—তারই নাম ভর। আবেশ যোগাচ্ছে সংগ্রামের শক্তি, থামতে দিচ্ছে না, আবার সংগ্রামের বীর্য তপস্যার তেজ ভগীরথের মতো নামিয়ে আনছে আবেশের সুরধুনীকে। সংগ্রামের আদিতে মধ্যে এবং অন্তে, পর্বে পর্বে, মুহূর্তে পলে অনুপলে রয়েছে এক হর্ষ[২৩], এক আনন্দ, যার চূড়ান্ত রূপ হল বেদের অমৃত সোম। উত্তাল ঊর্মিল সংগ্রাম-সিন্ধুর প্রতিটি বিন্দুতে সোম, অভ্রভেদী

সংগ্রামের প্রতিটি চড়াইয়ে-উৎরাইয়ে, প্রবতে উদ্বতে নিবতে[৯৪], বাঁকে বাঁকে, সাম্নতে সাম্নতে সোম। তাই ঋষি গোতম রাহূগণ সোমকে বললেন 'ভরেষু-জা', ভরে ভরে জাত—

অষাল্‌হং যুত্‌সু পৃতনাসু পপ্রিং
স্বর্ষাম্ অপ্‌সাং বৃজনস্য গোপাম্।
ভরেষুজাং সুক্ষিতিং সুশ্রবসং
জয়ন্তং ত্বাম্ অনু মদেম সোম[৯৫]

যুদ্ধে যুদ্ধে দুঃসহ দুর্জয়,
প্রতি সংগ্রামে আন পরিপূর্ণতা,
ছিনিয়ে নিয়া'স আলো-লোক, আলো-ধারা,
আগলাও যত কুটিলাবর্ত, বাঁক,
ভরে ভরে তুমি জন্মাও, হে বিজয়ী,
ঈশ্বর হয়ে বস, আন সুশ্রুতি,
তোমাতে আমরা হর্ষে মাতব, সোম।

প্রেম যেমন কবির অন্তম স্বধর্ম, তেমনি এবং সেইজন্যেই যুদ্ধও তাঁর অবধারিত বিধিলিপি। কবি অশ্রান্ত প্রেমিক, সেইজন্যেই কবি অক্লান্ত যোদ্ধা, অনলস সৈনিক। শুধু প্রেম নাটকের নায়ক নন, যুদ্ধেরও নায়ক! তাই ঋগ্বেদে বারে বারে যুদ্ধের কথা—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় a fierce and relentless battle.[৯৬] যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সেইসব শত্রুদের কতরকম নাম—রক্ষঃ, পণি, বৃত্র, দস্যু, শুষ্ণ, নমুচি, স্পৃধ্, দেবনিদ্ ··। বোঝাচ্ছে এক একটি সত্যশিব-সুন্দরবিরোধী বৃত্তি এবং ঐ বৃত্তিসম্পন্ন মানুষকে। **রক্ষঃ** মানে সবাইকে বঞ্চিত করে যে নিজের জন্যে রাখে সব।[৯৭] **পণি** হল সেই বণিক্‌বৃত্তি সেই কার্পণ্য সেই অনুদারতা যা আড়াল করে রেখেছে অন্তরের আলোটিকে।[৯৮] **বৃত্র** অজ্ঞানের অন্ধকারের পুরু যবনিকা।[৯৯] **দস্যু** হানাদার, আক্রমণ করে যা বিধ্বস্ত করতে চায় আলোর শক্তিকে। **শুষ্ণ** শুষ্কতা, বন্ধ্যাতা।[১০০] **নমুচি** নাছোড়-বান্দা সংস্কার, আত্মাভিমান, যা প্রবুদ্ধ চিত্তকেও পেছনে টেনে রাখে।[১০১] **স্পৃধ্** স্পর্ধিত যুযুৎসু অসত্য। **দেবনিদ্** দেবনিন্দক, মানুষের মধ্যে অমৃত-চেতনার, পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গের, আঁধারের মধ্যে আলোর অস্বীকার।

এই সব শত্রু যেমন রয়েছে বাইরে, তেমনি রয়েছে ভেতরে।[১০২] নিজের মধ্যে জাগ্রত দেবতার সাহায্যে এইসব শত্রুদের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াই কবির সাধনা, ঋষিত্ব লাভের ক্ষুরধারা-নিশিত দুর্গম পথ, যার শেষে আছে স্বস্তি, স্বর্ অর্থাৎ চেতনার সেই লোক যেখানে আলো আর শব্দ একাকার, বাক্ যেখানে পশ্যন্তী, কবি যেখানে সত্যদ্রষ্টা সত্যশ্রুৎ সত্যমন্ত্র, আনন্দ অমৃত, স্বধা—এককথায় নবজন্ম। এই সিদ্ধি যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ ততদিন সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। সে সাধনার পৌরুষ অদ্ভুত ভাষা পেয়েছে বাঙালি কবির কণ্ঠে—

আমারও সাধনা তাই; কিন্তু আমি বুকের ভিতরে
কোনো পূর্ণিমার আলো পাই নি প্রবল আবির্ভাবে।
তবু এই না-থাকাও সর্বব্যাপী তৃষ্ণার শিখরে
ভীষণ মন্ত্রের মতো অমাবস্যা হয়ে আজ কাঁপে।
কান পাতো সে আঁধারে; দেখ সেই বিপরীত ছবি:
শূন্যেরও কোটালবানে ভেসে যায় জীবন-জাহ্নবী![১০৩]

পৌরুষেয় আর অপৌরুষেয়, প্রেরণা আর পরিশ্রম, আবেশ আর আয়াস, প্রতীক্ষা আর প্রাপ্তি, সিদ্ধি আর সাধনার পার্থক্য এখানে ঘুচে যায়।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে-কোন বস্তু, যে-কোন ব্যক্তি, যে-কোন ভাব, ঘটনা, দৃশ্য, শব্দে ভর দিয়ে নামতে পারে এই ভর, বাকের এই তীব্র সব-ভেঙে-চুরমার করা আবেশ, এই ঘনীভূত জ্যোতির্ময় অনুভব। সেই আলম্বনটিই তখন দেবতা অর্থাৎ 'আলোয় আলোকময় করা আলোর আলো'। অনুক্রমণিকাকারের ভাষায় ঋষির বাক্যের বিষয়বস্তুটিই হল দেবতা।[১০৪] এই দেবতার অনুভব যত প্রগাঢ় হয়, ততই তার সঙ্গে তাদাত্ম্যবোধ ঘন হতে থাকে ঋষির, যার চরম হল নিজেকেই দেবতা বলে অনুভব করা, শুধু মনে মনে নয়, সর্বশরীরে। দুটি উদাহরণ নেওয়া যাক। একজন হলেন ঋগ্বেদের ঋষি বৃহদ্দিব অথর্বা। তিনি 'মহানুভব' হয়ে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমার এ তনু ইন্দ্রই।'[১০৫] আর একজন ইংরেজ কবি শেলী। তাঁর 'পশ্চিম প্রভঞ্জনের প্রতি' (Ode to the West Wind) নামক বিখ্যাত বাত-সূক্তে এই তাদাত্ম্যবোধের ধাপগুলি সুস্পষ্ট। প্রথমে বললেন,

Make me thy lyre,
আমাকে তোমার করো বীণা,
তারপর Be thou, Spirit fierce, My Spirit,
হে রুদ্রপ্রাণ হও তুমি মোর প্রাণ,
তারপরই Be thou me,
তুমি আমি হও।

এইরকম কোন প্রগাঢ়তম নিগূঢ়তম মুহূর্তে কবি অনুভব করেন, দেবতার অন্তরতমা পরমা সত্তা হল বাক্‌, বাক্‌ই আত্মা, আমিই বাক্‌। এই অনুভবেরই উত্তাল ঘোষণা ঋগ্বেদের বাক্‌-সূক্তে। এই সত্যেরই বিবৃতি উপনিষদে, 'ওঙ্কার আত্মৈব'[১০৬], ওঙ্কার অর্থাৎ বাক্‌ আত্মাই।

আধুনিক কবিরাও কেউ কেউ সাক্ষী এই অভিজ্ঞতার—
বাণীর আত্মারে জেনেছি আপন সত্তা ব'লে[১০৭]

The Spirit within is the long lost Word[১০৮]
হারিয়ে-যাওয়া বাক্‌ই অন্তরাত্মা।

নানান নিষ্ফল শব্দের মধ্যে দিয়ে এই বাক্‌কেই খুঁজছে মানুষ। শব্দানুসন্ধান আত্মানুসন্ধানেরই নামান্তর।

॥ ৮ ॥

বাকের আবেশের এই অমৃতক্ষণ কিন্তু কোন কবিরই হাতের আমলকি নয়। এ হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়, বিদ্যুৎস্বভাবা এই বাক্‌, এই স্বতন্ত্রা বিহঙ্গী, এই ইচ্ছাময়ী, এই ক্ষণিকের অতিথি, এই শাশ্বতী ক্ষণিকা। এই অতিথির জলন্ত পদচিহ্নগুলিই হল একজন কবির জীবনের শ্রেষ্ঠ ঋক্‌, শ্রেষ্ঠ কবিতা। বাকিগুলি হয় তার আগমনের পূর্বাভাস(ষ), না হয় তার স্মৃতির অগ্নিরেখা।

যে-বাণী বিহঙ্গে আমি আনন্দে করেছি অভ্যর্থনা
ছন্দের সুন্দর নীড়ে বার-বার··· ···
যদি ক্লান্তি আসে, যদি শান্তি যায়,
যদি হৃত্‌পিণ্ড শুধু হতাশার ডম্বরু বাজায়,
রক্ত শোনে মৃত্যুর মৃদঙ্গ শুধু,—তবুও মনের

চরম চূড়ায় থাক **সে অমর্ত্য অতিথি-ক্ষণের**
চিহ্ন, যে-মুহূর্তে বাণীর আত্মারে জেনেছি আপন
সত্তা ব'লে, স্তব্ধ মেনেছি কালেরে, মূঢ় প্রবচন
মরত্বে ;

তবু হয়েছিল সে-স্বরে সিদ্ধি
যা শুনে ভ্রষ্ট কল্পধেনু
ফিরে আসে গোঠে গোধূলিবেলায়
চপলতা জাগে রাধিকার পায়
মধুমালতীর বন্ধ্যা শাখায়
উড়ে এসে লাগে সৃজনরেণু।
দেবতারা রাতে দীপ্র নয়নে
শুনে গেছে মোর দিব্য বেণু।

বিরল দিনে **আকস্মিকের** রং ধরেছে শুধু
মেলেনি সেই ওতপ্রোত লয়।

Once, only once, there rose the heavy curtain,
The clouds rolled back, and for too brief a space
I drank in joy as from a living fountain.
....
O rapture ! to have seen it for a moment !
O anguish ! that it never came again !
That lightning flash of joy that seemed eternal[১০৯]

*

একবার, মাত্র একবার, উঠেছিল গুরু যবনিকা,
সরে গিয়েছিল মেঘ, ক্ষণেকের তরে
যেন কোন প্রাণবন্ত জীবন্ত ফোয়ারা হতে
আনন্দসলিল আমি করেছিনু পান।

কি আনন্দ! মুহূর্তের তরে সে দর্শন!
কি বেদনা! আর সে এল না!
অনন্তের ছদ্মবেশী সে-আনন্দ-বিদ্যুৎ-ঝলক!

বেদের ঋষিরা বারবার বলেছেন এই অতিথির কথা। ঋষিকবির চিত্তের সবখানে সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে আসেন এই অগ্নিরূপা অগ্নিবর্ণা অগ্নিময়ী আগ্নেয়ী অতিথি-বাক্। এই অতিথিকে ঋষি বলছেন দিব্য বরেণ্য প্রিয় প্রিয়তম—

প্রেষ্ঠম্ উ প্রিয়াণাং স্তুহি-আসাবাতিথিম্।
অগ্নিং রথানাং যমম্[১১০]

যিনি প্রিয়তম, প্রিয়ের মধ্যে,
সব রথ চলে যাঁর সারথ্যে,
সেই-অগ্নির, সেই অতিথির
স্তব গাও, ওগো সোতা। (সোম-সবনকারী)

দধুঃ-ত্বা ভৃগবো মানুষেষু-আ
রয়িং ন চারুং সুহবং জনেভ্যঃ।
হোতারম্ অগ্নে অতিথিং বরেণ্যং
মিত্রং ন শেবং দিব্যায জন্মনে[১১১]

বরেণ্য তুমি অতিথি, অগ্নি, হোতা,
আদরের ধন তুমি শিবসখা, সহজে দাও যে সাড়া
তোমার আধান করেছে ভৃগুরা মানুষে
দিব্যজন্ম পায় যাতে মানুষেরা![১১২]

ঋষি শোনেন এই অতিথির চরণধ্বনি, দেখেন তাঁর প্রদীপ্ত প্রভাস্বর রূপ—
প্রপ্রায়ম্ অগ্নির্ ভরতস্য শৃণ্বে
বি যত্ সূর্যো ন রোচতে বৃহদ্ভাঃ।
অভি যঃ পূরুং পৃতনাসু তস্থৌ
দ্যুতানো দৈব্যো অতিথিঃ শুশোচ[১১৩]

আবিষ্ট[১১৪] আমি ! আমার অগ্নি ঐ শুনি আসে আসে !
সুবৃহৎ বিভা সূর্যের মতো ঝলে তার ঝলমল,
দাঁড়াল বহুর মুখোমুখি একা—যুদ্ধ অন্তহীন,
দুঃসহদ্যুতি দিব্য অতিথি জ্বলছে কি উজ্জ্বল !

শুধু সূর্যের মতো নয়, সূর্যই। আঁধারের পুরু যবনিকা ভেদ করে ঋষির জীবনে ঘটে এই অতিথি সূর্যাগ্নির তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়, যিনি—

হংসঃ শুচিষদ্ বসুর্ অন্তরিক্ষসদ্
হোতা বেদিষদ্ অতিথির্ দুরোণসত্।[১১৫]

দীপ্ত হৃদয়-আকাশে[১১৬] আসীন হংস,
অন্তরিক্ষে সব-ছাওয়া ভরা আলো সে,
সে হোতা অগ্নি এই বেদি-পৃথিবীতে,
সে অতিথি এই গৃহ-দেহ-সোমকলশে।[১১৭]

রবীন্দ্রকাব্য এই চিরপথিক অতিথির জন্য চির প্রতীক্ষার আনন্দভৈরবী, যে ক্ষণিকা, যে পলাতকা এসেছিল তবু আসে নাই, নিত্যকাল যে শুধু আসিছে, যার পথ-চাওয়াতেই আনন্দ—

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি
ওই যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিন-রজনী
সে যে আসে আসে আসে ॥

গেয়েছি গান যখন যতো আপন মনে খ্যাপার মতো
সকল সুরে বেজেছে তার আগমনী—
সে যে আসে, আসে, আসে।[১১৮]

চরণধ্বনি শুনি তব নাথ, জীবনতীরে
কত নীরব নির্জনে কত মধুসমীরে।[১১৯]

ঐ শুনি যেন চরণধ্বনি রে,
পাবার আগে কিসের আভাস পাই…[১২০]

খেয়ার আগমন কবিতায় এই রাজ-অতিথির আকস্মিক আগমনের তূর্যধ্বনি বেজে উঠেছে।

অতুলপ্রসাদও গানে গেঁথেছেন এই চির-চেনা চির-অচেনা অতিথির বরণমালা—

কে গো তুমি আসিলে অতিথি মম কুটীরে ?
কবে যেন দেখেছি তোমারে আমি
কুঞ্জকুসুম হাতে ফিরিতে যমুনাতীরে[১২১]

॥ ৯ ॥

এই অতিথি যখন আসেন, তখন গানে গানে আঁধার পেরিয়ে ভোর হয় বিভাবরী।

অতারিষ্ম তমসস্ পারম্ অস্য
প্রতি স্তোমং দেবয়ন্তো দধানাঃ[১২২]

দেবতাকে চেয়ে গান গেয়ে গেয়ে
এ-আঁধা আমরা এলুম পেরিয়ে।

এই অতিথির প্রথম আবির্ভাবই সূচিত করে নবজন্মের অরুণরাগরঞ্জিত প্রথম ভোর। এই ভোরই হলেন বৈদিকদের উষা। এই উষায় জাগেন তিমিরান্তক তমোনাশন অগ্নি, জাগেন সূর্য, জাগেন সব দেবতা, জাগেন সর্বদেবময়ী বাক্। তাই তাঁরা সবাই 'উষর্বুধ্' (> উষর্ভুত্), অর্থাৎ ভোরে-জাগা।

বিশ্বায়ুর্ যো অমৃতো মর্ত্যেষু
উষর্ভুদ্ ভূদ্ অতিথির্ জাতবেদাঃ।[১২৩]

বিশ্বের যিনি প্রাণ আর যিনি অমৃত মর্ত্যে মর্ত্যে,
উষায় জাগুন সে-অতিথি জাতবেদা।

আ দাশুষে জাতবেদো বহা ত্বম্
অদ্যা দেবাঁ উষর্বুধঃ।[১২৪]

ভোর হল আজ জাগে দেবতারা,
ওগো জাতবেদা, তাদের বহন
কর তার কাছে, সব যে দিয়েছে।

এষ স্য সোমঃ পবতে সহস্রজিদ্-
হিন্বানো বাচম্ ইষিরাম্ উষর্বুধম্[১২৫]

অনন্তজয় এই তো সে-সোম চলছে বয়ে
ছুটিয়ে দিয়ে তীরের মতো উষায়-জাগা বাক্।

উদ্ উ স্তোমাসো অশ্বিনোর্ অবুধ্রন্
জামি ব্রহ্মাণি উষসশ্ চ দেবীঃ।[১২৬]

অশ্বিযুগল-উদ্দেশে গান
উঠল জেগে।
সঙ্গে জাগল মন্ত্র। জাগল
উষারা জ্যোতির্ময়ী।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বারবার দেখি উষর্বুধ্ সূর্যের অনুভব—

এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার ?
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার ?।
কাহার অভিষেকের তরে সোনার ঘটে আলোক ভরে,
উষা কাহার আশিস বহি হল আঁধার পার ?।
....
কার জীবনে প্রভাত আজি ঘুচায় অন্ধকার ?।[১২৭]

আকাশ হতে প্রভাত-আলো আমার পানে হাত বাড়ালো,
ভাঙা কারার দ্বারে আমার জয়ধ্বনি উঠল রে এই উঠল রে[১২৮]

উষর্বুধ্ অগ্নি তথা সূর্যের প্রদীপ্ত অনুভব ইংরেজ কবিরও কবিতায়—

A flame in my heart is kindled by the might of
the morn's pure breath ;
A passion···beyond all passion ;··· ···
A love that consumes and quickens ; **a soul-
transfiguring fire**

My life is possessed and mastered ; my heart
is inspired and filled.[১২৯]

উষার প্রবল নির্মল নিঃশ্বাসে
আমার বুকে জ্বলে উঠল আগুন,
একটা তীব্র কামনা···, যা সব কামনার পারে···
একটা ভালবাসা যা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেয়,
যা বাঁচিয়ে তোলে,
একটা আগুন, যা ঘটিয়ে দিল আমার স্বরূপান্তর,
আমার জীবন আর আমার হাতে নেই, তার রাজা স্বামী প্রভু
আর একজন।
বুকে আমার আগুনের জোয়ার, আমি প্রদীপ্ত, আমি পূর্ণ।

I have found the springs of my being in the flush
of the eastern sky[১৩০]
আমার সত্তার উৎস খুঁজে পেয়েছি ঐ পুব আকাশের অরুণিমায়।

I—the true self, the spirit, the self that is born of
death—
I have found the flame of my being in the morn's
ambrosial breath.
I lose my life for a season : I lose it beyond
recall :
But I find it renewed, rekindled, in the life of
the One, the All.
—I clasp the world to my bosom : I feel its pulse
in my breast—[১৩১]

আমি, আমার সত্যিকারের আমি, আমার আত্মা,
মৃত্যু থেকে প্রাণ পেল যে-আমি,

সেই আমি আমার অগ্নিস্বরূপ পেলাম খুঁজে প্রথম ভোরের
অমৃতনিঃশ্বাসে,
প্রাণ হারালাম একটি ঋতুর তরে,
হারিয়ে গেল প্রাণ যে আমার অচিন হয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ,
কিন্তু আবার নতুন করে ফিরে পেলাম তাকে,
নতুন করে উঠল জ্বলে সে,
সব হয়ে যে-এক আছে তার প্রাণে।

এখন বুকের কাছে বিশ্বভুবন আঁকড়ে ধরেছি[১৩২]
শুনতে পাচ্ছি আমার বুকে তার
ধুকপুকুনি নাড়ীর।

অগ্নি এখানে হয়ে উঠেছেন বৈশ্বানর, বৃহত্, বিরাট্, সূর্য।

Lay me to sleep in sheltering flame
O Master of the Hidden Fire !
In flame of sunrise bathe my mind,
O Master of the Hidden Fire[১৩৩]

হে অগ্নি গুহাহিত,
পরমশরণ তোমার শিখার ছায়
আমাকে ঘুম পাড়াও,
সূর্যোদয়ের অগ্নিশিখায় অভিষেক কর চিত্তের,
হে অগ্নি গুহাহিত।

নব নব রূপে এই উষা বার বার আসেন ঋষির জীবনে। তাই তিনি শুধু উষা নন, 'উষাসঃ' অর্থাৎ উষারা। অতীতের আগামীর এই সমস্ত উষারা যেন এক শাশ্বতী মহা-উষার এক একটি উদ্ভাস, যে উষায় জাগবে সবাই—

পরায়তীনাম্ অনু-এতি পাথ আয়তীনাং প্রথমা শশ্বতীনাম্।
ব্যুচ্ছন্তী জীবম্ উদীরয়ন্তী-উষা মৃতং কং চন বোধয়ন্তী
কিয়াত্যা যত্ সময়া ভবাতি যা বি-উষুর্ যাশ্ চ নূনং বি-উচ্ছান্।
অনু পূর্বাঃ কৃপতে বাবশানা প্রদীধ্যানা জোষম্ অন্যাভির্ এতি[১৩৪]

সুদূরে মিলিয়ে যায় ঐ যত উষারা,
তাদেরই লক্ষ্য ধরে চলেছেন এই যিনি শাশ্বতী উষাদের প্রথমা,
যারা আসছে আসছে আসছে।
ফুটতে ফুটতে উষা ফুটিয়ে ঊর্ধ্বপানে তুলছেন বেঁচে আছে যে, তাকে।
মরে ছিল কেউ বুঝি, তাকে ডেকে বলছেন
জা গো জা গো জা গো।

যে-সব উষারা আগে ফুটেছিল আর যারা
ফুটবেই ফুটবেই ফুটবে
কতটা ছড়ান তিনি এ দুটিকে মেলাতে ?
আগে চলে গেছে যারা সেই সব উষাদের
ভালোবেসে বেসে তিনি তাদের আলোটি ভরে পুরে দেন,
সামনে ছড়িয়ে দিয়ে বিভা তাঁর
নিবিড় মিলনে মিলে যান তিনি অনাগতা আগামিনী উষাদের সঙ্গে।

এই শাশ্বতীকে প্রত্যক্ষ করে ঋষি গেয়ে উঠেছেন—

এষা দিবো দুহিতা প্রত্যদর্শি ব্যুচ্ছন্তী যুবতিঃ শুক্রবাসাঃ।
বিশ্বস্যেশানা পার্থিবস্য বস্ব উষো অদ্যেহ সুভগে ব্যুচ্ছ[১৩৫]

ঐ দেখা দিল দ্যুলোক-দুলালী উষা,
ফুটছে ফুটছে নবযৌবনা ঝলমল করে সাজনি।
পৃথিবীর ধন যত কিছু আছে তার ঈশ্বরী হয়ে
সুন্দর ভোর, ওঠ ফুটে ওঠ, আজকে এখানে এখনই।

এই সুন্দরের উদ্দেশ্যে একালের কবিও দিয়েছেন সুরের অঞ্জলি—

তোমার মাঝে এমনি ক'রে নবীন করি লও যে মোরে
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর সুন্দর হে সুন্দর[১৩৬]

মানুষ নবজন্ম পাবে তার দেবত্বের উদ্বোধনে। সেই দেবত্বকে নিয়ে মাটির টানে আবার সে নতুন জন্ম নেবে বিশ্বনর বিশ্বা-মিত্র হয়ে—এই দুটি জন্মের ক্ষুধা বৈদিক ঋষির হৃদয়ে। সে-ক্ষুধার শান্তি হয়েছে ঋষি হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরসের জীবনে, নবরূপদক্ষ অগ্নির কল্যাণে—

ত্বং তম্ অগ্নে অমৃতত্বে-উত্তমে মর্তং দধাসি শ্রবসে দিবেদিবে।
যস্ তাতৃষাণ উভয়ায় জন্মনে……[১৩৭]

দিন হতে দিনে পরম অমৃতে নিয়ে যাও তাকে,
সেই মর্ত্যকে, অগ্নি, শোনাতে স্বর,
দুটি জন্মের জন্যে যে তৃষাতুর।

যিনি গৃহপতি হয়েও অতিথি, ঘরের মালিক হয়েও চির-অচেনা, ঘর-ভাঙা সর্বনাশের বিদ্যুতে যাঁকে হঠাৎ দেখা যায়, 'যে আছে বুকের কাছে কাছে চলেছি তাহারি অভিসারে',[১৩৮] সেই অন্তম পারাবত (অর্থাৎ নিকটতম সুদূর), সেই পথের সাথী চিরপথিক, সেই অশ্রান্ত রাখাল, যিনি কাছে থেকেও দূরে, অবিরাম যাঁর পথচলা[১৩৯], সেই মহা-আপন উত্তম পুরুষকেই গানের সূর্য জেলে জেলে দেখছে বেদ, বলছে 'যাদৃগ্ এব দদৃশে তাদৃগ্ উচ্যতে'[১৪০], যেমনটি দেখেছি তেমনটি বলছি, বলছে, কি অপরূপ রূপ তোমার হে দর্শতশ্রী[১৪১], হে দিদৃক্ষেণ্য[১৪২], ইচ্ছে করে বারবার দেখি তোমায়[১৪৩], তুমি সত্য[১৪৪], তুমি অদ্ভুত[১৪৫], তুমি আমাদের আমরা তোমার[১৪৬]।

সমস্ত শিল্প, সমস্ত সৃষ্টিই এই নিত্য-আবির্ভাবকে ফুটিয়ে তোলার সাধনা, এই পরমশিবের স্রগ্ধরা কন্যাকুমারী প্রতীক্ষা—

All shall discover God in self and things[১৪৭]

দেখবে সকলে—ঘুচে যাবে ব্যবধান—
আপনার মাঝে বিশ্বের মাঝে জাগ্রত ভগবান।

॥ ১০ ॥

এই অতিথি, এই বাক্, এই ব্রহ্ম অর্থাৎ বিপুল বৃহৎ বিরাট, এই দেবতা অর্থাৎ আলো,[১৪৮] এই আত্মা অর্থাৎ আমা-র অন্তরতম সত্তা, এই হঠাৎ হাওয়ায়-ভেসে-আসা ধন, এই দেব-ভাষা অর্থাৎ দেবতার ভাষণ আমার প্রতি, এই আত্মভাষা অর্থাৎ আমার অন্তরতম সত্তার ভাষণ সবার প্রতি, এই স্ব ছন্দ, এই অতল রস, এই বিশ্বের নিগূঢ় কাব্য-কবি, এই আমার সুদূরপারের স্বপ্ন-দোসর[১৪৯], এই পথিককে যিনি একবার দেখেছেন বিদ্যুত-উদ্ভাসে[১৫০],

শুনেছেন তাঁর বজ্রবাঁশির অপ্রতিরোধ্য আহ্বান, তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় মন প্রাণ সত্তা কান হয়ে যায় আবার তাঁকে শোনার জন্যে, চোখ হয়ে যায় আবার তাঁকে দেখার জন্যে, ভাষা—ঋক্ যজুঃ সাম পদ্য গদ্য গান—হয়ে ওঠে তাঁকে বলার জন্যে, ডাকার জন্যে, ডেকে ডেকে গান শোনানোর জন্যে, শূন্য কুম্ভ হয়ে যায় তাঁকে ধারণ করার জন্যে, পূর্ণকুম্ভ হয়ে ওঠে এ দেহমনপ্রাণের অমৃত তাঁকে পান করানোর জন্যে।

কান হয়ে যায় বলেই বেদের নাম শ্রুতি অর্থাৎ অন্তঃকর্ণে শোনা দিব্য কাব্য।[১৫১] চোখ হয়ে যায় বলেই বেদের কবির নাম ঋষি[১৫২] অর্থাৎ দ্রষ্টা। ভাষা হয়ে যায় বলেই বাঙ্ময় বেদের, মহাকবিতার, মহাসঙ্গীতের সৃষ্টি হয়—নইলে তা হয়ে থাকত শুধু কম্প্র বিপ্র[১৫৩] হৃদয়ের অশব্দ কম্পন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বারবার বলছেন, এই ঋঙ্ময় যজুর্ময় সামময় বেদময় ব্রহ্মময় অমৃতময় দেব-সাৎ দেবতা হওয়াই যজ্ঞের লক্ষ্য—

অগ্নির্ বৈ দেবযোনিঃ। সোঽগ্নের্ দেবযোন্যা আহুতিভ্যঃ সংভবতি ঋঙ্-ময়ো যজুর্ময়ঃ সামময়ো বেদময়ো ব্রহ্মময়ো ঽমৃতময়ঃ সম্ভূয় দেবতা অপ্যেতি য এবং বেদ যশ্ চ এবং বিদ্বান্ এতেন যজ্ঞক্রতুনা যজতে।[১৫৪]

অগ্নিই দেবযোনি। সেই (যজমান) দেবযোনি অগ্নি হইতে ও আহুতি-সমূহ হইতে (দেবতারূপে) উৎপন্ন হন। যে ইহা জানে, এবং ইহা জানিয়া এই যজ্ঞক্রতু দ্বারা যজন করে, সে ঋঙ্ময় যজুর্ময় সামময় বেদময় ব্রহ্মময় অমৃতময় হইয়া সকল দেবতাকে একযোগে প্রাপ্ত হয়।[১৫৫] জৈমিনীয় ব্রাহ্মণও বলছেন, যজমান আহুতিময় মনোময় প্রাণময় চক্ষুর্ময় শ্রোত্রময় বাঙ্ময় ঋঙ্ময় সামময় ব্রহ্মময় হিরণ্ময় অমৃতময় হয়ে নতুন জন্ম লাভ করেন।[১৫৬]

শূন্যকুম্ভ হয় বলেই বেদকে বলা হয়েছে অপৌরুষেয়—এক মহাবিরহের শূন্যপাত্রে ঝরে-পড়া দেবতার আলোর প্রসাদ, বাণীর ঝরণা। আর পূর্ণকুম্ভ হয় বলেই বেদ আবার পৌরুষেয়ও বটে—এক একটি বিশেষ আধারে এক একটি বিশেষ বাণীরূপের অফুরন্ত স্ব-চ্ছন্দ উৎসার—

আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র তব বাণী।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি

দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।[১৫৭]

এই শূন্য-ভরা পূর্ণকুম্ভের উচ্ছলন, এই অ-পুরুষ হতে হতে পূর্ণ পুরুষ হয়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথের একটি গানে ফুটে উঠেছে—

সে দিনে আপদ আমার যাবে কেটে
পুলকে হৃদয় যেদিন পড়বে ফেটে॥
তখন তোমার গন্ধ তোমার মধু
আপনি বাহির হবে বঁধু হে,
তারে আমার ব'লে ছলে বলে
কে বলো আর রাখবে এঁটে।
আমারে নিখিল ভুবন দেখছে চেয়ে রাত্রিদিবা।
আমি কি জানিনে তার অর্থ কিবা!
তারা যে জানে আমার চিত্তকোষে
অমৃতরূপ আছে বসে গো—
তারেই প্রকাশ করি, আপনি মরি,
তবে আমার দুঃখ মেটে॥[১৫৮]

বৈদিক সোমযজ্ঞে শূন্য কুম্ভকে অমৃত-রূপী সোমরস দিয়ে পূর্ণ করা এই দেহগাগরীভরণেরই অভিনয়—

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান?।[১৫৯]

শুনতে শুনতে, দেখতে দেখতে, মরতে মরতে, ভরতে ভরতে, না হতে হতে, হয়ে উঠতে উঠতে ঋষি হয়ে যান যেন সহস্রশীর্ষা পরম পুরুষের মতোই অনন্তকান, অনন্তচোখ, অনন্তপদ। হয়ে যান সহস্রাক্ষরা পরা বাক্।[১৬০] হয়ে যান হাজার ঋক্, সূক্ত, কবিতা, গান। পরা বাক্ তাঁর স্বয়ংবরা প্রতিভা হয়ে ফোটেন, ফোটান, ছোটেন, ছোটান সহস্রধারায়। সেই পক্ষিরাজিনীর পিঠে সওয়ার হয়ে ঋষি তখন অনন্ত যাত্রায় উধাও হন।

এ শোনার, দেখার, দেখাশোনার আকৃতিকে, অভিজ্ঞতাকে ঋষি যে

কতভাবে প্রকাশ করেছেন তার আর ইয়ত্তা নেই। এই শোনার, অন্তঃকর্ণে শ্রুতধ্বনির বৈদিক নাম হল শ্রবঃ, শ্রুত, শ্লোক। শ্রবস্ শব্দের অর্থবিচার প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন—

Śravas means literally hearing and from this primary significance is derived its secondary sense, 'fame'. But, psychologically, the idea of hearing leads up in Sanskrit to another sense which we find in śravaṇa, śruti, śruta—revealed knowledge, the knowledge which comes by inspiration. Dṛṣṭi and śruti, sight and hearing, revelation and inspiration are the two chief powers of that supramental faculty which belongs to the old vedic idea of the Truth, the Ṛtam. The word śravas is not recognised by the lexicographers in this sense, but it is accepted in the sense of a hymn—the inspired word of the Veda. This indicates clearly that at one time it conveyed the idea of inspiration or of something inspired, whether word or knowledge.[১৬১]

শ্রবস্ এর আক্ষরিক অর্থ হল শোনা। এই মুখ্য অর্থ থেকে এর লাক্ষণিক অর্থ হল—যশ। কিন্তু শোনার মানসিক প্রক্রিয়া থেকে সংস্কৃতে এর আর একটি অর্থ আসে, যে অর্থটি রয়েছে শ্রবণ, শ্রুতি, শ্রুত ইত্যাদি শব্দের মধ্যে, সেটি হল দিব্যজ্ঞান, প্রেরণাসঞ্জাত জ্ঞান। ঋতম্ অর্থাৎ সত্য বলতে প্রাচীন বৈদিকরা যা বুঝতেন, তার সম্পদ্ যে অতিমানস বৃত্তি, তার দুটি প্রধান শক্তি হল দৃষ্টি এবং শ্রুতি, দেখা এবং শোনা, দর্শন এবং উদ্দীপন। অভিধানকারেরা শ্রবস্ শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করেন নি বটে, কিন্তু 'সূক্ত অর্থাৎ বেদের প্রেরণাসম্ভূত বাণী' —এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এক সময়ে শব্দটি বোঝাত প্রেরণা অথবা প্রেরণাসঞ্জাত কিছু—সে বাণীই হোক বা জ্ঞানই হোক।

শ্রীঅনির্বাণ বলছেন, শ্রবঃ দিব্যশ্রুতি, পরমব্যোমে সহস্রাক্ষরা গৌরীর নাদকে শোনা। মরমীয়ারা আকাশে দেখেন রূপের আলো, আবার তাকে ছাপিয়ে শোনেন অরূপের ঝঙ্কার। বেদে তা-ই যথাক্রমে চক্ষুঃ এবং শ্রবঃ।[১৬২]

শ্রবঃ ॥ শ্লোকঃ ॥ শ্রুতম্ ৮।৫৯।৬, পরা বাক্‌কে শোনা পরম ব্যোমে ১।১৬৪।৪১, যা সিদ্ধির চরম, কেননা এই শোনা সবার ভাগ্যে ঘটে না ১০।৭১।৪, ৬, ৭।[১৬৩]

এই শ্রবঃ ঋষির কানে ধরা দেয় বিচিত্র রূপে, তাই তার বিচিত্র বিবিধ বিশেষণ—জ্যেষ্ঠং শ্রবঃ, ওজিষ্ঠং শ্রবঃ, পপুরি শ্রবঃ, মহি শ্রবঃ, চিত্রং শ্রবঃ, অমৃতং শ্রবঃ, পৃথু শ্রবঃ, উরুগায়ং শ্রবঃ।

ঋষি শংযু বার্হস্পত্য বলছেন—

ইন্দ্র জ্যেষ্ঠং ন আ ভরঁ ওজিষ্ঠং পপুরি শ্রবঃ।
যেনেমে চিত্র বজ্রহস্ত রোদসী ওভে সুশিপ্র প্রাঃ[১৬৪]

ওহে বিচিত্র, বজ্রহস্ত, ইন্দ্র বীর্যবান্,
আনো আমাদের জন্যে শুনি সে-গান,
যে-গানে ভরেছ এ আকাশ এই ধরা
আনো সে বিপুল বজ্ররাগিনী শূন্য পূর্ণ করা।

(সকল)

ঋষি বার্হস্পত্য ভরদ্বাজের প্রার্থনা দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশ্যে—

মধু নো দ্যাবাপৃথিবী মিমিক্ষতাং
মধুশ্চুতা মধুদুঘে মধুব্রতে।
দধানে যজ্ঞং দ্রবিণং চ দেবতা
মহি শ্রবো বাজম্ অস্মে সুবীর্যম্[১৬৫]

দেবতা তোমরা যজ্ঞ দ্রবিণ মোদের দিচ্ছ,
শ্রবণ ভরে কি মহাসঙ্গীত, বজ্রবীর্য;
মধু চুঁয়ে পড়ে মধু বুকে ঝরে
তোমাদের ব্রত মধু,
হে দ্যাবাপৃথিবী মধু বর্ষাও
মধু বর্ষাও মধু।

ঋষি বসিষ্ঠ দ্যুলোক-দুলালী উষার কাছে চাইছেন সেই 'চিত্রং রাধঃ' আশ্চর্য ধন, যা 'দীর্ঘশ্রুত্-তমম্' অনেকক্ষণ ধরে চিরকাল ধরে শোনা যায়, শুনতে শুনতে শোনা আর ফুরোয় না, সেই 'অমৃতং শ্রবঃ' অমৃত শ্রুতি।[১৬৬] এই আশ্চর্য গান শোনান বলেই বেদের দেবতা চিত্রশ্রবস্তম।

বৈশ্বানর অগ্নির কাছে ঋষি বশিষ্ঠ চাইছেন পৃথু শ্রবঃ,[১৬৭] সুরের পাথার, সবখানে ছড়িয়ে-যাওয়া সুর। উষার কাছে বার্হস্পত্য ভরদ্বাজ চাইছেন উরুগায়ং শ্রবঃ[১৬৮], অসীমে বৃহতে ধাওয়া সুর।

এই বিচিত্র অনন্ত শ্রুতির প্রার্থনা শুনি রবীন্দ্রনাথের গানেও—

	বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি, সে কি সহজ গান !
ওজিষ্ঠং শ্রবঃ	সেই সুরেতে জাগব আমি, দাও মোরে সেই কান ॥[১৬৯]
(বজ্রবলিষ্ঠ শ্রুতি)	
	আমার নীরব বেলা সেই তোমারি সুরে সুরে
পপ্রি শ্রবঃ	ফুলের ভিতর মধুর মতো উঠবে পুরে ।[১৭০]
(পরিপূর্ণ-করা শ্রুতি)	নবীন জীবন দেয় গো পূরে গানের সুরে ।[১৭১]
যেনেমে রোদসী প্রাঃ	আজি এ কোন গান নিখিল প্লাবিয়া
(যে গানে ভরেছ	তোমার বীণা হতে আসিল নাবিয়া ।
দ্যুলোক-ভূলোক)	ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে,[১৭২]
চিত্রং শ্রবঃ	তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী,
(আশ্চর্য শ্রুতি)	আমি অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি ॥[১৭৩]
তোমার	সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে
	দেবে কি গো বাসা আমায় একটি ধারে ?।
দীর্ঘশ্রুত্তমম্	আমি শুনব ধ্বনি কানে,
(সুদীর্ঘ শ্রুতি)	আমি ভরব ধ্বনি প্রাণে,
	সেই ধ্বনিতে চিত্তবীণার তার বাঁধিব বারে বারে ॥
অমৃতং শ্রবঃ	তোমার কাছে এ বর মাগি মরণ হতে যেন জাগি
(অমৃত শ্রুতি)	গানের সুরে ।
পৃথু শ্রবঃ	তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে,
(ছড়িয়ে-যাওয়া শ্রুতি)	সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে ।[১৭৪]

ইংরেজ কবিরও শ্রবণে ধরা দিয়েছে এই শ্রবঃ—

Again that Voice, which on my listening ears
Falls like star-music filtering through the spheres.[১৭৫]

শ্রবস্যু মম শ্রবণে আবার সেই স্বর শুনি ঝরে,
তারার গানের মতো পবমান অম্বরে অম্বরে।

ঋষি বসুকর্ণ বাসুক্র বলছেন, সব দেবতাই বৃহচ্ছ্রবাঃ এবং জ্যোতিষ্কৃত্‌[১৭৬] দেন বিপুল শ্রুতি এবং জ্যোতি। ঋষি অগস্ত্য শুনেছেন বৃহস্পতি অর্থাৎ বাক্‌-পতির সেই শ্লোক যা দ্যুলোকে ভূলোকে ধাবমান।[১৭৭]

এই শ্রুতিকে কে নিহিত করছেন দেবতাদের মধ্যে? কে এই শ্রুতি হয়ে নিহিত আছেন দেবতাদের মধ্যে? বাক্‌। বিশ্বতরঙ্গিণী বাক। ঋষি বিশ্বামিত্র বলছেন, সূর্যের মেয়ে এই সসর্পরী অর্থাৎ সর্পণস্বভাবা বিদ্যুচ্চকিতা[১৭৮] বাক্‌ দেবতাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন এই অমৃত অজর শ্রুতি।[১৭৯] শুধু দেবতা নয়, মানুষের মধ্যেও তিনি নিহিত করেছেন এই শ্রুতি।[১৮০] আর ঋষি দীর্ঘতমা বলছেন,

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌
যস্মিন্‌ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্‌ তন্‌-ন বেদ কিম্‌ ঋচা করিষ্যতি
যে-ইত্‌ তদ্‌ বিদুস্‌ তে-ইমে সমাসতে[১৮১]

ঋকেরা রয়েছে অ-ক্ষর মহাকাশে
সেখানে আসীন সমস্ত দেবতারা।
তা যে জানে না, সে ঋক্‌ দিয়ে কী বা করবে?
যারা তা জেনেছে, এই বসে আছে তারা।

এই সসর্পরী বাকের মধ্যেই চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হয়ে শব্দ জেগে ওঠে রূপ হয়ে, ধ্বনি হয় আলো। বৈদিক ঋষির কাছে তাই কবিতা শুধু কবিতা নয়, সে আগুন, সে ঋক্‌[১৮২]; গান শুধু গান নয়, সে সূর্যও, অর্ক। এই সুর-সূর্যের তথা সুরসূর্যলোকের বৈদিক নাম হল 'স্বর্‌', যেখানে না পৌঁছন পর্যন্ত বৈদিক ঋষির স্বরসাধনার তথা জীবনসাধনার বিরাম নেই। এই জ্যোতির্লোকের সন্ধান যাঁরা দিয়েছিলেন, সেই পূর্বপিতৃগণকে স্মরণ করে ঋষি পরাশর শাক্ত্য বলছেন,

বীলু. চিদ্‌ দৃল্‌.হা পিতরো ন উক্‌থৈর্‌
অদ্রিং রুজন্‌-অঙ্গিরসো রবেণ।

চক্ষুর্ দিবো বৃহতো গাতুম্ অস্মে
অহঃ স্বর্ বিবিদুঃ কেতুম্ উস্রাঃ[১৮৩]

মন্ত্রনিনাদে সুদুর্ভেদ্য কঠিন অদ্রি ভেঙে
পিতৃপুরুষ অঙ্গিরাগণ অবারিত করেছিল
বিশাল দ্যৌ-এর সঙ্গীতময় পথ[১৮৪] আমাদের তরে,
খুঁজে এনেছিল দিন, আদিত্য, আভাস, উষার আলো।

এই রূপময় শব্দের নানান নাম দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কখনো বলেছেন 'সুরের আলো', সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে;[১৮৫] কখনো বলেছেন 'সুরের আগুন', তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে[১৮৬]; কখনো বলেছেন 'আলোর ভাষা', তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভাল-বাসায়[১৮৭]; কখনো 'গানের তারা', হৃদয়ে মোর গানের তারা উঠবে ফুটে সারে সারে[১৮৮]; কখনো 'অগ্নিবীণা', অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন ক'রে! আকাশ কাঁপে তারার আলোর গানের ঘোরে[১৮৯]; কখনো আবার দেখেছেন নটরাজের 'পদযুগ ঘিরে **জ্যোতিমঞ্জীরে** বাজিল চন্দ্রভানু'[১৯০]।

শব্দ আর রূপ এক অদ্বৈত তত্ত্ব, শব্দ থেকেই সৃষ্টি,—বৈদিক মরমীয়াদের এই উপলব্ধির পুনরাবর্তন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথে—

প্রভু, তোমার বীণা যেমনি বাজে
আঁধার-মাঝে
অমনি ফোটে তারা।
যেন সেই বীণাটি গভীর তানে
আমার প্রাণে
বাজে তেমনি ধারা॥
তখন নূতন সৃষ্টি প্রকাশ হবে
কী গৌরবে
হৃদয়-অন্ধকারে।
তখন স্তরে স্তরে আলোকরাশি
উঠবে ভাসি'
চিত্তগগন পারে।[১৯১]

এই অনুভবের সাক্ষাৎ পাই জীবনানন্দেও—'কবি যখন ভাবাক্রান্ত হন তখন চোখ তাঁর ছবি দেখে, কান শোনে ছন্দ এবং **চোখও অনুভব করে যেন ছন্দবিদ্যুৎ**।'[১৯২]

এই প্রত্যক্ষ অনুভবই বৈদিকদের কাছে বাক্‌কে করেছে রূপের রাজা সূর্যের দুলালী এক পরমা রূপসী মেয়ে যাকে কখনো মনে হয় আগুন-দিয়ে-গড়া, কখনো মনে হয় আপাদমস্তক বিদ্যুন্ময়ী, কখনো মনে হয় সূর্যোজ্জ্বলা, কখনো বা বিন্দু বিন্দু জ্যোৎস্না দিয়ে রচা। এই পরমাশ্চর্য রূপবতী কন্যার দেহের অণু-পরমাণু দিয়ে তাঁরা গড়েন দেবতার অমূর্ত জ্যোতিঃশরীর। অজস্র পুঞ্জ পুঞ্জ দেবতার অর্থাৎ প্রদীপ্ত অনুভবের জ্যোতির্জবায়ু ভেদ করে ঋষির হৃদয়ে ভূমিষ্ঠ হয় এই নগ্নিকা একহায়নী (এক বছরের মেয়ে) বাক্, বলে আমি তোমায় ধরা দিয়েছি, এবার তুমি আমায় রূপ দাও, মূর্তি দাও, রক্তমাংস অবয়ব দাও। তখন ঋষি নিজের অবয়ব তাকে দেন, তার অবয়ব নিজে নেন। এই হল বাকের, ভাষার নবজন্ম ঋষির মধ্যে, ঋষির নবজন্ম বাকের, ভাষার মধ্যে। তখন ভাষা আর শব্দমাত্র নয়, তাঁর নিজেরই অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জা-ত্বক্-রক্ত-অশ্রু-ঘাম। এই ভাষা দিয়ে বিশ্বামিত্র কবি তখন সৃষ্টি করে চলেন তাঁর স্বপ্নের ভুবন, তাঁর সত্য শ্রুতি সত্য দৃষ্টি সত্য মন্ত্র দিয়ে দেখা এক নতুন পৃথিবী। তখন কবি আর শুধু দ্রষ্টা নন, স্রষ্টা, প্রজাপতি, ঈশ্বর।

প্রেমময়ী বাক্ যে কিভাবে কবির ভেতরে মূর্তি নেন, এবং সেই বাক্‌কে মূর্তি দেবার আকূতি যে কত গভীর হতে পারে কবির মধ্যে, তার নিদর্শন হিসেবে উদ্ধৃত করছি একটি কবিতাংশ। বাক্ যে কেমন করে দেবতা হয়ে ওঠেন, মানুষ হয়ে ওঠেন, সেই রহস্যের কিছুটা ইসারা এখানে মিলতে পারে।

মানসীরূপিণী ওগো, বাসনাবাসিনী
আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী,
পরজন্মে তুমি কি গো মূর্তিমতী হয়ে
জন্মিবে মানবগৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিন্দ্যসুন্দরী ? **এখন ভাসিছ তুমি**
অদিতি বাক্ **অনন্তের মাঝে**;[১৯৩] **স্বর্গ হতে মর্ত্যভুমি**
করিছ বিহার[১৯৪], সন্ধ্যার কনকবর্ণে

রাঙিছ অঞ্চল ; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা ; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার তলতল ছলছলে
ললিত যৌবনখানি··· ···
সেই তুমি
মূর্তিতে দিবে কি ধরা ? এই মর্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে ?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব ঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ, ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি ?
মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু একঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।
··· ··· ···
এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে সৃজনে
জ্বলিছে নিবিছে, যেন খদ্যোতের জ্যোতি,
কখনো বা ভাবময়, কখনো মুরতি।[১২৫]

সর্বময়ী বাক্

বাকের এবং প্রিয়ার অনুভব এখানে একটি একাকার অখণ্ড একরস প্রত্যয়। বাকই প্রিয়া, প্রিয়াই বাক্। উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে জায়েব পত্যে-উশতী সুবাসা ![১২৬]

॥ ১১ ॥

শুধু শোনা নয়, দেখা। শোনাই দেখা, দেখাই শোনা। শ্রুতি-দৃষ্টি এক-সঙ্গে। ইন্দ্রিয়কে রুদ্ধ করে নয়, ইন্দ্রিয়কে সহস্রগুণ করে দিয়ে, নতুন করে দিয়ে[১২৭]। অলৌকিক অপ্রাকৃত কোন ব্যাপার নয়, কবিদৃষ্টির উন্মোচন।

In the vedic idea of the revelation there is no suggestion

of the miraculous or the supernatural. The Rishi who employed these faculties, had acquired them by a progressive self-culture. Knowledge itself was a travelling and reaching or a finding and a winning; the **revelation came only at the end,** the light was the prize of a final victory.[১৯৮]

বৈদিকদের 'দর্শন' ব্যাপারটার মধ্যে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতের নামগন্ধও নেই। ক্রমাগত আত্ম-সংস্কৃতির দ্বারা ঋষি এই সুপ্ত শক্তিগুলিকে (বোধি, শ্রুতি, দৃষ্টি ইত্যাদি) আয়ত্ত করে তারপর সেগুলিকে ব্যবহার করতেন। 'জ্ঞান' জিনিষটা ছিল একটি যাত্রা এবং একটি পৌঁছন, অথবা একটি আবিষ্কার এবং একটি জিনে নেওয়া। 'দর্শন' আসত একেবারে শেষে, সে-আলো ছিল চূড়ান্ত বিজয়ের পুরস্কার।

বেদের কবি এই সৃষ্টিকে দেখেছেন এক মহাদেবতার মহাকাব্য রূপে—

অবির্ বৈ নাম দেবতা-ঋতেনাস্তে পরীবৃতা।
তস্যা রূপেণেমে বৃক্ষা হরিতা হরিতস্রজঃ
অন্তি সন্তং ন জহাতি অন্তি সন্তং ন পশ্যতি।
দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি[১৯৯]

করুণা[২০০] হল সে দেবতার নাম,
ঋত দিয়ে তিনি ঘেরা,
তাঁরি রূপে এই গাছেরা সবুজ
পরেছে সবুজমালা।
তিনি অতি কাছে, কেউ তাঁকে ছেড়ে থাকে না,
তিনি অতি কাছে, তবু কেউ তাঁকে দেখে না,
দেখ সে দেবের কাব্য—
মরল না সে তো জীর্ণ হল না হল না!

এই বিশ্বকাব্য এই বিশ্বকবিকেই দেখতে চেয়েছেন বেদের ঋষি—

তব ক্রত্বা তবোতিভিঃ জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যম্।
অথা নো বস্যসস্ কৃধি[২০১]

আগলাও, ঢালো সৃষ্টিবীর্য,
দেখব, দেখাও, সে-চিরসূর্য,
আরো আলো দাও আমাদের আরো আলো।—

ঋষি হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরসের প্রার্থনা।

উদ্ বয়ং তমসস্ পরি
জ্যোতিষ্ পশ্যন্ত উত্তরম্।
দেবং দেবত্রা সূর্যম্
অগন্ম জ্যোতির্ উত্তমম্[২০২]

আঁধারের বেড় উজিয়ে ঊর্ধ্বে
আরো উঁচু আরো উঁচুতে আমরা
আলোর বলয় দেখতে দেখতে
সব আলোকের আলোকে গেলাম
উত্তম জোতি পরম সূর্যে।—

ঋষি প্রস্কণ্ব কাণ্বের উদ্‌ঘোষণা।

দা নো অগ্নে বৃহতো দাঃ সহস্রিণো
দুরো ন বাজং শ্রুত্যা অপা বৃধি।
প্রাচী দ্যাবাপৃথিবী ব্রহ্মণা কৃধি
স্বর্ ণ শুক্রম্ উষসো বি দিদ্যুতুঃ[২০৩]

দাও গো অগ্নি বিপুল বৃহৎ অনন্ত অফুরান।
বজ্রদুয়ার কর অকপাট, শুনব বজ্রগান।
মন্ত্রের টানে দ্যুলোক ভূলোক এদিকে মুখ ফেরাক।
উজ্জ্বলন্ত সূর্যের মতো উষারা ঝলমলাক।—

ঋষি গৃত্‌সমদের বজ্রনিনাদ।

ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষসে আ সূর্যং রোহয়দ্ দিবি।
বি গোভির্ অদ্রিম্ ঐরয়ত্[২০৪]

কিরণের পরে কিরণে অদ্রি
বিদীর্ণ ক’রে ইন্দ্র সূর্যে

দ্যুলোকে চড়াল ধাপে ধাপে, যাতে
চিরদিন পাই দেখতে আমরা—

বিশ্বামিত্রপুত্র ঋষি মধুচ্ছন্দার প্রত্যক্ষ দর্শন।

দীর্ঘশ্রুতি আর দীর্ঘচক্ষস্—অফুরন্ত শোনা আর অফুরন্ত দেখা। এরি জন্য তাঁর সাধনা, এরি জন্য তাঁর ব্যাকুলতা। তাঁর সূর্যসন্ধান যেদিন সফল হয়, সেদিন তিনি হয়ে যান 'সূরচক্ষাঃ', সূর্য-চক্ষু। মর্ত হয়েও তিনি পান অমৃতকে, তিনি ঋভু হন[২০৫]। তিনি পান সৌশ্রবস অর্থাৎ পরমা বাকের শ্রুতিকে[২০৬]। তিনি হয়ে যান সুশ্রবাঃ, বাজশ্রবাঃ, বৃহচ্ছ্রবাঃ, সোমশ্রবাঃ। দেবতা তখন হন তাঁর চিত্রশ্রবস্তম সুশ্রবস্তম সখা। তা যতদিন না হয়, ততদিন তাঁর আকূতির সীমা থাকে না।

এই রূপদর্শনের আকূতির ব্যাকুল সুর বেজেছে রবীন্দ্রনাথে—

দাঁড়াও আমার আঁখির আগে।
তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে॥
সমুখ আকাশে চরাচর লোকে
এই অপরূপ অরূপ আলোকে দাঁড়াও হে
আমার পরাণ পলকে পলকে চোখে চোখে তব দরশ মাগে॥[২০৭]

বেজেছে যতীন্দ্রনাথে—

দেখা দাও, দেখা দাও।
আলো নিবিবার আগে একবার
সুন্দর, মোরে দেখা দাও।
... ...
অপরূপ রূপ আঁখির সমুখে
আপনি যদি না ফুটে
অপরের ডাকা নামে বারে বারে
ডাকিতে কি মন উঠে?
এস এস এস হে মোর অনামী,
অন্তর্হিত অন্তর্যামী

নিভৃতে গোপনে আমি-হতে-আমি
দেখা দাও।[২০৮]

শুধু দৃষ্টি নয়, স্পর্শও—

ইমাং প্রত্নায় সুষ্টুতিং নবীয়সীং
বোচেয়ম্ অস্মা উশতে শৃণোতু নঃ।
ভূয়া অন্তরা হৃদি অস্য নিস্পৃশে
জায়েব পত্যে-উশতী সুবাসাঃ[২০৯]

নূতনতর এ সুন্দর গান এনেছি, পুরাণ, তোমার জন্যে,
গাই, হে অধীর, শোনো।
বাসকসজ্জা অধীরা এ গান-বধূকে, হে স্বামী, হৃদয়ে তোমার
নিবিড় পরশ দান'।

শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও॥[২১০]

পরি পূষা পরস্তাদ্-হস্তং দধাতু দক্ষিণম্।
পুনর্ নো নষ্টম্ আজতু[২১১]

সুদূর থেকে পূষা দখিন হাত দিয়ে তাঁর
রাখুন মোদের ঘিরে।
যা হারাল, পাই যেন তা ফিরে।

হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো, দাও গো আমার হাতে—
ধরব তারে, ভরব তারে, রাখব তারে সাথে।[২১২]

॥ ১২ ॥

বাক্ স্বয়ংবরা হয়ে কবিকে বরণ করেন, প্রবেশ করেন তাঁর মধ্যে, এ যেমন রহস্যময় অপৌরুষেয়-তত্ত্বের গোড়ার কথা, তেমনি আর একটি গোড়ার কথাও এই আলোচনা থেকে আভাসে বোঝা গেল যে এই অপৌরুষেয়ী বাক্ একান্ত-ভাবেই পুরুষাশ্রিতা। এই আশ্চর্য বিরোধাভাসই অপৌরুষেয় তত্ত্বের প্রাণ। লৌকিক ভাষাকে সর্বতোভাবে আত্মসাৎ করেও কাব্যভাষা কি করে তাকে

ছাপিয়ে বহুদূর চলে যায়, সে তত্ত্বও এই গুহাতেই নিহিত।

সুদূরতম সুদূর পরম পরাবত্ ঋতের সদন মহাশূন্য পরম ব্যোম থেকে এক দিব্য বাক্-পারাবার তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে ঋষির সমর্থ আধারে নেমে আসছে, এ কথা যেমন সত্যি, তেমনি একথাও সমানভাবে সত্যি যে ঋষিরই গভীর হৃদয়-কন্দর থেকে, তাঁর গভীর গোপন মহা-আপন থেকে এই মর্ত্য পার্থিব বাক্-তরঙ্গ উঠছে।

rhythmic speech…as the veda puts it, rises at once from the heart of the seer and from the distant home of Truth[২১৩]

বেদের ভাষায়, ছন্দোময়ী বাক্ উত্থিত হয় একই সঙ্গে ঋষির হৃদয় এবং ঋতের সুদূর সদন থেকে।

যেন দ্যৌষ্পিতা এবং মাতা পৃথিবী ঋষির মধ্যে মিলে গিয়ে জন্ম দিচ্ছেন এক দিব্য-পার্থিব মর্ত্য-অমৃত বাগ্-বিহঙ্গীর। সে জন্মেই চলেছে, তার জন্মানো আর ফুরোয় না,

নবোনবো ভবতি জায়মানঃ[২১৪]

যে বাক্ ওপর থেকে ঝরে পড়ছে মেঘ-ভাঙা বৃষ্টির মতো,

অভ্রাদ্ বৃষ্টির্ ইবাজনি[২১৫], তার নির্মাণ ঋষিরই মুখে,

মিমীহি শ্লোকম্ আস্যে পর্জন্য ইব ততনঃ[২১৬]

মুখে মুখে শ্লোক রচে চল অবিরত
ছড়াও ছড়াও বর্ষা-মেঘের মতো।

যে-অগ্নি ঋষির মধ্যে বিশ্বকাব্যের আধান করছেন, তাঁর জন্ম ঋষিরই বীর্যে—

স প্রত্নথা সহসা জায়মানঃ
সদ্যঃ কাব্যানি বট্-অধত্ত বিশ্বা[২১৭]

অতীতেরি মতো, বীর্যে আমার
নিল সে জনম, জনমান্তর ;
সত্যি সত্যি সদ্য সদ্য
আহিত করল বিশ্ব কাব্য।

এই বাক্ যত বেশি করে যত গভীর ভাবে তাঁর নিজের, আপনার হয়ে

উঠছে, ততই তা হয়ে উঠছে সবার। যত সত্য ভাবে তা পৌরুষেয় হচ্ছে, ততই সত্যভাবে তা অপৌরুষেয় হচ্ছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথই বেজে বেজে উঠছেন, অতুলপ্রসাদের গানে অনন্যভাবে অতুলপ্রসাদই, বিশ্বামিত্রের মন্ত্রে নিবিড়ভাবে বিশ্বামিত্রকেই অনুভব করা যায়, বসিষ্ঠের মন্ত্রে বসিষ্ঠেরই অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত স্পর্শ, অথচ বিশ্ববীণার তারে তারেই সে সুর বাজছে। হৃদয়ের গভীর থেকে যে সুর উঠছে, তা হয়ে যাচ্ছে চরাচরব্যাপী সুরের সঙ্গে একাকার। তার মানে ঋষির হৃদয়টি সমুদ্রহৃদয়, বিশ্বহৃদয়, সর্বহৃদয় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মভাষাই হয়ে উঠছে বিশ্বভাষা!

একদিক থেকে যা মহাব্যোমে সহস্রাক্ষরা বাকের দিব্য স্পন্দন, আর একদিক থেকে তাই হল কবির অন্তরের অন্তম শব্দ। যা মহি শ্রবঃ[২১৮] বা মহা-শ্রুতি, নিখিল চরাচর-ছাওয়া ছন্দস্পন্দ, ভূরি শ্রবঃ[২১৯]—বা প্রচুর শ্রুতি, চারিদিক থেকে ধেয়ে-আসা শব্দের প্লাবন, দেবভক্তং শ্রবঃ, দেবাবিষ্ট শ্রুতি, যার কথা বলছেন ঋষি পরাশর শাক্ত্য—

এতা তে অগ্নে-উচথানি বেধো
জুষ্টানি সন্তু মনসে হৃদে চ।
শকেম রায়ঃ সুধুরো যমং তে
অধি শ্রবো দেবভক্তং দধানাঃ[২২০]

অগ্নি, বেধা, এই যে তোমার গান এরা সব—
নাও গো এদের হৃদয়মনে নাও গো ভালবেসে।
তোমার দেওয়া ধনের যেন টানতে পারি রাশ,
তোমায় দিয়ে সেই শ্রুতি যা পেলাম দেবাবেশে।

তাই আবার উপশ্রুতি,[২২১] অতি কাছের শব্দ, হৃদয়ের আপন শব্দ—

কানে কানে কথা উঠে পূরে
কোন সুদূরের সুরে সুরে[২২২]!

ব্রহ্মের মতোই এই বাক্ অতি দূরে আবার অতি কাছে। তাই আয়ুর দশম দশকে উত্তীর্ণ মহাকবি দীর্ঘতমা ঔচথ্য বললেন—

ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম[২২৩]
এই ব্রহ্মাই বাকের পরম ব্যোম।

এই ব্রহ্মীভূত ব্রহ্মপুরুষ আমার হৃদয়ই হল সেই মহাশূন্য যা থেকে নির্ঝরিত হয় বাক্। এই এ‌কই কথা অন্য ভাষায় বলেছেন একালের কবি—

হৃদয়ে ফুলের মতো ফুটিছে কবিতা
… … …
আকাশে তারার মতো তাহারা অনেক
সমুদ্রে ঢেউয়ের মতো ঢের ;
তাদের দু' একটি কি রোদের মতন
পড়িয়াছে চোখে তোমাদের ?
তোমরা দেখিতে পাও সেই ফুলগুলি—
কেমনে যে হয় ?
যে-আকাশে তারা তা'রা—যে-সমুদ্রে ঢেউ,
সে-আকাশ আমার হৃদয়,
সে-সমুদ্র আমার হৃদয়।[২২৪]

এই দূরতমা অন্তমা বাকের কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ নানা গানে—

আকাশ জুড়ে শুনিনু ঐ বাজে
তোমারি নাম সকল তারার মাঝে ॥
সে-নামখানি নেমে এল ভুঁয়ে,
কখন আমার ললাট দিল ছুঁয়ে[২২৫]

কোন্ সুদূর হতে আমার মনোমাঝে
বাণীর ধারা বহে—আমার প্রাণে প্রাণে।

আবার,

আমি কান পেতে রই
ও আমার আপন হৃদয় গহন-দ্বারে
বারে বারে[২২৬]

অদিতি বাকের প্রসাদপুষ্ট ঋষি মনুসুত নাভানেদিষ্ঠ উপলব্ধির তুঙ্গে উঠে বলছেন—

ইয়ং মে নাভির্ ইহ মে সধস্থম্
ইমে মে দেবা অয়ম্ অস্মি সর্বঃ।

দ্বিজা অহং প্রথমজা ঋতস্য
ইদং ধেনুর্ অদুহত্-জায়মানা[২২৭]

মিলেছি সবার সঙ্গে এখানে, এখানেই বাঁধা আছি,
আমারি অরোরা এই দেবতারা—আমি সব হয়ে আছি।
আমি ঋতের প্রথম জাতক—পেয়েছি নব জন্মান্তর।
এ ধারা ঝরাল যে ধেনু[২২৮] আমাতে জন্মে চলেছে নিরন্তর।

এই হল দ্যুলোক-ভূলোকের মিলন কবির মধ্যে, যার কথা বলেছেন ঋষি দীর্ঘতমা—

তে মায়িনো মমিরে সুপ্রচেতসো
জামী সযোনী মিথুনা সম্ ওকসা।
নব্যং নব্যং তন্তুম্ আ তন্বতে দিবি
সমুদ্রে অন্তঃ কবয়ঃ সুদীতয়ঃ[২২৯]

'যারা সোদর, যমজ, সমানাশ্রয় মিথুন সেই দ্যাবাপৃথিবীকে চিনেছেন বিশালচেতন উজ্জ্বল কবিরা তাঁদের আশ্চর্য প্রতিভা দিয়ে, আর গভীর সমুদ্র থেকে দ্যুলোক পর্যন্ত টানা দিয়ে চলেছেন নিত্য নূতন আলোকতন্তু।'

হৃদয়সমুদ্র থেকে ছুটে আসা আলোর জোয়ারের প্রত্যক্ষদর্শী ঋষি বামদেব তাঁর অনুভব বর্ণনা করেছেন উজ্জ্বল ভাষায়—

এতা অর্ষন্তি হৃদ্যাত্ সমুদ্রাত্
শতব্রজা রিপুণা নাবচক্ষে।
ঘৃতস্য ধারা অভি চাকশীমি
হিরণ্যয়ো বেতসো মধ্যে-আসাম্[২৩০]

একশ হয়ে চলছে ধেয়ে উজল রসের ধারা
হৃৎ-পারাবার হতে আমার—শত্রু কী তার জানে?
মধ্যিখানে দুলছি আমি সোনার বেতস-পারা
চেয়ে চেয়ে দেখছি ওদের পানে।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন সেই সুরের কথা,

যে সুর গোপন গুহা হতে
ছুটে আসে আকুল স্রোতে।[২৩১]

॥ ১৩ ॥

তাই,

ঋষি শুধু শোনেন না, শোনানও।

শোনান তাঁর অন্তরদেবতাকে হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে তক্ষণ করে করে রচা এক একটি গান।

ঋগ্বেদের আদ্য কবি মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র বলছেন—

আশ্রুত্‌কর্ণ শ্রুধী হবং
নূ চিদ্ দধিষ্ব মে গিরঃ।
ইন্দ্র স্তোমম্ ইমং মম
কৃষ্বা যুজশ্ চিদ্ অন্তরম্[২৩২]

আকাশজোড়া কান যে তোমার,
শোনো এ আহ্বান, এখনি
আমার বাণী চিত্তে তোমার ধরো ;
ইন্দ্র, আমার এ গানখানি
সখার চেয়েও কর আপনতর।

বিশ্বামিত্র আর বামদেব একই ভাষায় বলছেন—

জোষয়াসে গিরশ্ চ নঃ। বধূয়ুর্ ইব যোষণাম্[২৩৩]
অধীর প্রেমিক, নাও এ গীতালি-বধূকে !

দীর্ঘতমা বলছেন গভীর প্রত্যয়ে—

বিশ্বানি-একঃ শৃণবদ্ বচাংসি মে[২৩৪]
সে একা শুনবে যত কথা আছে মোর।

তাঁর 'ঘুম-ভাঙানিয়া'কে গান শোনাচ্ছেন ঋষি তিরশ্চী—

শ্রুধী হবং তিরশ্চ্যাঃ…
ইন্দ্র যস্ তে নবীয়সীং গিরং মন্দ্রাম্ অজীজনত্।
চিকিত্বিন্মনসং ধিয়ং প্রত্নামৃতস্য পিপ্যুষীম্[২৩৫]

ডাকে তিরশ্চী, শোনো হে ইন্দ্র, জন্ম সে দিল তার
জেগে-ওঠা মনে ধ্যানের অতলে প্রত্ন সুধায় ভরা
নব নবতর ঘুমভাঙা গান, তোমাকে মাতাবে যারা।

ঋষি অগস্ত্য বলছেন—

এষ বঃ স্তোমো মরুতো নমস্বান্
হৃদা তষ্টো মনসা ধায়ি দেবাঃ।[২৩৬]

হৃদয়মনে কেটে গড়া, ওগো মরুদ্‌গণ,
এই তোমাদের নম্র গীতি করছি সমর্পণ।

দেবতাও তখন আর শুধু শোনান না, শোনেনও। আকাশে বাতাসে কান পেতে তিনি শোনেন ভক্তকবির অপ্রতিরোধ্য আহ্বান, গৌরমৃগের মতো তৃষিত হয়ে পান করেন তার গীতাঞ্জলি—

সেমং নঃ স্তোমম্ আ গহি-উপেদং সবনং সুতম্।
গৌরো ন তৃষিতঃ পিব[২৩৭]

সে-তুমি এস আনন্দ যজ্ঞে,
এস এ স্তবন-গানে,
গৌরের মতো তৃষিত পিও হে পিও।

গান শোনার লোভে কন্যা হয়ে এসে বেড়া বাঁধেন, গরবী কবি অনুভব করেন, 'দেবতারা রাতে দীপ্র নয়নে শুনে গেছে মোর দিব্য বেণু'।

যে অগ্নি থেকে এসেছিল ঋষির কাব্য, মনীষা, বরণীয়া বাক্,[২৩৮] আবার তাঁরই উদ্দেশ্যে ধেয়ে যায় তাঁর মনীষা, তাঁর মধুমতী বাক্—

তুভ্যেদম্ অগ্নে মধুমত্তমং বচস্
তুভ্যং মনীষা ইয়ম্ অস্তু শং হৃদে[২৩৯]

মধুর মধুর মধুর এ-বাণী
মনীষা, তোমাকে দিলাম অগ্নি,
সুখেতে তোমার হৃদয় ভরুক-না সে।

শুধু ধেয়ে যায় না, শুধু তাঁকে প্রীত, আহ্লাদিত, নন্দিত করে না, তাঁকে বাড়িয়ে তোলে—

ত্বাং গিরঃ সিন্ধুম্ ইবাবনীর্ মহীর্
আ পৃণন্তি শবসা বর্ধয়ন্তি চ[২৪০]

সিন্ধু যেমন ভরে তোলে মহা-নদীরা
তেমন তোমাকে ভরছে এ বাণী-মদিরা
বাড়িয়ে তুলছে বিপুল প্রাণোচ্ছ্বাসে।

অলখের দূতী যে গানেরা ঋষির হৃদয় ভুলিয়েছিল, তারাই আবার দূত হয়ে চলে দেবতার হৃদয় স্পর্শ করতে—

অয়ং তে স্তোমো অগ্রিয়ো
হৃদিস্পৃগ্ অস্তু শন্তমঃ।[২৪১]
এ-গান তোমার হৃদয়কে ছুঁক,
সব-সেরা, দিক সবচেয়ে সুখ।

সে-গান তখন অদিতির অতি আদরের লক্ষ্মী ছেলে যাকে তিনি বুকে আঁকড়ে ধরবেন—

প্রতি মে স্তোমম্ অদিতির্ জগৃভ্যাত্
সূনুং ন মাতা হৃদ্যং সুশেবম্[২৪২]

দেবতার উদ্দেশে ঋষি তখন গানের তরী[২৪৩] ভাসিয়ে দেন।

তখন ঋষি যা শোনেন তাই মন্ত্র, যা দেখেন তা-ই দেবতা, এক সহজ সুধায় ভরে ওঠে তাঁর দেহমনপ্রাণ—

বি মে কর্ণা পতয়তো বি চক্ষুর্
বি-ইদং জ্যোতির্ হৃদয়ে-আহিতং যত্।
বি মে মনশ্ চরতি দূর-আধীঃ
কিং স্বিদ্ বক্ষ্যামি কিম্ উ নু মনিষ্যে[২৪৪]

পড়ছে গিয়ে সব ঠাঁইয়েতে দুকান আমার, চোখ,
পড়ছে গিয়ে এই হৃদয়ের আলো,
মন যে আমার ঘুরে বেড়ায় দূরে কোথায় দূরে
আমি বলব কী আর ভাবব কী বা বলো।

নয়ন আমার রূপের পুরে
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে
শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন।[২৪৫]

॥ ১৪ ॥

প্রতিটি কবির নিজস্বভাষা বা আত্মভাষা—যা তিনি তাঁর মাতৃভাষার ধ্বনি-স্রোত থেকে জন্মাবধি আহরণ করে করে গড়ে তুলেছেন—হল বিশ্বভাষা বা সর্বভাষা বা পরাবাকের ঘুমন্ত বীজ, ব্রহ্মের অণ্ড। তাঁর নিজের বাগিন্দ্রিয়ই হল 'পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী' মহাজিহ্বা মহাকালীর পুত্তলিকা। এক প্রচণ্ড উত্তাপে সেই পুতুলের অণুপরমাণু বিদীর্ণ হয়ে গড়ে উঠছে এক চিৎ-প্রতিমা। সেই বীজ, সেই অণ্ড ফেটে-ফুটে গজিয়ে উঠছে বেরিয়ে আসছে এক নিত্যাস্তোত্র বনস্পতি, এক অক্লান্তপক্ষ নিত্যচর বিহঙ্গ, এক অগ্নিগর্ভ অশ্রুগর্ভ অমৃতগর্ভ বাণীর প্লাবন, ব্রহ্মী বাক্। যা ছিল মাত্র একজনের ব্যক্তিগত ধরা-বাঁধা দাগা-বুলোন প্রতিধ্বনি-সর্বস্ব মামুলি অধমর্ণ ভাষা, ঐ উত্তাপের রসায়নে ভেঙে চুরে গলে তা হয়ে যাচ্ছে অধরা অবন্ধনা নূতনা ধ্বনিময়ী উত্তমর্ণা অদিতি ভাষা। তার প্রতিটি কণায় জ্বলছে সূর্য, প্রতিটি বিন্দুতে ঝলছে সোম, প্রতিটি অণুতে দেখা দিচ্ছে বিদ্যুন্ময়, ধ্বনিময়, ইঙ্গিতময় মহাকাশ।

এই উত্তাপ, যা কখনো নিষ্ঠুর জীবনসংগ্রাম, কখনো বা শুধুই আন্তরযন্ত্রণার রূপ ধরে আসে, তার আঁচ পাই ঋষি বামদেব গৌতমের আত্মজীবনীর একটি ছেঁড়া পাতায়—

> অবর্ত্যা শুন আন্ত্রাণি পেচে
> ন দেবেষু বিবিদে মর্ডিতারম্।
> অপশ্যং জায়াম্ অমহীয়মানাম্
> অধা মে শ্যেনো মধু-আজভার[২৪৬]
>
> ছিল না জীবিকা, রাঁধতে হয়েছে কুকুরের নাড়ীভুঁড়ি,
> সান্ত্বনা দিতে কোন দেবতাকে পাই নি;
> ধুলোয় লুটোতে দেখেছি আমার দয়িতার সম্মান,
> অবশেষে শ্যেন মধুর অমৃত আমাকে দিয়েছে এনে।

আঁচ পাই রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা দুঃসময়ে—

> আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন,
> উষা-দিশাহারা নিবিড় তিমির আঁকা
> ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।[২৪৭]

নবজন্মের উষার উদ্দেশ্যে, অমৃত সোমের উদ্দেশ্যে এ হল কবির বাগ্‌-বিহঙ্গীর তিমিরাভিসার। ঋগ্বেদের মহাকবি দীর্ঘতমার নামের তাত্‌পর্যও এখানেই মেলে। দীর্ঘদিন ধরে নিবিড় তমঃ বা তিমিরে যিনি বাস করেছেন, অভিযান চালিয়েছেন সেই অন্তবিহীন-নহে-তো অন্ধকারে, তারপর অগ্নি যাঁর অন্ধত্ব ঘুচিয়েছেন, তিনিই দীর্ঘতমা[২৪৮]। জীবনানন্দের কাব্য 'সাতটি তারার তিমির'-এর নামকরণের মধ্যেও পাই কবির দীর্ঘতমস্থের পরিচয়। একটি তারাকে ফোটাতে যেমন চাই অনেকখানি অন্ধকার, তেমন একটি কবিতাকে, একটি গানের তারাকে জ্বালতেও চাই হৃদয়-আকাশভরা অন্ধকারের ইন্ধন, তিমিরগর্ভে দীর্ঘদিবস দীর্ঘরজনী বাসের প্রস্তুতি। জীববিদ্যা একে বলবেন, incubation period ; খৃষ্টান মরমীয়া বলবেন dark night of the soul ; শ্রীঅরবিন্দ বলবেন এটি Everlasting Day-র—যার বৈদিক নাম হল সকৃদ্‌-দিবা—পূর্ববর্তী eternal night ; রবীন্দ্রনাথ বলবেন, নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘ রাত্রি রব জাগি দীপ নিবিবে না।

এ অন্ধকার বুঝি সেই আশ্চর্য অন্ধকারেরই পূর্ব-সঙ্কেত, যে-উত্‌স থেকে উৎসারিত হয় আলো, যা দেখে উপনিষদ্ বলেন, ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকম্‌···তস্য ভাসা সর্বম্‌ ইদং বিভাতি, রামপ্রসাদ বলেন, এ বড় আশ্চর্য কালো, যাকে হৃদয়মাঝে রাখলে পরে হৃদয়পদ্ম করে আলো ; আর বাউল বলেন, আমার ডুবল নয়ন রসের তিমিরে।

কাব্যজন্মের প্রচণ্ড উত্তাপ ভাষা পেয়েছে আধুনিক কবিরও কবিতায়—

একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে
আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ
রাগে রী-রী করে, সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে
দুরন্ত ঝড়, মেঘের ধূম্র জটা
খুলে খুলে পড়ে, বজ্রের হাঁকডাকে
অরণ্যে সাড়া শিকড়ে শিকড়ে
পতনের ভয় মাথা খুঁড়ে মরে
বিদ্যুৎ ফিরে তাকায়
সে আলোয় সারা তল্লাট জুড়ে
রক্তের লাল দর্পণে মুখ দেখে

ভস্মলোচন।
একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে[২৪৯]।

কাব্যজন্ম তথা নবজন্মের এই অগ্নিসমিন্ধনই হল ঋষি-কবিদের তপঃ, তথা যজ্ঞ। বাণীই এ যজ্ঞের সমিধ্, ঋক্ই এ-যজ্ঞের হবিঃ—

সমিদ্ধম্ অগ্নিং সমিধা গিরা গৃণে[২৫০]

দাউ দাউ জ্বলে অগ্নি আমার বাণীর সমিধে
গাই তার বন্দনা।

আ তে অগ্নে-ঋচা হবির্
হৃদা তষ্টং ভরামসি[২৫১]

তোমার জন্যে এনেছি হবিঃ, হে অগ্নি—
হৃদয়-যন্ত্রে কেটে-ছুলে গড়া মন্ত্র[২৫২]।

অগ্নে মন্মানি তুভ্যং কং
ঘৃতং ন জুহ্বে-আসনি[২৫৩]

অগ্নি, তোমার আস্যে আহুতি করি অর্পণ
মন্ত্রগুচ্ছ—ঘৃতসম—তব মনোনন্দন।

প্র যদ্-বস্ ত্রিষ্টুভম্ ইষং মরুতো বিপ্রো অক্ষরত্
বি পর্বতেষু রাজথ[২৫৪]

তোমাদের অন্নের
ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের বর্ষণ
বর্ষাল কবি যবে,
তোমরাও ঝলসালে
পাহাড়ে পাহাড়ে, হে মরুদ্‌গণ।

তপস্যার টানে নেমে আসে বেদ, আসে বাক্, আসে দেবতা। 'অজান্ হ বৈ পৃশ্নীংস্ তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু-অভ্যানর্ষত্ তে-ঋষয়োঽভবন্', অজ পৃশ্নিরা তপ করছিলেন, তখন স্বয়ম্ভু বেদ তাঁদের কাছে অর্ষণ করলেন অর্থাৎ এলেন, তাইতে তাঁরা ঋষি হলেন, বলছেন তৈত্তিরীয় আরণ্যক।[২৫৫] ঋগ্বেদে বিভিন্ন ঋষি বলছেন

গানের টানে দেবতার নেমে আসার কথা। উপলব্ধির নিশ্চিত প্রত্যয় নিয়ে ঋষি বত্‌স বলছেন—

আ তে বত্‌সো মনো যমত্‌ পরমাত্‌-চিত্‌ সধস্থাত্‌।
অগ্নে ত্বাং-কাময়া গিরা[২৫৬]

যেখানেই থাকো, হোক সে পরম লোক,
অগ্নি, তোমাকে-চাওয়া এই গানে গানে
বত্‌স তোমার মনকে এখানে আনবে আনবে টেনে।

অত্যন্ত লৌকিক ভাষা ও ভঙ্গিতে পরিহাসের সুরে বলছেন দশম মণ্ডলের ঋষি, অগ্নির ছদ্মনামে কোন বৈদিক রামপ্রসাদ!—

অনুষ্টুভম্‌ অনু চর্চূর্যমাণম্‌
ইন্দ্রং নি চিক্যুঃ কবয়ো মনীষা[২৫৭]

অনুষ্টুভের আশেপাশে খালি ঘুরঘুর করে ইন্দ্রটি, তাকে
চিনে ফেলেছেন কবিরা মনীষা দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের অনুভবও মিলে যায়—

যখন তোমার গানে আমি জাগি
আকাশে চাই তোমার লাগি
আবার একতারাতে আমার গানে
মাটির পানে তোমায় নামায়॥

আমার শরৎরাতের শেফালি-বন
সৌরভেতে মাতে যখন
তখন পালটা সে তান লাগে তব
শ্রাবণ-রাতের প্রেম-বরিষায়॥[২৫৮]

তপ ঘনীভূত হয়ে ঋষির হৃদয়ে জন্ম নেয় অগ্নি হয়ে, আগ্নেয়ী বাক্‌ হয়ে। তারপর সুরু হয় সেই বাগ্‌-বিহঙ্গীর শুক্লাভিসার। সে তখন চলে অন্ধকার থেকে আলোতে নয়, আলো থেকে আরো-আলোতে, উৎ-তর থেকে উৎ-তম জ্যোতিতে, 'দিবেদিবে' প্রকাশ হতে প্রকাশে। সে হয় সূর্যা, সে হয় সোম্যা। 'অগ্নি-ছন্দ গায়ত্রী সুপর্ণী শ্যেন হয়ে বা একবছরের মেয়ে হয়ে সোম-অমৃত

আহরণ করে এনেছিলেন'—বৈদিক সাহিত্যে বহুত্র বিবৃত এই আখ্যায়িকাতে এই তত্ত্বেরই বিস্তার।

এই আত্মজা বাক্ ঋষির প্রিয়া তনু তথা আত্মা হয়ে উঠতে উঠতে জন্ম দেয় মন্ত্রশরীর দেবতাদের। বিশ্বচরাচরের দিব্য মর্ত্য যত কিছু স্পন্দন-অস্পন্দন সব এক হয়ে এসে ঋষিকে বরণ করে 'নিম্নম্ আপো ন সধ্র্যক্', নিচুজমিতে যেমন সব জলধারা এক হয়ে এসে মেশে। তিনি তখন হয়ে যান একাধারে নবজাত শিশু, এবং প্রত্ন পিতা। তখন তাঁর নিত্য-নবীনতারও শেষ থাকে না, নিত্য প্রবীণতারও শেষ থাকে না। তিনি তখন হন পুনর্ণব সনাতন, এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তখন—

ফিরে সেই ঝুরু ঝুরু
চলে নাচ দিনে রেতে
পুরানোর পাঁজর বাজে
নতুনের পাঁয়জোড়েতে।
মহাকাল হয়ে নাকাল
মানে আপন পরাজয়।
কেমন করে এমন হয়?
ও অশথ[২৫৯]

নিজেরই ভেতরে এই যে 'গো', বাণীর কিরণ, আলোর ভাষা, এই যে অগ্নি উষা সূর্য লুকিয়ে আছে, ঘুমিয়ে আছে অন্ধকারে, 'গুহা হিতং গুহ্যং গূঢ়ম্ অপ্সু'[২৬০], অনন্ত পাষাণের অন্তরে এই যে সুগুপ্ত হয়ে রয়েছে পক্ষিণীর গর্ভের মতো দ্যুলোকের ধন[২৬১], এই ফসিলকে জাগিয়ে তোলা, এই তম-অঙ্কুর থেকে আলোর ফসল ঝলমলিয়ে তোলা—এই সাধনা, আত্মার এই মরণপণ দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী নানান রূপকের রূপ নিয়ে ছড়িয়ে আছে বেদের মধ্যে। এই সব রূপকের রূপোদ্ধার করেছেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'On the Veda' গ্রন্থে, বিশেষ করে The Herds of the Dawn, The Cow and the Angirasa Legend, The Lost Sun and the Lost Cows ইত্যাদি অধ্যায়ে, এবং শ্রীঅনির্বাণ তাঁর বেদমীমাংসা গ্রন্থে। আত্ম-আবিষ্কার আর বাক্-আবিষ্কার একই কথা। আত্মার গভীর রসাতলে ডুব দিয়ে সমস্ত বাধা, সমস্ত পাহাড়ের আড়াল ভেঙে চুরমার করে দিয়ে আমার আপন কথাটিকে আপন স্বরটিকে

আপন ছন্দটিকে, ব্রহ্মাণ্ডের কাণ্ডবীণায় আমার নিজস্ব তন্ত্রীটিকে চিনে নেওয়া— এই হল ঋষিদের বাক্‌সাধনা কাব্যসাধনা আত্মসাধনা দেবতাসাধনা প্রেম-সাধনা। জনে জনে যুগে যুগে এ চেনার শেষ নেই, তাই বেদ অনন্ত—

আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা[২৬২] ॥

ঋষি অযাস্য (=অক্লান্ত) আঙ্গিরস এই আত্ম-বাক্-আবিষ্কারের একটি চিত্র দিয়েছেন তাঁর একটি উপমাপ্লুত সূক্তে।

বৃহস্পতির্‌ অমত হি ত্যাদ্ আসাং নাম স্বরীণাং সদনে গুহা যত্।
আণ্ডেব ভিত্ত্বা শকুনস্য গর্ভম্ উদ্ উস্রিয়াঃ পর্বতস্য অনাজত্
অশ্নাপিনদ্ধং মধু পর্যপশ্যন্-মৎস্যং ন দীন উদনি ক্ষিয়ন্তম্।
নিস্-তত্-জভার চমসং ন বৃক্ষাদ্ বৃহস্পতির্‌ বিরবেণা বিকৃত্য
সোষাম্ অবিন্দত্ স স্বঃ সোঽগ্নিং সো অর্কেণ বি ববাধে তমাংসি[২৬৩]।

এই স্বর্ধেনুদের সেই যে নামটি নিভৃতে গোপনে ছিল, বৃহস্পতি তা জেনে পাহাড় ভেঙে বার করে আনলেন আলোকধেনুদের, ঊর্ধ্বে দিলেন ঠেলে, ডিম ভেঙে ভেঙে পক্ষিশাবকের মতো।
চারিদিক তাকিয়ে তিনি দেখলেন মধু রয়েছে পাষাণচাপা, একটুখানি জলে মাছের মতো তার দশা। তখন বিবিধ রবে আবরণ ছিন্নভিন্ন করে তিনি বার করে আনলেন তাকে. যেন বৃক্ষ থেকে কেটে বার করলেন একটি সোমপাত্র। (অর্থাৎ যা ছিল শুকনো কাঠ, তাকে করে তুললেন অমৃতপানের পেয়ালা)। তিনি আবিষ্কার করলেন উষাকে, স্বর্জ্যোতিকে, অগ্নিকে (যারা নিগূঢ় ছিল আমার মধ্যে)। তীব্র রশ্মি দিয়ে বিদীর্ণ করলেন অন্ধকারের পরে অন্ধকার।

আড়াল যত ভাঙছে, আবরণ যত ঘুচছে, একটি একটি করে খসে যাচ্ছে নির্মোক, আমার অন্তঃস্থ দেবতার সঙ্গে আমার ব্যবধান তত কমছে, পাচ্ছি তার উষ্ণ স্পর্শ, শুনছি তার স্বর, দেখছি তার ব্যঞ্জনা সর্বত্র। আমি হয়ে যাচ্ছি আমার দেবতার রথ, বাহন, প্রহরণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, দেহকান্তি, দেহ[২৬৪]। তেমনি দেবতাও আমার[২৬৫]। দ্বৈতভ্রম মুছে মুছে যাচ্ছে, সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্য[২৬৬] দ্বৈতাদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত অদ্বৈত অচিন্ত্যভেদাভেদ। আত্মবোধ তার আপন কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছে কেন্দ্রের, যা সবার

কেন্দ্র তার। তারপর এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে এক হয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রের সঙ্গে[২৬৭]। এক হয়েও হচ্ছে না, কেন্দ্রের অসংখ্য সূর্যের একটি হয়ে আপন বৈশিষ্ট্যে জ্বলজ্বল করছে। বিস্ফারিত হয়ে যাচ্ছে। বড় বড় সূর্য-চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছে সব, 'বিপশ্যতি সং চ পশ্যতি'[২৬৮], প্রত্যেককে দেখছে আলাদা করে, দেখছে এক করে সবাইকে। ঋষি হচ্ছে। বাক্ হচ্ছে। প্রাণের আগুন, মন্ত্র ছড়িয়ে দিচ্ছে সবখানে। যা জ্বলার তা উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠছে, যা পোড়ার তা পুড়ে যাচ্ছে। 'অহং সূর্য ইবাজনি'[২৬৯], আমি জন্মালাম সূর্য হয়ে—বলছেন ঋষি বত্স (=নবজাতক) কাণ্ব। সে-সূর্য কেমন? না, 'সাধারণঃ সূর্যো মানুষাণাম্'[২৭০], সে-সূর্য সমস্ত মানুষের।

॥ ১৫ ॥

লৌকিক চেতনা থেকে এই লোকোত্তর চেতনায় আরোহণ, মামুলি শব্দার্থ-পরম্পরা থেকে এই অভিনব, নব্য, নবীয়সী, নব্যসী, নবিষ্ঠা ভাষায় উত্তরণ, বৈখরীর গভীরে এই উজ্জ্বলা পশ্যন্তী বাকের আবিষ্কার—এই হল কবির অন্তর্জীবনের ইতিহাস।

> তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
> ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
> নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
> গড়িলে মনের মতো[২৭১]।

এই নূতনত্বই তাঁর জন্মান্তরের, তাঁর দ্বিজত্বের চিহ্ন। তাই ঋগ্বেদের কবি থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত বিশ্বের সমস্ত উল্লেখযোগ্য কবিই নূতন বাণীর বাহক। নব মহাসঙ্গীতে বৃহস্পতির পরিচর্যা করছেন ঋষি গৃত্সমদ[২৭২]। দ্যুলোকের 'সোনালি ডানার চিল' অগ্নির উদ্দেশ্যে নব স্তোমের জন্ম দিচ্ছেন ঋষি বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি[২৭৩]। সুবীর স্বায়ুধ সুবজ্র ইন্দ্রকে নব্য স্তুতি দিয়ে আকর্ষণ করছেন ঋষি বার্হস্পত্য ভরদ্বাজ[২৭৪], যজ্ঞে যজ্ঞে নবীয়ঃ উক্থের জন্ম দেবার প্রার্থনা জানাচ্ছেন সেই মহাকৃত্তীর কাছে[২৭৫]। সমস্ত আবরণ যাঁরা ভেঙে চুরমার করে দেন, সেই ইন্দ্র-অগ্নির আস্বাদনের জন্যে ঋষি বসিষ্ঠ তুলে ধরছেন তাঁর নবজাত উজ্জ্বল স্তোমখানি[২৭৬]। নব্যসী গীতি দিয়ে দেবজনের তথা মিত্র-

বরুণের স্তব গাইছেন ঋষি ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ[২১৭]। নবিষ্ঠা গীতি গাইছেন ঋষি সোভরি প্রসাদবর্ষী তরুণ দেবতা পাবন মরুদ্‌গণের উদ্দেশ্যে[২১৮]। ঋষিকৃত্‌ মহাকবি সোমের উদ্দেশ্যে ঋষি কাশ্যপের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে সকল যুগের সকল কবির প্রার্থনা—

নূ নব্যসে নবীয়সে সূক্তায় সাধয়া পথঃ।
প্রত্নবদ্‌ রোচয়া রুচঃ[২১৯]

নব নবতর সূক্তের তরে দাও পথ করে দাও।
অতীতেরি মতো দীপ্তির পরে দীপ্তি ঝলমলাও।

বাণীর এই নূতনত্বই কবির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই নূতনত্ব যদি তাঁর জন্মান্তরের ফলে এসে না থাকে, এ যদি হয় শুধু বুদ্ধির চমক-লাগানো নূতনত্ব, তাহলে মেকি কিছুদিনেই ধরা পড়ে, তাঁর রচনা কালজয়ী হয় না।

এখানে একটি কথা আছে। বাণীর নূতনত্ব যদি হয় কবির দ্বিজত্বের নিরিখ, তাহলে বেদের কবিরা তো সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছেন না, কেন না সমস্ত ঋগ্বেদ পুনরুক্তিতে ভর্তি! পুনরুক্তি ভাবের, শব্দের, বাগ্‌ভঙ্গির, পদগুচ্ছের, পঙ্‌ক্তির এমন কি গোটা গোটা ঋকের। এক কবির পঙ্‌ক্তি এমন কি ঋক্‌ পর্যন্ত অনায়াসে আত্মসাৎ করে নিচ্ছেন আর এক কবি।

অবশ্য এই পুনরুক্তি দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর পুনরুক্তি কাব্যকলারই অন্তর্গত। এ যেন একধরণের অনুপ্রাস। একই পদ বা পদগুচ্ছ বা বাক্য বা ঋক্‌, এক কথায় একই ধ্বনিপ্রবাহ একই অর্থে বারবার অনুবৃত্ত হচ্ছে তাৎপর্যটিকে ঘনতর গভীরতর স্পষ্টতর করার জন্যে। যখন একটাই ভাব একই সুরে কবির মনে বারে বারে উদ্বেল হয়ে ওঠে, তখন এই আবর্তন তাঁর কবিতায় এসেই যায়। যেমন পূরবীর 'কিশোর প্রেম' কবিতায়—

অনেক দিনের কথা সে যে অনেক দিনের কথা;
পুরানো এই ঘাটের ধারে
ফিরে এল কোন জোয়ারে
পুরানো সেই কিশোর প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা?
সে যে অনেক দিনের কথা।

এই স্তবকে 'অনেক দিনের কথা' এই পদগুচ্ছটি তিনবার ঘুরে-ফিরে আসছে।

এইভাবে পরের স্তবকগুলিতে যথাক্রমে 'নির্জন অঙ্গন', 'আধেক জানাজানি', 'প্রথম ফাগুন মাস', 'শেষ-না-করা কথা' এবং 'সেই কিশোরের ভাষা'—এই পদগুচ্ছগুলি দুবার করে উক্ত হয়ে একটি বারে-বারে-ফিরে-চাওয়া বেদনাবিধুর অনুভূতির সৃষ্টি করেছে। এখানে পুনরুক্তি দোষ তো নয়ই, বরং সহজ অলঙ্কার। এ পুনরুক্তিতে কবির নূতনত্ব খণ্ডিত তো হয়ই না, বরং উজ্জ্বলতর হয়।

এই ধরণের পুনরুক্তি-অলঙ্কারের রাজা হলেন প্রথম মণ্ডলের কবি পরুচ্ছেপ দৈবোদাসি[২৮০]। এটি লক্ষ্য করেছেন যাস্কও[২৮১]। অতিশক্বরী, অষ্টি, অত্যষ্টি, ধৃতি, অতিধৃতি—এইসব সুদীর্ঘ ছন্দের স্তবকগুলিকে এই ধরণের পুনরুক্তি দিয়ে কারুকার্যমণ্ডিত করেছেন তিনি। শুধু কারুকার্য নয়, ছন্দের অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য যাতে ক্লান্তিকর না হয়, তার জন্যে এই পুনরুক্তি যেন তাঁর একটি সূক্ষ্ম রুচির কৌশল। একই কথা বারবার গুনগুনিয়ে তিনি যেন আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর অনুভূতির অতলে—

> অবিন্দদ্ দিবো নিহিতং গুহা নিধিং
> বেব্ন গর্ভং পরিবীতম্ অশ্মনি—
> অনন্তে অন্তর্ অশ্মনি।[২৮২]
>
> খুঁজে পেয়েছিল নিভৃতে লুকোন দ্যুলোকের ধন
> পাখির গর্ভ যেন বেষ্টিত পাষাণে
> গভীর অন্তবিহীন পাষাণে।

যেখানে সূক্তের প্রত্যেক ঋকে একটি ধুয়া বারবার ঘুরে ঘুরে আসছে, অথবা একটি সূক্তযুগ্মক বা সূক্তগুচ্ছের প্রতি সূক্তের শেষে একই ধুয়া পুনরাবৃত্ত হচ্ছে, সেখানেও পুনরুক্তি এই প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে। কেন না গীতধর্মী কবিতায় ধ্রুবপদের আবর্তন স্বাভাবিক কাব্যকারুকর্মের অন্তর্গত। যেমন ১।৯৭ এ কুত্স আঙ্গিরসের অগ্নিসূক্তে—

> অপ নঃ শোশুচদ্ অঘম্
> জ্বালাও পোড়াও ঘোচাও মোদের সব মালিন্য

—এই চরণটি রয়েছে আটটি ঋকের প্রত্যেকটিরই শেষে। ২।১২তে স জনাস ইন্দ্রঃ', 'ওগো মানুষেরা, তিনিই ইন্দ্র'—এই হল শেষ ঋক্ বাদে বাকি চোদ্দটিরই অন্তিম পদগুচ্ছ। ৩।৫৫-র বাইশটি ঋকে রয়েছে সেই বিখ্যাত ধুয়া—

মহদ্ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্
সব দেবতাই সেই এক মহা দেবতা

যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ
স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তিতে ঘিরে রেখো হে

—এই চরণটি রয়েছে সপ্তম মণ্ডলের ঋষি বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণির বহু সূক্তে। পড়লেই বোঝা যায়, সানাইয়ের পোঁ-এর মতো ঋষি বসিষ্ঠের অন্তরে সর্বপ্লাবী সর্বজনীন বিপুল স্বস্তির এক অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষা একটানা অক্লান্ত সুরে বেজে চলেছে অনুক্ষণ, তাঁর সমস্ত জীবনরাগিণী যেন বারবার ঐ সমে এসে শম্-এ এসে, ধ্রুবপদে এসে দম নিয়ে, প্রাণরস আহরণ করে নিয়ে বেজে বেজে উঠছে বিশ্বতানে। ঠিক তেমনি ঋষি কুত্স আঙ্গিরসের[২৮৩] ধুয়া—

তত্-নো মিত্রো বরুণো মামহন্তাম্
অদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যোঃ

এ-চাওয়া মোদের মান্য করুন মিত্র-বরুণ
অদিতি, পৃথিবী, আলোকের লোক, অন্তরিক্ষ

তাঁর কুড়িটির মধ্যে আঠারোটি সূক্তই শেষ হচ্ছে এই অর্ধর্চটি দিয়ে। যেন প্রতিটি গানের প্রদীপ জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে তিনি আকাশে তুলে ধরছেন, একই প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণ করে, এক একটি আলোর পতঙ্গের মতো উড়িয়ে দিচ্ছেন লোক-লোকান্তর-সীমা অসীমা···মহা অজানার মহাকাশে। বলছেন, দেখো, তোমার মহা-মহিমার জলুসে আমার এ-চাওয়া যেন হারিয়ে না যায়। তোমার জ্যোতিমঞ্জীরে একএকটি আলোর কিঙ্কিণী হয়ে বাজুক আমার এ হৃদয়ের কাঁপনগুলি। বাজতে থাকুক অনন্তকাল।

বসিষ্ঠের অনেকগুলি জোড়াসূক্তের[২৮৪] পায়ে বাজছে একই ঋকের নূপুর ; যেন এক কথা একবার বলে তৃপ্তি নেই। আবার বলতে ইচ্ছে করে। যেন ছদ্ম সন্দেহ। যা বলেছি, শুনেছ তো হে দেবতা ? না যদি শুনে থাক, আবার শোনো। কৃষ্ণ আঙ্গিরসের তিনটি সূক্তে রয়েছে জোড়াঋকের ধুয়া ![২৮৫] কখনো আবার এক সূক্তের কয়েকটি চরণে মাত্র ধুয়া, যেমন—

পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ।[২৮৬]

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ, ভজ গোবিন্দম্···, প্রণমামি শিবং শিব-

কল্পতরুম্, জয় জগদীশ হরে, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ, এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি··· ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ধুয়া কাব্যকলার দিক থেকে বেদের এই সব পুনরুক্তির সগোত্র। এই শ্রেণীর পুনরুক্তি কারো আপত্তির লক্ষ্য হতে পারে না।

আপত্তি হল দ্বিতীয় শ্রেণীর পুনরুক্তি নিয়ে। সেটি হল সমস্ত ঋগ্বেদ জুড়ে একই ভাব, একই ভাষা, একই রূপক, একই রূপকল্পের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি—

The Rig-veda is one in all its parts. Whichever of its ten Mandalas we choose, we find the same substance, the same ideas, the same images, the same phrases,—বলছেন শ্রীঅরবিন্দ। অর্থাৎ 'ঋগ্বেদ তার প্রতিটি খণ্ডেই অখণ্ড, এক। দশটি মণ্ডলের যে-কোন একটিকে বেছে নিলেই দেখি একই বস্তু, একই ভাব, একই রূপকল্প, একই বাগ্ভঙ্গি।

কেন?

The Rishis are the seers of a single truth and use in its expression a common language. They differ in temperament and personality; some are inclined to a more rich, subtle and profound use of Vedic symbolism; others give voice to their spiritual experience in a barer and simpler diction···. Often the songs of one seer vary in their manner, range from the utmost simplicity to the most curious richness. Or there are risings and fallings in the same hymn···Some of the Suktas are plain and almost modern in their language others baffle us at first by their semblance of antique obscurity. But these differences of manner take nothing from the unity of spiritual experience, nor are they complicated by any variation of the fixed terms and the common formulæ[২৮৭]

ঋষিরা একটি অনন্য সত্যের দ্রষ্টা এবং তা তাঁরা প্রকাশ করছেন একই সাধারণ ভাষায়। অবশ্য তাঁদের ধাতে এবং ব্যক্তিত্বে তফাৎ আছে। বৈদিক

রূপকজালের সূক্ষ্ম, ঐশ্বর্যময়, সান্দ্র প্রয়োগ কারো কারো পছন্দ, কেউ কেউ আবার তাঁদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা বলছেন অনেক সরল, নিরলঙ্কার ভাবে···। একই ঋষির সূক্তগুচ্ছে পাচ্ছি চূড়ান্ত সরলতা থেকে সুরু করে বিস্ময়কর বর্ণাঢ্যতা। এমন কি একই সূক্তের মধ্যেও রয়েছে নানান রকমের ওঠাপড়া ;··· কিছু সূক্ত রয়েছে, সাদাসিধে, ভাষায় প্রায় আধুনিক। আবার কিছু আছে যাদের প্রাচীনতা তথা দুর্বোধ্যতার প্রাচীরের সামনে প্রথমটা যেন থমকে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু ভঙ্গির এইসব বহুতর বৈচিত্র্য অনু-ভবের ঐকতানকে এতটুকুও বেসুরো করেনি, অথবা নির্দিষ্ট শব্দাবলী বা নির্ধারিত পদগুচ্ছের এদিক-ওদিক করে তাকে অযথা ভারাক্রান্ত করে তোলে নি।

এই fixed term বা common formulaগুলি কিন্তু বাঁধাগত নয়, সাধা গত। প্রত্যেকেই ঐ গতগুলি সেধে সিদ্ধ বা সিদ্ধকল্প হয়ে তবে উচ্চারণ করেছেন। তাই বাইরে থেকে দেখতে একরকম হলেও এগুলি দাগা-বুলোন উচ্চারণ নয়, অনুভূত উচ্চারণ। যেন প্রত্যেক ঋষি-কবিরই অনুভূতি একটি বিশেষ স্তরে—সরস্বতীর সেই মহো অর্ণঃ-তে—পৌঁছলেই থেকে থেকে একই সুরের একই ধ্বনির ঝঙ্কার তুলছে। সমস্ত ঋগ্বেদ যেন একটি সম্মিলিত গান, যেখানে প্রত্যেক কবি নিজস্ব পদ গাইতে গাইতে মাঝে মাঝে এক একটি পদ বহুজনে একসঙ্গে গেয়ে উঠছেন। আবার প্রসিদ্ধ পদে নিজস্ব আখর যোগ করছেন। এ যেন পরম দেবতার উদ্দেশে এক শতকণ্ঠী সহস্রকণ্ঠী কীর্তন যেখানে প্রত্ন মধ্যম নূতন অবম সব কবিরাই কীর্তনিয়া সেই অরূপ অলখ এই-আছে-এই নেই মূল গায়েনের সুরে সুরে—

> যদি স্তোতারঃ শতং যত্ সহস্রং গৃণন্তি গির্বণসং শং তদ্ অস্মৈ[২৮৮]
>
> শতকবি যদি, সহস্র কবি যদি
> স্তব গায় তাঁর, ভাল লাগে তাঁর, তিনি যে গান-দরদী।

পুরোণ কবির রচন-বচনকে আত্মসাৎ নয় আত্মীকৃত করে বেড়ে উঠছেন নতুন কবিরা। নবম মণ্ডলের শেষ ভণিতায় যেন সব কবির প্রতিভূ হয়ে ঋষি কশ্যপ নিজেকে বলছেন—

> ঋষে মন্ত্রকৃতাং স্তোমৈঃ কশ্যপোদ্বর্ধয়ন্ গিরঃ।
> সোমং নমস্য রাজানম্

ঋষি কশ্যপ, মন্ত্রকর্তা ঋষিদের গানে গানে
বাড়াও তোমার জেগে-ওঠা গান, ঊর্ধ্বে কণ্ঠ তোলো,
রাজার, সোমের চরণে লুটিয়ে দাও।

বৈষ্ণব পদাবলী, বাউল গান—এইসব হল ঋগ্বেদের এই ধরণের পুনরুক্তির উপমা। প্রাকৃত ভিন্নধর্মী কবিও কতসময় পূর্ব কবির এক একটি পঙ্‌ক্তির বিদ্যুৎ চমকে তোলেন নিজের রচনায়। যেমন বিষ্ণু দের কবিতায় 'কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে' রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকার এই পঙ্‌ক্তিটি[২৮৯]। যেমন বিমলচন্দ্র ঘোষের কবিতায় উপনিষদের এক একটি পদগুচ্ছ, যথা—মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

ব্যাপারটা তাহলে এই যে এক কবি যখন আর এক কবির অনুভূত ধ্বনি-প্রবাহকে নিজের রচনায় এনে বসান, তখন তিনি শুধু ভাষার প্রতিমাটিকে তুলে আনেন না, তিনি নিজের প্রাণ তাতে দিয়ে আবার নতুন করে তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে তবে তাকে সূক্তস্থ করেন। অর্থাৎ একটি ধ্বনিপ্রবাহ যতবার পুনরুক্ত হচ্ছে, ততবার তার পুনর্জন্ম ঘটছে। এইজন্যেই শঙ্করাচার্য বলেছেন, 'ন মন্ত্রাণাং জামিতাঽস্তি'—,[২৯০] মন্ত্রের কখনো পুনরুক্তি হয় না। যা বাসি, যাতযাম, যা দাগা-বুলোন, তা মন্ত্র নয়। ঋষি কখনো এক বাক্‌-ঢেউয়ে দুবার স্নান করেন না। তিনি চিরনূতন, চিরপুরাতন, চিরন্তন, 'সব দেবতার আদরের ধন নিত্যকালের তুই পুরাতন, তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী।'

বিশ্বা সনানি জঠরেষু ধত্তে
অন্তর্ নবাসু চরতি প্রসূষু,[২৯১]

পুরানো যা কিছু জঠরে ধরেন
ঘোরেন ফেরেন
সবে-জন্মানো পল্লবে-তৃণে,
নতুনে।

সত্যিকারের কবি যখন আত্মরচনার পুনরুক্তি করেন, তখনো তার এই একই ব্যাখ্যা। রবীন্দ্রনাথ বলছেন ছিন্নপত্রাবলীতে[২৯২]—

বারম্বার আমি একই কথা একই আগ্রহকে প্রায় একই ভাষায় প্রকাশ করেছি। আমার আর অন্য উপায় নেই। কারণ, আমি ঠিক একই ভাব

প্রতিবারেই নতুন করে অনুভব করি।

'শেষের কবিতায়' পরিহাসচ্ছলে বলা রবীন্দ্রনাথের আর একটি অবিস্মরণীয় মন্তব্যও এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—

এক এক সময়ে এমন অবস্থা আসে, মনের ভিতরটা শংকরাচার্য হয়ে ওঠে; বলতে থাকে, আমিই লিখেছি কি আর কেউ লিখেছে এই ভেদজ্ঞানটা মায়া।

এই সব কারণেই, প্রাচীন কবিদের পদে পদে স্মরণ-মনন-নিদিধ্যাসন দর্শন-শ্রবণ-আত্মীকরণ করেও ঋগ্বেদের কবিরা দ্বিধাহীন কণ্ঠে নিজেকে নতুন কবি বলে ঘোষণা করছেন বারবার। বলা বাহুল্য, এ শুধুই কালগত নূতনত্ব নয়। সেই সঙ্গে আপন সৃষ্টির অক্ষয় পরমায়ু সম্পর্কেও তাঁরা অকুণ্ঠভাবে সচেতন—

এতদ্ বচো জরিতর্ মাপি মৃষ্ঠা
আ যত্ তে ঘোষান্ উত্তরা যুগানি[২৯৩]

ভুলো না তোমার এ গান, হে কবি,
ঘোষণা করবে যা ভাবী যুগেরা।

॥ ১৬ ॥

তাহলে দেখছি, সামান্য ভাষার উপকরণকেই ভেঙে ভেঙে গড়ে উঠছে এক অসামান্য নতুন ভাষা, ঠিক যেমন সাধারণ মানুষের প্রাণ-মন-চিত্ত-বুদ্ধি-হৃদয়ের উপাদানগুলিকেই ভেঙে ভেঙে গড়ে উঠছে একজন অ-সাধারণ কবি-মানুষ। 'আমারে ভেঙে ভেঙে করো হে তোমার তরী'। 'পাত্রখানা যায় যদি যাক ভেঙে চুরে, হৃদয় আমার সহজ সুধায় দাও না পূরে।'

জঘান বৃত্রং স্বধিতির্ বনেব
রুরোজ পুরো অরদন্ ন সিন্ধূন্।
বিভেদ গিরিং নবম্ ইত্-ন কুম্ভম্
আ গা ইন্দ্রো অকৃণুত স্বযুগ্ভিঃ।[২৯৪]

'তোমারে আবরিয়া ধুলাতে ঢাকে হিয়া মরণ আনে রাশি রাশি'—
সেই বৃত্রকে হানলে, যেমন কুঠার গাছকে হানে,
ভেঙে চুরমার করলে আমার গোপন দুর্গগুলি,
খাত কেটে কেটে বওয়ালে কত-না অশ্রু-রক্ত-অগ্নি-অমৃত-নদী,

সবে-গড়া, আহা, নবকলসের মতো
ফাটালে আমার কঠিন পাষাণ-গিরি।

এখন, ইন্দ্র, এসেছ সবান্ধবে,
মেতেছ, মেতেছি, আলোকধেনুর মুক্তি-মহোৎসবে। (ভাবানুবাদ)

—বলছেন বিশ্বামিত্র-পুত্র রেণু, ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যিনি—এবং যাঁর বাক্—হয়ে উঠেছেন নতুন সৃষ্টির তেজস্ক্রিয় পরমাণু।

কাব্যভাষার সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় দুটি ব্যাপার লক্ষ্য করার আছে। কবি যখন কবি হয়ে উঠতে থাকেন তখন তাঁর ভাষা ক্রমশ অসামান্য হতে থাকে—নতুন নতুন শব্দ, নতুন নতুন অলঙ্কার, নতুন নতুন ভঙ্গি। এ যেন কবির স্বর্লোকে আরোহণ। তারপর তিনি যখন সেই সীমায় পৌঁছে যান যাকে বলতে পারি সিদ্ধির সুরু, তখন তাঁর ভাষা আবার ক্রমশ—অবশ্য এই ক্রমটি কালানুক্রম নয়, তাঁর চেতনার প্রসারণ-ক্রম—সামান্য হতে থাকে ; বাতাসের মতো সূক্ষ্ম, সজীব, অবাধ, কোথাও আটকায় না, যেন অবয়ব নেই, খুব চেনা, খুব আপন। যেন সবার শব্দ দিয়ে বোনা একখানি দিগম্বর, নীলাম্বর, রাজা-প্রজা বিদ্বান-মূর্খ সবাই পরতে পারে—

অহম্ এব বাত ইব প্র বামি-
আরভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা-
এতাবতী মহিনা সং বভূব[২৯]

বুকের ভিতর আঁকড়ে ধরে বিশ্বভুবন
স্রষ্টা আমি চলছি বয়ে হাওয়ার মতন।
ছাড়িয়ে আকাশ ছাড়িয়ে বিশাল এ-পিথিমি
দাঁড়িয়ে আছি কি মহিমায় বিপুল আমি।

এইটি কবির মর্ত্যাবতরণ এবং তৎপরবর্তী স্বর্গমর্ত্যবিহার, নিখিলের পাথায় ভর দিয়ে মহাশূন্য ধ্বনিত করে করে গান গাওয়া। ইনিই হলেন বৈদিক ঋষির মহানগ্নিকা বাক্ রামপ্রসাদের পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী দিগম্বরী কালী।

কবি-মনীষী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লক্ষ্য করেছেন—

মহাকবিরা নিজেদের ভাষা নিজেরা বানিয়ে যান বটে, কিন্তু সে ভাষা যখন

চূড়ান্তে পৌঁছায়, তখন তার মধ্যে শোনা যায় নিত্যনৈমিত্তিক উক্তি-প্রত্যুক্তির প্রতিধ্বনি, প্রাকৃত ভাষায় সবল, সরল ও সজীব পদক্ষেপ, তখন আর শেক্সপীয়র-এর ভাষা বলে কিছু থাকে না, ধরা পড়ে যে শেক্সপীয়র জনসাধারণের সাবলীল ভাষা ধার নিয়েছেন। অথচ এতখানি আত্মত্যাগ সত্ত্বেও শেক্সপীয়র-এর পৃথক পরিচয় হারায় না, বরং উজ্জ্বলতর রূপে দেখা দেয়; দুটো চারটে অসংলগ্ন ছত্র পড়লেই বুঝি, সে-রচনা শেক্সপীয়রের কিনা।[২৯৬]

কেমন করে এমন হয়?

আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে দিয়েই কি করে হঠাৎ বেজে ওঠে যেন অজানা অচেনা এক ভাষার নূপুরশিঞ্জন? অতি সাধারণ পদ এক বিশেষ বিন্যাসে সেজে হয়ে ওঠে পদাবলী? প্রাকৃত ধাতুতে নামে সংখ্যা সর্বনামে বেজে ওঠে এক চিরবাঞ্ছিত চিরপথিকের পদধ্বনি? যাঁকে বলছি বাক্, সর্বদেবতাময়ী সর্বময়ী অদিতি, মহাকবিদের আজন্ম-সাধনধন, আত্মার আত্মীয়তমা, আত্মা, যিনি নিজে ধরা না দিলে তাঁকে ধরা যায় না, তিনি কি আমাদের এই অতিপরিচিত দৈনন্দিন ভাষার মধ্যে থেকেই, পালিয়ে বেড়ান দৃষ্টি এড়ান ডাক দিয়ে যান ইঙ্গিতে? তেমন করে কান পাততে পারলে কি শোনা যায় সব কলরবে সারা দিনমান তাঁর অনাদি সঙ্গীতগান?

> harsh discordant murmurs swell into a
> psalm of praise ?[২৯৭]

> কর্কশ বেসুরো কলরব উচ্ছ্বসিত হয় স্তবগান?

সাধক কবি বলছেন, হ্যাঁ, যত শুনি কর্ণপুটে সবি মায়ের মন্ত্র বটে। কর্ণপুট যদি অল্পশ্রবা হয়, সঙ্কীর্ণঘরের ছোট্ট ঘুলঘুলির মতো অপ্রশস্ত চেতনার ক্ষীণশক্তি ইন্দ্রিয়, তা হলে সে-কানে শব্দ শুধু শব্দ, কথা শুধু কথা, আশু প্রয়োজন মেটান ছাড়া তার আর কোন উপযোগিতা নেই। কিন্তু কর্ণপুট যদি হয় উচ্চৈঃশ্রবা, ভূরিশ্রবা, বৃহচ্ছ্রবা, প্রশস্ত উদার অকুণ্ঠ অনিবাধ অগাধ চেতনার অগস্ত্যবল ইন্দ্রিয়, তাহলে সে-কানে প্রতিটি শব্দ—শুধু শব্দ কেন, প্রতিটি ধ্বনিকণাই—মন্ত্রের মতো তীক্ষ্ণ তীব্র ঋজু, সৃষ্টিবীর্যগর্ভ, অনন্তব্যঞ্জনাবাহী, সূর্যপ্রভ, চন্দ্রপ্রভ, পরমের দ্যোতক, পরম। সে-চেতনা থেকে যে-শব্দ, যে ধ্বনিপ্রবাহ উচ্চারিত

হয়, তা-ও তাই। অর্থাৎ বাক্ এবং তার অন্তর্গত এক-একটি ধ্বনিকণা যেন স্তরে স্তরে পুঞ্জিত অনন্ত লোকপরম্পরার মতো, এক একটি চেতনার সোনার কাঠির স্পর্শে খোলে এক একটি লোক। অথবা সে যেন এক অনন্তা নাগিনী, সাধারণ চেতনায় সে থাকে ঘুমিয়ে, যেন নিস্পন্দ, প্রাণহীন, শব ; কিন্তু চেতনা জাগলেই সে-ও জাগে। চেতনা যত বিশাল হয়, সে-ও পাক খুলে খুলে ততই বিশাল হয়, হয় বিশ্বব্যাপী প্রাণস্পন্দ, সব। তাই ঋষি বললেন, 'যাবদ্ বৈ ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাক্।' একথা যেমন তত্ত্ব হিসেবে সত্য, তেমনি ব্যক্তিগত অনুভূতি হিসেবেও। অর্থাৎ তোমার বাক্ ততদূর যাবে, যতদূর গিয়েছে তোমার চেতনা। কবির চেতনার আকাশ হংসবলাকা হয়ে হংসবতী ঋক্ হয়ে সোঽহং মন্ত্র হয়ে নেমে আসে তাঁর বাকের মধ্যে। তাঁর বাক্ আকাশ হয়ে ধারণ করে তাঁর চেতনার পাখিকে, সুপর্ণকে, হংসকে। প্রাকৃত ভাষা-ভঙ্গি, অতি চেনা শব্দ, অপশব্দ, গ্রাম্যশব্দ, হেয়শব্দ—সব পায় এক নতুন তাৎপর্য।

'কেমন করে এমন হয়', অথবা 'পথ বাৎলে দে'—অতি প্রচলিত বাগ্‌ভঙ্গি, দ্বিতীয়টি আরো বেশি প্রাকৃত। কিন্তু যেই কবি বললেন,

ও অশথ, বাৎলে দে পথ,—
কেমন ক'রে এমন হয়
হু হু হু চৈতি বায়ে
জরাজর্জর গায়ে
সহসা কি পুলকে
দুলে উঠে কিশলয়!
তোর দলে দলে কিশলয়!
কেমন করে এমন হয়?

অমনি যেন প্রাকৃত বাকের বুকে দুলে দুলে নেচে উঠল একজোড়া আলোর পাঁয়জোড়! তারপর সেই বিস্ময়ের অনুভূতির তালে তালে 'কেমন করে এমন হয়, কেমন করে এমন হয়' বলতে বলতে সুরের গুঞ্জনে প্রাকৃতকে অপ্রাকৃত করতে করতে মিলিয়ে গেল বিপুলবিস্তার অরণ্যপ্রতিম এক চরাচরজোড়া মহা-অশ্বত্থের—বেদ যাকে বলেছেন রুশত্ পিপ্পলম্—আলোছায়ার ঝিলিমিলিতে। কেউ যেন বাঁশি বাজিয়েছিল। তাই সমস্ত শব্দ নূপুর হয়ে ছুটে চলে গেল তার অভিসারে।

বয়সের সেই গহনে
　　চকিতে মন উদাসি'
বাজাল কেমন ক্ষণে
　　কে কিশোর এমন বাঁশি ?
তোর অঙ্গভরা জীর্ণজরা
　　শ্যামে শ্যামে শ্যামময় !
তোর পথে বসা পাতা খসা
　　জীবন হল মধুময় !
　　কেমন করে এমন হয় ?[২৯৮]

একেবারে পথে-বসা প্রাকৃত ভাষা বসেছে বৃন্দাবনের শ্যামকিশোরের সঙ্গে অঙ্গে অঙ্গ মিলিয়ে একই কেলিকদম্বদোলনায়।

কোন হিসাবে হর-হৃদে
দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে
আবার সাধ করে জিভ বাড়ায়েছ
　　যেন কত ন্যাকা মেয়ে।
জেনেছি জেনেছি তারা
তারা কি তোর এমনি ধারা
তোর মা কি তোর বাপের বুকে
　　দাঁড়িয়েছিল এমনি করে।

এখানে ভঙ্গি ভর্ৎসনার, ভাষা গ্রাম্য, এমন কি গালাগালির পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ কি গভীর, কি বিশাল, কি মর্মপ্লাবী! এ অনুভূতির এই-ই ভাষা, এই-ই ভঙ্গি। অন্য ভাষায় অন্য ভঙ্গিতে বলতে গেলে বলাই হত না। অনুভূতি যত গভীরে যাচ্ছে, যত অন্তরঙ্গ হচ্ছে, বাক্‌ও ততই অবচেতনায় প্রবেশ করছে, টেনে টেনে বের করে আনছে গোপন সব শব্দ, তাদের লজ্জা-কলুষ-গ্লানি ঘুচিয়ে তাদের জ্যোতিঃস্বরূপটিকে ঝলমলিয়ে তুলছে, আত্মদর্পণে তাদের মুখ দেখিয়ে দেখিয়ে বলছে, এই দেখ, তুই হলি মায়ের মন্ত্র, পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী মন্ত্র-শরীরা মায়ের তুই অঙ্গ, তুই না হলে গড়ব কি করে মায়ের শরীর ?

অনুভূতি যত গভীর হচ্ছে তত বিশালও হচ্ছে। আত্মচেতনা যত অন্তরঙ্গ হচ্ছে তত ব্যাপকও হচ্ছে, সেই সঙ্গে বাক্‌-ও। আমার আমিকে আবিষ্কার

করতে করতে সবার আমিতে যতই পৌঁছচ্ছেন কবি, ততই সবার বাক্ তাঁর বাক্ হয়ে যাচ্ছে। তাঁর ভেতরের সূত্রাত্মা সুতোর মত গেঁথে গেঁথে যাচ্ছেন এই সর্বময়ী সাধারণী বাক্‌কে মানানসই করে করে। তিনি নকল করছেন না, তিনি আত্মসাৎ করছেন, ঐ বাক্‌কে নতুন করে সৃষ্টি করছেন, সৃষ্টি হতে দেখছেন নিজের মধ্যে। সর্বসাধারণের ব্যবহৃত মুদ্রার ওপরে যেই পড়ছে তাঁর নামমুদ্রার ছাপ, অমনি তা হয়ে উঠছে ঝকঝকে নতুন। সিদ্ধার্থ কবির হৃদয়স্পর্শে ঘুচে যাচ্ছে বাকের জরামরণ। 'এই বেটী সেই ন্যাংটা বটে, পদতলে পাগলা লোটে'— প্রেম কত গভীর হলে তবে ফোটে নিরাবরণ নিরাভরণ মহানিশার মতো এই মহানগ্নিকা সহজিয়া বাক্, আর জ্ঞান কত গভীর হয়ে মহাজ্ঞানে পৌঁছলে তবে ফোটে এই অবজ্ঞা—পাগলা! যেন ভদ্রতার সূক্ষ্মতম ওড়নাটি পর্যন্ত উড়ে গেল, আর ভুবনমোহিনী হাসি নিয়ে প্রকাশিত হলেন সর্বতোভদ্রা বাক্—ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্ নিহিতাধি বাচি।[২৯৯] ভদ্রা লক্ষ্মী নিহিত আছেন এঁদের বাকে।

এর ঠিক উল্টো প্রক্রিয়া হল যজ্ঞ—মহাকবির বাক্‌কে নিজের করে নেওয়া।—

যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়ম্ আয়ন্
তাম্ অন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্[৩০০]

যজ্ঞের মধ্যে দিয়ে বাকের পায়ে চলা পথে চলতে চলতে ধীরেরা খুঁজে পেলেন তাকে—ঋষিদের মধ্যে প্রবিষ্ট সেই বাক্‌কে।

ঋষিদৃষ্ট মন্ত্রকে সমস্ত দেহমনপ্রাণহৃদয় দিয়ে উচ্চারণ করে করে সেই সিদ্ধ-ধ্বনির জাল পেতে লুব্ধা বাগ্-বিহঙ্গীকে ধরবার চেষ্টাই হল যজ্ঞ। ঋত্বিকসহায় সপত্নীক যজমান হলেন এক আশ্চর্য লুব্ধক, ব্যাধ, যিনি শরবৎ তন্ময় হয়ে নিজেকে দিয়েই বিদ্ধ করছেন সেই পরমলক্ষ্যকে।

ঋগ্বেদের কবিতার মধ্যেও দেখি এই সহজতা সরলতা নবীনতা, এই মহাশৈশব। এই অ-ভদ্রতা। গায়ত্রীমন্ত্রের দ্রষ্টা-স্রষ্টা ঋষি বিশ্বামিত্রের ভাষায়, ঋগ্বেদের সপ্তলোকবিহারিণী—চেতনার নিম্নতম থেকে তুঙ্গতম লোক পর্যন্ত, অবম থেকে পরম পর্যন্ত, নির্ঋতি থেকে পরম পরাবত্ পর্যন্ত বিহারিণী—বাণীরা হল 'অবসানা অনগ্নাঃ'[৩০১], তারা বসন পরে নি, কিন্তু তাই বলে তারা নগ্নও নয়। তাদের ঢাকাঢুকিও নেই, খোলাখুলিও নেই। তারা নিরাবরণ—

তাই বলে নিরাভরণ নয়, সমস্ত ঋগ্বেদ অনুপ্রাসে-যমকে-শ্লেষে-বিরোধাভাসে-উভয়ান্বয়ে-উপমায় ঝকঝক করছে—সত্যের স্বচ্ছ দুরন্ত দামাল স্রোতোধারা। এ বাণীর গায়ে রয়েছে একটি জ্যোতির্জরায়ু[৩০২]—আলোর আবরণ, যা ঢাকে না, প্রকাশ করে; আবার চোখ ধাঁধিয়ে অন্ধও করে দেয়!

যে দেবতা ঋষিদের মধ্যে এক আশ্চর্য আলোর শিশু[৩০৩] হয়ে জন্ম নিচ্ছেন বারবার, তাঁরি নিত্যনবীনতার স্পর্শে তাঁরা হয়ে উঠছেন চিরশিশু, চিরকিশোর, চিরযুবা, চিরপ্রবীণ[৩০৪], এবং সেইজন্যেই শৈশবে-কৈশোরে-যৌবনে-প্রাবীণ্যে মেশামেশি এক চিন্ময় অপরূপ সনাতন বাণীর স্রষ্টা। সে-বাণীর মধ্যে আছে শৈশবের অলজ্জ সরলতা, কৈশোরের বিমুগ্ধ বিস্ময়, যৌবনের বিশ্বজয়ী বীর্য আর বার্ধক্যের সুস্থিত প্রজ্ঞা।

ঋষি দীর্ঘতমার অস্যবামীয় সূক্ত—যার রহস্যের তল পাওয়া ভার—তার ভাষা এইরকম—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োর্ অন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্ব্-অত্তি
অনশ্নন্-অন্যো অভি চাকশীতি।

জড়িয়ে আছে
একটি গাছে
দুটি মাণিকজোড়—
(দেখ) পক্ষী মাণিকজোড়;
দুয়ের একটি
মিষ্টি মিষ্টি
পিপ্পল ফল চাখে,
অন্যজনা
খায় না শুধু
তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

স্ত্রিয়ঃ সতীস্ তাঁ উ মে পুংস আহুঃ
পশ্যদ্ অক্ষণ্বান্ ন বি চেতদ্ অন্ধঃ।

কবির্ যঃ পুত্রঃ স ঈম্ আ চিকেত
যস্ তা বিজানাত্ স পিতুষ্ পিতাসত্ ।

ছিল মেয়ে। বললে আমায়, 'পুরুষ। মেয়ে না, না।'
চোখ আছে যার দেখতে পাবে, দেখবে না তো কানা।
কবি-ছেলে সেই তো এসব জানে,
সে হয় তার বাবার বাবা, যে জানে তার মানে।[৩০৫]

এই ধরণের সব লৌকিক ভাষা-ভঙ্গির টুকরো সমস্ত ঋগ্বেদময়ই ছড়িয়ে আছে। সায়ণও দ্বিতীয়টির ব্যাখ্যায় মন্তব্য করছেন, লৌকিকোক্তির্ ইয়ম্। যাস্কও এধরণের প্রয়োগ লক্ষ্য করে বলেছেন, অথাপি ভাষিকেভ্যো ধাতুভ্যো নৈগমাঃ কৃতো ভাষ্যন্তে অথাপি নৈগমেভ্যো ভাষিকাঃ (২।৩) অর্থাৎ, বৈদিক ধাতুর সঙ্গে লৌকিক প্রত্যয় এবং লৌকিক ধাতুর সঙ্গে বৈদিক প্রত্যয় বলা হয়ে থাকে।

কর্ণগৃহ্য[৩০৬], কান ধরে। পাদগৃহ্য[৩০৭], পা ধরে। হস্তগৃহ্য[৩০৮], হাত ধরে। পিবা সুপূর্ণম্ উদরম্[৩০৯], বেশ পেটটি ভর্তি করে খাও। ন জাতো ন জনিষ্যতে[৩১০], জন্মায় নি, জন্মাবে না। কৃতানি যা চ কর্ত্বা[৩১১], যা করা হয়েছে আর যা করতে হবে।

অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা
নক্তং দদৃশ্রে কুহ চিদ্ দিবেয়ুঃ[৩১২]

ঐ যে উঁচুতে রয়েছে তারারা—
রাতে দেখি, দিনে কোথা যায় তারা ?

ক্বেদানীং সূর্যঃ কশ্ চিকেত
কতমাং দ্যাং রশ্মির্ অস্যা ততান[৩১৩]

কে জানে এখন সূর্য কোথায়,
কোন্-সে আকাশে রশ্মি ছড়ায়।

ইহেব শৃণ্ব এষাং কশা হস্তেষু যদ্ বদান্[৩১৪]
তাদের হাতে যে চাবুক বলছে, এখানেই যেন শোনা যায়।

উষাসোষা উচ্ছাত্-চ নু[৩১৫]
উষা ফুটেছিল, আবার ফুটবে এখন।

কদ্-হ নূনং···পিতা পুত্রং ন হস্তয়োঃ। দধিধ্বে···[৩১৬]
কবে বল কবে বাবার মতন দুহাতে ধরবে ছেলেকে ?

যত্-জাতং যত্-চ জন্ত্বম্[৩১৭]
যা জন্মেছে আর যা জন্মাবে।

নহি ত্বদন্যঃ[৩১৮]; তুমি ছাড়া আর কেউ না।

গাত্রে গাত্রে নিষসথা[৩১৯], সারা গায়ে বসে আছ।

তিষ্ঠা সু কং···মা পরা গাঃ[৩২০]
দাঁড়াও দাঁড়াও চলে যেও না।

সিচম্ আ রভে তে[৩২১], তোমার আঁচল চেপে ধরেছি।

যাদৃগ্ এব দদৃশে তাদৃগ্ উচ্যতে[৩২২],
যেমনটি দেখেছি তেমনটিই বলছি।

পলিক্লীর্ ইদ্ যুবতয়ো ভবন্তি[৩২৩], বুড়িরাই হল কুড়ি।

যদা সত্যং কৃণুতে মন্যুম্ ইন্দ্রো
বিশ্বং দৃল্.হং ভয়তে-এজদ্ অস্মাত্[৩২৪]

ইন্দ্র যখন সত্যি সত্যি রাগ করেন, তখন যা নড়ে আর যা অনড় সব তাঁর ভয়ে কাঁপে।

জুজুর্বা ইব বিশ্পতিঃ, থুথুরে বুড়ো সর্দারের (বা রাজার) মত। পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি, পুত্রেরা যখন পিতা হয়। জনা আহুঃ, লোকে বলে[৩২৫]।

বিশ্বো হি-অন্যো অরির্ আজগাম
মমেদ্ অহ শ্বশুরো না জগাম।
জক্ষীয়াদ্ ধানা উত সোমং পপীয়াত্
স্বাশিতঃ পুনর্ অস্তং জগায়াত্[৩২৬]

দেব্তারা অন্য সব্বাই এলেন, আমার শ্বশুর তো কই এলেন না! যবের খই খেতেন, সোম খেতেন, ভাল করে খেয়েদেয়ে বাড়ি যেতেন। এটি ইন্দ্রের বৌমা বসুক্রপত্নীর উক্তি। এই ভূমিকাটুকু করে তারপর তিনি শ্রুতিবদ্ধ করেছেন স্বামী ও শ্বশুরের কথোপকথন। একেবারে ঘরোয়া মেয়েলি ভাষার আমেজ রয়েছে এই ঋকটিতে।

অদো যদ্ দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম্[৩২৭],

ঐ যে একটা কাঠ ভাসছে নদীর কিনারায়, লোক-টোক নেই।

উভয়াহস্তি আ ভর[৩২৮], দুহাত ভরে এনে দাও।

বস্ত্রমথিং ন তায়ুম্[৩২৯], কাপড়চোরের মতো।

মো যু অদ্য…সায়ং করদ্ আরে অস্মত্। অশ্রীর ইব জামাতা[৩৩০]:

সে (ইন্দ্র) যেন আজ অসভ্য জামাইয়ের মতো সন্ধে পর্যন্ত বাইরে বাইরে না কাটায়।

রেবাঁ ইদ্ রেবতঃ স্তোতা স্যাত্ ত্বাবতো মঘোনঃ[৩৩১]

তোমার মত বড়লোকের স্তোতা বড়লোকই হবে।

সোমো বীরং কর্মণ্যং দদাতি।

সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং

পিতৃশ্রবণং যো দদাশদ্ অস্মৈ[৩৩২]

যে সোমকে দেয়, সোম তাকে দেন কেমন ছেলে? না, কাজের (কর্মণ্য! অকর্মণ্য নয়!), বাড়ির কাজকর্মে ওস্তাদ (এবং বাড়িতে তাকে পাওয়া যায়!), যজ্ঞ করে, সভাতেও যায় (অর্থাৎ বেশ কইয়ে-বইয়ে), এবং বাবার যশের কারণ, তথা বাবার কথা কান দিয়ে শোনে।

আরো রয়েছে প্রবাদকল্প সব বচন, যা সাধারণী বাকের অঙ্গীকারের অভিজ্ঞান—

ন হি স্বম্ আয়ুশ্ চিকিতে জনেষু[৩৩৩],

নিজের আয়ু কেউ জানে না।

ন দুরুক্তায় স্পৃহয়েত্[৩৩৪]

খারাপ কথা বলতে চাইবে না।

জায়েদ্ অস্তম্[৩৩৫]

গৃহিণী গৃহম্ উচ্যতে।

ঋতস্য পন্থাং ন তরন্তি দুষ্কৃতঃ[৩৩৬]

দুষ্টেরা ঋতের পথে চলে না।

কুলায়য়দ্ বিশ্বয়ত্[৩৩৭]

বাসা বাঁধে তারপর ছড়ায়, অর্থাৎ ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোয়, বা বসতে পেলে শুতে চায়।

ক ঈশানং ন যাচিষত্[৩৩৮]

বড়-র কাছে কে না চায় ?

মনে করিয়ে দেয় কালিদাসের 'যাচ্ঞা মোঘা বরম্ অধিগুণে নাধমে লব্ধকামা'।

স্ত্রিয়া অশাস্যং মনঃ। উতো অহ ক্রতুং রঘুম্[৩৩৯]

মেয়েদের মন শাসনের বাইরে, আর বুদ্ধি বড় হালকা।

পর্ণা মৃগস্য পতোরিবারভে[৩৪০]

পড়তে পড়তে যেমন পাতাকেও আঁকড়ে ধরে পশু ;

অর্থাৎ, ডুবন্ত মানুষ যেমন ঘাস আঁকড়ে ধরে।

নাবাজিনং বাজিনা হাসয়ন্তি ন গর্দভং পুরো অশ্বান্-নয়ন্তি[৩৪১]

ঘোড়ার সঙ্গে অন্য পশু কেউ ছোটায় না, কিম্বা ঘোড়ার সামনে সামনে গাধাকে নিয়ে চলে না।

ঋগ্বেদের ভাষা অনায়াসে খাদে নেমেছে ভাবয়ব্য-রোমশা[৩৪২] এবং যম-যমীর কথোপকথনে[৩৪৩], শশ্বতীর উক্তিতে[৩৪৪], শিশু আঙ্গিরসের রসিকতায়[৩৪৫] ইন্দ্রের প্রতি মেধাতিথি কাণ্ব এবং প্রিয়মেধ আঙ্গিরসের বন্ধুসুলভ অন্তরঙ্গ ভাষণে[৩৪৬]। দেহচেতনা এবং বিশ্বচেতনা তথা দিব্যচেতনা যে একই স্বর-সপ্তকের বিভিন্ন পর্দা, তা পরিস্ফুট হয়েছে লোপামুদ্রা-অগস্ত্য-অগস্ত্যশিষ্য-সংবাদে[৩৪৭]। পুলুকামো হি মর্ত্যঃ[৩৪৮], মানুষের অনেক যে কামনা—শুধু অগস্ত্যশিষ্যের এই সহজ স্বীকৃতিতেই নয়, দেহচেতনার অসঙ্কোচ উচ্চারণ ঋগ্বেদের সর্বত্রই। আধুনিক মনস্তত্ত্বের ভাষায়, ঋগ্বেদের কবিদের কোন inhibition নেই, তাই তাঁদের কাছে কিছুই অনুচ্চার্য নয়—সেই পরম অনির্বচনীয় অনুচ্চার্য থেকে সুরু করে অবম অনুচ্চার্য পর্যন্ত। তাই ঋষি বার্হস্পত্য ভরদ্বাজ যে-পূষাকে বললেন আঘৃণি, দুঃসহ তেজে ঝলমল ; ঋতস্য রথীঃ, আমাদের ঋতলক্ষ্য জীবনযজ্ঞরথকে হাঁকড়ে নিয়ে চলেছেন চিরসারথি ;

রথীতমঃ, তাঁর মতো এমন সারথি আর হয় না ; ঈশানং রাধসো মহো রায়ঃ, সিদ্ধিরূপী মহাধনের ঈশান ; রায়ো ধারা, মহাসম্পদের মুক্তধারা ; বসো রাশিঃ, একরাশ আলো ; ধীবতোধীবতঃ সখা, প্রতিটি ধীরের ধীমানের সখা ; সখা মম, আমার সখা ;—তাঁকেই একই নিঃশ্বাসে বিনা দ্বিধায় নির্বিকার চিত্তে বলে বসলেন, স্বস্রুর্ জারঃ, ভগিনীপ্রেমিক ; এমন কি মাতুর্ দিধিষুঃ, মায়ের পতি ! স্বস্রুর্জারঃ অপবাদটি তাঁর আগে থেকেই ছিল, পরবর্তী গালিটি ভরদ্বাজের অবদান[৩৪৯] ।

পরিপুষ্ট রশ্মি পূর্ণপ্রভ সূর্যই পূষা[৩৫০] । উষা-পূষা দুটি ভাই-বোন । রাতি-মার কোলে তাদের জন্ম । আবার পলাতকা উষার পেছনে তরুণীলক্ষ্য কোন তরুণের মতো ধাবমান সূর্য[৩৫১] উষার প্রেমিকও বটে । ঠিক তেমনি রাত্রির তপস্যায় রাত্রির কোলে যাঁর জন্ম, সেই সূর্য রাত্রিকে আপন মহিমা দিয়ে আচ্ছন্ন করেন, রাত্রি তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে যায় বলে রাত্রির পতি, প্রভু, ঈশানও বটে। আঁধারের বুক চিরে আলোর আবির্ভাবের অতিলৌকিক দিব্য চিন্ময় ছবিটিকে অতি লৌকিক মর্ত্য অপভাষার[৩৫২] টানে আপন করে টেনে নিলেন ঋষি, হেয় ভাষার ঢাকন দিয়ে ঢেকে-ঢুকে রাখলেন স্বর্লোকের হিরন্ময় পাত্র, ঘৃণ্য-ভাষার আঘাতে চুরমার করে ভেঙে দিলেন দেবতার আলোর আড়াল, সাধারণী ভাষার মাটি দিয়ে গড়লেন দেবতার অনাবরণ সর্বজনীন প্রতিমা ।

কেননা,

সাধারণঃ সূর্যো মানুষাণাম্[৩৫৩] । সূর্য কারো একলার সম্পত্তি নন, তিনি সমস্ত মানুষের, সবার । সত্যের সূর্য আবদ্ধ নন কোন বিশেষ স্থানে কালে পাত্রে সম্প্রদায়ে । তিনি অণু-রূপে নিগূঢ় আছেন প্রতি জনে, প্রতি আত্মায়, প্রতিটি আত্ম-ভাষায় ।

উপসংহার

যে-উত্তাপ কবির এবং তাঁর ভাষার নবজন্ম ঘটাচ্ছে, ব্যক্তিভাষা কাব্যভাষা হয়ে উঠছে, এবং কাব্যভাষা হয়ে উঠছে বেদ—তার স্বরূপ কী ?

বেদের কবি বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি বললেন, এ এক অদ্ভুত তৃষ্ণা যা কিছুতেই যাবার নয়, কেননা—

> অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণা-অবিদত্-জরিতারম্[৩৫৪]
> আকণ্ঠ জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কবি তৃষ্ণার্ত

এ তৃষ্ণা অনন্তের। সহস্রায় তৃষ্যতে গোতমস্য[৩৫৫]। অনন্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে অনন্তের জন্য ব্যাকুলতা। বিপুলের মধ্যে দাঁড়িয়ে চঞ্চলতা সুদূর বিপুল সুদূরের জন্য।

কবীর বললেন—

> জল উপজী জলহী সো নেহা, রটত পিয়াস পিয়াস[৩৫৬]
> জলেই জনম জলে নিমগন, তবু করে জল জল

নারদ বললেন তাঁর ভক্তিসূত্রে, পরম প্রেমরূপা যে ভক্তি তা হল এগারো রকম—গুণমাহাত্ম্যাসক্তি, রূপাসক্তি, পূজাসক্তি, স্মরণাসক্তি, দাস্যাসক্তি, সখ্যাসক্তি, বাৎসল্যাসক্তি, কান্তাসক্তি, আত্মনিবেদনাসক্তি, তন্ময়তাসক্তি এবং সবশেষে **পরমবিরহাসক্তি**। সর্বভাবে সর্বরকমে ভালোবেসে নিজের বলতে কিছুই না রেখে তন্ময় হয়ে যাওয়ার পরেও যে-বিরহ আর কিছুতেই ঘোচে না, তার মধ্যে ডুবে থাকাই হল প্রেমের চরম।

পদকর্তা বললেন—

> দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া
> দুজনের কোলে কাঁদিছে দুজন বিরহের বেদনায়

বাউল বললেন—

> নিত্য-দ্বৈতে নিত্য-ঐক্য প্রেম তার নাম
> দুয়ে এক, একে দুই অনুভব, তারি নাম ভালোবাসা

কবি যতীন্দ্রনাথ বললেন—

দিবস রজনী যাপে পাশাপাশি
কবি আর তার প্রিয়া ;
কত অনুরাগে এ যখন জাগে
ও তখন ঘুমাইয়া !

চোখোচোখি নাহি হয়—
সে ব্যর্থতার দুঃসহ ভার
বিশ্ব ভুবনময়।

কবি আর তার পরাণ-প্রিয়ার
মিলনের ব্যবধান
ফাগুনের ফুলে শাওনের কূলে
গাঁথে বেদনার গান।

এ নহে কথার কথা—
একজোড়া বুকে কাঁদে অধোমুখে
ত্রিভুবনজোড়া ব্যথা[৩৫৭]।

এই চিরবিরহী প্রেম—এই-ই হল মরমীয়া কবিতার অক্ষীয়মাণ শতধার উৎস।

সৃষ্টির মর্মমূলেও রয়েছে এই চিরবিরহী প্রেম। স্রষ্টা ডুবে রয়েছেন আত্ম-প্রেম-আত্মবিরহের গভীর আনন্দ-বেদনায়। তার থেকে উচ্ছলিত হয়ে চলেছে অনন্ত সৃষ্টির কাব্য—আত্মসম্ভোগবিপ্রলম্ভশৃঙ্গারসহস্রক।

দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি

দেখ সে-দেবের কাব্য
মরল না এ তো জীর্ণ হল না হল না।

টীকা

সঙ্কেত

নি.=নিরুক্ত	তু.=তুলনীয়	OBMV—Oxford Book of
ই=ইত্যাদি	গী=গীতবিতান	English Mystical Verse.
ব্রা=ব্রাহ্মণ	দ্র.=দ্রষ্টব্য	উল্লেখ না থাকলে মন্ত্রটি ঋগ্বেদের
অ=অষ্টাধ্যায়ী,	টী=টীকা	বুঝতে হবে।

অথর্ববেদ। বেমী=বেদমীমাংসা, অনির্বাণ

১. the deep and mystic style of Dirghatamas Auchahya...the melodious lucidity of Medhatithi Kanwa... the puissant and energetic hymns of Viswamitra... Vasishtha's even harmoines...(On the Veda, Sri Aurobindo p. 62)

২. অভ্যাসে ভূয়াংসম্ অর্থং মন্যন্তে ··তত্ পরুচ্ছেপস্য শীলম্ নি. ১০।৪২

৩. ভূয়া অন্তরা হৃদি-অস্য নিস্পৃশে জায়েব পত্যে-উশতী সুবাসাঃ ১০।৯১।১৩

৪. এবা মহান্ বৃহদ্দিবো অথর্বা-অবোচত স্বাং তন্বম্ ইন্দ্রম্ এব ১০।১২০।৯

৫. ৩.৫৩।১২ ৬. ৭।৩৩.৮ ৭. ২।১৯।৮ ৮. ১০।৮০।৭

৯. ১।৬২।১৩ ১০. ২।৩৫।২ ১১. ৮।৮৮।৪ ১২. ৪।৪।১১

১৩. ১।১৮৭।৮ ১৪. ১।১৮০।৮ অনুবাদ বিকল্প— কত সহস্র

১৫. ৭।২৯।৩, ৪

১৬. অয়ং কবির্ অকবিষু প্রচেতা মর্তেষু-অগ্নির্ অমৃতো নি ধায়ি ৭।৪।৪ যং মর্তাসঃ শ্যেতং জগৃভ্রে। নি যো গৃভং পৌরুষেয়ীম্ উবোচ ৭।৪।৩

১৭. ত্বত্তো অগ্নে কাব্যানি ত্বত্-মনীষাঃ ৪।১১।৩

১৮. ১।৫৮।৮, ১৪৩।১, ৩।১।৮, ২।৬।২, ৩।২৭।১২, ৬।১৬।২৫ ই

১৯. অমূ ত্বাহিয়ে অধ দেব দেবা মদন্ বিশ্বে কবিতমং কবীনাম্ ৬।১৮।১৪

২০. যঃ স্তোমেভির্ বাবৃধে পূর্ব্যেভির্ যো মধ্যমেভির্ উত নূতনেভিঃ ৩।৩২।১৩

২১. ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াত্ ৩।৬২।১০

২২. উদীরয় কবিতমং কবীনাম্ ৫।৪২।৩

২৩. ঋষিমনা য ঋষিকৃত্ স্বর্ষাঃ সহস্রনীথঃ পদবীঃ কবীনাম্ ৯।৯৬।১৮

২৪. ইন্দো সমুদ্রম্ ঈঙ্খয় ৯.৩৫।২ সমুদ্রো বাচম্ ঈঙ্খয় ৯।১০১।৬

২৫. নৃভির্ যেমানো জজ্ঞানঃ পূতঃ ৯।১০৯।৮
ত্বাং যজ্ঞৈর্ অবীবৃধন্ পবমান বিধর্মণি ৯।৪।৯

২৬. শিশুর্ বৈ-আঙ্গিরসো মন্ত্রকৃতাং মন্ত্রকৃদ্ আসীত্ স পিতৄন্ পুত্রকা ইত্যামন্ত্রয়ত···তে দেবান্ অপৃচ্ছন্ত তে দেবা অব্রুবন্নেষ বাব পিতা যো মন্ত্রকৃত্ (তাণ্ড্যব্রা ১৩।৩।২৪)—সায়ণ কর্তৃক ১।১৬৪।১৬ তে উদ্ধৃত

২৭. এবম্ উচ্চাবচৈর্ অভিপ্রায়ৈর্ ঋষীণাং মন্ত্রদৃষ্টয়ো ভবন্তি নি. ৭।৩

২৮. যত্কাম ঋষির্ যস্যাং দেবতায়াম্ আর্থপত্যম্ ইচ্ছন্ স্তুতিং প্রযুঙ্ক্তে তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি নি. ৭।১

২৯. ঋষির্ দর্শনাত্। স্তোমান্ দদর্শ ইত্যৌপমন্যবঃ নি. ২।১১

৩০. তদ্ যদ্ এনান্ তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভ্বভ্যানর্ষত্ তে-ঋষয়োঽভবন্-তদ্ ঋষীণাম্ ঋষিত্বম্ ইতি বিজ্ঞায়তে নি. ২।১১. যাস্ক এটি উদ্ধৃত করেছেন তৈত্তিরীয় আরণ্যক ২।৯।১ থেকে (অজান্ হ বৈ পৃশ্নীন্-তপস্য-মানান্···)

৩১. সাক্ষাত্কৃতধর্মাণ ঋষয়ো বভূবুঃ নি. ১।২০

৩২. ন শব্দ-শ্লোক-কলহ-গাথা-বৈর-চাটু-সূত্র-মন্ত্র-পদেষু (অ ৩।২।২৩) 'শব্দ' প্রভৃতি উপপদে কৃ ধাতুর উত্তর ট প্রত্যয় হয় না, অর্থাৎ অণ্ হয়। কাশিকার উদাহরণ, সূত্রকারঃ, মন্ত্রকারঃ, পদকারঃ। অর্থাৎ সূত্রকার এবং পদকার সূত্র এবং পদের যতখানি কর্তা, মন্ত্রকারও ততখানিই মন্ত্রের কর্তা।

৩৩. দ্র. বেমী পৃ ৭০/টী ৬, মন্ত্রকৃত্ (৯।১১৪।২), ব্রহ্মকার (৬।২৯।৪) ইত্যাদি বলে ঋষিরা উল্লেখ করেছেন নিজেদের।

৩৪. যস্য বাক্যং স ঋষিঃ ৩৫. যা তেনোচ্যতে সা দেবতা

৩৬. তু. ঋষি বসিষ্ঠের অনুভব—

ইয়ং বাম্ অস্য মন্মন ইন্দ্রাগ্নী পূর্ব্যস্তুতিঃ।
অভ্রাদ্ বৃষ্টির্ ইবাজনি ৭।৯৪।১

ওগো ইন্দ্র-অগ্নি, তোমাদের উদ্দেশে এই অভূতপূর্ব স্তুতি জন্ম নিল আমার এই মন্ম (মনন) থেকে, যেন মেঘ থেকে ঝরে পড়ল বৃষ্টি।

তু. রবীন্দ্রনাথের অনুভব—

শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে
তোমারি সুরটি আমার মুখের পরে, বুকের পরে।

গী পূজা ৯৮

আজি এ কোন গান নিখিল প্লাবিয়া
তোমার বীণা হতে আসিল নাবিয়া।

গী পূজা ১৩

৩৭. This then is the immaculate conception of Vedic Poetry that the blind—hence more reliable—memory of tradition has retained in the epithet APAURUṢEYA, this ascension of the soul like the Himalaya out of the tidal waves of the heart, this descension of the Word like Deluge to annihilate the pre-conceived World, and on the Vast bed of rushing roaring fiery water the silent expectant ark of coupled love dreaming the dream of the world-to-be. Linguistic Atom p 15

৩৮. তু. সমস্ত শরীর এবং সমস্ত মন আগাগোড়া একটা বাজনার যন্ত্রের মতো কম্পিত এবং গুঞ্জরিত হয়ে উঠতে থাকে এবং সেই সুরের স্পন্দন আমার শরীর মন থেকে সমস্ত বাইরের জগতে সঞ্চারিত এবং ব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার সঙ্গে একটা স্বরসম্মিলন স্থাপিত হয়ে যায়। ছিন্নপত্রাবলী ১৪৮

৩৯. ঋগ্বেদের কবি একেই বলেছেন 'পূর্ব্যস্তুতি', দ্র. টী. ৩৬

৪০. দ্র. টী. ১৭

৪১. ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম—ঋষি দীর্ঘতমা ঔচথ্যের অনুভব ১।১৬৪।৩৫ দ্র. টী. ১৬০

৪২. তাস্ ত্রিবিধা ঋচঃ। পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতা আধ্যাত্মিক্যশ্চ নি. ৭।১

৪৩. দ্র. বেমী পৃ ৩৽৪ / টী ১৯৫৽ √তন্ ধাতুর অর্থ বিস্তার, ছড়ানো

৪৪. ৬।৫৬।৬ ৪৫. বসুন্ধরা, সোনার তরী ৪৬ The poet (A fragment)

৪৭. এবার ভ্রূমধ্যে এস, সংকলিত কবিতা, মণীন্দ্র রায়

৪৮. জন্মদিনে, ১০ (বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি)

৪৯. অর্ধনারীশ্বর, সংকলিত কবিতা, মণীন্দ্র রায়

৫০. In Woods of God-Realization, Or, Complete Works of Swami Rama Tirtha, Vol IV (sixth edition) pp. 180-181.

৫১. ঈশোপনিষদ্ ৭ ৫২. শুক্ল যজুঃ ৩২।৮

৫৩. অমিয়কুমার চক্রবর্তী

৫৪. অমিল থেকে মিলে, সংকলিত কবিতা, মণীন্দ্র রায়

৫৫. ১০।১২৯।১ বায়ঃ=বি-পুত্র অর্থাৎ বিহঙ্গশিশু। চাকন্—যে কামনা করছে এবং যে দেখছে, দ্র. সায়ণ

৫৬. গী প্রেম ৯ ৫৭ A Ballade of the Centre, অজ্ঞাত OBMV, p 549

৫৮. ছিন্নপত্রাবলী ১৫৮

৫৯. দ্র. টী ৩০

৬০. মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও অর্থাৎ সামান্যতম পৌরুষেয় প্রচেষ্টাও

৬১. কবিতার কথা, জীবনানন্দ দাশ, পৃ ৯-১০

৬২. কবি ও কবিতা, বুদ্ধদেব বসু, দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৯

৬৩. কী ক'রে কী ক'রে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ঐ

৬৪. আমি আর আমার কবিতা, মণীন্দ্র রায়, ঐ

৬৫. তুমি আদি কবি, কবিগুরু তুমি হে, মন্ত্র তোমার মন্দ্রিত সব ভুবনে গী পূজা ৪৭০

৬৬. অয়ং কবির্ অকবিষু প্রচেতা মর্তেষু-অগ্নির্ অমৃতো নি ধায়ি ৭।৪।৪ প্রতি অকবির গভীরে আছেন নিহিত

চেতনাবিশাল কবি এ-অগ্নি,

মর্ত্যে মর্ত্যে অমৃত।

৬৭. গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে কবিং কবীনাম্ উপমশ্রবস্তমম্ ২।২৩।১

দেব-গণের গণপতি তুমি (হে ব্রহ্মণস্পতি), তোমাকে আহ্বান করি আমরা, কবিদের মধ্যে তুমি কবি, যাঁরা দেন পরমা শ্রুতি তাঁদের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ।

৬৮. গৃৎসং রায়ে কবিতরো জুনাতি ৭।৮৬।৭

কবি-তর বরুণ তাঁর স্তোতা কবি বসিষ্ঠকে নিয়ে চলেছেন পরমসম্পদের পানে।

৬৯. অগ্নি—

অবোধি জার উষসাম্ উপস্থাদ্-হোতা মন্দ্রঃ কবিতমঃ পাবকঃ ৭।৯।১

উষাদের কোল থেকে জেগে উঠলেন প্রিয়তম পাবক,

হোতা, আনন্দমাতাল, সকল কবির সেরা।

সত্যো যজ্বা কবিতমঃ স বেধাঃ ৩।১৪।১ তিনি সত্য, যাজক (শ্রেষ্ঠ), কবিতম, বেধা।

সবিতা—

উদীরয় কবিতমং কবীনাম্ উনত্ত-এনম্ অভি মধ্বা ঘৃতেন ৫।৪২।৩

কবিদের সেরা কবিকে ওঠাও

ভেজাও জরাও এঁকে

অমৃতে অগ্নিরসে।

ইন্দ্র—

অনু ত্বাহিঘ্নে অধ দেব দেবা মদন্ বিশ্বে কবিতমং কবীনাম্ ৬।১৮।১৪

কবিদের সেরা কবি হে

সব দেবতারা মাত্‌ল তোমাতে

মারলে যখন অহিকে।

বরুণ—

ইমাম্ উ নু কবিতমস্য মায়াং মহীং দেবস্য নকির্ আ দধর্ষ ৫।৮৫।৬

কবিতম (বরুণ) দেবের এই প্রজ্ঞাকর্ম—

কেউ পারে নি একে ধর্ষণ করতে।

৭০. ক ইমং বো নিণ্যম্ আ চিকেত···অপসাম্ উপস্থাত্
মহান্ কবির্ নিশ্ চরতি স্বধাবান্ ১।৯৫।৪
তোমাদের মধ্যে কে জান এই গোপন রহস্য (অগ্নি) কে ?
অপ্ সমূহের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন এই স্বধাবান্ মহান্ কবি।

৭১. মানসসুন্দরী, সোনার তরী ৭২. জীবনদেবতা, চিত্রা

৭৩. অশেষ, কল্পনা ৭৪. গী পূজা ৩৪০ ৭৫. অন্তর্যামী, চিত্রা—

ছাড়ি কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
জীবনের শেষে কী নূতন বেশে
দেখা দিবে মোরে অয়ি।

চিরদিবসের মর্মের ব্যথা
শতজনমের চিরসফলতা,
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা,
আমার বিশ্বরূপী,···

৭৬. ইন্দ্রং মিত্রং বরুণম্ অগ্নিম্ আহুর্ অথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি-অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানম্ আহুঃ ১।১৬৪।৪৬
তু সুপর্ণং বিপ্রা কবয়ো বচোভির্ একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি
১০।১১৪।৫

৭৭. ১০।১১৪.৮ 'সহস্র' বা হাজার মানে 'অনন্ত', সহস্রং বৈ অনন্তম্ (শতপথ ব্রা) যেমন 'মরেছি হাজার মরণে'।

৭৮. ৯.৩৩।৪, ৫ ৭৯ বাগ্ এব দেবাঃ শব্রা ১৪।৪।৩।১৩ দ্র. বেমী পৃ ৩০৫ / টী ১৪০ ৮০. ১০।১২৫ ৮১. ১০।১২৫।৫ ৮২. ১০।৭১।৪

৮৩. তু. And yet, tho' its voice be so clear and full,
You never could hear it ; your ears are so dull ;
The Poet's mind, Tennyson.

আবার বধির কানকে ফুটো করে মরমে প্রবেশ করছে ঋতের শ্লোক, এমন নজিরেরও অভাব নেই। বাকের রাজ্যে সব অঘটনই ঘটে—
ঋতস্য শ্লোকো বধিরা ততর্দ কর্ণা বুধানঃ শুচমান আয়োঃ ৪।২৩।৮
বধিরজনের কান ফুঁড়ে দেয় ঋতের শ্লোক, জাগিয়ে দেয়, জ্বলতে থাকে।

৮৪. মানসসুন্দরী, সোনার তরী ৮৫. জীবনদেবতা, চিত্রা

৮৬. ৮।৪৫।১৭, ১৮ আরো দ্র. অগ্নি অষ্টম ৩।১০।৮, ৫।২৪।১ ই, ইন্দ্র ৬।৪৬।১০, ৮।৪৫।১৮, ৮।১৩।৩

৮৭. Beethoven, J. W. N. Sullivan, pp 111-112.

৮৮. অশেষ, কল্পনা

৮৯. গী পূজা ৩৫৯ ৯০. বসিষ্ঠ বরুণের প্রতি, ৭।৮৬।৭

৯১. গল্প সংগ্রহ, প্রমথ চৌধুরী, পৃ ৩৪৪

৯২ দ্র. বেমী পৃ ৫৫৪ / টী ৫৯২৫

৯৩. তু. হয়ে ওঠা, সংকলিত কবিতা, মণীন্দ্র রায়

৯৪. প্রবত্ ঢালু, উদ্বত্ উঁচু, নিবত্ নিচু

৯৫. ১।৯১।২১

৯৬. On the Veda, p 392. the whole struggle is between the Light and the Darkness, the Truth and the Falsehood, the divine Maya and the undivine.—

ঐ p. 240

৯৭. মানুষের যত দুষ্কৃতি, তার মূলে এই রক্ষের প্ররোচনা। যা-কিছু সুভদ্র তাকে আপনখুশিতে সে দূষিত করে, তার বচনে অনর্থ, কর্মে বঞ্চনা ; সে মূর্তিমান পাপ। দেবতাকে সে দিতে জানে না, সব-কিছু আগলে রাখে নিজের জন্য ; তাই সে রক্ষঃ—বেমী পৃ ৪২০

৯৮. miser traffickers in the sense-life, stealers and concealers of the higher Light and its illuminations which they can only darken and misuse,—an impious host who are jealous of their store and will not offer sacrifice to the Gods—On the Veda, p 393 পণি হল আমাদের বণিক্-বৃত্তি বা বুভুক্ষা, যা সব আগলে রাখে নিজের জন্য ; আর যদি-বা দেয়, অমনি তার প্রতিদান চেয়ে বসে। এই মর্ত্য আধারেই অমৃতজ্যোতি লুকানো আছে, সংহিতার রূপকের ভাষায় তা-ই 'গাবঃ' বা গোযূথ। আমাদের আত্মম্ভরি বুভুক্ষা তাকে আধারের গহনে পাষাণ প্রাচীরের আড়ালে বন্দী করে রেখেছে, কিছুতেই তাকে বাইরে ফুটতে দেবে না—বেমী পৃ. ২৭৮

৯৯. Vritra, the Serpent, is the grand Adversary ; for he obstructs with his coils of darkness all possibility

of divine existence and divini action. And even when Vritra is slain by the light, fiercer eremies arise out of him. Shushna afflicts us with his impure and ineffetive force, Namuchi fights man by his weaknesses, and others too assail, each with his proper evil. On the Veda, p. 393

বৃত্র…অজ্ঞানের আবরিকা শক্তি—বেমী পৃ ২৬১

১০০. এই শুষ্কতা সংহিতায় বৃত্রানুচর 'শুষ্ণ' (< √শুষ্ শুকিয়ে যাওয়া)—বেমী পৃ ২৮১ / টী ৯২[৫]। তু. জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা-ধারায় এসো

১০১. নমুচি বৃত্রের অনুচর, 'যে কিছুতেই ছাড়ে না' ; তু. যোগের 'আশয়' বা অবচেতনার সংস্কার। বেমী পৃ ৭৭৪ / টী ৯১৮[৯]

তু. জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম,
এমন ধন আর নাহি যে তোমা-সম,
তবু যা ভাঙাচোরা ঘরেতে আছে পোরা
ফেলিয়া দিতে পারি না যে ॥
জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই—
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে। গী পূজা ১৮২

১০২. আবার অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অদেব হল আমাদেরই চিত্তের ক্লিষ্টতা দ্বিধা কার্পণ্য বাধা দ্রোহ স্পর্ধা বা সেইসব রন্ধ্র যার ভিতর দিয়ে অদিব্য-শক্তি আধারে এসে বাসা বাঁধে। এদের সঙ্গে সংগ্রামই আমাদের পুরুষার্থ…বেমী পৃ ২৬২

১০৩. বিপরীত ছবি, সংকলিত কবিতা, মণীন্দ্র রায়

১০৪. যা তেনোচ্যতে সা দেবতা

১০৫. এবা মহান্ বৃহদ্দিবো অথর্বা অবোচত স্বাং তন্বম্ ইন্দ্রম্ এব ১০।১২০।৯।

১০৬. মাণ্ডূক্য ১২ ১০৭. প্রত্যহের ভার, বুদ্ধদেব বসু

১০৮. The Morality of the Lost Woid,
Arthur Edward Wait, OBMV.

The Spirit within is the long lost Word,
Besought by the world of the soul in pain
Through a world of words which are void and
vain.

O Never while shadow and light are blended
Shall the world's Word-Quest or its woe be
ended,
And never the world of its wounds made whole
Till the Word made flesh be the Word made
soul!

১০৯. যথাক্রমে—
প্রত্যহের ভার, বুদ্ধদেব বসু। প্রতিদান, উত্তরফাল্গুনী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। অর্ধনারীশ্বর, মনীন্দ্র রায়। What the Soul Desires, Augusta Theodosia Drane, OBMV

১১০. ৮।১০৩।১০

১১১. ১।৫৮।৬

১১২. দ্র. সায়ণ—দিব্যায় জন্মনে দেবত্বপ্রাপ্তয়ে

১১৩. ৭।৮।৪

১১৪. ভরত শব্দের অর্থ অগ্নি যার মধ্যে আবিষ্ট। দ্র. বেমী পৃ ৫৫৪ / টী ৫৯২° সায়ণও বলছেন 'ভরতস্য যজমানস্য মম'

১১৫. ৪।৪০।৫

১১৬. বেমী পৃ ২৪৯ / টী ২৮—'শুচি' আকাশ বা হৃদয় ;
তু. রবীন্দ্রনাথের অনুভব—হৃদয় আমার প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে

১১৭. বেমী ঐ, দুরোণ ॥ দ্রোণ, সোমপাত্র
সায়ণ—দুরোণং গৃহনাম

১১৮. পূজা, ১৫০ ১১৯. পূজা, ৩৯৯ ১২০. পূজা, ৩৮০ ১২১. কাকলি ৪।৩

১২২. ৭।৭৩।১ ১২৩. ৬।৪।২ ১২৪. ১।৪৪।১ আরো দ্র. ঐ ৯

১২৫. ৯।৮৪।৪

১২৬. ৭।৭২।৩ ১২৭. পূজা, ৩১০ ১২৮. পূজা, ২৭১

১২৯. The creed of My Heart, Edmond Gore Alexander Holmes, OBMV. ১৩০. ঐ ১৩১. ঐ

১৩২ তু. আরভমাণা ভুবনানি বিশ্বা—বাকসূক্ত ১০।১২৫।৮

১৩৩. The Mystic's Prayer, William Sharp, OBMV.

১৩৪. ১।১১৩।৮, ১০—ঋষি কুত্স আঙ্গিরস। শ্রীঅরবিন্দের Life Divine-এর প্রথম অনুচ্ছেদের শিরোমন্ত্র এই দুটি।

১৩৫. ১।১১৩।৭

১৩৬. পূজা, ৫১৬

১৩৭. ১।১০১।৭

১৩৮. পূজা, ৩৮৮

১৩৯. অপশ্যং গোপাম্ অনিপদ্যমানম্ আ চ পরা চ পথিভিশ্‌ চরন্তম্ ১।১৬৪।৩১

দেখলাম সেই অশ্রান্ত রাখালকে,

কাছে দূরে পথে পথে তিনি চলেছেন চলেছেন···

১৪০. ৫।৪৪।৬

১৪১. স দর্শতশ্রীর্ অতিথির্ গৃহে গৃহে ১০।৯১।২

অপরূপ রূপ, ঘরে ঘরে তিনি অতিথি।

১৪২. ১।১৪৬।৫, ৫।৫৫।৪

১৪৩. তু. জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল

১৪৪. ১।১।৫ ই

১৪৫. ত্বং হি সত্যো অদ্ভুতঃ ৫।২৩।২

৫।১০।২, ৮।২৬।২১, ৯।২০।৫, ২।২৬।৪, ৬।৮।৩, ১০।১৫২।১ এ যথাক্রমে অগ্নি বায়ু, সোম, ব্রহ্মণস্পতি, বৈশ্বানর অগ্নি ও ইন্দ্র অদ্ভুত। ইন্দ্রের স্তোতাও অদ্ভুত ৮।১৩।১৯

১৪৬. ত্বম্ অস্মাকং তব স্মসি ৮।৯২।৩২

১৪৭. Savitri vi. 2. ১৪৮. দ্র. বেদমী পৃ. ২৪৩, দেবতার স্বরূপ. হল আলো।

১৪৯. গী প্রকৃতি, ১০৫

১৫০. 'তস্যৈষ আদেশো যদ্ এতদ্ বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্ আ ইতি-ইত্-ন্যমীমিষদ্ আ ইতি'। সে কেমন? না, ঐ যে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল, আর নিবে গেল, ঐরকম। কেনোপনিষদ্ ৪।৪

তু. আমার প্রাণে গভীর গোপন মহা-আপন সেকি,
অন্ধকারে হঠাৎ তারে দেখি॥
বিদ্যুত-উল্লাসে বেদনারই দূত আসে,
আমন্ত্রণের বাণী যায় হৃদয়ে লেখি॥

পূজা, ৩৪০

১৫১. The language of veda itself is sruti, a rhythm not composed by the intellect but heard, a divine Word that came vibrating out of the Infinite to the inner audience of the man who had previously made himself fit for the impersonal knowledge.

On the Veda p. 9.

বেদের ভাষা হল শ্রুতি অর্থাৎ যে-ছন্দ শ্রুত, বুদ্ধি দিয়ে রচা নয়। এক দিব্য-বাক্-স্পন্দন অসীম থেকে ধেয়ে আসছে সেই মানুষের অন্তঃকর্ণে যে নিজেকে আগে থেকেই তৈরি করেছে ঐ অপৌরুষেয় জ্ঞানের আধার হবার জন্যে।

১৫২. √ঋষ্ ধাতুর তিনটি অর্থ—গতি, বেধ, দর্শন।

১৫৩. বিপ্র মানে আবেগকম্পিত, √বিপ্—কাঁপা। বেমী পৃ ২৯২ / টী. ১১৮

১৫৪. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৪।৫ ১৫৫. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কৃত অনুবাদ রামেন্দ্র রচনাবলী, ৫ম খণ্ড

১৫৬. জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১।১—২ ১৫৭. পূজা, ৮৫

১৫৮. পূজা, ৪৯ ১৫৯. পূজা, ৮৫

১৬০. ঋষি দীর্ঘতমার দীর্ঘতম সূক্তে আছে পরম ব্যোমে সহস্রাক্ষরা গৌরী বাকের কথা (১।১৬৪।৪১), যে পরম ব্যোম অর্থাৎ মহাকাশ তিনি নিজেই (ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম, ঐ ৩৫)। এই ৩৫শ ঋকে ব্রহ্মা বলতে তিনি যে নিজেকে বুঝিয়েছেন, তার প্রমাণ ১।১৫৮।৬এ—

দীর্ঘতমা মামতেয়ো জুজুর্বান্ দশমে যুগে।
অপাম্ অর্থং যতীনাং ব্রহ্মা ভবতি সারথিঃ

আয়ুর দশম দশকে তীর্ণ
জরায় জীর্ণ
মমতাপুত্র দীর্ঘতমা—
ব্রহ্মা, সারথি হয়ে নিয়ে চলে
সমস্ত স্রোত পরম লক্ষ্যে।

১৬১. On the veda, pp 67—68. ১৬২. বেমী পৃ ৫৫৪/টী ৫৯২

১৬৩. বেমী পৃ ৩৩৯/টী ১৯১[১০] ১৬৪. ৬।৪৬।৫। ১৬৫. ৬।৭০।৫

১৬৬. ৭।৮১।৫, ৬ এ-সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা—

rādhaḥ dīrghaśruttamam (VII. 81.5), rayim śravasyum (VII. 75 2) is that rich state of being, that spiritually opulent felicity which turns towards the knowledge (শ্রবস্যু) and has a far-extended hearing for the vibrations of the Word that comes to us from the regions (diśaḥ) of the Infinite.

—On the veda, p. 147.

'রাধঃ দীর্ঘশ্রুত্তমম্' এবং 'রয়িং শ্রবস্যুম্' হল সেই সম্পদ, সেই সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক আনন্দ, জ্ঞানের জন্যে যা উন্মুখ (শ্রবস্যু), এবং যা সেই অসীমের দিক-দিগন্ত থেকে যে বাক্ আমাদের দিকে ধেয়ে আসে তার স্পন্দকে শুনতে পায় সুদীর্ঘ স্থানকাল জুড়ে।

১৬৭. ৭।৫।৮ ১৬৮. ৬।৬৫।৬ ১৬৯. পূজা, ২২২ ১৭০. পূজা, ৩

১৭১. পূজা, ১৭ ১৭২. পূজা, ১৩ ১৭৩. পূজা, ৪

১৭৪. যথাক্রমে পূজা, ৩, ১৭, ৬ ১৭৫. O soul of mine,

James Rhoades. OBMV.

১৭৬. দেবান হুবে বৃহচ্ছ্রবসঃ স্বস্তয়ে জ্যোতিষ্কৃতো অধ্বরস্য প্রচেতসঃ

১০।৬৬।১

১৭৭. অস্য শ্লোকো দিবি-ঈয়তে পৃথিব্যাম্ ১।১৯০।৪

১৭৮. বেমী পৃ. ৩৩৯ / টী ১৯১[১০]

১৭৯. সসর্পরীর্‌······আ সূর্যস্য দুহিতা ততান
শ্রবো দেবেষু-অমৃতম্‌ অজুর্যম্‌ ৩।৫৩।১৫

১৮০. সসর্পরীর্‌ অভরত্‌ তুযম্‌ এভ্যো অধি শ্রবঃ পাঞ্চজন্যাসু কৃষ্টিষু
৩।৫৩।১৬

পঞ্চজনে, এই মানুষে,
শ্রুতি দিলেন ক্ষিপ্রহাতে
সসর্পরী বাক্‌।

১৮১. ১।১৬৪।৩৯

১৮২. আধার যোগাগ্নিময় হলে যে-বাকের স্ফূর্তি হয়, তা-ই 'ঋক্‌' যা অগ্নিশিখা সুর ও মন্ত্র তিনটিকেই বোঝায়— বেমী পৃ ১৩৯ / টী ১৮৭

১৮৩. ১।৭১।২ ১৮৪. গাতু মানে গান-ঢালা পথ (√গৈ—গাওয়া + √গা—যাওয়া)—বেমী

১৮৫. পূজা, ৪ ১৮৬. পূজা, ৬ ১৮৭ পূজা, ২৬

১৮৮. পূজা, ৩ ১৮৯ পূজা, ১১৮ ১৯০. বিচিত্র, ২

১৯১. পূজা, ৩৫ ১৯২. কবিতার কথা, পৃ ৪৪

১৯৩. অদিতি অর্থাৎ অনন্ত বাকের একটি প্রতিশব্দ—নিঘণ্টু ১।১১।৪৮

১৯৪. দ্র. টী ১৭৭

১৯৫. মানসসুন্দরী, সোনার তরী

১৯৬. দ্র. টী ৮২

১৯৭. উপনিষদের ভাষায় এরি নাম 'আপ্যায়ন'

১৯৮. On the Veda, p. 9 ১৯৯. অথর্ববেদ, ১০।৮।৩১-৩২

২০০. দ্র বেমী পৃ ৩২৯ / টী ১৮১ ২০১. ৯।৪।৬ ২০২. ১।৫০।১০

২০৩. ২।২।৭ ২০৪. ১।৭।৩

২০৫. মর্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বম্‌ আনশুঃ।
সৌধন্বনা ঋভবঃ সূরচক্ষসঃ ১।১১০।৪

২০৬. দ্র. বেমী পৃ ৬০৫ / টী ৬৫৯ ২০৭. পূজা, ১০১

২০৮. দেখা দাও, নিশান্তিকা, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

২০৯. ১০।৯১।১৩ ২১০. পূজা, ৩৭ ২১১. ৬।৫৪।১০

২১২. পূজা, ৩৭.

২১৩. Future Poetry, Sri Aurobindo, p. 11

২১৪. দ্র. ১০।৮৫।১৯, প্রসঙ্গটি অন্য।

২১৫. ৭।৯৪।১ ২১৬. ১।৩৮।১৪ ২১৭. ১।৯৬।১ ২১৮. দ্র. টী ১৬৫

২১৯. ভূরিশ্রবাঃ-নামটির মধ্যে যে-অর্থ নিহিত আছে।

২২০. ১।৭৩।১০ ২২১. সুশ্রুতিশ্ চ মা-উপশ্রুতিশ্ চ মা হাসিষ্টাং সৌপর্ণং চক্ষুর্ অজস্রং জ্যোতিঃ (অ ১৬।২।৫)

২২২. পূজা, ৩৮৮ ২২৩. ১।১৬৪।৩৫ দ্র. টী. ১৬০

২২৪. কবি, বুদ্ধদেব বসু

২২৫. পূজা, ৬৫০ ২২৬. বিচিত্র, ৩৫ পূজা, ৫৪৬

২২৭. ১০।৬১।১৯ ২২৮. এই ধেনুই বাক্। দ্র. সায়ণ

২২৯. ১।১৫৯।৪ ২৩০. ৪।৫৮।৫ ২৩১. পূজা, ৩০

২৩২. ১।১০।৯ ২৩৩. ৩।৫২।৩=৪।৩২।৬ ২৩৪. ১।১৪৫।৩

২৩৫. ৮।৯৫.৪, ৫ ২৩৬. ১।১৭১।২ তু. হৃদা যত্ তষ্টান্ মন্ত্রাঁ অশংসন্ ১।৬৭।২ ২৩৭. ১।১৬।৫

২৩৮. ৫।১১।৩ ত্বদ্ অগ্নে কাব্যা ত্বন্ মনীষাস্ ত্বদ্ উক্‌থা জায়ন্তে রাধ্যানি।

২৩৯. ৫।১১।৫ ২৪০. ঐ ২৪১. ১।১৬।৭ ২৪২. ৫।৪২।২

২৪৩. দ্র. ৮।৯৬।১১ উক্‌থবাহসে বিভ্বে মনীষাং দ্রুণা ন পারম্ ঈরয়া নদীনাম্। কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে, পূজা, ১৬। একা মোর গানের তরী ভাসিয়েছিলেম নয়ন-জলে, অতুলপ্রসাদ।

২৪৪. ৬।৯।৬ ২৪৫. পূজা, ৩১৭ ২৪৬. ৪।১৮।১৩

২৪৭. কল্পনা।

২৪৮. যে পায়বো মামতেয়ং তে অগ্নে
পশ্যন্তো অন্ধং দুরিতাদ্ অরক্ষন্ ১।১৪৭।৩
মমতার কানা ছেলেকে তোমার
সর্বদর্শী ত্রাণশক্তিরা
দুর্গতি থেকে বাঁচাল, অগ্নি।

২৪৯. একটি কবিতার জন্যে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়

২৫০. ৬।১৫।৭ ২৫১. ৬।১৬।৪৭

২৫২. ঋচা ঋগ্-রূপেণ বর্তমানং হবিঃ ঋচমেব হবিঃ কৃত্বা—সায়ণ

২৫৩. ৮।৩৯।৩ ২৫৪. ৮।৭।১ ২৫৫. ২।৯।১

২৫৬. ৮।১১।৭

২৫৭. ১০।২৪।৯ ২৫৮ পূজা, ৩৪৬

২৫৯. ও অশথ, নিশান্তিকা, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

২৬০. ৬।৩৯।৬=২।১১।৫

২৬১. অবিন্দদ্ দিবো নিহিতং গুহা নিধিং
বেবৃ ন গর্ভং পরিবীতম্ অশ্মনি-অনন্তে অন্তর্ অশ্মনি ১।১৩০।৩

২৬২. পূজা, ৭৫ ২৬৩. ১০।৬৮।৭-৯

২৬৪. দ্র. টী ১০৫ সূক্ত দেবরথ ১০।৪।৬, ১০।৩৯।১৪

২৬৫. দেবতার 'অঙ্গীকরণের' একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত ২।১৯

২৬৬. তু. এতাসাম্ এব তদ্ দেবতানাং যজমানং সাযুজ্যং সরূপতাং সলোকতাং গময়তি গচ্ছতি শ্রেয়সঃ সাযুজ্যং গচ্ছতি শ্রেষ্ঠতাং য এবং বেদ (ঐ ব্রা ৮।৬)। যে ইহা জানে, সে যজমানকে ঐ সকল দেবতার সাযুজ্য, সামীপ্য ও সালোক্য প্রাপ্ত করায় ও শ্রেষ্ঠ (দেবতার) সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় ও শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকৃত অনুবাদ, ঐ রচনাবলী ৩।১৪৪

২৬৭. fission (আলাদা হয়ে যাওয়া) থেকে fusion-এ (এক হয়ে যাওয়া) শক্তির প্রয়োজন অনেক বেশী. এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটিকে এখানে উপমান হিসেবে নেওয়া চলে।

২৬৮. ১০।১৮৭।৪

২৬৯. ৮।৬।১০ ২৭০. ৭।৬৩।১ ২৭১. অন্তর্যামী, চিত্রা

২৭২. অয়া বিধেম নবয়া মহা গিরা ২।২৪।১

২৭৩. নবং নু স্তোমম্ অগ্নয়ে দিবঃ শ্যেনায় জীজনম্ ৭।১৫।৪

২৭৪. সুবীরং ত্বা স্বায়ুধং সুবজ্রম্ আ ব্রহ্ম নব্যম্ অবসে ববৃত্যাত্ ৬।১৭।১৩

২৭৫. উক্থং নবীয়ো জনয়স্ব যজ্ঞৈঃ ৬।১৮।১৫

২৭৬. শুচিং নু স্তোমং নবজাতম্ অদ্য ইন্দ্রাগ্নী বৃত্রহণা জুষেথাম্ ৭।৯৩।১

২৭৭. স্তবে জনং সুব্রতং নবসীভির্ গীর্ভির্ মিত্রাবরুণা ৬।৪৯।১

২৭৮. যূন উ ষু নবিষ্ঠয়া বৃষ্ণঃ পাবকাঁ অভি সোভরে গিরা। গায় ৮।২০।১৯

২৭৯. ৬।৯।৮ ২৮০. ১।১২৭-১৩৯ সূক্তের দ্রষ্টা ২৮১. দ্র. টী ২

২৮২. ১।১৩০।৩

২৮৩. ১।৯৪-১১৫। ৯৯ ও ১০০ বাদে। শততম সূক্তের দ্রষ্টা বার্ষা-গিরেরা কুত্সের ধুয়াটির আত্মীকরণ করেছেন।
অনুরূপ গৃত্সমদের ধুয়া 'বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ' দ্বিতীয় মণ্ডলের বহু সূক্তে। বিশ্বামিত্রের ধুয়া 'শুনং হুবেম' তৃতীয় মণ্ডলের ৩০-৩২, ৩৪-৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪৩, ৪৮-৫০ সূক্তে।

২৮৪. ৭।৩-৪; ৭-৮; ২০-২১; ২৪-২৫; ৩৯-৪০; ৬০-৬১; ৬৭-৬৯; ৭০-৭১; ৭২-৭৩; ৮২-৮৩; ৮৪-৮৫; ৯০-৯১; ৯৭-৯৮; ৯৯-১০০। ২৮-২৯-৩০ এই তিনটি সূক্তের অন্তিম ঋক্ও এক।

২৮৫. ১০।৪২ ৪৪ ২৮৬. ১।৪২।৭-৯

২৮৭. On the veda, p 62. ২৮৮. ৬।৩৪।৩ ২৮৯. পঙ্ক্তিটি আবার ঘুরে ফিরে এসেছে তাঁর 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধারে'র বারোমাস্যা কবিতাগুচ্ছের দশম কবিতায়।

২৯০. ঈশোপনিষদ্ ভাষ্য, ৫ ২৯১. ১।৯৫।১০

২৯২. ২০০ নং ২৯৩. ৩।৩৩।৮ ২৯৪. ১০।৮৯।৭

২৯৫. ঋগ্বেদের চূড়ান্ত সূক্তের ঋষিকা দেবী বাকের অন্তিম ঋকের উক্তি ১০।১২৫।৮

২৯৬. ঐতিহ্য ও টি. এস. এলিয়ট, স্বগত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পৃ ১৪৯-৫০

২৯৭. E. G. A. Homes, OBMV.

২৯৮. ও অশথ, নিশান্তিকা, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
তু. জুজুর্বা যো মুহুর্ আ যুবা ভূত্, (২।৪।৫), থুথ্রে যিনি যুবা হয়ে যান পলকে।

২৯৯. ১০।৭১।২

৩০০. ১০।৭১।৩

৩০১. বব্রাজা সীম্ অনদতীর্ অদব্ধা দিবো যহ্বীর্ অবসানা অনগ্নাঃ।
সনা অত্র যুবতয়ঃ সযোনীর্ একং গর্ভং দধিরে সপ্তবাণীঃ ৩।১।৬

৩০২. দ্র ১০।১২৩।১

৩০৩. যে অগ্নি 'পলিত যুবা' অর্থাৎ চির তরুণ চির প্রবীণ (১।১৪৪।৪),

তিনিই আবার সদ্যোজাত শিশু, চলেছেন বিপুল বীর্যে সবকিছু আঁকড়াতে আঁকড়াতে (১।১৪৫।৩, ৪)। অগ্নি দ্যুলোকের শিশু (৪।১৫।৬ ; ৬।৪৯।২), সোম দ্যুলোকের শিশু (৯।৩৮।৫), অগ্নি 'চিত্র' অর্থাৎ উজ্জ্বল শিশু (১০।১।২)। বৃষা-শিশু অর্থাৎ যুবক-শিশু সোম আসেন দেহ-গাগরীতে কিরণ-বালাদের সঙ্গে মিলতে, যেমন করে কোন উজ্জ্বল তরুণ যায় তার বাঞ্ছিতার সঙ্গে মিলতে কোন গোপন সঙ্কেতস্থানে (৯।৯৩।২)। ইন্দ্র সদ্যোজাত (৮।৭৭।৮) আরো দ্র. ২।৩৫।১৩, ৫।৪৭।৩ (দেবতা অজর যুবা আবার বৃষা শিশু), ১।৯৬।৫, ১।১৪০।৩, ৭।৯৫।৩, ৯।৭৪।১, ৯।১০২।১, ৯।১১০।১০, ৮।৯৯।৬, ৯।৯৬।১৭, ৯।৮৫।১১

৩০৪. রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রিতা কাব্যের প্রথম কবিতা আশীর্বাদের শিরো-লেখনটি এ প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য—পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ।

৩০৫. যথাক্রমে ১।১৬৪।২০ ও ১৬

৩০৬. ৮।৭০।১৫ ৩০৭. ৪।১৮।১২, ১০।২৭।৪ ৩০৮. ১০।৮৫।২৬, ১০৯।২ ৩০৯. ৮।২।১ ৩১০. ৭।৩২।২৩; ন ভূতো ন ভবিষ্যতি-র সঙ্গে তুলনীয় ৩১১. ১।২৫।১১ ৩১২. ১।২৪।১১

৩১৩. ১।৩৫।৭ ৩১৪. ১।৩৭।৩ ৩১৫. ১।৩৮।৩ ৩১৬. ১।৩৮।১

৩১৭. ৮।৮৯।৬ ৩১৮. ৮।৬৬।১৩, ৭।৩২।১৯ ৩১৯. ৮।৪৮।৯

৩২০. ৩।৫৩।২ ৩২১. ঐ। ৩২২. ৫।৪৪।৬ ৩২৩. ৫।২।৪

৩২৪. ৪।১৭।১০ ৩২৫. যথাক্রমে ১।৩৭।৮, ১।৮৯।৯, ১।৭৪।৫

৩২৬. ১০।২৮।১

৩২৭. ১০।১৫৫।৩ ৩২৮. ৫।৩৯।১ ৩২৯. ৪।৩৮।৫ ৩৩০. ৮।২।২০

৩৩১. ৮।২।১৩ ৩৩২. ১।৯১।২০ ৩৩৩. ৭।২৩।২ ৩৩৪. ১।৪১।৯

৩৩৫. ৩।৫৩।৪ ৩৩৬. ৯।৭৩।৬ ৩৩৭. ৭।৫০।১ ৩৩৮. ৮।১।২০

৩৩৯. ৮।৩৩।১৭ ৩৪০. ১।১৮২।৭ ৩৪১. ৩।৫৩।২৩ ৩৪২. ১০।১১৬

৩৪৩. ১০।১০ ৩৪৪. ৮।১ ৩৪৫. ৯।১১২ ৩৪৬. ৮।২ ৩৪৭. ১।১৭৯

৩৪৮. ১।১৭৯।৫ ৩৪৯. ৬।৫৫ ৩৫০. অথ যদ্ রশ্মিপোষং পুষ্যতি

তত্ পূষা ভবতি। নি ১২।১৬ ৩৫১. মর্যো ন যোষাম্ অভি-এতি পশ্চাত ১।১১৫।২।

৩৫২. শুদ্ধভাষার কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন,

বুঝি আমি কোন্ নিগম অর্থ
ইতরের অপভাষায় রাজে। প্রতিদান, উত্তরফাল্গুনী

'ক্রন্দসী'র 'কুক্কুট' কবিতাটিতেও তিনি অপভাষাকে অর্ঘ্য দিয়েছেন—

শূন্যগর্ভ নভস্তল অকস্মাৎ অনুনাদে ভরি
তরঙ্গিল সারা বিশ্বে, হে কুক্কুট, তোমার মাভৈঃ;
আশার অলকানন্দা বহায়িলে, অশুচি বিজয়ী;
বাঙ্ময় উদ্ধার এল, প্রেতমুক্ত হল বিভাবরী॥

দেখেছি, পতিত, তব অতিমর্ত্য বিরাট মুরতি
অসংস্কৃত অন্ত্যজের চমৎকৃত, তীব্র পরিচয়ে।
রুচিগ্রস্ত সিদ্ধ কবি শুদ্ধ থাক আভিজাত্য লয়ে;
তুমি ধরো, হে অস্পৃশ্য, অখ্যাতের সহজ প্রণতি॥

৩৫৩. ১০।৭১।৪

৩৫৪. ৭।৮৯।৪। ৩৫৫. ১।১১৬।৯ সহস্র মানে অনন্ত। 'গোতমস্য' ষষ্ঠী হয়েছে চতুর্থীর অর্থে, দ্র. সায়ণ

৩৫৬ কবীর, চতুর্থ খণ্ড, ক্ষিতিমোহন সেন

৩৫৭. চোখোচোখি, নিশান্তিকা

বেদের কবিতা / মন্ত্র ও অনুবাদ

১

ঋগ্বেদ মণ্ডল ১ সূক্ত ১

ঋষি মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র দেবতা অগ্নি ছন্দঃ গায়ত্রী

অগ্নিম্ ঈলে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্ ॥১॥

অগ্নিঃ পূর্বেভির্ ঋষিভির্
ঈড্যো নূতনৈর্ উত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥২॥

অগ্নিনা রয়িম্ অশ্নবত
পোষম্ এব দিবেদিবে।
যশসং বীরবত্-তমম্ ॥৩॥

অগ্নে যং যজ্ঞম্ অধ্বরং
বিশ্বতঃ পরিভূর্ অসি।
স ইদ্ দেবেষু গচ্ছতি ॥৪॥

অগ্নির্ হোতা কবি-ক্রতুঃ
সত্যশ্ চিত্রশ্রবস্-তমঃ।
দেবো দেবেভির্ আ গমত্ ॥৫॥

১

ঋষি মধুচ্ছন্দার অগ্নিসূক্ত

জ্বেলেছি আগুন আগ আগুয়ান
সামনে রেখেছি — অগ্রনিশান
দেখাবে যজ্ঞ আলোলীলাময়
যজন করাবে বুঝে সুসময়
ডেকে ডেকে দেবে নেওয়াবে আহুতি
গভীরে জ্বালাবে রত্নদ্যুতি—
এমন কে দেবে আর ? ॥১॥

জ্বেলেছে আগুন পূর্বঋষিরা
জ্বালবে আবার অধুনাতনেরা
এখানে আসুন বয়ে সে-আগুন
দেব-দ্যুতি-সম্ভার ॥২॥

বিপুল কামনা হে আগুন আনো আনো
বাড়াও বাড়াও দিন দিন দিন। আরো আলো আরো আলো।
হব সম্রাট্ বীর্যবিরাট্, ঈশ্বরত্ব পাব ॥৩॥

ধূর্তিহীন যে যজ্ঞকে তুমি
চারিদিক হতে ঘের হে অগ্নি
দেবতার কাছে পৌঁছবেই তা ॥৪॥

সত্যস্বরূপ। ধরেন আহুতি
কবি—করে চলেছেন কবিকৃতি
দিয়ে চলেছেন বিচিত্র শ্রুতি—
এমন কে দেবে আর

এখানে আসুন নিয়ে সে-আগুন
দেব-দ্যুতি-সম্ভার ॥৫॥

যদ্ অঙ্গ দাশুষে ত্বম্
অগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি।
তবে.ত্ তত্ সত্যম্ অঙ্গিরঃ ॥৬॥

উপ ত্বা.গ্নে দিবেদিবে
দোষাবস্তর্ ধিয়া বয়ম্।
নমো ভরন্ত এমসি ॥৭॥

রাজন্তম্ অধ্বরাণাং
গোপাম্ ঋতস্য দীদিবিম্।
বর্ধমানং স্বে দমে ॥৮॥

স নঃ পিতে.ব সূনবে-
অগ্নে সূপায়নো ভব।
সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥৯॥

সব যে দিয়েছে তার কল্যাণ
করবেই ওগো অগ্নি তুমি যে—
তোমারই সত্য সে তো, অঙ্গিরা ॥৬॥

আঁধার-উজালা হে আগুন, মোরা
প্রতিদিন আসি তোমার সমুখে
ধী নিয়ে, প্রণতি ব'য়ে, আলো চেয়ে—
আরো আলো, আরো আলো ॥৭॥

আসি উজ্জ্বল, ঋতের রাখাল,
যজ্ঞ-ঈশান রাজার সমুখে
আপনার গৃহে গৃহপতি যিনি নিত্য বর্ধমান ॥৮॥

পুত্রের কাছে পিতার মতন
হও হে অগ্নি সু-দান সুগম
জড়িয়ে নিবিড় ধর আমাদের দাও হে স্বস্তি দান ॥৯॥

২

অথর্ববেদ কাণ্ড ১২ সূক্ত ১

ঋষি অথর্বা দেবতা ভূমি ছন্দঃ বিবিধ
(দ্র. ভাষ্য)

সত্যং ৰৃহদ্ ঋতম্ উগ্রং দীক্ষা
তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি ।
সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্নী-
উরুং লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু ॥১॥

অসংবাধং ৰধ্যতো মানবানাং
যস্যা উদ্বতঃ প্রবতঃ সমং ৰহু ।
নানাবীর্যা ওষধীর্ যা ৰিভর্তি
পৃথিবী নঃ প্রথতাং রাধ্যতাং নঃ ॥২॥

যস্যাং সমুদ্র উত সিন্ধুর্ আপো
যস্যাম্ অন্নং কৃষ্টয়ঃ সংৰভূবুঃ ।
যস্যাম্ ইদং জিন্বতি প্রাণদ্ এজত্
সা নো ভূমিঃ পূর্বপেয়ে দধাতু ॥৩॥

যস্যাশ্ চতস্রঃ প্রদিশঃ পৃথিব্যা
যস্যাম্ অন্নং কৃষ্টয়ঃ সংৰভূবুঃ ।
যা ৰিভর্তি ৰহুধা প্রাণদ্ এজত্
সা নো ভূমির্ গোষ্বপ্য ন্নে দধাতু ॥৪॥

যস্যাং পূর্বে পূর্বজনা বিচক্রিরে
যস্যাং দেবা অসুরান্ অভ্যবর্তয়ন্ ।
গবাম্ অশ্বানাং বয়সশ্ চ বিষ্ঠা
ভগং বর্চঃ পৃথিবী নো দধাতু ॥৫॥

২

ঋষি অথর্বার ভূমিসূক্ত

বিপুল বিশাল বৃহৎ সত্য, ঋতচ্ছন্দ ওজঃক্ষরা,
দীক্ষা তপস্ ব্রহ্ম যজ্ঞ—পৃথিবীকে ধরে আছে এরা।
যা হয়েছে, হবে—সবের ঈশানী বিপুল পৃথিবী,
দাও আমাদের সমস্ত-ছাওয়া আলোক-রাজ্য বিরাট্ লোক ॥১॥

জোরে বাঁধছ না, তবু মানুষকে বাঁধছ কি মহা বাঁধনে
চলেছ চড়াই উৎরাই সোজা—কত বিচিত্র চলনে।
ধর বিচিত্রবীর্য ওষধি কত অসংখ্য—
আমাদের কাছে ছড়াও পৃথিবী, হও বাড়ন্ত ॥২॥

তোমাতে রয়েছে সমুদ্র নদী, রয়েছে জল
শস্য মানুষ মানব-জমিনে কত ফসল।
যা-কিছু এই যে বাঁচছে কাঁপছে
তোমাতে শিউরে শিউরে উঠছে
দাও ভূমি আমাদের প্রতিষ্ঠা প্রথম-পানে ॥৩॥

পৃথিবী তোমার চারটি দিক্ বিদিক্
শস্য মানুষ জন্ম নিচ্ছে তোমাতে।
কতভাবে কত করছ লালন থরথর প্রাণ
রাখো ওগো ভূমি আমাদের দুধে-ভাতে ॥৪॥

একদা এখানে পূর্বপুরুষ করেছে কত কি
হারিয়ে অসুর-দল দেবতারা হয়েছে বিজয়ী।
গরু ঘোড়া পাখি সবার আপন বিচিত্র ঠাঁই
হে পৃথিবী দাও, দাও দ্বারভাঙা আলো-আনন্দ ॥৫॥

বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা
হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী।
বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমির্ অগ্নিম্
ইন্দ্র-ঋষভা দ্রবিণে নো দধাতু ॥৬॥

যাং রক্ষন্তি-অস্বপ্না বিশ্বদানীং
দেবা ভূমিং পৃথিবীম্ অপ্রমাদম্।
সা নো মধু প্রিয়ং দুহাম্
অথো উক্ষতু বর্চসা ॥৭॥

যা-র্ণবেঽধি সলিলম্ অগ্রে-আসীদ্
যাং মায়াভির্ অন্বচরন্ মনীষিণঃ।
যস্যা হৃদয়ং পরমে ব্যোমন্-ত্-
সত্যেনা-বৃতম্ অমৃতং পৃথিব্যাঃ।
সা নো ভূমিস্ ত্বিষিং বলং
রাষ্ট্রে দধাতু-উত্তমে ॥৮॥

যস্যাম্ আপঃ পরিচরাঃ সমানীর্
অহোরাত্রে অপ্রমাদং ক্ষরন্তি।
সা নো ভূমির্ ভূরিধারা পয়ো দুহাম্
অথো উক্ষতু বর্চসা ॥৯॥

যাম্ অশ্বিনৌ-অমিমাতাং
বিষ্ণুর্ যস্যাং বিচক্রমে।
ইন্দ্রো যাং চক্রে-আত্মনে-
অনমিত্রাং শচীপতিঃ।
সা নো ভূমির্ বি সৃজতাং
মাতা পুত্রায় মে পয়ঃ ॥১০॥

বিশ্বভরণী আলোকধারিণী সর্বশরণ
বু'খানি সোনার, ঘুমোয় সে-বুকে বিশ্বভুবন।
ইন্দ্র-বৃষের ধেনু, ধরে আছ কি মহা-আগুন এ
দাও আমাদের দাও প্রতিষ্ঠা দাও মহাধনে ॥৬॥

যাঁর পাহারায় অপ্রমত্ত দেবতারা জেগে আছে নিশিদিন
সে-পৃথিবী প্রিয় মধু আমাদের দুয়ে দুয়ে দিন,
ঝরান ঝরান তিমিরবিদার আলোকবীর্য ॥৭॥

যে পৃথিবী আগে অর্ণবলীন ছিল শুধু জল,
প্রজ্ঞান দিয়ে মনীষীরা যার খুঁজে ফেরে তল,
যাঁর হিয়ামৃত সত্যে আবৃত পরম শূন্যে
সে-ভূমি দিন-না মোদের সে-তেজ, শক্তি দিন সে
গড়ব যা দিয়ে সুন্দরতম মহৎ রাষ্ট্র ॥৮॥

জল শুধু জল সমানে অঝোর দিকে দিগন্তে
দিনে আর রাতে অপ্রমত্ত ঝরে যে-ভূমিতে
তিনি আমাদের বহু-ধারা ধেনু, পয়োধারা তাঁর দুয়ে দুয়ে দিন
ঝরান ঝরান তিমিরবিদার আলোক-বীর্য ॥৯॥

অশ্বিযুগল মাপ নিল যাঁর
বিষ্ণু যেখানে চরণ ফেলল,
নিজের জন্যে ইন্দ্র শচীশ
করল যাঁকে অমিত্র-শূন্য,
সে ভূমি-মা দুধ ঝরান মোদের—
আমার জন্যে, আমি যে পুত্র ॥১০॥

গিরয়স্ তে পর্বতা হিমবন্তো-
অরণ্যং তে পৃথিবি স্যোনম্ অস্তু।
বভ্রুং কৃষ্ণাং রোহিণীং বিশ্বরূপাং
ধ্রুবাং ভূমিং পৃথিবীম্ ইন্দ্রগুপ্তাম্।
অজীতোঽহতো অক্ষতো-
অধ্য.ষ্ঠাং পৃথিবীম্ অহম্ ॥১১॥

যস্ তে মধ্যং পৃথিবি যত্-চ নভ্যং
যাস্ তে-উর্জস্ তন্বঃ সংবভূবুঃ।
তাসু নো ধেহি-অভি নঃ পবস্ব
মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ।
পর্জন্যঃ পিতা স উ নঃ পিপর্তু ॥১২॥

যস্যাং বেদিং পরিগৃহ্ণন্তি ভূম্যাং
যস্যাং যজ্ঞং তন্বতে বিশ্বকর্মাণঃ।
যস্যাং মীয়ন্তে স্বরবঃ পৃথিব্যাম্
ঊর্ধ্বাঃ শুক্রা আহুত্যাঃ পুরস্তাত্।
সা নো ভূমির্ বর্ধয়দ্ বর্ধমানা ॥১৩॥

যো নো দ্বেষত্ পৃথিবি যঃ পৃতন্যাদ্
যোঽভিদাসাত্-মনসা যো বধেন
তং নো ভূমে রন্ধয় পূর্বকৃত্বরি ॥১৪॥

ত্বজ্জাতাস্ ত্বয়ি চরন্তি মর্ত্যাস্
ত্বং বিভর্ষি দ্বিপদস্ ত্বং চতুষ্পদঃ।
তবে.মে পৃথিবি পঞ্চ মানবা
যেভ্যো জ্যোতির্ অমৃতং মর্ত্যেভ্য
উদ্যন্-ত্-সূর্যো রশ্মিভির্ আতনোতি ॥১৫॥

পৃথিবী, তোমার গিরি অরণ্য
হিমেল পাহাড় হোক সুরম্য।
পিঙ্গলা শ্যামা রাঙা শতরূপা
ধ্রুবা পৃথু ভূমি ইন্দ্রগুপ্তা।
আমি অক্ষত আমি অদম্য
মরি নি, দাঁড়িয়ে আছি পৃথিবীতে ॥১১॥

পৃথিবী, তোমার মধ্য যা, আর যা নাভি তোমার,
তোমার তনুতে জন্ম নিল যে বজ্র-বীর্য,
সেখানে আসন দাও আমাদের, পূতধারে বও।
ভূমি মা আমার, আমি ছেলে তাঁর। সে-পর্জন্য
পিতা আমাদের পালন করুন, করুন পূর্ণ ॥১২॥

বিশ্বকারুরা বেদি ঘিরে নেয়
যে-ভূমিতে আর যজ্ঞ বিছোয়,
উঁচু উজ্জ্বল যূপগুলি পোঁতা
হয় যে-ভূমিতে আহুতির আগে
সে ভূমি বাড়ুন, মোদেরও বাড়ান ॥১৩॥

আমাদের করে বিদ্বেষ যে, যে আহ্বান করে যুদ্ধে
মনে মনে করে ধ্বংসের সংকল্প,
হত্যার হাতিয়ার নিয়ে ছোটে
আমাদের উদ্দেশ্যে—
করেছিস আগে কত—তাকে ভূমি
আমাদের কর্ বশ্য ॥১৪॥

তোমারই গর্ভে জনম সবার, তোমাতেই বিচরণ
যত দ্বিপদকে চতুষ্পদকে তুমিই কর ভরণ।
তোমারই আপন, হে পৃথিবী, এই মর্ত্য পঞ্চজন—
যাদের জন্যে মৃত্যুঞ্জয় জ্যোতি
কিরণে কিরণে ছড়িয়ে চলেছে সূর্য ঊর্ধ্বগতি ॥১৫॥

তা নঃ প্রজাঃ সং দুহ্রতাং সমগ্রা
বাচো মধু পৃথিবি ধেহি মহ্যম্ ॥১৬॥

বিশ্বস্বং মাতরম্ ওষধীনাং
ধ্রুবাং ভূমিং পৃথিবীং ধর্মণা ধৃতাম্।
শিবাং স্যোনাম্ অনু চরেম বিশ্বহা ॥১৭॥

মহত্ সধস্থং মহতী বভূবিথ
মহান্ বেগ এজথুর্ বেপথুস্-তে
মহাংস্.ত্বে.ন্দ্রো রক্ষতি-অপ্রমাদম্।
সা নো ভূমে প্র রোচয়
হিরণ্যস্যে.ব সংদৃশি
মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন ॥১৮॥

অগ্নির্ ভূম্যাম্ ওষধীষু-
অগ্নিম্ আপো বিভ্রতি-অগ্নির্ অশ্মসু।
অগ্নির্ অন্তঃ পুরুষেষু
গোষু-অশ্বেষু-অগ্নয়ঃ ॥১৯॥

অগ্নির্ দিব আ তপতি-
অগ্নের্ দেবস্য-উরু-অন্তরিক্ষম্।
অগ্নিং মর্তাস ইন্ধতে
হব্যবাহং ঘৃতপ্রিয়ম্ ॥২০॥

অগ্নিবাসাঃ পৃথিবী-অসিতজ্ঞূস্
ত্বিষীমন্তং সংশিতং মা কৃণোতু ॥২১॥

সেই সব যত সন্তান—তারা
ঝরিয়ে ঝরিয়ে দিক আমাদের দিক।
শব্দের মধু পৃথিবী আমাতে সঞ্চিত কর হে ॥১৬॥

সবার আপন, প্রসূতি সবার, সব ওষধির জননী
ধর্মে বিধৃতা ধ্রুবা মঙ্গলা সুখদা পৃথিবী ভূমি—
চিরদিন যেন চলি তাঁর অনুচর ॥১৭॥

দেব-মিলনের মহাভূমি তুমি, মহতী, মহত্তরা,
কি বিপুল বেগ, কি মহা কাঁপন, কি মহা চঞ্চলতা!
মহান্ ইন্দ্র অপ্রমত্ত রক্ষা করছে তোমাকে।
সে-ভূমি মোদের করো উজ্জ্বল
সোনার মতন করি ঝলমল—
কেউ না করুক দ্বিষ ॥১৮॥

মাটিতে আগুন, আগুন গাছে লতায়,
পাথরে পাথরে আগুন, আগুন জলে।
গোরুতে ঘোড়াতে আগুন আগুন আগুন
প্রতি মানুষের গভীরে আগুন জলে ॥১৯॥

আকাশ ঝরায় আগুন তাতিয়ে দিক-দিগন্ত
দাউ দাউ জলে দেবতা আগুন বিপুল বিশাল অন্তরিক্ষে।
মর্ত্যমানুষও জ্বালিয়ে তুলছে, জ্বালিয়ে চলেছে
হব্যবাহন উজ্জ্বলরস-প্রিয় আগুনকে ॥২০॥

অগ্নিবসন পরেছ শ্যামল ও জানু দুটি ঘিরে যে
পৃথিবী, আমায় করো উজ্জ্বল শাণিত তীক্ষ্ণ তেজে ॥২১॥

ভূম্যাং দেবেভ্যো দদতি
যজ্ঞং হব্যম্ অরংকৃতম্।
ভূম্যাং মনুষ্যা জীবন্তি
স্বধয়া.ন্নেন মর্ত্যাঃ।
সা নো ভূমিঃ প্রাণম্ আয়ুর্ দধাতু
জরদষ্টিং মা পৃথিবী কৃণোতু ॥২২॥

যস্ তে গন্ধঃ পৃথিবি সংবভূব
যং বিভ্রতি-ওষধয়ো যম্ আপঃ।
যং গন্ধর্বা অপ্সরসশ্ চ ভেজিরে
তেন মা সুরভিং কৃণু
মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন ॥২৩॥

যস্ তে গন্ধঃ পুষ্করম্ আবিবেশ
যং সংজভ্রুঃ সূর্যায়া বিবাহে।
অমর্ত্যাঃ পৃথিবি গন্ধম্ অগ্রে
তেন মা সুরভিং কৃণু
মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন ॥২৪॥

যস্ তে গন্ধঃ পুরুষেষু
স্ত্রীষু পুংসু ভগো রুচিঃ।
যো অশ্বেষু বীরেষু যো
মৃগেষু-উত হস্তিষু।
কন্যায়াং বর্চো যদ্ ভূমে
তেনা.স্মাঁ অপি সং সৃজ
মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন ॥২৫॥

এই মাটিতেই দেব্‌তাকে দেয় যজ্ঞ সবাই
যত্নে-রচা হব্যটি দেয়।
এই মাটিতেই মানুষ বাঁচে—মাটির মানুষ
অন্নে স্বধায়।
সেই মাটি দিন প্রাণ আমাদের
দিন্-না আয়ু সেই পৃথিবী
বুড়ো হব সেই অবধি ॥২২॥

পিথিমি গো, যে গন্ধ তোর অঙ্গ ভ'রে
গাছপালাতে জলে জলে ম' ম' করে,
গন্ধর্ব অপ্সরারাও ভাগ নিল যার, মজ্‌ল যাতে
তাই দে' আমায় কর্ স্বরভি
জড়িয়ে নিবিড় ধর্ পৃথিবী
কেউ যেন না দ্বেষ করে ॥২৩॥

যে-গন্ধ তোর ভর করেছে নীলকমলে
সূর্যা-মেয়ের বিয়ের বেলা দেব্‌তারা সব
সবার আগে করল যোগাড় যে-গন্ধকে-
তাই দে' আমায় কর্ স্বরভি
জড়িয়ে নিবিড় ধর পৃথিবী
কেউ যেন না দ্বেষ করে ॥২৪॥

যে-গন্ধ তোর সব মানুষে
সব মেয়েতে সব পুরুষে
রূপ পীরিতি পুলক হয়ে জড়ায়,
রয়্‌ছে যা সব বীরপুরুষে পশু-হাতি-ঘোড়ায়,
চটক হয়ে কুমারীতে ফুটছে যা, ভুঁই,
তাই দে' মোদের মাখামাখি করে দে তুই
কেউ যেন না দ্বেষ করে ॥২৫॥

শিলা ভূমিরু অশ্মা পাংসুঃ
সা ভূমিঃ সংধৃতা ধৃতা।
তস্যৈ হিরণ্যবক্ষসে
পৃথিব্যৈ-অকরং নমঃ ॥২৬॥

যস্যাং বৃক্ষা বানস্পত্যা
ধ্রুবাস্ তিষ্ঠন্তি বিশ্বাহা।
পৃথিবীং বিশ্বধায়সং
ধৃতাম্ অচ্ছাবদামসি ॥২৭॥

উদীরাণা উতা.সীনাস্
তিষ্ঠন্তঃ প্রক্রামন্তঃ।
পদ্ভ্যাং দক্ষিণসব্যাভ্যাং
মা ব্যথিষ্মহি ভূম্যাম্ ॥২৮॥

বিমৃগ্বরীং পৃথিবীম্ আ বদামি
ক্ষমাং ভূমিং ব্রহ্মণা বাবৃধানাম্।
ঊর্জং পুষ্টং বিভ্রতীম্ অন্নভাগং
ঘৃতং ত্বা-অভি নি ষীদেম ভূমে ॥২৯॥

শুদ্ধা ন আপস্ তন্বে ক্ষরন্তু
যো নঃ সেদুরু অপ্রিয়ে তং নি দধ্মঃ।
পবিত্রেণ পৃথিবি মো.ত্ পুনামি ॥৩০॥

এই পৃথিবী—নুড়ি পাথর ধুলো মাটি—
শক্ত করে রয়েছে ধরা আঁটিসাঁটি।
সোনায় গড়া হৃদয়খানি তার
করছি তাকে নমো নমস্কার ॥২৬॥

বনের রাজা গাছগুলি ঠায় যাতে
দাঁড়িয়ে আছে দিনের পরে দিন,
সবার যিনি ধাত্রী-মা সেই ধীরা
পৃথিবীকে ডাকছি, (সাড়া দিন) ॥২৭॥

উঠতে-উঠতে কিম্বা বসতে ভুঁয়ে
দাঁড়াতে কিম্বা চলতে ডান-বাঁ পায়ে
যেন না টলি না পড়ি ॥২৮॥

নির্মলা ক্ষমা পৃথিবী ভূমির মহিমা গাই
বাড়ছেন যিনি বৃহদ্‌গর্ভ মন্ত্রে।
বীর্যপুষ্টিধারিণী অন্নপূর্ণা জ্যোতির্ময়ী
চাই ওগো ভূমি তোমার সমুখে বসতে ॥২৯॥

নির্মল ধারা ঝরুক এ-দেহে নিত-নিতুই।
যাকে পছন্দ করি না, তাতেই তলানি থুই।
পবিত্র দিয়ে উৎ-পূত করি নিজেকে ॥৩০॥

যাস্ তে প্রাচীঃ প্রদিশো যা উদীচীর্
যাস্ তে ভূমে অধরাত্-যাশ্ চ পশ্চাত্।
স্যোনাস্ তা মহ্যং চরতে ভবন্তু
মা নি পপ্তং ভুবনে শিশ্রিয়াণঃ ॥৩১॥

মা নঃ পশ্চাত্-মা পুরস্তাত্-নুদিষ্ঠা
মো-ত্তরাদ্ অধরাদ্ উত।
স্বস্তি ভূমে নো ভব
মা বিদন্ পরিপন্থিনো
বরীয়ো যাবয়া বধম্ ॥৩২॥

যাবত্ তেঽভি বিপশ্যামি
ভূমে সূর্যেণ মেদিনা।
তাবত্-মে চক্ষুর্ মা মেষ্ট-
উত্তরাম্ উত্তরাং সমাম্ ॥৩৩॥

যত্-শয়ানঃ পর্যাবর্তে
দক্ষিণং সব্যম্ অভি ভূমে পার্শ্বম্।
উত্তানাস্ ত্বা প্রতীচীং যত্
পৃষ্টীভির্ অধিশেমহে।
মা হিংসীস্ তত্র নো ভূমে
সর্বস্য প্রতিশীবরি ॥৩৪॥

পুবে, ও ভুঁই, আছে যা তোর দিক্, আছে বিদিক্,
এবং আছে উত্তরে আর দক্ষিণে, পশ্চিমে—
পথিক আমি, চলার পথে আরাম তারা দিক,
নিপাত না যাই, আঁকড়ে আছি ভুবন-শরণ এ ॥৩১॥

সামনে পেছন দখিন উতোর—
ধাক্কা যেন পাই নে ভূ তোর
স্বস্তি হয়ে থাক্।
বেড়াজালে ঘিরছে যারা
নাগাল যেন পায় না তারা
যার-বাড়া-নেই মরণটাকে
দূর হটিয়ে রাখ্ ॥৩২॥

সূর্য-মিতার সঙ্গে, ও ভুঁই,
তোমার পানে চেয়ে চেয়ে
দেখব যতদিন
একটার পর একটা বছর—
এ-চোখ আমার হয় না যেন ক্ষীণ ॥৩৩॥

শুয়ে শুয়ে ডাইনে-বাঁয়ে যখনই হই কাৎ,
পাঁজরায় ভর কিম্বা দিয়ে লম্বামি চিৎপাত,
আমার দিকে, সবার দিকে, ফিরেই থাক, ভূমি,
যে যেখানে আছে সবার শয়ন-সাথী তুমি—
তখন হিংসা কোরো না
আঘাত- ব্যাঘাত দিও না ॥৩৪॥

যত্ তে ভূমে বিখনামি
ক্ষিপ্রং তদ্ অপি রোহতু।
মা তে মর্ম বিমৃগ্বরি
মা তে হৃদয়ম্ অর্পিষম্ ॥৩৫॥

গ্রীষ্মস্ তে ভূমে বর্ষাণি
শরদ্-হেমন্তঃ শিশিরো বসন্তঃ।
ঋতবস্ তে বিহিতা হায়নীর্
অহোরাত্রে পৃথিবি নো দুহাতাম্ ॥৩৬॥

যা.প সর্পং বিজমানা বিমৃগ্বরী
যস্যাম্ আসন্-ন্ অগ্নয়ো যে অপ্সু-অন্তঃ ;
পরা দস্যূন্ দদতী দেবপীয়ূন
ইন্দ্রং বৃণানা পৃথিবী ন বৃত্রম্।
শক্রায় দধ্রে বৃষভায় বৃষ্ণে ॥৩৭॥

যস্যাং সদো-হবির্ধানে
যূপো যস্যাং নিমীয়তে।
ব্রহ্মাণো যস্যাম্ অর্চন্তি-
ঋগ্ভিঃ সাম্না যজুর্বিদঃ।
যুজ্যন্তে যস্যাম্ ঋত্বিজঃ
সোমম্ ইন্দ্রায় পাতবে ॥৩৮॥

ভুঁই গো, যা তোর এখানে-ওখানে খুঁড়ি,
ভরে যাক পূরে যাক সব তাড়াতাড়ি।
ওগো নির্মলা বিদ্ধ না করি যেন
মর্ম তোমার, তোমার হৃদয়খানি ॥৩৫॥

গ্রীষ্ম তোমার, ওগো ভূমি, বর্ষা শরৎ হেমন্ত
শিশির এবং বসন্ত
বাঁধাধরা এই ঋতুরা, বছরগুলি, দিন ও রাত
মোদের 'পরে, ও পৃথিবী, দুধের ধারা ঝরঝরাক ॥৩৬॥

সাপটাকে দেন উসকে যিনি
সেই পাবনী—
রয়েছে যাঁতে সে-অগ্নিরা
জলের তলায় যাদের বাস,
সেই পৃথিবী—
দস্যু যারা দেব্‌তাদ্বেষী
সটান তাদের দূর হটিয়ে
ব'রে নিলেন ইন্দ্রকে তো—বৃত্রকে নয়,
তাঁরই হলেন, শক্র যিনি শক্তিমান্
বীর্য ধরেন আর ঝরান ॥৩৭॥

সদঃ হবির্ধান হয় যেথা নির্মাণ
যূপ পোঁতা হয় যার মধ্যে,
ঋক্-যজু-সাম-জানা বিদ্বান্ ব্রহ্মারা
অর্চনা করে যেথা মন্ত্রে,
একযোগে মেলে যেথা ঋত্বিক্-বৃন্দ
ইন্দ্রকে সোমপান করাতে— ॥৩৮॥

যস্যাং পূর্বে ভূতকৃত
ঋষয়ো গা উদ্-আনৃচুঃ।
সপ্ত সত্রেণ বেধসো
যজ্ঞেন তপসা সহ ॥৩৯॥

সা নো ভূমির্ আ দিশতু
যদ্ ধনং কাময়ামহে।
ভগো অনুপ্রযুঙ্ক্তাম্
ইন্দ্র এতু পুরোগবঃ ॥৪০॥

যস্যাং গায়ন্তি নৃত্যন্তি
ভূম্যাং মর্ত্যা বি-ঐলবাঃ।
যুধ্যন্তে যস্যাম্ আক্রন্দো
যস্যাং বদতি দুন্দুভিঃ।
সা নো ভূমিঃ প্র ণুদতাং সপত্নান্
অসপত্নং মা পৃথিবী কৃণোতু ॥৪১॥

যস্যাম্ অন্নং ব্রীহিযবৌ
যস্যা ইমাঃ পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ।
ভূম্যৈ পর্জন্যপত্ন্যৈ
নমোঽস্তু বর্ষমেদসে ॥৪২॥

যস্যাঃ পুরো দেবকৃতাঃ
ক্ষেত্রে যস্যা বিকুর্বতে।
প্রজাপতিঃ পৃথিবীং বিশ্বগর্ভাম্
আশাম্ আশাং রণ্যাং নঃ কৃণোতু ॥৪৩॥

সত্র যজ্ঞ তপ দিয়ে যেথা সাতজন
বিধাতা সৃষ্টিধর আদি-ঋষি মন্ত্রের
সুর-শিখা জ্বেলেছিল ঊর্ধ্বে— ॥৩৯॥

সে-ভূমি দেখিয়ে দিন কোথায় আছে সে ধন
আমাদের সবার যা কাম্য,
সঙ্গের সাথী হয়ে ভগ যান পিছে পিছে
দিশারী চলুন আগে ইন্দ্র ॥৪০॥

যে-ভূমিতে গায় নাচে যোঝে লড়ে কত কি
ইলাসুত মানুষেরা। রণডাক, জয়ঢাক
গমগম করে ওঠে যেখানে, সে-ভূমি দিন
দূর করে আমাদের যত আছে শত্রু র—
পৃথিবী আমাকে নিঃশত্রু করুন ॥৪১॥

যাঁতে আছে ব্রীহি-যব অন্ন,
যাঁর এ পঞ্চজন,
পর্জন্যের যিনি পত্নী,
বর্ষণমেদুরা সে ভূমিকে নমস্কার ॥৪২॥

দেবতার গড়া যাঁর গড়গুলি, আর যাঁর
জমিনেতে কত কিছু করে লোকে, প্রজাপতি
সর্বগর্ভা সেই পৃথিবীকে দিকে দিকে
করুন আনন্দিনী আমাদের জন্যে ॥৪৩॥

নিধিং বিভ্রতী বহুধা গুহা বসু
মণিং হিরণ্যং পৃথিবী দদাতু মে।
বসূনি নো বসুদা রাসমানা
দেবী দধাতু সুমনস্যমানা ॥৪৪॥

জনং বিভ্রতী বহুধা বিবাচসং
নানাধর্মাণং পৃথিবী যথৌকসম্।
সহস্রং ধারা দ্রবিণস্য মে দুহাং
ধ্রুবে.ব ধেনুর্ অনপস্ফুরন্তী ॥৪৫॥

যস্ তে সর্পো বৃশ্চিকস্ তৃষ্টদংশ্মা
হেমন্তজব্ধো ভৃমলো গুহা শয়ে।
ক্রিমির্ জিন্বত্ পৃথিবি যদ্ যদ্ এজতি
প্রাবৃষি তত্-নঃ সর্পত্-মো.প সৃপদ্
যত্-শিবং তেন নো মৃল. ॥৪৬॥

যে তে পন্থানো বহবো জনায়না
রথস্য বর্ত্মা-অনসশ্ চ যাতবে।
যৈঃ সংচরন্তি-উভয়ে ভদ্রপাপাস্
তং পন্থানং জয়েম-
অনমিত্রম্ অতস্করং
যত্-শিবং তেন নো মৃল. ॥৪৭॥

মল্বং বিভ্রতী গুরুভৃদ্
ভদ্রপাপস্য নিধনং তিতিক্ষুঃ।
বরাহেণ পৃথিবী সংবিদানা
সূকরায় বি জিহীতে মৃগায় ॥৪৮॥

নানান গোপন গুহা যে তাঁর গুপ্তধনে-ভরা,
হিরণ-মণি-আলোর-খনি—দিন না আমায় ধরা।
আলোকধনদাত্রী তিনি, আলোকরূপা স্বয়ং
ভালোবেসে উজাড় করে দিন আমাদের সে-ধন ॥৪৪॥

নানান ভাষা নানান ধরম মানুষ নানান-তর
পিথিমি তো পালেন সবায় যার যেখানে ঘর।
আমাকে দিন ঝরিয়ে দ্রাবিণ--হাজারঝোরা ঢল—
ঠায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী গাভীর মতন অচঞ্চল ॥৪৫॥

ও পৃথিবী, তোমার যে সাপ, আর মা বিছে, বাপ্ কি হুল—
শীতে কাবু গুটিসুটি নিরিবিলি লাগায় ঘুম—
আর যা আছেন পোকামাকড়, বর্ষা এলেই নড়নচড়ন
কিলবিলোনি। তাঁরা যেন সরসরিয়ে এদিকপানে আর না এগোন।
যা ভালো তাই দাও আমাদের সুখী করো ॥৪৬॥

যে-সব হাজার পথে তোমার লোক চলাচল করে,
রথ চলে যে রাস্তা দিয়ে, এবং শকট চলে,
দুষ্ট এবং শিষ্ট—দুয়ের যে-সব পথে আনাগোনা,
জিনব সে পথ, করব তাকে তস্করহীন, শত্রু-বিনা,
যা ভালো তাই দাও আমাদের সুখী করো ॥৪৭॥

মলিন যা, তা পালেন-পোষেন, তা-ও যা গরীয়ান্,
পাপীও মরে ভালোও মরে, সহ্য করে যান।
এই পৃথিবী বরাহ-সঙ্গিনী
আবার বুনো শুয়োর তার জন্যেও ফাঁক হয়ে যান তিনি ॥৪৮॥

যে তে-আরণ্যাঃ পশবো মৃগা বনে হিতাঃ
সিংহা ব্যাঘ্রাঃ পুরুষাদশ্ চরন্তি।
উলং বৃকং পৃথিবি দুচ্ছুনাম্ ইত
ঋক্ষীকাং রক্ষো অপ বাধয়া স্মত্ ॥৪৯॥

যে গন্ধর্বা অপ্সরসো
যে চা-রায়াঃ কিমীদিনঃ।
পিশাচান্-ত্ সর্বা রক্ষাংসি
তান্ অস্মদ্ ভূমে যাবয় ॥৫০॥

যাং দ্বিপাদঃ পক্ষিণঃ সংপতন্তি
হংসাঃ সুপর্ণাঃ শকুনা বয়াংসি।
যস্যাং বাতো মাতরিশ্বা-ঈয়তে
রজাংসি কৃণ্বংশ্-চ্যাবয়ংশ্-চ বৃক্ষান্।
বাতস্য প্রবাম্ উপবাম্ অনু বাতি-অর্চিঃ ॥৫১॥

যস্যাং কৃষ্ণম্ অরুণং চ সংহিতে
অহোরাত্রে বিহিতে ভূম্যাম্ অধি।
বর্ষেণ ভূমিঃ পৃথিবী বৃতা-বৃতা
সা নো দধাতু ভদ্রয়া
প্রিয়ে ধামনি-ধামনি ॥৫২॥

দ্যৌশ্ চ মে-ইদং পৃথিবী চ-
অন্তরিক্ষং চ মে ব্যচঃ।
অগ্নিঃ সূর্য আপো মেধাং
বিশ্বে দেবাশ্ চ সং দদুঃ ॥৫৩॥

বনে থাকে ঘোরে তোমার যে-সব বুনো পশুগুলো
মানুষ-খেকো সিংহ বাঘা দলে দলে নেকড়ে উলো,
বিঘ্ন-বিপদ্ ফাঁড়া-গেরো, ভূত পেঁচো প্রেত, জংলী বুনো
এখান থেকে দাও খেদিয়ে মোদের থেকে অনেক দূর—
ও পৃথিবী ॥৪৯॥

গন্ধর্ব-অপ্সরারা
হাড়-কেপ্পন, কিমীদীরা,
মাংসখেকো পিশাচ এবং রাক্ষসদের গুষ্টি যত—
তফাৎ রাখো সব্বাইকে মোদের থেকে, ও ভূমি গো ॥৫০॥

উড়ে উড়ে ফেরে তুপেয়ে পাখিরা যেথা ঝাঁকে ঝাঁক
কত রকমের— সোনালি ডানার চিল আর হাঁস
ধায় শন শন মাতরিশ্বন্ ধুলো আর ধুলো
উড়িয়ে-ছড়িয়ে, ঝাঁকিয়ে নড়িয়ে গাছপালাগুলো,
আর ঝড়তালে এলোমেলো হেলে দোলে অগ্নির শিখা ॥৫১॥

যে-ভূমির পরে ধরা-বাঁধা চলে
দিন আর রাত গাঁটছড়া-বাঁধা—কালো আর রাঙা,
যে ভূমি-পৃথিবী ছেয়ে বর্ষার ঘন ঘের টানা
ভালবেসে তিনি রাখুন মোদের প্রিয়ধামে প্রিয়ধামে ॥৫২॥

এই যে বিপুল বিরাট অসীমে ছড়ানো
এই যে অতল গভীর গভীরে তলানো
সব দেবতারা মিলে আমাকে এ দিলেন সম্প্রদান—
দ্যুলোক পৃথিবী অন্তরিক্ষ অগ্নি সূর্য প্রাণ ॥৫৩॥

অহম্ অস্মি সহমান
উত্তরো নাম ভূম্যাম্ ।
অভীষাড্ অস্মি বিশ্বাষাড্
আশাম্ আশাং বিষাসহিঃ ॥৫৪॥

অদো যদ্ দেবি প্রথমানা পুরস্তাদ্
দেবৈর্ উক্তা ব্য.সর্পো মহিত্বম্ ।
আ ত্বা সুভূতম্ অবিশত্ তদানীম্
অকল্পয়থাঃ প্রদিশশ্ চতস্রঃ ॥৫৫॥

যে গ্রামা যদ্ অরণ্যং
যাঃ সভা অধি ভূম্যাম্ ।
যে সংগ্রামাঃ সমিতয়স্
তেষু চারু বদেম তে ॥৫৬॥

অশ্ব ইব রজো দুধুবে বি তান্ জনান্
য আক্ষিয়ন্ পৃথিবীং যাদ্ অজায়ত ।
মন্দ্রা.গ্রেত্বরী ভুবনস্য গোপা
বনস্পতীনাং গৃভির্ ওষধীনাম্ ॥৫৭॥

যদ্ বদামি মধুমত্ তদ্ বদামি
যদ্ ঈক্ষে তদ্ বনন্তি মা ।
ত্বিষীমান্ অস্মি জূতিমান্
অবা.ন্যান্ হন্মি দোধতঃ ॥৫৮॥

এ ভূমিতে আমি সবার উপরে উঁচু, আরো উঁচু,
আমি অভিজিৎ, আমি জয়ন্ত,
নিঃশেষে জয় করি সব কিছু
জিতেছি প্রতিটি দিক্-দিগন্ত ॥৫৪॥

দেবতার হাঁকে ঐ
বিপুল বাড়লে, মহিমা ছড়ালে যখন আলোকময়ী,
তখনই তোমাতে আবিষ্ট হল কল্পনা অপরূপ
চারটি দিককে তখনই তো দিলে রূপ ॥৫৫॥

যত গ্রাম আছে যত অরণ্য
যত সভা আছে ভূমিতে
যত মানুষের মেলা ও সমিতি
তোর গুণ গাব সবেতে ॥৫৬॥

ঘোড়া ধুলো ঝাড়ে গা থেকে যেমন
ঝেড়েছেন কত জাতিকে তেমন
জন্মে' অবধি এই পৃথিবীতে ডেরা গেড়েছিল যারা।
রাখালিনী তিনি সব ভুবনের
আঁকড়ে সাপটে গাছপালাদের
এগিয়ে চলেন বিশ্বনায়িকা আনন্দে মাতোয়ারা ॥৫৭॥

যা দেখি তাই ভালো লাগে
যা বলি তাই মধুর বচন।
ভরছি তেজে ভরছি বেগে
প্রচণ্ডদের হানছি মরণ ॥৫৮॥

শন্তিবা স্বরভিঃ স্যোনা
কীলালোগ্নী পয়স্বতী ।
ভূমির্ অধি ব্রবীতু মে
পৃথিবী পয়সা সহ ॥৫৯॥

যাম্ অন্বৈ চ্ছদ্-হবিষা বিশ্বকর্মা-
অন্তর্ অর্ণবে রজসি প্রবিষ্টাম্ ।
ভুজিষ্যং পাত্রং নিহিতং গুহা যদ্
আবির্ ভোগে অভবত্-মাতৃমদ্ভ্যঃ ॥৬০॥

ত্বম্ অসি-আবপনী জনানাম্
অদিতিঃ কামদুঘা পপ্রথানা ।
যত্ তে-উনং তত্ তে-আ পূরযাতি
প্রজাপতিঃ প্রথমজা ঋতস্য ॥৬১॥

উপস্থাস্ তে অনমীবা-অযক্ষ্মা
অস্মভ্যং সন্তু পৃথিবি প্রসূতাঃ ।
দীর্ঘং ন আয়ুঃ প্রতিবুধ্যমানা
বয়ং তুভ্যং বলিহৃতঃ স্যাম ॥৬২॥

ভূমে মাতর্ নি ধেহি মা
ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্ ।
সংবিদানা দিবা কবে
শ্রিয়াং মা ধেহি ভূত্যাম ॥৬৩॥

শান্তিময়ী আনন্দিনী স্থগন্ধা
মধুস্তনী পয়স্বিনী
ভূমি আমার সঙ্গে হেসে
কথা বলুন—সঙ্গে দুধও ॥৫৯॥

রাজ্য সে এক ঢেউ-থৈ-থৈ সায়র-অতলে
তার ভেতরে ডুব দিয়ে মা ছিলি সে কোন্ জলে।
বিশ্বধাতা খুঁজল তোকে হব্য ঢেলে ঢেলে।
ভোগের থালি তুই গোপনে লুকিয়ে ছিলি
আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এলি
মায়ের ছেলে যারা তাদের ভোগ করাবি ব'লে ॥৬০॥

মানুষ ছড়াও ঝাড়-বাছ-নাও
তুমি কামধেনু তুমি মা অদিতি
বাড়ছ বাড়ছ বেড়েই চলেছ
তোমার যা কিছু হানি খুঁত ত্রুটি
পুরিয়ে দিন তা, দিয়ে চলেছেন
ঋতের প্রথম সুত প্রজাপতি ॥৬১॥

নিল হে পৃথিবী তোমার কোলে জন্ম যারা
দেখো যক্ষ্মা বা রোগ-বালাই যেন দেয় না তারা।
মোরা নিত্য র'ব জেগে (ও মা) দীর্ঘ জীবন
দেব নৈবেদ্য ব'য়ে তোমার পায় নিবেদন ॥৬২॥

ভালবেসে স্বর্গ-সখী
অটল গভীর ওগো কবি
ঠাঁই আমাকে সম্পদে আর
দাও, ও ভূমি মা গো। শ্রীতে আমায় রাখো ॥৬৩॥

৩

ঋগ্বেদ মণ্ডল ৫ সূক্ত ৮৪

ঋষি অত্রি ভৌম দেবতা পৃথিবী ছন্দঃ অনুষ্টুপ্

বট্-ইত্থা পর্বতানাং
খিদ্রং বিভর্ষি পৃথিবি।
প্র যা ভূমিং প্রবত্বতি
মহ্না জিনোষি মহিনি ॥১॥

স্তোমাসস্ ত্বা বিচারিণি
প্রতি ষ্টোভন্তি অক্তুভিঃ।
প্র যা বাজং ন হেষন্তং
পেরুম অস্যসি-অর্জুনি ॥২॥

দৃল্হা চিদ্ যা বনস্পতীন্
ক্ষ্মযা দর্ধর্ষি-ওজসা।
যত্ তে অভ্রস্য বিদ্যুতো
দিবো বর্ষন্তি বৃষ্টয়ঃ ॥৩॥

৩

ঋষি ভৌম অত্রির পৃথিবী-সূক্ত

বল ধর বটে সত্যি পৃথিবী—
ছিন্ন ভিন্ন মেঘ-পাহাড়!
নির্ঝরময়ী, বিপুল বীর্যে
ভূমিকে ভরছ প্রাণে, হে বিরাট্ ॥১॥

ওগো চঞ্চলা, তব স্তবগান
দিকে দিকে বাজে ঝলকে ঝলকে,
ছোটাও তড়িৎ-তুরঙ্গ একি
দুরন্ত বেগে, হে মহাশ্বেতা ॥২॥

দৃঢ় তবু ধর বনস্পতিকে
সবলে আঁকড়ে মাটির সঙ্গে,
দ্যুলোক অভ্র বিদ্যুৎ হতে
যখন তোমার বৃষ্টিরা ঝরে ॥৩॥

৪

ঋগ্বেদ মণ্ডল ১ সূক্ত ১৮৫

ঋষি অগস্ত্য মৈত্রাবরুণি দেবতা দ্যাবাপৃথিবী ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্

কতরা পূর্বা কতরা.পরা.য়োঃ
কথা জাতে কবয়ঃ কো বি বেদ।
বিশ্বং ত্মনা বিভৃতো যদ্-হ নাম
বি বর্তেতে অহনী চক্রিয়ে.ব ॥১॥

ভূরি দ্বে অচরন্তী চরন্তং
পদ্বন্তং গর্ভম্ অপদী দধাতে।
নিত্যং ন সূনুং পিত্রোর্ উপস্থে
দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাত্ ॥২॥

অনেহো দাত্রম্ অদিতের্ অনর্বং
হুবে স্বর্বদ্ অবধং নমস্বত্।
তদ্ রোদসী জনয়তং জরিত্রে
দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাত্ ॥৩॥

অতপ্যমানে অবসা অবন্তী
অনু ষ্যাম রোদসী দেবপুত্রে।
উভে দেবানাম্ উভয়েভির্ অহ্নাং
দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাত্ ॥৪॥

সংগচ্ছমানে যুবতী সমন্তে
স্বসারা জামী পিত্রোর্ উপস্থে।
অভিজিঘ্রন্তী ভুবনস্য নাভিং
দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাত্ ॥৫॥

৪

ঋষি অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির দ্যাবাপৃথিবী-সূক্ত

কোনটি যে আগে, কোনটি যে পরে, এই দুজনের মধ্যে,
জন্মাল এরা কি করে, কবিরা, তোমরা কেউ কি জান ?
নিজেকে দিয়েই ধরে আছে সব যেখানে যা কিছু আছে
গড়িয়ে চলেছে সারা দিনরাত যুগল চক্র যেন ॥১॥

চল না, দুজনে তবু ধরে আছ কত-না চলন্তকে,
পা নেই তবুও গর্ভে ধারণ করছ পা-ওলাদেরও।
তোমরা মা-বাবা তোমাদের কোলে আমরা যে চির-শিশু,
হে দ্যাবাপৃথিবী মহাভয় হতে মোদের রক্ষা করো ॥২॥

অদিতির দান অক্ষয় ধন চাই
জ্যোতি নিয়ে গড়া, নতি দিয়ে ভরা, অবাধ, মৃত্যু নাই—
স্তোতার জন্যে রোদসী সৃষ্টি করো
হে দ্যাবাপৃথিবী মহাভয় হতে মোদের রক্ষা করো ॥৩॥

ক্লান্তিবিহীন রক্ষা করছ হে রোদসী দয়া দিয়ে
দেবতারা তোমাদের ছেলেমেয়ে, অনুগত আমরাও
হব। দিনে রাতে সব দেবতার মধ্যে তোমরা দোঁহে
হে দ্যাবাপৃথিবী, মহাভয় হতে মোদের রক্ষা করো ॥৪॥

তরুণবয়সী দুটি মেশামেশি সীমানা পরস্পর
মিলেছ আপন দুটি ভাইবোন কোলটিতে মা-বাবার,
ভুবনের নাভি আদরে ঘ্রাণ কর—
হে দ্যাবাপৃথিবী মহাভয় হতে মোদের রক্ষা করো ॥৫॥

উর্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন
হুবে দেবানাম্ অবসা জনিত্রী।
দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে
দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাত ॥৬॥

উর্বী পৃথ্বী বহুলে দূরে-অন্তে
উপ ব্রুবে নমসা যজ্ঞে অস্মিন্।
দধাতে যে সুভগে সুপ্রতূর্তী
দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাত্ ॥৭॥

দেবান্ বা যত্-চকৃমা কত্-চিদ্ আগঃ
সখায়ং বা সদম্ ইত্-জাস্পতিং বা।
ইয়ং ধীর্ভূয়া অবযানম্ এষাং
দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাত্ ॥৮॥

উভা শংসা নর্যা মাম্ অবিষ্টাং
উভে মাম্ ঊতী অবসা সচেতাম্।
ভূরি চিদ্ অর্যঃ সুদাস্তরায়-
ইষা মদন্ত ইষয়েম দেবাঃ ॥৯॥

ঋতং দিবে তদ্ অবোচং পৃথিব্যৈ-
অভিশ্রাবায় প্রথমং সুমেধাঃ।
পাতাম্ অবদ্যাদ্ দুরিতাদ্ অভীকে
পিতা মাতা চ রক্ষতাম্ অবোভিঃ ॥১০॥

বিপুল-বিথার তোমরা আধার ঋতে প্রবর্ধমান
সত্যমন্ত্রে দেবতার দয়া চেয়ে করি আহ্বান।
অমৃতধারিণী জনক-জননী, অপরূপ রূপ ধর—
হে দ্যাবাপৃথিবী মহাভয় হতে মোদের রক্ষা করো ॥৬॥

বিরাট বিপুল বহু বিচিত্র, সীমানা কোথায় দূরে,
তোমাদের স্তব গাই এ যজ্ঞে নম্র নমস্কারে।
জগদ্ধাত্রী, সুভগা, সমর অনায়াসে জয় কর—
হে দ্যাবাপৃথিবী মহাভয় হতে মোদের রক্ষা করো ॥৭॥

দেবতার কাছে করেছি যা কিছু ভুল-ত্রুটি-অপরাধ,
বন্ধু, বা যিনি গৃহপতি তাঁরও কাছে কত শতবার,
দিক ধুয়ে সব এই সংস্তব—প্রার্থনাখানি ধরো
হে দ্যাবাপৃথিবী মহাভয় হতে মোদের রক্ষা করো ॥৮॥

মানুষকে ভালবাস, ভাল চাও, রক্ষা করো এ-দীনে
দয়া দিয়ে দোঁহে জড়াও মোরে হে দয়াময়-দয়াময়ী।
কৃপণকে আহা ঢেলে দেন যিনি, চেয়ে সেই অকৃপণে
ওগো দেবতারা, মেতেছি আমরা, আরো চাই, আরো চাই ॥৯॥

যে আছ যেখানে শোনো হে আকাশ-পৃথিবীর উদ্দেশে
সুমেধা আমার অ-পূর্ব এই সত্যমন্ত্রবাণী।
হে পিতঃ হে মাতঃ, 'কুটিল কুপথ ধরিয়া' না যাই দেখো
নির্মল করো, কাছে এসো, দয়া তব দয়া দিয়ে রাখো ॥১০॥

ইদং দ্যাবাপৃথিবী সত্যম্ অস্তু
পিতর্ মাতর্ যদ্ ইহো.পব্রুবে বাম্।
ভূতং দেবানাম্ অবমে অবোভির্
বিদ্যামে.ষং বৃজনং জীরদানুম্ ॥১১॥

হে মাতা পৃথিবী শোনো হে পিতা দ্যুলোক
তোমাদের কাছে মম নিবেদন-এ পূর্ণ হোক হে হোক
সব দেবতার নিচে নেমে এসো কাছাকাছি, দয়াময়,
পাই তীব্র এষণা, বিপুল বীর্য, অকৃপণ দেবতায় ॥১১॥

৫

ঋগ্বেদ মণ্ডল ৫ সূক্ত ৮৩

ঋষি অত্রি ভৌম দেবতা পর্জন্য ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্
জগতী
অনুষ্টুপ

কনিক্রদদ্ বৃষভো জীরদানু
রেতো দধাত্‌-ওষধীষু গর্ভম্ ॥১॥ শেষার্ধ।

বি বৃক্ষান্ হন্তি-উত হন্তি রক্ষসো
বিশ্বং বিভায় ভুবনং মহাবধাত্ ॥২॥ প্রথমার্ধ।

দূরাত্ সিংহস্য স্তনথা উদ্ ঈরতে
যত্ পর্জন্যঃ কৃণুতে বর্ষ্যং নভঃ ॥৩॥ শেষার্ধ।

প্র বাতা বান্তি পতয়ন্তি বিদ্যুত
উদ্ ওষধীর্ জিহতে পিন্বতে স্বঃ ॥৪॥ প্রথমার্ধ।

মহান্তং কোশম্ উদ্ অচা নি ষিঞ্চ
স্যন্দন্তাং কুল্যা বিষিতাঃ পুরস্তাত্।
ঘৃতেন দ্যাবাপৃথিবী বি-উন্ধি
সুপ্রপাণং ভবতু অঘ্ন্যাভ্যঃ ॥৮॥

যত্ পর্জন্য কনিক্রদত্
স্তনয়ন্ হংসি দুষ্কৃতঃ।
প্রতী.দং বিশ্বং মোদতে
যত্ কিং চ পৃথিব্যাম্ অধি ॥৯॥

৫

ঋষি ভৌম অত্রির পর্জন্য সূক্ত

গর্জায় পর্জন্য-বৃষভ ক্ষিপ্র-দান,
রেতোবর্ষণে ওষধিতে করে গর্ভাধান ॥১॥ শেষার্ধ।

আঘাতে আঘাতে ভাঙছে বৃক্ষ, রক্ষ মারছে,
সর্বনাশার ভয়ে সমস্ত সৃষ্টি কাঁপছে ॥২॥ প্রথমার্ধ।

দূরে বেজে ওঠে সিংহের গুরু গুরু গর্জন,
বর্ষার মেঘে নভ ছায় পর্জন্য যখন ॥৩॥ শেষার্ধ।

বেগে হাওয়া বয়, দিকে দিকে দিকে বিদ্যুৎ ছোটে,
চল্‌কায় ভরা আকাশ, গজিয়ে ওষধিরা ওঠে ॥৪॥ প্রথমার্ধ

মহাজলাধার তুলে ধরো, ঢালো ঢালো নিচে,
মুক্তধারার ঝরণা ধাওয়াও দিকে দিকে।
দ্যুলোক ভূলোক জলে জলে করো জলময়,
পিপাসার জল যেন অফুরান গাভীরা পায় ॥৮॥

মুহু-হুঙ্কারে বজ্রের ঘোর রবে যখন
দুষ্টগুলোকে, হে পর্জন্য, হান তখন
হর্ষে মাতে এ বিশ্ব নিখিল চারি ভিতে
মাতোয়ারা হয় যা কিছু আছে এ পৃথিবীতে ॥৯॥

৬

অথর্ববেদ কাণ্ড ৪ সূক্ত ১৫

ঋষি অথর্বা দেবতা বৃষ্টি ছন্দঃ বিবিধ

সম্ উত্ পতন্তু প্রদিশো নভস্বতীঃ
সম্ অভ্রাণি বাতজূতানি যন্তু।
মহ-ঋষভস্য নদতো নভস্বতো
বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তর্পয়ন্তু ॥১॥

সম্ ঈক্ষয়ন্তু তবিষাঃ সুদানবো
অপাং রসা ওষধীভিঃ সচন্তাম্।
বর্ষস্য সর্গা মহয়ন্তু ভূমিং
পৃথগ্ জায়ন্তাম্ ওষধয়ো বিশ্বরূপাঃ ॥২॥

সম্ ঈক্ষয়স্ব গায়তো নভাংসি-
অপাং বেগাসঃ পৃথগ্ উদ্ বিজন্তাম্।
বর্ষস্য সর্গা মহয়ন্তু ভূমিং
পৃথগ্ জায়ন্তাং বীরুধো বিশ্বরূপাঃ ॥৩॥

গণাস্ ত্বা-উপ গায়ন্তু মারুতাঃ
পর্জন্য ঘোষিণঃ পৃথক্।
সর্গা বর্ষস্য বর্ষতো
বর্ষন্তু পৃথিবীম্ অনু ॥৪॥

উদ্ ঈরয়ত মরুতঃ সমুদ্রতস্
ত্বেষো অর্কো নভ উত্ পাতয়াথ।
মহ-ঋষভস্য নদতো নভস্বতো
বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তর্পয়ন্তু ॥৫॥

৬

ঋষি অথর্বার বৃষ্টি-সূক্ত

দিক্ দিগন্ত ভরেছে ভিজে হাওয়ায়,
উড়ুক তবে উড়ুক।
মেঘে মেঘে ঠেলা দিয়েছে বিষম বায়ু,
বাঁধুক জোট বাঁধুক।
দেয়া গরজায়—বিপুল বৃষভ,
জলধারা-ধেনু করে কলরব,
জুড়োক পৃথিবী জুড়োক ॥১॥

দেখা দিক দেখা দিক মরুতেরা মহাবল অকৃপণ,
গাছপালাদের সঙ্গে মিশুক নব জলরসায়ন।
ভূমিকে ভরুক মহা-আনন্দে বর্ষার বারিধারা,
এখানে ওখানে বিচিত্ররূপা জন্মাক ওষধিরা ॥২॥

জমেছে মেঘের পরে মেঘ দেখি দেখাও, গান উঠুক,
এখানে ওখানে জলরাশি ছোটে বিষম তোড়ে ছুটুক।
ভূমিকে ভরুক মহা-আনন্দে বর্ষার বারিধারা,
এখানে ওখানে বিচিত্ররূপা জন্মাক ব্রততীরা ॥৩॥

হে পর্জন্য, সপ্ত মরুদ্গণ
গুরু গরজনে একে একে সুরু করুক তোমার গান।
বর্ষণ-ঢালা বর্ষার ধারাপাত
পৃথিবীর 'পরে ঝরুক ঝরুক ঝরুক অবিশ্রাম ॥৪॥

সমুদ্রলীনা তোলো জলকণা, ওড়াও নভ-সমান,
ওগো মরুতেরা, একি প্রদীপ্ত প্রজ্বলন্ত গান!
দেয়া গরজায়—বিপুল বৃষভ,
জলধারা-ধেনু করে কলরব,
জুড়োক পৃথিবী জুড়োক ॥৫॥

অভি ক্রন্দ স্তনয়-অর্দয়ো.দধিং
ভূমিং পর্জন্য পয়সা সম্ অঙ্‌গ্ধি।
ত্বয়া সৃষ্টং বহুলম্ ঐ.তু বর্ষম্
আশারৈষী কৃশগুর্ এতু-অস্তম্ ॥৬॥

সং বোহবন্তু সুদানব
উত্‌সা অজগরা উত।
মরুদ্‌ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘা
বর্ষন্তু পৃথিবীম্ অনু ॥৭॥

আশাম্ আশাং বি দ্যোততাং
বাতা বান্তু দিশো দিশঃ।
মরুদ্‌ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘাঃ
সং যন্তু পৃথিবীম্ অনু ॥৮॥

আপো বিদ্যুদ্ অভ্রং বর্ষং
সং বোহবন্তু সুদানব
উত্‌সা অজগরা উত।
মরুদ্‌ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘাঃ
প্রা.বন্তু পৃথিবীম্ অনু ॥৯॥

ফুকারো গর্জ হে পর্জন্য বজ্রগভীর স্বনে,
করো হে ক্ষুব্ধ
মহাসমুদ্র,
লেপে দাও মাটি নিবিড় জলাঞ্জনে।
মহাবরষার বিপুল আসার আনো, ঘনাক।
ক্ষীণালোক শরণার্থী সূর্য অস্ত যাক ॥৬॥

বাঁচো গো সকলে, এসেছে সদলে অকৃপণ মরুতেরা,
অজগর হল নির্ঝরিণীর দল।
মরুদ্‌গণের ছোটানো মেঘেরা
পৃথিবীর 'পরে বর্ষাবে ধারাজল ॥৭॥

দিকে দিগন্তে বিদ্যুৎ চমকাক
দিকে দিকে বায়ু বয়ে যাক এলোমেলো।
মরুদ্‌গণের ছোটানো মেঘের ঝাঁক
পৃথিবীর 'পরে এলো ঐ নেমে এলো ॥৮॥

জল বিদ্যুৎ মেঘ বারিধারা,
দুই হাত ভরে ঢেলে দেয় যারা,
বাঁচাক সবায়, আর অজগর-নির্ঝরিণীর দল।
মরুদ্‌গণের ছোটানো মেঘেরা
ঢালুক প্রসাদ পৃথিবীর 'পরে ঢেলে দিক অবিরল ॥৯॥

অপাম্ অগ্নিস্ তনূভিঃ সংবিদানো
য ওষধীনাম্ অধিপা বভূব।
স নো বর্ষং বনুতাং জাতবেদাঃ
প্রাণং প্রজাভ্যো অমৃতং দিবস্পরি ॥১০॥

প্রজাপতিঃ সলিলাদ্ আ সমুদ্রাদ্
আপ ঈরয়ন্-ন্-উদধিম্ অর্দয়াতি।
প্র প্যায়তাং বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতো
অর্বাঙ্ এতেন স্তনয়িত্নুনে.হি ॥১১॥

অপো নিষিঞ্চন্-ন্-অসুরঃ পিতা নঃ
শ্বসন্তু গর্গরা অপাং
বরুণ- অব নীচীর্ অপঃ সৃজ।
বদন্তু পৃশ্নিবাহবো
মণ্ডূকা ইরিণা-অনু ॥১২॥

সংবত্সরং শশয়ানা
ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ।
বাচং পর্জন্যজিন্বিতাং
প্র মণ্ডূকা অবাদিষুঃ ॥১৩॥

অগ্নি, ওষধিরাজ হলে জল-
তনুতে মিলিয়ে তান।
আমাদের, সন্তানদের তরে
আনো জাতবেদা আনো জয় ক'রে
আলোকদীপ্ত স্বর্লোক হতে
বৃষ্টি অমৃত প্রাণ ॥১০॥

থৈ-থৈ-জল সমুদ্র হতে
তুলে তুলে জল, ওগো প্রজাপতি,
মহাসমুদ্র করো তোলপাড়,
বীর্য বাড়াও মেঘের ঘোড়ার।
গুরু গুরু দেয়া গরজে সঘনে
তারি সনে নেমে এস এইখানে ॥১১॥

বরুণ অসুর পিতা আমাদের,
ঢেলেই চলেছ, ঢেলে চলো জল -
গর গর গর ফুঁসুক ফুলুক।
জলধারাদের পাশে বসে বসে
বিচিত্রবাহু ব্যাঙেরা ডাকুক ॥১২॥

তপস্বী যেন ব্রাহ্মণ—সারা
বচ্ছর ছিল শুকিয়ে ব্যাঙেরা।
পর্জন্যকে খুশী-করা ডাক
এখন সমস্বরে ডাকে তারা ॥১৩॥

উপ প্র বদ মণ্ডূকি
বর্ষম্ আ বদ তাদুরি।
মধ্যে হ্রদস্য প্লবস্ব
বিগৃহ্য চতুরঃ পদঃ ॥১৪॥

খণ্বখা-আ-আ-ই খৈমখা-আ-আ-ই
মধ্যে তদুরি।
বর্ষং বনুধ্বং পিতরো
মরুতাং মন ইচ্ছত ॥১৫।

মহান্তং কোশম্ উদ্ অচা ভি ষিঞ্চ
সবিদ্যুতং ভবতু বাতু বাতঃ।
তন্বতাং যজ্ঞং বহুধা বিসৃষ্টা
আনন্দিনীর্ ওষধয়ো ভবন্তু ॥১৬॥

— —

ডাকো মণ্ডূকী তুমিও সঙ্গে,
ডেকে ডেকে ডেকে নামাও বর্ষা।
দাদুরী, সাঁতার দাও লাফে লাফে
হ্রদের মধ্যে চিতিয়ে চার পা ॥১৪॥

ওগো খণ্বখা-আ-আ, ওগো খৈমখা-আ-আ,
মধ্যে দাদুরী, শোনো গো পালিকা,
শোনো—
মরুদ্‌গণের মন বশ করে
বর্ষাকে জিনে আনো ॥১৫॥

মহাজলাধার তুলে ধরো, অভি-
ষিক্ত করো এ ধরা।
জ্বলুক বিজুরী, বয়ে যাক বায়ু,
যজ্ঞের আয়োজন হোক সুরু
চারিদিকে মেঘ-ভাঙা জলে জলে—
খুশী হোক ওষধিরা ॥১৬॥

——

৭

ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সূক্ত ১৬৮

ঋষি অনিল বাতায়ন দেবতা বাত ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ

বাতস্য নু মহিমানং রথস্য
রুজন্-ন্-এতি স্তনয়ন্-ন্-অস্য ঘোষঃ।
দিবিস্পৃগ্ ভাতি-অরুণানি কৃণ্বন্-ন্-
উতো এতি পৃথিব্যা রেণুম্ অস্যন্ ॥১॥

সং প্রে.রতে অনু বাতস্য বিষ্ঠা
ঐ.নং গচ্ছন্তি সমনং ন যোষাঃ।
তাভিঃ সযুক্ সরথং দেব ঈয়তে-
অস্য বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা ॥২॥

অন্তরিক্ষে পথিভির্ ঈয়মানো
ন নি বিশতে কতমত্-চনা.হঃ।
অপাং সখা প্রথমজা ঋতাবা
ক স্বিদ্-জাতঃ কুত আ বভূব ॥৩॥

আত্মা দেবানাং ভুবনস্য গর্ভো
যথাবশং চরতি দেব এষ।
ঘোষা ইদ্ অস্য শৃণ্বিরে ন রূপং
তস্মৈ বাতায় হবিষা বিধেম ॥৪॥

———

৭

ঋষি অনিল বাতায়নের বাত-সূক্ত

ঐ আসে রথ—ঝড় মহাঝড়,
ভাঙছে ভাঙল মড় মড় মড়,
আকাশ ছুঁয়েছে, সব লালে লাল—
পৃথিবীর ধুলো উড়িয়ে আসছে ॥১॥

স্থাবর ঘুরছে সঙ্গে সঙ্গে
অভিসারে ধায় দিক দিগন্ত।
রথে নিয়ে সব চলেছে বন্ধু
জ্যোতির্ময়—এ নিখিলের রাজা ॥২॥

অন্তরিক্ষ পথে পথে ঘোর'
বিশ্রাম নেই একটি দিনেরও।
আদি ঋতবান্ সলিলের সখা
কোথা জন্মালে ? ভুবন ভরলে ? ॥৩॥

দেবতা-আত্মা, ভুবন-গর্ভ,
যেমন ইচ্ছে, দেবতা, ধাও।
ধ্বনি শুনি শুধু, চক্ষে দেখি না,
হে ঝড়, হে বায়ু, আহুতি নাও ॥৪॥

৮

ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সুক্ত ১৪৬

ঋষি দেবমুনি ঐরম্মদ | দেবতা অরণ্যানী | ছন্দঃ অনুষ্টুপ

অরণ্যানি-অরণ্যানি
অসৌ যা প্রে.ব নশ্যসি।
কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি
ন ত্বা ভীর্ ইব বিন্দতি-ঈ-ঈ ॥১॥

বৃষারবায় বদতে
যদ্ উপাবতি চিচ্চিকঃ।
আঘাটিভির্ ইব ধাবয়ন্-ন্-
অরণ্যানির্ মহীয়তে ॥২॥

উত গাব ইবা.দন্তি
উত বেশ্মে.ব দৃশ্যতে।
উতো অরণ্যানিঃ সায়ং
শকটীর্ ইব সর্জতি ॥৩॥

গাম্ অঙ্গৈ.ষ আ হ্বয়তি
দার্ব.ঙ্গৈষো অপা.বধীত্।
বসন্-ন্- অরণ্যান্যাং সায়ম্
অক্রুক্ষদ্ ইতি মন্যতে ॥৪॥

৮

ঋষি ঐরম্মদ দেবমুনির অরণ্যানী-সূক্ত

অরণ্যানী, অরণ্যানী
হারিয়ে কোথায় যাও, কি জানি !
গ্রাম কোথা, কই, জিগ্যেসও নেই—
আচ্ছা তোমার ভয় করে না ?
ভয় করে না ? ॥১॥

ঝিল্লি ডাকে, সঙ্গে সঙত্
করছে পোকা চিক চিক চিক,
ধাওয়ায় বীণার ঘাটে ঘাটে
অরণ্যানী স্বর যেন ঠিক—
কি মহিমা। ॥২॥

চরছে গোরুর পাল কি ? বুঝি
ঐ দেখা যায় একটা বাড়ি।
সন্ধে হলেই অরণ্যানী
একের পর এক গোরুর গাড়ি
উগরে চলে ॥৩॥

ঐ শোনো কে ডাকছে যেন
তার গোরুকে। কাটল কে কাঠ ?
সাঁঝের বেলা থাকবে বনে
যে, সে মনে করবে, হঠাৎ
কে চেঁচালে ? ॥৪॥

ন বৈ- অরণ্যানির্ হন্তি
অন্যশ্ চেত্-না.ভিগচ্ছতি।
স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধ্বায়
যথাকামং নি পদ্যতে ॥৫॥

আঞ্জনগন্ধিং সুরভিং
বহ্বন্নাম্ অকৃষীবলাম্।
প্রা.হং মৃগাণাং মাতরম্
অরণ্যানিম্ অশংসিষম্ ॥৬॥

——

অরণ্যানী মারেন না তো
অন্যে যদি না হয় চড়াও।
সুস্বাদু ফল খেয়ে-দেয়ে
যেমন খুশি গা ঢেলে দাও ॥৫॥

অঞ্জন-সুগন্ধে ম' ম'
নেই চাষী তাও কতরকম
অন্নে-ভরা, বন্যপ্রাণীর
মা যিনি, সেই অরণ্যানীর
এই করেছি স্তুতিরচন ॥৬॥

——

৯

অথর্ববেদ কাণ্ড ১১ সূক্ত ৪

ঋষি ভার্গব বৈদভি দেবতা প্রাণ ছন্দঃ অনুষ্টুপ্ ইত্যাদি

প্রাণায় নমো
যস্য সর্বম্ ইদং বশে।
যো ভূতঃ সর্বস্যে.শ্বরো
যস্মিন্-ত্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১॥

নমস্ তে প্রাণ ক্রন্দায়
নমস্ তে স্তনয়িত্নবে।
নমস্ তে প্রাণ বিদ্যুতে
নমস্ তে প্রাণ বর্ষতে ॥২॥

যত্ প্রাণ স্তনয়িত্নুনা-
অভিক্রন্দতি-ওষধীঃ।
প্র বীয়ন্তে গর্ভান্ দধতে
অথো বহ্বীর্ বি জায়ন্তে ॥৩॥

যত্ প্রাণ ঋতৌ-আগতে-
অভিক্রন্দতি-ওষধীঃ।
সর্বং তদা প্রমোদতে
যত্ কিং চ ভূম্যাম্ অধি ॥৪॥

যদা প্রাণো অভ্য.বর্ষীদ্
বর্ষেণ পৃথিবীং মহীম্।
পশবস্ তত্ প্র মোদন্তে
মহো বৈ নো ভবিষ্যতি ॥৫॥

৯

ঋষি বৈদর্ভি ভার্গবের প্রাণ-সূক্ত

এই সব কিছু বশে যার, সেই
প্রাণকে নমস্কার।
সবার মালিক হয়ে বসে আছে,
সবার সেই আধার ॥১॥

গুরু গুরু গর্জন, হে প্রাণ, তোমাকে নম
মন্ত্রিত বজ্র, তোমাকে নমঃ।
তোমাকে নমস্কার, হে প্রাণ, হে বিদ্যুৎ,
বিতরিত-বর্ষণ, হে প্রাণ নমঃ ॥২॥

গাছপালাদের বজ্ররবে
প্রাণ যখন ডাকে
অমনি তারা নিষিক্ত হয়, গর্ভ ধরে,
গজায় ঝাঁকে ঝাঁকে ॥৩॥

ঋতু এলে গাছপালাদের
প্রাণ যখন ডাকে
এই মাটিতে যা আছে সব
আনন্দে মাতে ॥৪॥

বর্ষার বর্ষণ ঝরায় যখন প্রাণ
বিশাল এ পৃথিবীর উপরে,
কি মাতন কি মাতনে মেতে ওঠে পশুরা—
আমাদের জোর হবে এবারে ॥৫॥

অভিবৃষ্টা ওষধয়ঃ
প্রাণেন সম্ অবাদিরন্।
আয়ুর্ বৈ নঃ প্রা তীতরঃ
সর্বা নঃ সুরভীর্ অকঃ ॥৬॥

নমস্ তে অস্তু-আয়তে
নমো অস্তু পরায়তে।
নমস্ তে প্রাণ তিষ্ঠতে
আসীনায়ো.ত তে নমঃ ॥৭॥

নমস্ তে প্রাণ প্রাণতে
নমো অস্তু-অপানতে।
পরাচীনায় তে নমঃ
প্রতচীনায় তে নমঃ
সর্বস্মৈ তে-ইদং নমঃ ॥৮॥

যা তে প্রাণ প্রিয়া তনূর্
যা তে প্রাণ প্রেয়সী।
অথো যদ্ ভেষজং তব
তস্য নো ধেহি জীবসে ॥৯॥

প্রাণঃ প্রজা অনু বস্তে
পিতা পুত্রম্ ইব প্রিয়ম্।
প্রাণো হ সর্বস্যে.শ্বরো
যত্-চ প্রাণতি যত্-চ ন ॥১০॥

প্রাণ-ঝরানো বৃষ্টি-নেয়ে গাছপালারা
বলছে সবাই সমস্বরে, আঃ বাঁচালে,
পেরিয়ে বাধা এগিয়ে দিলে মোদের আয়ু
ভরলে মোদের সবকটিকে কি সৌরভে ॥৬॥

কাছে যখন আস তখন তোমায় নমস্কার
নমঃ তোমায় যখন দূরে যাও
দাঁড়িয়ে থাক যখন, হে প্রাণ, তখন তোমায় নম,
নমঃ তোমায় যখন আসন নাও ॥৭॥

হে প্রাণ নমস্কার, নাও যবে নিঃশ্বাস
তোমাকে নমস্কার, ছাড় যবে নিঃশ্বাস
যখন ফেরাও মুখ, তোমাকে নমস্কার
যখন মুখ ফেরাও, তোমাকে নমস্কার
নমি হে তোমার সবখানিকে ॥৮॥

যে-তনু তোমার প্রিয় ওগো প্রাণ
প্রিয়তরা যে-তনুটি
দাও তা হে প্রাণ দাও যা ভেষজ
আমরা যাতে বাঁচি ॥৯॥

পিতা যেমন তার আদরের পুতকে ঢাকে
তেমনি করে বসন হয়ে জড়িয়ে থাকে
সব প্রাণীকে প্রাণ।
নিঃশ্বাস যে নেয়, যে না-নেয়
সবার মালিক প্রাণ ॥১০॥

প্রাণো মৃত্যুঃ প্রাণস্ তক্মা
প্রাণং দেবা উপা.সতে।
প্রাণো হ সত্যবাদিনম্
উত্তমে লোকে-আ দধত ॥১১॥

প্রাণো বিরাট্ প্রাণো দেষ্ট্রী
প্রাণং সর্বে-উপা.সতে।
প্রাণো হ সূর্যশ্ চন্দ্রমাঃ
প্রাণম্ আহুঃ প্রজাপতিম্ ॥১২॥

প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ
অনড্বান্ প্রাণ উচ্যতে।
যবে হ প্রাণ আহিতো
অপানো ব্রীহির্ উচ্যতে ॥১৩॥

অপা.নতি প্রা.ণতি
পুরুষো গর্ভে-অন্তরা।
যদা ত্বং প্রাণ জিন্বসি
অথ স জায়তে পুনঃ ॥১৪॥

প্রাণম্ আহুর্ মাতরিশ্বানং
বাতো হ প্রাণ উচ্যতে।
প্রাণে হ ভূতং চ ভব্যং চ
প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥

প্রাণই মৃত্যু, প্রাণই তক্মা
উপাসনা করে দেবেরা প্রাণ।
সবার উপরে যে-লোক সেখানে
সত্যবাদীকে বসায় প্রাণ ॥১১॥

প্রাণ সে বিরাট, প্রাণ সে দেষ্ট্রী,
উপাসনা করে প্রাণকে সকলে।
প্রাণই সূর্য প্রাণ চন্দ্রমা
প্রাণকে সকলে প্রজাপতি বলে ॥১২॥

প্রাণ ও অপান
যব আর ধান
ষাঁড়কেও বলে প্রাণ।
যবের ভিতরে
প্রাণ আছে ভ'রে
ধানকে বলে অপান ॥১৩॥

গর্ভের মধ্যে পুরুষ
নিঃশ্বাস ছাড়ে আর নেয়।
যখন ঠেল' হে তুমি প্রাণ
তখন সে ফের জন্মায় ॥১৪॥

প্রাণকে বলেছে মাতরিশ্বন্
প্রাণকে বলেছে বায়ু।
যা হবে হয়েছে
প্রাণেই তা আছে
প্রাণে আছে সব কিছু ॥১৫

আথর্বণীর্ আঙ্গিরসীর্
দৈবীর্ মনুষ্যজা উত।
ওষধয়ঃ প্র জায়ন্তে
যদা ত্বং প্রাণ জিন্বসি ॥১৬॥

যদা প্রাণো অভ্য.বর্ষীদ্
বর্ষেণ পৃথিবীং মহীম্।
ওষধয়ঃ প্র জায়ন্তে
অথো যাঃ কাশ্ চ বীরুধঃ ॥১৭॥

যস্ তে প্রাণ-ইদং বেদ
যস্মিং-শ্-চা.সি প্রতিষ্ঠিতঃ।
সর্বং তস্মৈ ৰলিং হরান্
অমুষ্মিঁল্-লোকে-উত্তমে ॥১৮॥

যথা প্রাণ ৰলিহৃতস্
তুভ্যং সর্বাঃ প্রজা ইমাঃ।
এবা তস্মৈ ৰলিং হরান্
যস্ ত্বা শৃণবত্ সুশ্রবঃ ॥১৯॥

অন্তর্গর্ভশ্ চরতি দেবতাসু-
আভূতো ভূতঃ স উ জায়তে পুনঃ।
স ভূতো ভব্যং ভবিষ্যত্
পিতা পুত্রং প্র বিবেশা শচীভিঃ ॥২০॥

আথর্বণী আঙ্গিরসী
দৈবী যত আর মানুষী
গাছ-গাছড়ারা—
ঠেল' তুমি হে প্রাণ যখন,
গজিয়ে ওঠে তারা ॥১৬॥

বর্ষার বর্ষণ ঝরায় যখন প্রাণ
বিশাল এ পৃথিবীর উপরে,
তখন গজিয়ে ওঠে যত গাছ-গাছড়া
যত আছে লতা ওঠে লতিয়ে ॥১৭॥

তোমার এটুকু প্রাণ জেনেছে যে, জেনেছে
কিসের ওপরে তুমি দাঁড়িয়ে,
সকলে খাজনা এনে দেবে তাকে ঐ লোকে
রয়েছে যা সবচেয়ে উঁচুতে ॥১৮॥

তোমাকে খাজনা দেয় এই সব প্রাণীরা
হে প্রাণ যেমন,
তোমাকে যে-সুশ্রবা শুনেছে তাকেও দেবে
খাজনা তেমন ॥১৯॥

গর্ভ নিয়ে দেবতাদের মধ্যে বেড়ায় ঘুরে,
চারদিকে সব হয়ে থেকেও জন্ম সে নেয় ফিরে।
হয়েছে, হবে, হচ্ছে যা, সব সে,
শক্তি যত নিয়ে ঢোকে পিতা-সে পুত্রে ॥২০॥

একং পাদং নো.ত্খিদতি
সলিলাদ্-হংস উচ্চরন্।
যদ্ অঙ্গ স তম্ উত্খিদেত্-
ন-এব-অদ্য ন শ্বঃ স্যাত্-
ন রাত্রী ন-অহঃ স্যাত্-
ন বি-উচ্ছেত্ কদা চন ॥২১॥

অষ্টাচক্রং বর্ততে একনেমি
সহস্রাক্ষরং প্র পুরো নি পশ্চা।
অর্ধেন বিশ্বং ভুবনং জজান
যদ্ অস্য-অর্ধং কতমঃ স কেতুঃ ॥২২॥

যো অস্য বিশ্বজন্মন
ঈশে বিশ্বস্য চেষ্টতঃ।
অন্যেষু ক্ষিপ্রধন্বনে
তস্মৈ প্রাণ নমোঽস্তু তে ॥২৩॥

যো অস্য সর্বজন্মন
ঈশে সর্বস্য চেষ্টতঃ।
অতন্দ্রো ব্রহ্মণা ধীরঃ
প্রাণো মা-অনু তিষ্ঠতু ॥২৪॥

হাঁস সে। যখন ওড়ে
একটি পা জল থেকে তোলে না।
তুলত যদি সে পা-টা,
তাহলে হত না জেনো—
আজও নয়, কালও নয়,
রাতও নয়, দিনও নয়,
ভোর তবে ফুটত না কখনো ॥২১॥

আটটি-চাকা একটি-নেমি গড়িয়ে চলে
সামনে পিছে অনন্ত 'অক্ষর'।
আধেক দিয়ে করল সৃজন বিশ্বভুবন
বাকি আধেক 'নিলক্ষ্যের চর' ॥২২॥

জন্ম নিচ্ছে যা-কিছু এই যে
যা-কিছু নড়ছে-চড়ছে, করছে—
সবার মালিক তুমি, হে প্রাণ, তোমায় নম
শত্রু পেলে ক্ষিপ্র হাতে ধনুক টান' ॥২৩॥

জন্ম নিচ্ছে যা-কিছু এই যে
যা-কিছু নড়ছে-চড়ছে, করছে—
সবার মালিক পতি
অটল অনিদ্ থাকুন সে-প্রাণ
নিয়ে প্রচেতনা বিপুল বিশাল
আমার সাথের সাথী ॥২৪॥

ঊর্ধ্বঃ সুপ্তেষু জাগার
নন্থ তির্যঙ্‌ নি পদ্যতে।
ন সুপ্তম্‌ অস্য সুপ্তেষু
অনু শুশ্রাব কশ্চন ॥২৫॥

প্রাণ মা মত্‌ পর্যাবৃতো
ন মদ্‌ অন্যো ভবিষ্যসি।
অপাং গর্ভম্‌ ইব জীবসে
প্রাণ বধ্নামি ত্বা ময়ি ॥২৬॥

লোকে শুয়ে পড়ে বেঁকে তো কিন্তু ঘুমন্তপুরে
প্রাণ সোজা জেগে থাকে।
ঘুমোলে সবাই, ঘুমিয়ে পড়েছে প্রাণ
একথা শুনেছে কে? ॥২৫॥

হোয়ো না পরাঙ্মুখ ওগো প্রাণ
হোয়ো না কো পর, দূর।
জলের গর্ভ অগ্নির মত তোমাকেও ওগো প্রাণ
বাঁধছি আমাতে—জীবনতৃষ্ণাতুর ॥২৬॥

১০

ঋষি কুত স আঙ্গিরস দেবতা অগ্নি ছন্দঃ গায়ত্রী

ঋগ্বেদ মণ্ডল ১ সূক্ত ৯৭

অপ নঃ শোশুচদ্ অঘম্
অগ্নে শুশুগ্ধি-আ রয়িম্।
অপ নঃ শোশুচদ্ অঘম্ ॥১॥

সুক্ষেত্রিয়া সুগাতুয়া
বসূয়া চ যজামহে।
অপ নঃ শোশুচদ্ অঘম্ ॥২॥

প্র যদ্ ভন্দিষ্ঠ এষাং
প্রা.স্মাকাসশ্‌ চ সূরয়ঃ।
অপ নঃ শোশুচদ্ অঘম্ ॥৩॥

প্র যত্‌ তে অগ্নে সূরয়ো
জায়েমহি প্র তে বয়ম্।
অপ নঃ শোশুচদ্ অঘম্ ॥৪॥

প্র যদ্ অগ্নেঃ সহস্বতো
বিশ্বতো যান্তি ভানবঃ।
অপ নঃ শোশুচদ্ অঘম্ ॥৫॥

১০

ঋষি কুৎস আঙ্গিরসের অগ্নি-সূক্ত

জ্বালাও পোড়াও ঘোচাও মোদের সব মালিন্য
জ্বল্‌জ্বল্‌ জ্বলে ওঠ হে আগুন, জাগাও বিপুল সৃষ্টিকামনা,
জ্বালাও পোড়াও ঘোচাও মোদের সব মালিন্য ॥১॥

রম্যক্ষেত্র চেয়ে গান-ঢালা রমণীয় পথ
চেয়ে আলো-ধন, তোমার যজন করি হে আমরা,
জ্বালাও পোড়াও ঘোচাও মোদের সব মালিন্য ॥২॥

গানে গানে জ্বলে উঠব যেমন জ্বলে নি গো কেউ
জ্বলবে মোদের আপন স্বজন সূর্যকবিরা,
জ্বালাও পোড়াও ঘোচাও মোদের সব মালিন্য ॥৩॥

নতুন জন্ম পাব যে আমরা, হব যে তোমার
সূর্যকবি, হে অগ্নি, তোমার,
জ্বালাও পোড়াও ঘোচাও মোদের সব মালিন্য ॥৪॥

বিশ্ববিজয়ী-অগ্নি-প্রভারা
এই যে ছড়াল দিকে দিকে দিকে,
জ্বালাও পোড়াও ঘোচাও মোদের সব মালিন্য ॥৫॥

ত্বং হি বিশ্বতোমুখ
বিশ্বতঃ পরিভূর্ অসি।
অপ নঃ শোশুচদ্ অঘম্ ॥৬॥

দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখ
অতি নাবে.ব পারয়।
অপ নঃ শোশুচদ্ অঘম্ ॥৭॥

স নঃ সিন্ধুম্ ইব নাবয়া-
অতি পর্ষা স্বস্তয়ে।
অপ নঃ শোশুচদ্ অঘম্ ॥৮॥

দিকে দিকে হেরি তোমারই ও-মুখ
মহাবেষ্টনী ঘিরে আছ সব,
জ্বালাও পোড়াও ঘোচাও মোদের সব মালিন্য ॥৬॥

তোমার নায়েতে পার করে দাও
সব দ্বেষ ওগো বিশ্বতোমুখ,
জ্বালাও পোড়াও ঘোচাও মোদের সব মালিন্য ॥৭॥

এ মহাসিন্ধু পারাও তোমার
নায়ে, নিয়ে চল স্বস্তির কূলে,
জ্বালাও পোড়াও ঘোচাও মোদের সব মালিন্য ॥৮॥

১১

ঋগ্বেদ মণ্ডল ১ সূক্ত ১১৩

ঋষি কুত স আঙ্গিরস　　দেবতা উষা　　ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতির্ আ.গাত্-
চিত্রঃ প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ্বা।
যথা প্রসূতা সবিতুঃ সবায়ঁ
এবা রাত্রী-উষসে যোনিম্ আরৈক্ ॥১॥

রুশদ্-বৎসা রুশতী শ্বেত্যা-আ গাত্-
আরৈগ্ উ কৃষ্ণা সদনানি-অস্যাঃ।
সমানবন্ধূ অমৃতে অনূচী
দ্যাবা বর্ণং চরত আমিনানে ॥২॥

সমানো অধ্বা স্বস্রোর্ অনন্তস্
তম্ অন্যাঽন্যা চরতো দেবশিষ্টে।
ন মেথেতে ন তস্থতুঃ সুমেকে
নক্তোষাসা সমনসা বিরূপে ॥৩॥

ভাস্বতী নেত্রী সূনৃতানাম্
অচেতি চিত্রা বি দুরো ন আবঃ।
প্রা.র্প্যা জগদ্ বি-উ নো রায়ো অখ্যদ্
উষা অজীগর্ ভুবনানি বিশ্বা ॥৪॥

জিহ্মশ্যে চরিতবে মঘোনী-
আভোগয়ে ইষ্টয়ে রায়ে-উ ত্বম্।
দভ্রং পশ্যদ্ভ্য উর্বিয়া বিচক্ষে-
উষা অজীগর্ ভুবনানি বিশ্বা ॥৫॥

১১

ঋষি কুত্স আঙ্গিরসের উষা সূক্ত

ঐ আলোয় আলোকময় করে এল উজল আলোর আলো !
একি তিমিরবিদার উদার আবির্ভাব !
বেগের আবেগ দেবে সবিতাকে সবিতার প্রসবিত্রী—
অকাতরে তাই ছেড়ে দিল ঠাঁই উষাকে দাত্রী রাত্রি ॥১॥

এসেছে শুভ্রা দীপ্ত বত্সা আলো আলো-ঝলমল,
কালো রাত তাকে ছেড়ে দিল একে একে সব অঞ্চল।
একই বন্ধনে বাঁধা দুইজনে চলেছে এ ওর পিছে
অমৃতোজ্জ্বলা একে অন্যের রূপ-রং মুছে মুছে ॥২॥

অন্তবিহীন একই পথ ধরে দেবতার অনুশাসনে
চলেছে যাত্রী উষা ও রাত্রি দু-বোন পালাক্রমে।
রূপসী দুজনা, এ ওর মতো না, একমন একপ্রাণ—
দ্বন্দ্ববিহীন বিরামবিহীন অনন্ত অভিযান ॥৩॥

হৃদয়ে হৃদয়ে প্রকাশ হলেন উজ্জ্বলা ভাস্বতী,
অমৃতের ভাষা তাঁতে পেল দিশা, জগৎ পেল প্র-গতি ;
একি বিস্ময় ! কি জ্যোতির্ময় দুয়ার-উন্মোচনে
দেখালেন ধন। বিশ্বভুবন উষা জাগালেন গানে ॥৪॥

ঘুমিয়ে রয়েছে বাঁকা গুটিসুটি যে-জন কুটিল শয়নে
তাকে পা-হাঁটাতে, কাউকে ছোটাতে ভোগ-যাগ-ধন-সাধনে,
যারা দেখে কম তাদের নয়ন খুলতে ভূমার পানে
মহিমার রাণী—বিশ্বভুবন উষা জাগালেন গানে ॥৫॥

ক্ষত্রায় ত্বং শ্রবসে ত্বং মহীয়ৈ-
ইষ্টয়ে ত্বম্ অর্থম্-ইব ত্বম্ ইত্যৈ।
বিসদৃশা জীবিতা ভিপ্রচক্ষে-
উষা অজীগর্ ভুবনানি বিশ্বা ॥৬॥

এষা দিবো দুহিতা প্রত্য.দর্শি
বি-উচ্ছন্তী যুবতিঃ শুক্রবাসাঃ।
বিশ্বস্যে শানা পার্থিবস্য বস্ব
উষো অদ্যে হ সুভগে বি-উচ্ছ ॥৭॥

পরায়তীনাম্ অনু-এতি পাথ
আয়তীনাং প্রথমা শশ্বতীনাম্।
বি-উচ্ছন্তী জীবম্ উদীরয়ন্তী-
উষা মৃতং কং চন বোধয়ন্তী ॥৮॥

উষো যদ্ অগ্নিং সমিধে চকর্থ
বি যদ্ আবশ্-চক্ষসা সূর্যস্য।
যত্-মানুষান্ যক্ষ্যমাণাঁ অজীগস্
তদ্ দেবেষু চকৃষে ভদ্রম্ অপ্নঃ ॥৯॥

কিয়াতী-আ যত্ সময়া ভবাতি
যা বি-উষুর্ যাশ্-চ নূনং বি-উচ্ছান্।
অনু পূর্বাঃ কৃপতে বাবশানা
প্রদীধ্যানা জোষম্ অন্যাভির্ এতি ॥১০॥

কাউকে শক্তি, কাউকে বা শ্রুতি, কাউকে বিপুল চাওয়া,
কাউকে যেন সে-অর্থের পানে অবিরাম ধেয়ে-যাওয়া,
জীবন-চর্যা পৃথক্ যার যা—উদ্ভাসনে
মেলতে নয়ন, বিশ্বভুবন উষা জাগালেন গানে ॥৬॥

আলোঝলমল-আকাশের মেয়ে ভোর দেখা দিল ঐ
ফুটছে ফুটছে নবযৌবনা, ঝলমল করে সাজনি।
বিশ্বেশ্বরী মর্ত্যধনের, ওগো মঙ্গলময়ী,
হে রূপসী ভোর, ওঠ ফুটে ওঠ আজকে এখানে এখনই ॥৭॥

সুদূরে মিলালো যত ভোর তারই অন্তরিক্ষ-পথে
আসে আসে ভোর—আগামিনী যত চিরন্তনীর প্রথমা।
ফুটতে ফুটতে উর্ধ্বপানে সে তুলছে জীবন্তকে,
মরে ছিল কেউ বুঝি তাকে ঠেলে বলছে, জাগো-না জাগো-না ॥৮॥

সূর্যনয়ন দিয়ে খুললে যে উষা সব আবরণ
বললে, আগুন জ্বালো,
জাগালে যে গানে মানুষগুলিকে যজ্ঞ করবে যারা,
সব দেবতার জন্যে / মধ্যে এই তো করেছ ভালো ॥৯॥

যারা আগে ফুটেছিল আর যারা ফুটবেই এইবার
দুটিকে কাছিয়ে রয়েছে এ উষা—কতখানি! কবেকার!
এ যে উত্তর-সাধিকা, উতলা পুরাতনীদের জন্যে,
জ্যোতিরুজ্জ্বলা আনন্দ-মেলা মেলে ভাবীদের সঙ্গে ॥১০॥

ঈয়ুস্-তে যে পূর্বতরাম্ অপশ্যন্
বি-উচ্ছন্তীম্ উষসং মর্ত্যাসঃ।
অস্মাভির্ উ নু প্রতিচক্ষ্যা-অভূদ্
ও. তে যন্তি যে অপরীষু পশ্যান্ ॥১১॥

যাবয়দ্-দ্বেষা ঋত-পা ঋতেজাঃ
সুম্নাবরী সূনৃতা ঈরয়ন্তী।
সুমঙ্গলীর্ বিভ্রতী দেব-বীতিম্
ইহা.দ্যো.ষঃ শ্রেষ্ঠতমা বি-উচ্ছ ॥১২॥

শশ্বত্ পুরো.ষা বি-উবাস দেবী-
অথো অদ্যে.দং বি-আবো মঘোনী।
অথো বি-উচ্ছাদ্ উত্তরাঁ অনু দ্যূন্
অজরা-অমৃতা চরতি স্বধাভিঃ ॥১৩॥

বি-অঞ্জিভির্ দিব আতাসু-অদ্যোদ্
অপ কৃষ্ণাং নির্ণিজং দেবী-আবঃ।
প্রবোধয়ন্তী-অরুণেভির্ অশ্বৈর্
আ-উষা যাতি সুযুজা রথেন ॥১৪॥

আবহন্তী পোষ্যা বার্যাণি
চিত্রং কেতুং কৃণুতে চেকিতানা।
ঈয়ুষীণাম্ উপমা শশ্বতীনাং
বিভাতানাং প্রথমো.ষা বি-অশ্বৈত ॥১৫॥

সে-সব মানুষ চলে গেছে যারা দেখেছিল আগে-আগে
হঠিয়ে তমসা পূরবী উষার প্রথম আবির্ভাব।
দর্শনীয়াকে দেখছি আজকে চোখ মেলে আমরাও,
তারাও আসছে, যারা এ উষাকে দেখবে অন্য রাতে ॥১১॥

ঘুচিয়ে হিংসা-দ্বেষ-বিদ্বেষ, জাগিয়ে অমৃতবাণী,
দেব-সম্ভোগ আনন্দ নিয়ে সঙ্গে সুকল্যাণী
ঋতের দুহিতা ঋতের পালিকা সুখদা-বরদা-'উষা'
ফুটে ওঠ আজ এখানে হে উষা, ফোটো হে শ্রেষ্ঠতমা ॥১২॥

আঁধার হটিয়ে জ্যোতির্ময়ী-এ ফুটেছে অনাদিকাল
আজকে এই যে উজলে তুলেছে মহিমময়ী আবার।
ফুটবে আবার আগামী দিনেও দিন-দিন প্রতিদিন
আপনাতে-আছে-আপনি চলেছে অজরা মৃত্যুহীন ॥১৩॥

কালো আবরণ খুলে ফেলে দিয়ে—আলো
আকাশের বুকে ঝলকে ঝলকে দিকে দিকে ঝল্কাল।
অরুণ-কিরণে জগৎ জাগিয়ে আসে
রাঙা ঘোড়া যুতে সুন্দর রথে আসে ঐ উষা আসে ॥১৪॥

নিয়ে সে আসছে জীবন-পোষণ বরণীয় যত বিত্ত
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি দিয়ে ঝলমল ক'রে চিত্ত।
যারা গেল চলে দলে দলে দলে, তাদের অন্তিম 'ওর'
নিত্য-বিহান-মালার প্রথম—ভোর ভয়ি, ভয়ি ভোর ॥১৫॥

উদ্ ঈর্ধ্বং জীবো অসুর্ ন আ.গাদ্
অপ প্রা.গাত্ তম আ জ্যোতির্ এতি।
আরৈক্ পন্থাং যাতবে সূর্যায়-
অগন্ম যত্র প্রতিরন্তে-আয়ুঃ ॥১৬॥

স্যূমনা বাচ উদ্ ইয়র্তি বহ্নিঃ
স্তবানো রেভ উষসো বিভাতীঃ।
অদ্যা তদ্ উচ্ছ গৃণতে মঘোনি-
অস্মে আয়ুর্ নি দিদীহি প্রজাবত্ ॥১৭॥

যা গোমতীর্ উষসঃ সর্ববীরা
বি-উচ্ছন্তী দাশুষে মর্ত্যায়।
বায়োর্-ইব সূনৃতানাম্ উদর্কে
তা অশ্বদা অশ্নবত্ সোমসুত্বা ॥১৮॥

মাতা দেবানাম্ অদিতের্ অনীকং
যজ্ঞস্য কেতুর্ ব হতী বি ভাহি।
প্রশস্তিকৃদ্ ব হ্মণে নো বি-উচ্ছ
আ নো জনে জনয় বিশ্ববারে ॥১৯॥

যত্-চিত্রম্ অপ্ন উষসো বহন্তি-
ঈজানায় শশমানায় ভদ্রম্।
তত্-নো মিত্রো বরুণো মামহন্তাম্
অদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥২০॥

ওঠ্‌রে সবাই, এল আমাদের প্রাণ, জীবন ;
হট্‌ল আঁধার, এল এল এল আলো-প্লাবন,
সূর্যকে ছেড়ে দিল নিঃশেষে যাওয়ার পথ—
আমরা গেলাম যেখানে আয়ুর উত্তরণ ॥১৬॥

ফুটে চলে ভোর—স্তবগানে ভোর ভোরের বৈতালিক
বাহক-বহ্নি বাণীর ফোয়ারা বুনে চলি অনায়াস।
কবির সামনে তবে আজ রাণী হও হে প্রভাস্বরা,
নিবিড় গভীরে উজলে তোল হে জীবন-পরম্পরা ॥১৭॥

সব যে দিয়েছে ভায় তার কাছে আলোয়-আলোয়-ভরা
বীর্যজননী বীর্যদায়িনী যে-উষা-পরম্পরা
সোম নিঙড়ে যে সবন করেছে, সে তাঁদের কাছে পাক্
শেষ হলে গান—হাওয়ার মতন ঋতচ্ছন্দা বাক্ ॥১৮॥

দেবতাদের মা, অদিতির মুখ, যজ্ঞ-প্রকাশ,
আঁধার হটিয়ে ফোটো হে বিরাট্, হও প্রকাশ।
সব-ছাওয়া ওগো বরণীয়তমা, বিপুল প্রস্নার মন্ত্রে দাও
দেবতার কুলে দাও আমাদের দাও হে নূতন জন্ম দাও ॥১৯॥

যে করে যজন, আহুতি-হবন, যে থাকে শান্ত, যে করে স্তবন,
তাদের জন্যে উষারা আন যে উজ্জ্বলস্ত কল্যাণ-ধন,
হোক আমাদের হোক তা—এ চাওয়া মান্য করুন, করুন মান্য
মিত্র বরুণ অদিতি আকাশ পৃথিবী সিন্ধু-অন্তরিক্ষ ॥২০॥

———

১২

ঋগ্বেদ মণ্ডল ১ সূক্ত ১১৫

ঋষি কুত্‌স আঙ্গিরস দেবতা সূর্য ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্‌

চিত্রং দেবানাম্ উদ্ অগাদ্ অনীকং
চক্ষুর্ মিত্রস্য বরুণস্য-অগ্নেঃ।
আ প্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং
সূর্য আত্মা জগতস্ তস্থুষশ্‌ চ ॥১॥

সূর্যো দেবীম্ উষসং রোচমানাং
মর্যো ন যোষাম্ অভি-এতি পশ্চাত্‌।
যত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি
বিতন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রম্ ॥২॥

ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্যস্য
চিত্রা এতগ্বা অনুমাদ্যাসঃ।
নমস্যন্তো দিব আ পৃষ্ঠম্ অস্থুঃ
পরি দ্যাবাপৃথিবী যন্তি সদ্যঃ ॥৩॥

তত্‌ সূর্যস্য দেবত্বং তত্‌-মহিত্বং
মধ্যা কর্তোর্ বিততং সং জভার।
যদে.দ্ অযুক্ত হরিতঃ সধস্থাদ্
আদ্ রাত্রী বাসস্ তনুতে সিমস্মৈ ॥৪॥

১২

ঋষি কুৎস আঙ্গিরসের সূর্য-সূক্ত

সব দেবতার উজ্জ্বল মুখ জ্যোতিঃপুঞ্জ
উঠেছে মিত্র বরুণ অগ্নি—সবার চক্ষু।
দ্যুলোক ভূলোক ছাইল, ছাইল অন্তরিক্ষ
দাঁড়িয়ে আছে যা, চলছে, সবার আত্মা সূর্য ॥১॥

আলো-ঝলমল উষার পেছনে তরুণীলক্ষ্য
উজ্জ্বল কোন তরুণের মতো চলেছে সূর্য,
দেবকাম যত মানুষ যখন জোড়ায় জোড়ায়
ভালো চেয়ে যজ্ঞে ভালোকে, সময়ে, লাঙ্গল বিছায় ॥২॥

আনন্দধ্বনি জাগিয়ে চলেছে সূর্যাশ্বেরা
কল্যাণময় হিরণ্যজ্যোতি রাঙা অপরূপ
প্রণতি জাগিয়ে আকাশের গায়ে দিগ্‌দিগন্তে
ছড়াল। ঘুরছে দ্যুলোক ভূলোক এক মুহূর্তে ॥৩॥

সেই দেবত্ব সূর্যের, ওগো, সেই তো মহিমা
কর্মের ঠিক মাঝখানে আনে ছড়ানো গুটিয়ে।
এ-পৃথিবী থেকে যেতে যেই যোতে সে ঘোড়াগুলিকে
সব ঢেকে তার কাপড় বিছোয় অমনি রাত্রি ॥৪॥

তত্-মিত্রস্য বরুণস্যা.ভিচক্ষে
সূর্যো রূপং কৃণুতে দ্যোর্ উপস্থে।
অনন্তম্ অন্যদ্ রুশদ্ অস্য পাজঃ
কৃষ্ণম্ অন্যত্-হরিতঃ সং ভরন্তি ॥৫॥

অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য
নির্ অংহসস্ পিপৃতা নির্ অবদ্যাত্।
তত্-নো মিত্রো বরুণো মামহন্তাম্
অদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥৬॥

——

দ্যুলোকের কোলে ফোটে অপরূপ সূর্য ওই-যে
ওই আলোতেই দেখব আমরা বরুণ, মিত্র ;
হিরণ্যজ্যোতি সূর্যাশ্বেরা বহন করছে
একদিকে আলো একদিকে কালো—তেজ অনন্ত ॥৫॥

সূর্য উঠেছে আজ, দেবতারা, উঠেছে সূর্য,
সব মালিন্য গ্লানি হতে তারো, কর হে পূর্ণ।
এ-চাওয়া মোদের মান্য করুন, করুন মান্য
মিত্র বরুণ অদিতি আকাশ পৃথিবী সিন্ধু-অন্তরিক্ষ ॥৬॥

১৩

ঋগ্বেদ মণ্ডল ২ সূক্ত ৩৯

ঋষি গৃত্‌সমদ ভার্গব শৌনক দেবতা অশ্বিদ্বয় ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্‌

গ্রাবাণে.ব তদ্‌ ইদ্‌ অর্থং জরেথে
গৃধ্রে.ব বৃক্ষং নিধিমন্তম্‌ অচ্ছ।
ব্রহ্মাণে.ব বিদথে - উক্‌থশাসা
দূতে ব হব্যা জন্যা পুরুত্রা ॥১॥

প্রাতর্যাবাণা রথ্যে.ব বীরা-
অজে.ব যমা বরম্‌ আ সচেথে।
মেনে ইব তন্বা শুম্ভমানে
দম্পতী.ব ক্রতুবিদা জনেষু ॥২॥

শৃঙ্গে.ব নঃ প্রথমা গন্তম্‌ অর্বাক্‌-
শফৌ-ইব জর্ভুরাণা তরোভিঃ।
চক্রবাকে.ব প্রতি বস্তোর্‌ উস্রা-
অর্বাঞ্চা যাতং রথ্যে.ব শক্রা ॥৩॥

নাবে.ব নঃ পারয়তং যুগে.ব
নভ্যে.ব ন উপধী.ব প্রধী.ব।
শ্বানে ব নো অ-রিষণ্যা তনূনাং
খৃগলে.ব বিস্রসঃ পাতম্‌ অস্মান্‌ ॥৪॥

১৩

ঋষি গৃত সমদ ভার্গবের অশ্বি-সূক্ত

সেই অর্থ পরমতম
তোমরা দুজন গাও তারি গান যজ্ঞপাষাণসম।
এ গাছে লুকোন রয়েছে গুপ্তধন
এস এস ধনলোভীর মতো দুজন।
যজ্ঞে যজ্ঞে গায় যে ব্রহ্মা মন্ত্রস্তুতিগান,
কিম্বা যে দূত করে জনকল্যাণ,
তাদেরি মতন ঘরে ঘরে জাগে তোমাদের আহ্বান ॥১॥

দুই বীর রথী এসেছ প্রভাতে যেন দুটি অজা-বীর
দম্পতি যেন সবার মধ্যে, কর্মবেত্তা, ধীর।
তোমাদের চায় যে, যাকে তোমরা চাও
তাকে ঝলমল-বরতনু দুটি রূপসী হয়ে জড়াও ॥২॥

হে প্রথম, এসো যুগ্মশৃঙ্গ হয়ে,
জোড়া-খুর হয়ে দ্রুতবেগে ত্বরা দোঁহে
এসো চখাচখী, ভোর হল নাকি, অরুণরশ্মি এসো,
মহাসামর্থী এসো দুই রথী এসো ॥৩॥

তোমরা নৌকা, তোমরাই রথ-জোয়াল, চক্রনাভি,
তোমরাই নেমি, তোমরা চাকার-পাখি।
ওগো পারে নিয়ে যাও,
হিংসা কোরো না আমাদের দেহ-রক্ষী কুকুর হও।
বর্মের মত থাকো,
জরা-ঝরা হতে রাখো ॥৪॥

বাতে.ব-অজুর্যা নদ্যে.ব রীতির্
অক্ষী.ব চক্ষুষা যাতম্ অর্বাক্।
হস্তৌ-ইব তন্বে শং-ভবিষ্ঠা
পাদে.ব নো নয়তং বস্যো অচ্ছ ॥৫॥

ওষ্ঠৌ-ইব মধু-আস্নে বদন্তা
স্তনৌ-ইব পিপ্যতং জীবসে নঃ।
নাসে.ব নস্ তন্বো রক্ষিতারা
কর্ণৌ-ইব সুশ্রুতা ভূতম্ অস্মে ॥৬॥

হস্তে.ব শক্তিম্ অভি সং-দদী নঃ
ক্ষামে.ব নঃ সম্ অজতং রজাংসি।
ইমা গিরো অশ্বিনা যুষ্ময়ন্তীঃ
ক্ষ্ণোত্রেণে.ব স্বধিতিং সং শিশীতম্ ॥৭॥

এতানি বাম্ অশ্বিনা বর্ধনানি
ব্রহ্ম স্তোমং গৃৎসমদাসো অক্রন্।
তানি নরা জুজুষাণো.প যাতং
বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥৮॥

—

হাওয়ার মতন এসো হে অজর,
এসো তুটি নদী বয়ে হে।
এসো আমাদের আঁখির সমুখে
তুটি চোখ হয়ে আলোর ঝলকে,
তুটি হাত হয়ে পরমশান্তি এ দেহে।
আরো আলো আরো আলো—
চাই যে সে-ধন
হয়ে তু চরণ
আমাদের নিয়ে চলো ॥৫॥

তুটি ঠোঁট হয়ে এসো এ আস্যে বলো মধু, মধু বলো,
তুটি বুক হয়ে আমাদের মুখে প্রাণরসসুধা ঢালো।
তুটি নাসা হয়ে বাঁচাও মোদের এই তনু-কলেবর,
হয়ে তুটি শ্রুতি আনো সুশ্রুতি, শুনি যেন সুন্দর ॥৬॥

তুটি হাত হয়ে দাও হে শক্তি দাও।
হ্যলোক-ভূলোক হয়ে সব জ্যোতি সমস্ত লোক এখানে আনো, মেলাও।
তোমাদের চেয়ে উঠেছে জেগে যে বাণীর বন্যাধারা,
দাও তাতে শান, বজ্রসমান করো করো অশ্বীরা ॥৭॥

তোমাদের তরে এ গান বেঁধেছে গৃৎসমদেরা,
বাড়বে তোমরা যাতে সে-মন্ত্র, ওগো অশ্বীরা।
মজে' তাতে এসো যুগ্মনায়ক, যজ্ঞে আমরা
ঘোষণা করব সোচ্চারে তোমাদের, সুবীর্য ॥৮॥

—

১৪

ঋগ্বেদ মণ্ডল ৭ সুক্ত ৮৬

ঋষি বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি দেবতা বরুণ ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ

ধীরা তু-অস্য মহিনা জনূংষি
বি যস্ তস্তম্ভ রোদসী চিদ্ উর্বী।
প্র নাকম্ ঋষ্বং নুনুদে বৃহন্তং
দ্বিতা নক্ষত্রং পপ্রথত্-চ ভূম ॥১॥

উত স্বয়া তন্বা সং বদে তত্
কদা নু-অন্তর্ বরুণে ভুবানি।
কিং মে হব্যম্ অহৃণানো জুষেত
কদা মৃলী.কং সুমনা অভি খ্যম্ ॥২॥

পৃচ্ছে তদ্ এনো বরুণ দিদৃক্ষু-
উপো এমি চিকিতুষো বিপৃচ্ছম্।
সমানম্ ইত্-মে কবয়শ্ চিদ্ আহুর্
অয়ং হ তুভ্যং বরুণো হৃণীতে ॥৩॥

কিম্ আগ আস বরুণ জ্যেষ্ঠং
যত্ স্তোতারং জিঘাংসসি সখায়ম্।
প্র তত্-মে বোচো দূল.ভ স্বধাবো-
অব ত্বা.নেনা নমসা তুর ইয়াম্ ॥৪॥

১৪

ঋষি বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণির বরুণ-সূক্ত

কি বিশাল! তবু অমরা ও ধরা
তাঁরি দুই হাতে দুই দিকে ধরা—
জন্মে' চলেন সুস্থিরে মহাজন্ম অন্তহীন।
ঘুরিয়ে চলেন বিরাট আকাশ,
ক্ষণে তারা ক্ষণে সূর্য প্রকাশ,
বাড়িয়ে চলেন ভূমাকে ভূমিকে অনুখণ অনুদিন ॥১॥

আমি ও আমার দেহ করি কানাকানি—
কবে বরুণের মধ্যে বল্ তো আত্ম-হারাব আমি?
আমার আহুতি রাগ ভুলে সে কি তুলে নেবে ভালবেসে?
কবে হাসিমুখে দেখব সুমুখে আমার আনন্দে—সে? ॥২॥

তোমাকে দেখতে চাই, হে বরুণ, তাই
বিদ্বানদের দুয়ারে দুয়ারে জিজ্ঞাসা নিয়ে যাই,
শুধোই তাদের, কী দোষ করেছি বলুন।
কবিরা সকলে একই কথা বলে—
তোমার উপরে রাগ করেছেন বরুণ ॥৩॥

বলো তো বরুণ, কী বা সে দারুণ অতি-বড় অপরাধ
করেছি আমি, যে স্তোতাকে সখাকে মারতে তোমার সাধ?
ওগো দুর্জয়, ওগো স্বমহিম, আমাকে তা বলে দাও,
ঘুচিয়ে সে-গ্লানি ত্বরা করে আনি প্রণতি তোমার পায় ॥৪॥

অব দ্রুগ্ধানি পিত্র্যা সৃজা নো-
অব যা বয়ং চকৃমা তনূভিঃ।
অব রাজন্ পশুতৃপং ন তায়ুং
সৃজা বত্‌সং ন দাম্নো বসিষ্ঠম্ ॥৫॥

ন স স্বো দক্ষো বরুণ ধ্রুতিঃ সা
সুরা মন্যুর্ বিভীদকো অচিত্তিঃ।
অস্তি জ্যায়ান্ কনীয়স উপারে
স্বপ্নশ্ চনে.দ্ অনৃতস্য প্রযোতা ॥৬॥

অরং দাসো ন মীল্‌.হুষে করাণি-
অহং দেবায় ভূর্ণয়ে - অনাগাঃ।
অচেতয়দ্ অচিতো দেবো অর্যো
গৃত্‌সং রায়ে কবিতরো জুনাতি ॥৭॥

অয়ং স তুভ্যং বরুণ স্বধাবো
হৃদি স্তোম উপশ্রিতশ্ চিদ্ অস্তু।
শং নঃ ক্ষেমে শম্ উ যোগে নো অস্তু
যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥৮॥

—

পিতা-পিতামহ থেকে পাওয়া দ্রোহ—তা থেকে মুক্ত কর,
মুক্ত কর সে অন্যায় থেকে, করেছি যা শরীরেও।
ঘোচাও রাজন্ গলবন্ধন বৎস বসিষ্ঠ-র
কেন দেবে ফাঁসি ? পশু পেয়ে খুশী আমি কি গো পশুচোর ? ॥৫॥

নয় গো আমারি সে তো কারিকুরি, বরুণ, ধ্রুব সে নিয়তি ;
সুরা, ক্রোধ, পাশা, অজ্ঞান, আরো কত কি।
কেউ আছে বড়, সব ছোটদের ওপরে,
কত অন্যায় দেখ ঘটে যায় স্বপন-ঘুমেরও ভিতরে ॥৬॥

ঢেলে তুমি, দেব, দিয়েছ আমায়, আমি হব তব ভৃত্য,
হবে না কো ত্রুটি, রুদ্র, সাজাব তোমার সেবায় চিত্ত।
চেতনা ছিল না—তাদের চেতনা দিয়েছ উদার স্বামী,
কবিগুরু, নিয়ে চলেছ তোমার কবিকে—
কী ধনে করতে ধনী ॥৭॥

ওগো স্বধাবান্, বরুণ, এ গান
হৃদয়ে লহ হে লহ ;
চাওয়ায় শান্তি পাওয়ায় শান্তি থাক,
স্বস্তি স্বস্তি দিয়ে আমাদের ঘিরে থাকো অহরহ ॥৮॥

—

১৫

ঋগ্বেদ মণ্ডল ১ সূক্ত ২০

ঋষি মেধাতিথি কাণ্ব — দেবতা ঋভুগণ — ছন্দঃ গায়ত্রী

অয়ং দেবায় জন্মনে
স্তোমো বিপ্রেভির্ আসয়া।
অকারি রত্নধাতমঃ ॥১॥

য ইন্দ্রায় বচোযুজা
ততক্ষুর্ মনসা হরী।
শমীভির্ যজ্ঞম্ আশত ॥২॥

তক্ষন্ নাসত্যাভ্যাং
পরিজ্মানং সুখং রথম্।
তক্ষন্ ধেনুং সবর্দুঘাম্ ॥৩॥

যুবানা পিতরা পুনঃ
সত্যমন্ত্রা ঋজূয়বঃ।
ঋভবো বিষ্টী-অক্রত ॥৪॥

সং বো মদাসো অগ্মত-
ইন্দ্রেণ চ মরুত্বতা।
আদিত্যেভিশ্ চ রাজভিঃ ॥৫॥

উত ত্যং চমসং নবং
ত্বষ্টুর্ দেবস্য নিষ্কৃতম্।
অকর্ত চতুরঃ পুনঃ ॥৬॥

১৫

ঋষি মেধাতিথি কাণ্বের ঋভু-সূক্ত

দিব্যজন্ম চেয়ে এই গান বিপ্রেরা মুখে মুখে
রচেছে দিব্যজন্ম পেয়েছে যারা
তাদের জন্যে। আনবে এ গান পরম-রত্ন-দান ॥১॥

মন দিয়ে চেঁচে-ছুলে ইন্দ্রের জন্যে যুগল ঘোড়া
গড়েছেন তাঁরা, যুতেছেন বাক্ দিয়ে। আর যজ্ঞকে
শ্রম দিয়ে ভ'রে, ভ'রে দিয়েছেন শান্তি শান্তি শান্তি ॥২॥

গড়েছেন রথ অশ্বী-দোঁহার জন্যে
সর্বতোগামী, অনায়াস, স্বচ্ছন্দ।
গড়েছেন ধেনু অমৃতজ্যোতিঃক্ষরা ॥৩॥

ঋভু তাঁরা, ঋজু সাধনা তাঁদের, সত্য তাঁদের মন্ত্র ;
ক্লান্তিবিহীন বিরামবিহীন তপে
নবযৌবন দিলেন পিতা ও মাতাকে ॥৪॥

আনন্দধারা তোমাদের, ওগো ঋভুরা,
মরুত্-সহায় ইন্দ্রের সনে মিশল,
মিশল দীপ্ত আদিত্যদের সঙ্গে ॥৫॥

ত্বষ্টা দেবের সযত্নে-গড়া সেই যে
অভিনব সোমরসের পেয়ালাখানি—
ভেঙে ভেঙে তাকে তোমরা করেছ চার ॥৬॥

তে নো রত্নানি ধত্তন
ত্রির্ আ সাপ্তানি সুন্বতে
একম্ একং সুশস্তিভিঃ ॥৭॥

অধারয়ত বহ্নয়ো-
অভজন্ত সুকৃত্যয়া।
ভাগং দেবেষু যজ্ঞিয়ম্ ॥৮॥

—

সুপ্রশস্তি করেছি রচনা তোমাদের উদ্দেশে,
পিষে পিষে সোম, ঢেলেছি রসের ধারা।
দাও আমাদের একুশ রত্ন একটি একটি ক'রে ॥৭॥

করেছ বহন, করেছ ধারণ। পুণ্যকর্মবলে
দেবতাগণের মধ্যে আসন নিয়েছ দেবতা হয়ে,
গ্রহণ করেছ যজ্ঞহবির ভাগ ॥৮॥

—

১৬

ঋগ্বেদ মণ্ডল ১ সূক্ত ১৭৯

ঋষি লোপামুদ্রা (১, ২) দেবতা রতি ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্
অগস্ত্য মৈত্রাবরুণি (৩, ৪) বৃহতী (৫)
অগস্ত্যশিষ্য ব্রহ্মচারী (৫, ৬)

পূর্বীর্ অহং শরদঃ শশ্রমাণা
দোষা বস্তোর্ উষসো জরয়ন্তীঃ।
মিনাতি শ্রিয়ং জরিমা তনূনাম্
অপি-উ নু পত্নীর্ বৃষণো জগম্যুঃ ॥১॥

যে চিত্-হি পূর্ব ঋতসাপ আসন্-ত্
সাকং দেবেভির্ অবদন্-ন্ ঋতানি।
তে চিদ্ অবা.সুর্ নহি-অন্তম্ আপুঃ
সম্ উ নু পত্নীর্ বৃষভির্ জগম্যুঃ ॥২॥

ন মৃষা শ্রান্তং যদ্ অবন্তি দেবা
বিশ্বা ইত্ স্পৃধো অভি-অশ্নবাব।
জয়াবে.দ্ অত্র শতনীথম্ আজিং
যত্ সম্যঞ্চা মিথুনৌ - অভ্যজাব ॥৩॥

নদস্য মা রুধতঃ কাম আগন্-ন্
ইত আজাতো অমুতঃ কুতশ্চিত্।
লোপামুদ্রা বৃষণং নী রিণাতি
ধীরম্ অধীরা ধয়তি শ্বসন্তম্ ॥৪॥

১৬

অগস্ত্য-লোপামুদ্রা-সংবাদ

কত বচ্ছর দিন রাত শ্রম করেই চলেছি করেই…
এল আর গেল কত কত উষা, বুড়ো হলাম।
অঙ্গে অঙ্গে যত রূপ ছিল, জরা ঝরায়—
আর না। এখন পত্নীর কাছে পতি আসুক ॥১॥

পূর্বপুরুষ ঋতের রসিক ছিল যারা,
দেববৃন্দের সঙ্গে করত ঋতকথন,
তারাও নামিয়েছিল নেমেছিল, পায়নি তল।
পুরুষ-পতির সঙ্গে পত্নী তবে মিলুক ॥২॥

বৃথা হয় নি সে শ্রম, যাকে রাখে দেবতারা।
স্পর্ধিত যত শক্তিকে এস হার মানাই।
শতমুখী এই সংগ্রাম এস জয় করি,
একাত্ম হয়ে যেখানে আমরা দুজনে ধাই ॥৩॥

স্তবনে নিরত ছিলাম রুদ্ধ-ইন্দ্রিয়।
জাগল কামনা! হেথা, হোথা—কোথা জন্মাল?
বিহ্বলা লোপা ধীর পুরুষকে করে উতল,
ঘন বহে শ্বাস। সে পিপাসার্তা পান-বিভোল ॥৪॥

ইমং নু সোমম্ অন্তিতো
হৃৎসু পীতম্ উপ ব্রুবে।
যৎ সীম্ আগশ্ চকৃমা তৎ সু মৃলতু
পুলুকামো হি মর্ত্যঃ ॥৫॥

অগস্ত্যঃ খনমানঃ খনিত্রৈঃ
প্রজাম্ অপত্যং বলম্ ইচ্ছমানঃ।
উভৌ বর্ণৌ - ঋষির্ উগ্রঃ পুপোষ
সত্যা দেবেষু-আশিষো জগাম ॥৬॥

—

এই যে পিয়েছি সোম হৃদয়ের গভীরে
তার কাছাকাছি গিয়ে বলছি,
ক্ষমা কর নিঃশেষে যা কিছু করেছি পাপ,
মানুষের অনেক যে কামনা ॥৫॥

চেয়ে প্রজা, চেয়ে সন্ততি, চেয়ে সুবীর্য,
খনিত্র দিয়ে খুঁড়তে খুঁড়তে অগস্ত্য
তেজস্বী ঋষি পুষ্টি দিলেন দু বর্ণেই
দেবতার কাছে সব চাওয়া হল সুপূর্ণ ॥৬॥

—

১৭

ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সূক্ত ১০৮

ঋষি পণিগণ (১, ৩, ৫, ৭, ৯) দেবতা সরমা ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্
সরমা (২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১১) পণিগণ

কিম্ ইচ্ছন্তী সরমা প্রে.দম্ আনড্
দূরে হি-অধ্বা জগুরিঃ পরাচৈঃ।
কা.স্মেহিতিঃ কা পরিতক্ম্যা-আসীত্
কথং রসায়া অতরঃ পয়াংসি ॥১॥

ইন্দ্রস্য দূতীর্ ইষিতা চরামি
মহ ইচ্ছন্তী পণয়ো নিধীন্ বঃ।
অতিষ্কদো ভিয়সা তত্-ন আবত্
তথা রসায়া অতরং পয়াংসি ॥২॥

কীদৃঙ্-ঙ্ ইন্দ্রঃ সরমে কা দৃশীকা
যস্যে.দং দূতীর্ অসরঃ পরাকাত্।
আ চ গচ্ছাত্-মিত্রম্ এনা দধাম-
অথা গবাং গোপতির্ নো ভবাতি ॥৩॥

না.হং তং বেদ দভ্যং দভত্ স
যস্যে.দং দূতীর্ অসরং পরাকাত্।
ন তং গূহন্তি স্রবতো গভীরা
হতা ইন্দ্রেণ পণয়ঃ শয়ধ্বে ॥৪॥

১৭

পণি-সরমা সংবাদ

কী চেয়ে সরমা এলে এতদূর ?
দূর অতিদূর পথ যে সুদুর্গম।
আমাদের আছে কী লুকোন সম্বল ?
ঘোর ছিল রাত, তবু ঘুরে ঘুরে এলে
কেমনে, কেমনে পেরোলে রসার জল ? ॥১॥

তোমাদের কাছে যা লুকানো আছে
সে বিপুল ধনরাশি
চেয়ে চেয়ে ফিরি, আমি ইন্দ্রেরি
প্রেরিতা দূতী, হে পণিরা।
ভয়ে আগলেছে রসাই আমাকে, পাছে ডিঙোই,
তাইতে পেরিয়ে এসেছি তো তার জল অথৈ ॥২॥

কেমনধারা সে ইন্দ্র সরমা,
দেখতে কেমন তাকে ?
দূতী হয়ে যার এসেছ ওপার
সুদূর অজানা থেকে ?
আসুক-না চলে এখানে সে, তাকে
রাখব বন্ধু ক'রে,
সে হবে গোপতি, সে হবে গো পতি
আমাদের গোকুলের ॥৩॥

দূতী হয়ে যাঁর এসেছি ওপার
সুদূর অজানা থেকে,
গভীর-গভীরা পারে না নদীরা
তাঁকে আবরণে ঢাকে।
তাকে কেউ পারে মারতে, জানি না,
জানি, সে-ই মারে সবি,
ইন্দ্রের হাতে, ওরে পণি, তোরা
মরণশয়নে শুবি ॥৪॥

ইমা গাবঃ সরমে যা ঐচ্ছঃ
পরি দিবো অন্তান্ সুভগে পতন্তী।
কস্ তে-এনা অব সৃজাদ্ অযুধ্বী-
উতা.স্মাকম্ আয়ুধা সন্তি তিগ্মা ॥৫॥

অসেন্যা বঃ পণয়ো বচাংসি-
অনিষব্যাস্ তন্বঃ সন্তু পাপীঃ।
অধৃষ্টো ব এতবৈ - অস্তু পন্থা
বৃহস্পতির্ ব উভয়া ন মৃল.াত্ ॥৬॥

অয়ং নিধিঃ সরমে অদ্রিবুধ্নো
গোভির্ অশ্বেভির্ বসুভির্ নি-ঋষ্টঃ।
রক্ষন্তি তং পণয়ো যে সুগোপা
রেকু পদম্ অলকম্ আ জগন্থ ॥৭॥

এ.হ গমন্-ন্ ঋষয়ঃ সোমশিতা
অযাস্যো অঙ্গিরসো নবগ্বাঃ।
তে-এতম্ ঊর্বং বি ভজন্ত গোনাম্
অথৈ.তদ্ বচঃ পণয়ো বমন্-ন্ ইত্ ॥৮॥

বিনাযুদ্ধেই ছাড়ব তোমাকে
এসব গাভীকে, বটে ?
আলোকলোকের সীমানা পেরিয়ে
ঘুরে ঘুরে ছুটে ছুটে
খুঁজছ যাদের, ওলো সুন্দরী সরমা।
চোখা চোখা ঢের আছে আমাদেরও
অস্ত্রশস্ত্র ঘটে ॥৫॥

তোদের বচন, ওরে পণি শোন,
যোদ্ধাশোভন নয়।
তোদের শরীর পাপে-ভরা, তীর
কেউ না ছুঁড়ুক তায়।
অগম্য পথে চলুক তোদের
নিষ্ফল অভিযান।
বৃহস্পতির হাতে বাধা পাক
দুদিকের কল্যাণ ॥৬॥

গাভীতে, অশ্বে, মণিমাণিক্যে ঠাসা
এ নিধি, সরমা, লুকোন আছে পাষাণে।
রক্ষানিপুণ পণিরা পাহারাদার—
মিথ্যে এলে এ শঙ্কাবহুল স্থানে ॥৭॥

ঐ আসছেন ঋষিরা, তীক্ষ্ণ সোমে,
অযাস্য আর অঙ্গিরাগণ—
নয়টি যাঁদের আলো।
বেঁটে নেবেন তো এই অনন্ত
গাভীধন তাঁরা সবে।
একথা তখন, পণিরা, তোদের
উগরে ফেলতে হবে ॥৮॥

এবা চ ত্বং সরমে-আজগন্থ
প্রবাধিতা সহসা দৈব্যেন।
স্বসারং ত্বা কৃণবৈ মা পুনর্ গা
অপ তে গবাং সুভগে ভজাম ॥৯॥

না.হং বেদ ভ্রাতৃত্বং নো স্বসৃত্বম্
ইন্দ্রো বিদুর্ অঙ্গিরসশ্ চ ঘোরাঃ।
গোকামা মে অচ্ছদয়ন্ যদ্ আয়ম্
অপা.ত ইত পণয়ো বরীয়ঃ ॥১০॥

দূরম্ ইত পণয়ো বরীয়
উদ্ গাবো যন্তু মিনতীর্ ঋতেন।
বৃহস্পতির্ যা অবিন্দন্ নিগূল্.হাঃ
সোমো গ্রাবাণ ঋষয়শ্ চ বিপ্রাঃ ॥১১॥

যাই বল বাপু, সরমা, এসেছ তাও
এখানে বাধ্য হয়ে দেবতার জোরে।
তুমি আমাদের বোন হও, সোনা, নাও
গোধনের ভাগ, যেও না যেও না ফিরে ॥৯॥

ভাইবোনাবোনি জানিনে কো আমি,
ওসব ইন্দ্র জানে,
জানে অঙ্গিরা দারুণ ঋষিরা,
চায় তারা ধেনু-ধনে।
তাদের এ-চাওয়া ভালো লেগেছিল,
তাই তো এসেছি চলে।
পণিরা পালাও, হটো, দূরে যাও,
আরো দূর···আরো দূরে ॥১০॥

পণিরা পালাও, দূরে চলে যাও,
দূর···দূর···আরো দূর ;
লুকিয়ে শুকিয়ে ছিল গভীরে যে গাভীরা,
খুঁজে পেয়েছেন তাদের বৃহস্পতি,
যজ্ঞপাষাণ, সোম, ঋষি আর কবিরা।
ঋত-নাদে দ্বার ভেঙে চুরমার
উজিয়ে তারা চলুক ॥১১॥

১৮

অথর্ববেদ কাণ্ড ১১ সূক্ত ৫

ঋষি ব্‌্রহ্মা | দেবতা ব্‌্রহ্মচারী | ছন্দঃ বিবিধ

ব্‌্রহ্মচারীঃষ্ণংশ্‌ চরতি রোদসী উভে
তস্মিন্‌ দেবাঃ সংমনসো ভবন্তি ।
স দাধার পৃথিবীং দিবং চ
স আচার্যং তপসা পিপর্তি ॥১॥

ব্‌্রহ্মচারিণং পিতরো দেবজনাঃ
পৃথগ্‌ দেবা অনুসংযন্তি সর্বে ।
গন্ধর্বা এনম্‌ অন্বা.য়ন্‌
ত্রয়স্ত্রিংশত্‌ ত্রিশতাঃ ষট্‌ সহস্রাঃ
সর্বান্‌-ত্‌ স দেবাংস্‌ তপসা পিপর্তি ॥২॥

আচার্য উপনয়মানো
ব্‌্রহ্মচারিণং কৃণুতে গর্ভম্‌ অন্তঃ ।
তং রাত্রীস্‌ তিস্র উদরে বিভর্তি
তং জাতং দ্রষ্টুম্‌ অভিসংযন্তি দেবাঃ ॥৩॥

ইয়ং সমিত্‌ পৃথিবী দ্যৌর্‌ দ্বিতীয়া-
উতা.ন্তরিক্ষং সমিধা পৃণাতি ।
ব্‌্রহ্মচারী সমিধা মেখলয়া
শ্রমেণ লোকাংস্‌ তপসা পিপর্তি ॥৪॥

১৮

ব্রহ্মচারী

দ্যুলোকে ভূলোকে সাড়া জাগিয়ে ও কে যায় ?
ব্রহ্মচারী।
একমন সব দেবতারা তার সঙ্গে।
সে ধরে রয়েছে পৃথিবীকে স্বর্গকে।
সে আচার্যকে তপস্যা দিয়ে করে চলে পরিপূর্ণ ॥১॥

ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে পিতৃগণ,
যত দেবযোনি, দেবতারা প্রত্যেকে।
গন্ধর্বেরা চলেছে। তিনশো তেত্রিশ ছ হাজার—
সব দেবতাকে তপস্যা দিয়ে-সে করে চলে পরিপূর্ণ ॥২॥

ব্রহ্মচারীকে আচার্য দেন উপনয়ন যখন,
গর্ভের মতো নিয়ে নেন তাকে ভেতরে,
ধারণ করেন উদরে তিনটি রাত।
জন্মালে পরে দেবতারা তাকে দেখতে আসেন সদলে ॥৩॥

এ-পৃথিবী তার একটি সমিধ্, দ্বিতীয় সমিধ্ দ্যৌ,
অন্তরিক্ষ করে সে পূর্ণ একটি সমিধ্ দিয়ে।
সমিধ্, মেখলা, শ্রম ও তপস্যায়
ব্রহ্মচারী-সে পূর্ণ পূর্ণ করে সমস্ত লোক ॥৪॥

পূর্বো জাতো ব্রহ্মণো ব্রহ্মচারী
ঘর্মং বসানস্ তপসো.দ্ অতিষ্ঠত্ ।
তস্মাত্-জাতং ব্রাহ্মণং ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠং
দেবাশ্ চ সর্বে অমৃতেন সাকম্ ॥৫॥

ব্রহ্মচারী-এতি সমিধা সমিদ্ধঃ
কার্ষ্ণং বসানো দীক্ষিতো দীর্ঘশ্মশ্রুঃ ।
স সদ্য এতি পূর্বস্মাদ্ উত্তরং সমুদ্রং
লোকান্-ত্ সংগৃভ্য মুহুর্ আচরিক্রত ॥৬॥

ব্রহ্মচারী জনয়ন্ ব্রহ্মা.পো লোকং
প্রজাপতিং পরমেষ্ঠিনং বিরাজম্ ।
গর্ভো ভূত্বা-অমৃতস্য যোনৌ-
ইন্দ্রো হ ভূত্বা অসুরাং-স্ ততর্হ ॥৭॥

আচার্যস্ ততক্ষ নভসী উভে ইমে
উর্বী গম্ভীরে পৃথিবীং দিবং চ ।
তে রক্ষতি তপসা ব্রহ্মচারী
তস্মিন্ দেবাঃ সংমনসো ভবন্তি ॥৮॥

ইমাং ভূমিং পৃথিবীং ব্রহ্মচারী
ভিক্ষাম্ আ জভার প্রথমো দিবং চ ।
তে কৃত্বা সমিধৌ - উপা.স্তে
তয়োর্ আর্পিতা ভুবনানি বিশ্বা ॥৯॥

ব্রহ্মের আগে ব্রহ্মচারীর জন্ম,
রৌদ্র বসন, উঠেছিল তপোবলে।
ব্রাহ্মণ আর জ্যেষ্ঠ ব্রহ্ম জন্মাল তার থেকে
অমৃত এবং দেবতা সদলবলে ॥৫॥

চলে দীক্ষিত ব্রহ্মচর্যে, কৃষ্ণমৃগের চর্ম পরণে,
সমিধ্-আহুতি-দীপ্ত শরীর, দীর্ঘ শ্মশ্রু শোভিত আননে।
সদ্য যায় সে পূর্বসাগর হতে উত্তরদিক্-সমুদ্রে,
লোক-লোকান্ত হাতে ধ'রে তার আপন করে সে এক মুহূর্তে ॥৬॥

ব্রহ্মচারীর থেকে জন্মাল ব্রহ্ম, জল,
প্রজাপতি, পরমেষ্ঠী, বিরাট্, লোক সকল।
গর্ভ হয়ে সে অমৃত-যোনিতে
ইন্দ্র-মূর্তি হানে অসুরকে ॥৭॥

স্বর্গ-পৃথিবী — গভীর এ দুটি সৃষ্টি-কুয়াশা বিশাল ভূমিকে
তৈরী করেন আচার্য কুঁদে কুঁদে কেটে ছুলে।
ব্রহ্মচারী সে তপ দিয়ে দেয় তাদের পাহারা,
ব্রহ্মচারীতে একমন হয়ে মেলে দেবতারা ॥৮॥

বিরাট এ ভূমি এবং দ্যুলোক
প্রথম ভিক্ষা-আহরণ তার।
এই দুটি তার যজ্ঞ-সমিধ্—
সব সৃষ্টির যুগল আধার ॥৯॥

অর্বাগ্ অন্যঃ পরো অন্যো দিবস্পৃষ্ঠাদ্
গুহা নিধী নিহিতৌ ব্রাহ্মণস্য ।
তৌ রক্ষতি তপসা ব্রহ্মচারী
তত্ কেবলং কৃণুতে ব্রহ্ম বিদ্বান্ ॥১০॥

অর্বাগ্ অন্য ইতো অন্যঃ পৃথিব্যা
অগ্নী সম্ এতো নভসী অন্তরে.মে ।
তয়োঃ শ্রয়ন্তে রশ্ময়ো-অধি দৃঢ়াস্
তান্ আ তিষ্ঠতি তপসা ব্রহ্মচারী ॥১১॥

অভিক্রন্দন্ স্তনয়ন্-ন্ অরুণঃ শিতিঙ্গো
বৃহচ্ছেপো-অনু ভূমৌ জভার ।
ব্রহ্মচারী সিঞ্চতি সানৌ রেতঃ পৃথিব্যাং
তেন জীবন্তি প্রদিশশ্ চতস্রঃ ॥১২॥

অগ্নৌ সূর্যে চন্দ্রমসি মাতরিশ্বন্
ব্রহ্মচারী-অপ্সু সমিধম্ আ দধাতি ।
তাসাম্ অর্চীংষি পৃথগ্ অভ্রে চরন্তি
তাসাম্ আজ্যং পুরুষো বর্ষম্ আপঃ ॥১৩॥

নিভৃতে লুকোন আছে ব্রাহ্মণের দুটি গুপ্তধন—
একটি এখানে আর অন্যটি দ্যুলোকের পার।
ব্রহ্মচারী রক্ষা করে সে-ধন তপস্যা দিয়ে তার,
ব্রহ্মকে জেনে পেয়ে, করে তাকে একান্ত আপন ॥১০॥

পৃথিবীর দিকে, পৃথিবীর থেকে ওঠে-নামে অগ্নির
শিখা। মিলে যায় মহামোহানায় স্বর্গ ও পৃথিবীর।
জড়ায় দ্যুলোক জড়ায় ভূলোক বজ্ররশ্মিজালে,
তার মাঝখানে দাঁড়ায় ব্রহ্মচারী তপস্যাবলে ॥১১॥

ঘন-ঘন-ঘন গুরু-গরজন রক্ত শুভ্র শ্যাম
বিপুলবীর্য পর্জন্যে ও পৃথিবীতে সঙ্গম।
ধরার শীর্ষে ব্রহ্মচারী সে তেজ করে সিঞ্চন—
চারিদিক্ পায় প্রাণ ॥১২॥

অগ্নিতে দেয় সমিধ্ ব্রহ্মচারী
সূর্যে চন্দ্রে মাতরিশ্বায় জলে।
ভিন্ন ভিন্ন সে হোমশিখারা মেঘে মেঘে ধেয়ে চলে
বর্ষণ হয়, জলে জলময়, আজ্য, পুরুষ, নারী ॥১৩॥

আচার্যো মৃত্যুর্ বরুণঃ
সোম ওষধয়ঃ পয়ঃ।
জীমূতা আসন্-ত্ সত্বানস্
তৈর্ ইদং স্বর্ আভৃতম্ ॥১৪॥

অমা ঘৃতং কৃণুতে কেবলম্
আচার্যো ভূত্বা বরুণো
যদ্ যদ্ ঐচ্ছত্ প্রজাপতৌ।
তদ্ ব্রহ্মচারী প্রা.যচ্ছত্
স্বাত্-মিত্রো অধি-আত্মনঃ ॥১৫॥

আচার্যো ব্রহ্মচারী
ব্রহ্মচারী প্রজাপতিঃ।
প্রজাপতির্ বি রাজতি
বিরাড্ ইন্দ্রোঽভবদ্ বশী ॥১৬॥

ব্রহ্মচর্যেণ তপসা
রাজা রাষ্ট্রং বি রক্ষতি।
আচার্যো ব্রহ্মচর্যেণ
ব্রহ্মচারিণম্ ইচ্ছতে ॥১৭॥

আচার্য যম,
বরুণ ও সোম,
গাছপালা-ব্রীহিযব।
তিনি পয়োধার
মেঘেরা যে তাঁর
সেনা-অনুচর সব।

ভরণ করছে তারা
সুরময়বাণী
এ ভুবনখানি
আলোয় আলোয় ভরা ॥১৪॥

আলো ঝরে শুধু···সব মিলে শুধু আলো···
আচার্য হয়ে প্রজাপতি-কাছে
ছিল বরুণের যা কিছু চাওয়ার,
মিত্র ব্রহ্মচারী সবই তাঁকে
গভীর আপন হতে দিল তার ॥১৫॥

আচার্য হন ব্রহ্মচারী যে,
ব্রহ্মচারী সে প্রজাপতি হয়,
প্রজাপতি থেকে হয় সে বিরাট্
তা থেকে ইন্দ্র ইচ্ছাময় ॥১৬॥

ব্রহ্মচর্য-তপস্যা দিয়ে
রাজ্য রাখে রাজায়।
ব্রহ্মচর্য দিয়ে আচার্য
ব্রহ্মচারীকে চায় ॥১৭॥

ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা
যুবানং বিন্দতে পতিম্।
অনড্বান্ ব্রহ্মচর্যেণ
অশ্বো ঘাসং জিগীর্ষতি ॥১৮॥

ব্রহ্মচর্যেণ তপসা
দেবা মৃত্যুম্ অপাঘ্নত।
ইন্দ্রো হ ব্রহ্মচর্যেণ
দেবেভ্যঃ স্বর্ আ ভরত্ ॥১৯॥

ওষধয়ো ভূতভব্যম্
অহোরাত্রে বনস্পতিঃ।
সংবত্সরঃ সহ.র্তুভিস্
তে জাতা ব্রহ্মচারিণঃ ॥২০॥

পার্থিবা দিব্যাঃ পশব
আরণ্যা গ্রাম্যাশ্ চ যে।
অপক্ষাঃ পক্ষিণশ্ চ যে
তে জাতা ব্রহ্মচারিণঃ ॥২১॥

পৃথক্ সর্বে প্রাজাপত্যাঃ
প্রাণান্ আত্মসু বিভ্রতি।
তান্-ত্ সর্বান্ ব্রহ্ম রক্ষতি
ব্রহ্মচারিণি-আভৃতম্ ॥২২॥

ব্রহ্মচর্যে মেয়ে পায় স্বামী—
যুবক নওজোয়ান।
ব্রহ্মচর্যে গাড়ি টানে ষাঁড়
ঘোড়া তৃণসন্ধান ॥১৮॥

ব্রহ্মচর্য-তপে দেবতারা
মৃত্যু হটাল দূরে।
ব্রহ্মচর্যে ইন্দ্র তাদের
আলো এনে দিল ধরে ॥১৯॥

গাছপালা যত, দিন আর রাতও,
যা হল, আর যা হবে,
ঋতুরা, বছর—জন্মেছে সব
ব্রহ্মচারীর থেকে ॥২০॥

যা আছে দিব্য আর পার্থিব
পশু—বনে, গ্রামে থাকে,
অ-পাখা, পাখিরা—জন্মেছে তারা
ব্রহ্মচারীর থেকে ॥২১॥

বিশ্বধাতার যত আছে সন্তান
প্রত্যেকে তারা আপন আপন দেহে ধরে আছে প্রাণ।
ব্রহ্মচারীতে যে-তেজ জমেছে বৃহতের অনুভবে
সেই সঞ্চয় তাদের সবায় আগলে রয়েছে, র'বে ॥২২॥

দেবানাম্ এতত্ পরিষূতম্
অনভ্যারূঢং চরতি রোচমানম্।
তস্মাত্-জাতং ব্রাহ্মণং ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠং
দেবাশ্ চ সর্বে অমৃতেন সাকম্ ॥২৩॥

ব্রহ্মচারী ব্রহ্ম ভ্রাজদ্ বিভর্তি
তস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে সমোতাঃ।
প্রাণাপানৌ জনয়ন্-ন্ আদ্ ব্যানং
বাচং মনো হৃদয়ং ব্রহ্ম মেধা ॥২৪॥

চক্ষুঃ শ্রোত্রং যশো অস্মাসু ধেহি-
অন্নং রেতো লোহিতম্ উদরম্ ॥২৫॥

তানি কল্পদ্ ব্রহ্মচারী সলিলস্য পৃষ্ঠে
তপো-অতিষ্ঠত্ তপ্যমানঃ সমুদ্রে।
স স্নাতো বভ্রুঃ পিঙ্গলঃ
পৃথিব্যাং বহু রোচতে ॥২৬॥

সব দেবতার পুঞ্জপ্রসব চিরচক্ষুর জ্যোতি
সবার অনধিগম্য চূড়ায় ঝলমল করে ওই।
ওরই থেকে নিল জন্ম ব্রহ্ম সর্ববৃহত্তম,
অমৃতসঙ্গী সব দেবতারা, ব্রহ্মের সন্ততি ॥২৩॥

ধরেছে ব্রহ্মচারী সুবিপুল তেজ দেদীপ্যমান।
ব্রহ্মচারীতে সব দেবতারা সূত্রের মত গাঁথা।
তার থেকে নিল জন্ম প্রাণ-অপান,
তার পরে ব্যান, বাক্য ও মন, হৃদয় মন্ত্র মেধা ॥২৪॥

দেখার যা', তা দেখব, নয়ন দাও।
শোনার যা', তা শুনব, শ্রবণ দাও।
দাও হে সুনাম, সবার রাজা হব।
দাও অন্ন, খাবার মতো, খাব।
দাও আমাদের বীর্য—ছোটাই ছুটুক প্রাণস্রোত।
দাও আমাদের পাকস্থলী, রক্ত তাজা হোক ॥২৫॥

জলের মধ্যে মহাসমুদ্রে নিরত তপস্যায়
ব্রহ্মচারী-সে এতে ওতে তাতে দিল রূপ দিল কায়।
উজ্জ্বল পিঙ্গল
স্নানের পরে সে পৃথিবীতে করে ঝলমল ঝলমল ॥২৬॥

——

১৯

বিবাহ-মন্ত্র

শুভদৃষ্টি	অঘোরচক্ষুর্ অপতিঘ্নী-এধি
বর—	শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চাঃ।
	বীরসূর্ দেবকামা স্যোনা
	শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥১॥
বিবাহমণ্ডপে বধূকে নিয়ে	সত্যেনো.ত্তভিতা ভূমিঃ
গিয়ে বর আসনে বসাবে,	সূর্যেণো.ত্তভিতা দ্যৌঃ।
নিজেও বসবে।	ঋতেনা.দিত্যাস্ তিষ্ঠন্তি
আচার্য কর্তৃক সোম-সূর্যা	দিবি সোমো অধি শ্রিতঃ ॥২॥
বিবাহের অনুধ্যান—	
সোমতত্ত্ব	
	সোমেনা.দিত্যা বলিনঃ
	সোমেন পৃথিবী মহী।
	অথো নক্ষত্রাণাম্ এষাম্
	উপস্থে সোম আহিতঃ ॥৩॥
	সোমং মন্যতে পপিবান্
	যত্ সংপিংষন্তি-ওষধিম্।
	সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুর্
	ন তস্যা.শ্নাতি কশ্চন ॥৪॥
বধূকাম সোম	সোমো বধূয়ুর্ অভবদ্
	অশ্বিনা স্তাম্ উভা বরা।
	সূর্যাং যত্ পত্যে শংসন্তীং
	মনসা সবিতা.দদাত্ ॥৫॥

১৯

বিবাহ-মন্ত্র

তাকাও স্নিগ্ধ নয়নে,
চিরদিন থাক পতির সঙ্গে সঙ্গী জীবনে-মরণে।
কল্যাণী, কর পশুদের মঙ্গল,
সুন্দর রাখ মনটি তোমার, রূপে হও উজ্জ্বল।
বীরমাতা হও, সুখদা কোমলা, মন রাখ ভগবানে।
মানুষকে দিও শান্তি, শান্তি দিও, প্রিয়ে, পশুগণে ॥১॥

সত্যের থামে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধরণী।
আলোঝলমল আকাশ— সূর্যে ধরা সে।
ঋতেই দাঁড়িয়ে আছেন আদিত্যেরা।
সোম রয়েছেন আলোঝলমল আকাশে ॥২॥

বলীয়ান্ সোম-বলেই আদিত্যেরা।
পৃথিবী মহান্ সোমে।
সোম রয়েছেন তারাদের মাঝখানে ॥৩॥

সোমলতা পিষে পিষে
'এই তো খেলাম সোম' মনে করে লোকে।
ব্রহ্মবিদেরা যে-সোমকে জেনেছেন,
কেউ তো খায় না তাকে ॥৪॥

সোম বললেন, বধূ চাই, এনে দাও।
অশ্বী দুজন এলেন সূর্যা-বরণে।
পতি চাইছিল মনে মনে সূর্যাও।
সবিতা দিলেন মানস-সম্প্রদানে ॥৫॥

সূর্যার বর্ণনা

চিত্তির্ আ উপবর্হণং
চক্ষুর্ আ অভ্যঞ্জনম্।
দ্যৌর্ ভূমিঃ কোশ আসীদ্
যদ্ অযাত্ সূর্যা পতিম্ ॥৬॥

মনো অস্যা অন আসীদ্
দ্যৌর্ আসীদ্ উত চ্ছদিঃ।
শুক্রৌ-অনড্বাহৌ-আস্তাং
যদ্ অযাত্ সূর্যা গৃহম্ ॥৭॥

দ্বে তে চক্রে সূর্যে
ব্রহ্মাণ ঋতুথা বিদুঃ।
অথৈ.কং চক্রং যদ্ গুহা
তদ্ অদ্ধাতয় ইদ্ বিদুঃ ॥৮॥

সবাইকে প্রণাম

সূর্যায়ৈ দেবেভ্যো
মিত্রায় বরুণায় চ।
যে ভূতস্য প্রচেতস
ইদং তেভ্যোঽকরং নমঃ ॥৯॥

বধূকে উদ্দেশ করে

সোমঃ প্রথমো বিবিদে
গন্ধর্বো বিবিদে-উত্তরঃ।
তৃতীয়ো অগ্নিস্-তে পতিস্
তুরীয়স্ তে মনুষ্যজাঃ ॥১০॥

সূর্যা যখন গেলেন স্বামীর কাছে,
পৃথিবীই ছিল রথাসন তাঁর, ওপরে আকাশ ঢাকা।
'প্রথম দেখায় চিনেছি তোমায়'—এই ছিল উপাধান।
দৃষ্টিই ছিল কাজল, নয়নে-আঁকা ॥৬॥

সূর্যা যখন গেলেন স্বামীর ঘর,
মনই ছিল রথ, রথের বাহন উজ্জ্বল দুটি তারা।
রথের ছাউনি ছিল সূর্যার
আকাশ আলোয় ভরা ॥৭॥

কাল ঘুরে যায় যে দুটি চাকায়—
জানেন ব্রাহ্মণেরা,
সূর্যা, তোমার অলখ চাকাটি জানে
শুধু কবিমনীষীরা ॥৮॥

সূর্যা মিত্র বরুণ এবং
আর সব দেবতারা,
প্রণাম তাঁদের—জীবের চেতনা
বিশাল করেন যাঁরা ॥৯॥

তোমাকে প্রথম পেয়েছিল সোম,
তারপর গন্ধর্ব,
অগ্নি তোমার তৃতীয় পতি সে,
মানুষ চতুর্থ ॥১০॥

অগ্নি প্রজ্বালন করে অগ্নির প্রতি

অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায়
তব দ্যুম্নানি-উত্তমানি সন্তু।
সং জাস্পত্যং সুযমম্ আকৃণুষ্ব
শত্রুয়তাম্ অভি তিষ্ঠা মহাংসি ॥১১॥

বরের আজ্যাহুতি
২ বার দুটি মন্ত্রে
(বধূ ডানহাতে বরের ডান কাঁধ স্পর্শ করে থাকবে)

ওঁ দ্যৌস্ তে পৃষ্ঠং রক্ষতু
বায়ুর ঊরূ অশ্বিনৌ চ।
স্তনন্ধয়াংস্ তে পুত্রান্
সবিতা-অভিরক্ষতু।
আ বাসসঃ পরিধানাদ্ বৃহস্পতির্
বিশ্বে দেবা অভিরক্ষন্তু পশ্চাত্ স্বাহা ॥১২॥

ওঁ পরৈতু মৃত্যুর্
অমৃতং মে-আগাদ্।
বৈবস্বতো নো
অভয়ং কৃণোতু স্বাহা ॥১৩॥

আসন বদলের পর
পাণিগ্রহণ
আচার্য

পূষা ত্বে.তো নয়তু হস্তগৃহ্য
অশ্বিনা ত্বা প্র বহতাং রথেন।
গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথা.সো
বশিনী ত্বং বিদথম্ আ বদাসি ॥১৪॥

বর

গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং
ময়া পত্যা জরদষ্টির্ যথা.সঃ।
ভগো অর্যমা সবিতা পুরন্ধির্
মহ্যং ত্বা.দুর্ গার্হপত্যায় দেবাঃ ॥১৫॥

বিপুল বীর্যে ছড়াও অগ্নি জ্যোতি তব অতুলন,
জিনে এনে দাও দাও আমাদের পরমানন্দধন।
দাম্পত্যকে কর সুনিবিড় অটুট বাঁধনে বাঁধা,
মুখোমুখি হয়ে ভাঙ তেজীয়ান শত্রুর যত বাধা ॥১১॥

পৃষ্ঠ তোমার রক্ষা করুক আকাশ জ্যোতির্ময়,
অশ্বী দুজন আর বায়ু উরু দুটি।
সবিতা রাখুন পুত্রগুলিকে যতদিন দুধ খায়,
যতদিন থাকে নগ্ন—বৃহস্পতি।
তারপর বড় হলে,
রাখবে তাদের আগলে রাখবে সব দেবতারা মিলে ॥১২॥

দূরে যাক মৃত্যু
অমৃত কাছে আসুক।
সূর্যপুত্র যম
অভয় মোদের দিন ॥১৩॥

এইখান থেকে হাত ধরে পূষা তোমাকে নিয়ে চলুন,
অশ্বী দুজন বহন করুন রথে।
গৃহে চলে যাও, গৃহস্বামিনী হও,
নিয়ন্ত্রী হয়ে আজ্ঞা-আদেশ দাও ॥১৪॥

আমার সঙ্গে—স্বামীর সঙ্গে
বুড়ো হবে তুমি একই সঙ্গে
সে-ভাগ্য চেয়ে তোমার হাতটি আমার হাতে নিলাম।
পুরন্ধি ভগ অর্যমা আর
সবিতা দেবতা তোমাকে আমার
গার্হস্থ্যের সঙ্গিনী করে দিলেন সম্প্রদান। ॥১৫॥

বধুর লাজাহোম	ওঁ	দীর্ঘায়ুর্ অস্তু মে পতিঃ	
২ বার দুটি মন্ত্রে		শতং বর্ষাণি জীবতু।	
বধূ		এধন্তাং জ্ঞাতয়ো মম স্বাহা	॥১৬॥
	ওঁ	অর্যমণং নু দেবং	
		কন্যা অগ্নিম্ অযক্ষত।	
		স মাং দেবো অর্যমা	
		প্রে.তো মুঞ্চাতু মা.মুতঃ স্বাহা	॥১৭॥
পরিণয়ন বা অগ্নি-প্রদক্ষিণ	ওঁ	কন্যলা পিতৃভ্যঃ	
বধূকে নিয়ে ৩ বার		পতিলোকং যতী-ইয়ম্	
বর		অপদীক্ষাম্ অযষ্ট।	
		কন্যা উত ত্বয়া বয়ং	
		ধারা উদন্যা ইব	
		অতিগাহেমহি দ্বিষঃ	॥১৮॥

সপ্তপদী গমন	ইষে	বিষ্ণুস্ ত্বা নয়তু	॥১৯॥
(বধূ প্রত্যেকবার ডান	ঊর্জে	বিষ্ণুস্ ত্বা নয়তু	॥২০॥
পা ফেলবে)	ব্রতায়	বিষ্ণুস্ ত্বা নয়তু	॥২১॥
বর	মায়োভবায়	বিষ্ণুস্ ত্বা নয়তু	॥২২॥
	পশুভ্যো	বিষ্ণুস্ ত্বা নয়তু	॥২৩॥
	রায়স্পোষায়	বিষ্ণুস্ ত্বা নয়তু	॥২৪॥
	সপ্তভ্যো হোত্রাভ্যো	বিষ্ণুস্ ত্বা নয়তু	॥২৫॥

দীর্ঘায়ু হোন স্বামী আমার,
বাঁচুন শত বরষ,
বাড়ুন আমার জ্ঞাতিরা ॥১৬॥

অর্যমাদেবতাকে পূজেছিল কন্যা
পূজেছিল অগ্নিকে সঙ্গে।
এখানে ওখানে যত বাধা আছে তা থেকে
মুক্ত করুন তিনি আমাকে ॥১৭॥

নাই বা হল দীক্ষা, মেয়ে যজ্ঞ করেছে
বাপের বাড়ি ছেড়ে, স্বামীর ঘরে চলেছে।
ওগো মেয়ে, তোমায় পেয়ে আমরা অবহেলে
শত্তুরদের স্রোত যেন সব পার হয়ে যাই চলে ॥১৮॥

বিষ্ণু তোমায় নিয়ে চলুন এষণায় ॥১৯॥
বিষ্ণু তোমায় নিয়ে চলুন বীর্যে ॥২০॥
বিষ্ণু তোমায় নিয়ে চলুন ব্রতে ॥২১॥
বিষ্ণু তোমায় নিয়ে চলুন আনন্দে ॥২২॥
বিষ্ণু তোমায় নিয়ে চলুন পশু ও প্রাণের প্রাচুর্যে ॥২৩॥
বিষ্ণু তোমায় নিয়ে চলুন নিত্য নূতন সমৃদ্ধিতে ॥২৪॥
বিষ্ণু তোমায় নিয়ে চলুন সপ্ত বাণীতে ॥২৫॥

আচার্য

ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সম্ ঋধ্যতাম্
অস্মিন্ গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি ।
এনা পত্যা তন্বং সং সৃজস্ব
অধা জিব্রী বিদথম্ আ বদাথঃ ॥২৬॥

মূর্ধাভিষেক
আচার্য

সম্ অঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ
সম্ আপো হৃদয়ানি বাম্ ।
সং মাতরিশ্বা সং ধাতা
সম্ উ দেষ্ট্রী দধাতু বাম্ ॥২৭॥

সিন্দূর দান
বর

যদ্ ইদং হৃদয়ং তব
তদ্ ইদং হৃদয়ং মম
মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু ।
মম চিত্তম্ অনু চিত্তং তে-অস্তু
মম বাচম্ একমনা জুষস্ব ।
বৃহস্পতিস্ ত্বা নি যুনক্তু মহ্যম্ ॥২৮॥

আচার্য

ইহৈ.ব স্তং মা বি যৌষ্টং
বিশ্বম্ আয়ুর্ বি-অশ্নুতম্ ।
ক্রীল.ন্তৌ পুত্রৈর্ নপ্তৃভির্
মোদমানৌ স্বে গৃহে ॥২৯॥

এ ঘর-দুয়ার সকলই তোমার, রানী হয়ে জেগে থাকো,
মনোমত সব পাও যা যা চাও, পাও সন্তান-সুখও।
স্বামীর তনুতে মেশাও তোমার তনু—দেহমনপ্রাণ
বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হয়ে কর দোঁহে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান ॥২৬॥

তোমাদের দুটি প্রাণ
অপ্‌-এরা এবং বিশ্বদেবতা
মাতরিশ্বা ও নিয়তি ও ধাতা
করে দিন একতান ॥২৭॥

তোমার হৃদয় আমারি হৃদয়
আমার হৃদয় তোমারি
মোর ব্রতে তব হৃদয় মিলুক এসে।
আমার চিত্ত তোমার চিত্ত
পাশাপাশি জেগে থাক,
একমনে শুনো মোর কথা ভালবেসে।
তোমাকে আমার সনে
দেবতা বৃহস্পতি বেঁধে দিন সুনিবিড় বন্ধনে ॥২৮॥

ছাড়াছাড়ি যেন হয় না দুজনে
এখানেই থাকো তোমার আপন ঘরে,
অখণ্ড পরমায়ু ভোগ কর
ছেলে নাতি পুতি নিয়ে দোঁহে হেসে-খেলে ॥২৯॥

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব
সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্‌বাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব
সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু ॥৩০॥

প্রেক্ষকানুমন্ত্রণ
দর্শকদের প্রতি
আচার্য

সুমঙ্গলীর্ ইয়ং বধূর্
ইমাং সম্-এত পশ্যত।
সৌভাগ্যম্ অস্মৈ দত্বায়-
অথা.স্তং বি পরেতন ॥৩১॥

——

শ্বশুরের মহারানী হও,
মহারানী হও শাশুড়ীর,
ননদের মহারানী হও,
মহারানী হও দেওরেরও ॥৩০॥

এই বধূ শুভা, সুকল্যাণী,
সকলে আসুন, একে দেখুন,
সৌভাগ্যের আশীর্বাদ দিয়ে
তারপর বাড়িতে ফিরুন ॥৩১॥

———

২০

অথর্ববেদ কাণ্ড ৭ সূক্ত ৬০

ঋষি ব্রহ্মা দেবতা গৃহ, বাস্তোষ্পতি ছন্দঃ অনুষ্টুপ্
১—পরানুষ্টুপ্ ত্রিষ্টুপ্

ঊর্জং বিভ্রদ্ বসুবনিঃ সুমেধা
অঘোরেণ চক্ষুষা মিত্রিয়েণ।
গৃহান্ ঐ.মি সুমনা বন্দমানো
রমধ্বং মা বিভীত মত্ ॥১॥

ইমে গৃহা ময়োভুব
ঊর্জস্বন্তঃ পয়স্বন্তঃ।
পূর্ণা বামেন তিষ্ঠন্তস্
তে নো জানন্ত-আয়তঃ ॥২॥

যেষাম্ অধ্যেতি প্রবসন্
যেষু সৌমনসো বহুঃ।
গৃহান্ উপ হ্বয়ামহে
তে নো জানন্ত-আয়তঃ ॥৩॥

উপহূতা ভূরিধনাঃ
সখায়ঃ স্বাদুসম্মুদঃ।
অক্ষুধ্যা অতৃষ্যা স্ত
গৃহা মা.স্মদ্ বিভীতন ॥৪॥

২০

রম্য গৃহ

তেজে ভরা প্রাণ, ধনী, মেধাবান্,
মিতার স্নিগ্ধ দৃষ্টি নয়নে—
হে গৃহ তোমার গেয়ে স্তবগান
বাড়িতে ফিরছি প্রসন্নমনে ;
খুশি হও, ভয় পেও না আমায় ॥১॥

এ বাড়ি আমার সুখের আগার,
তেজে ভরপুর, দুধের পুকুর,
অচল, অটল, ভরা প্রিয়-ধনে—
আমি যে আসছি সে যেন তা জানে ॥২॥

সুদূর প্রবাসে মনে পড়ে যাকে,
কত ভালবাসা ভরা যার বুকে,
সেই বাড়িটিকে কানে কানে ডাকি—
আমি যে আসছি, তুমি তা জান কি ? ॥৩॥

ধনের সিন্ধু, হে চির-বন্ধু,
আনন্দ-স্বাদু, ডাকছি তোমাকে।
হও ক্ষুধাহীন, হও তৃষাহীন,
ওগো গৃহ ভয় পেও না আমাকে ॥৪॥

উপহূতা ইহ গাব
উপহূতা অজাবয়ঃ।
অথো অন্নস্য কীলাল
উপহূতো গৃহেষু নঃ ॥৫॥

সূনৃতাবন্তঃ সুভগা
ইরাবন্তো হসামুদাঃ।
অতৃষ্যা অক্ষুধ্যা স্ত
গৃহা মা.স্মদ্ বিভীতন ॥৬॥

ইহৈ.ব স্ত মা.নু গাত
বিশ্বা রূপানি পুষ্যত।
ঐ.ষ্যামি ভদ্রেণা সহ
ভূয়াংসো ভবতা ময়া ॥৭॥

ডাকি গাভীদের, অজ-অবি-দের
কি খবর ? ভালো আছ তো সবাই ?
ভাণ্ডার-ভরা অন্ন ও সুধা—
তাদেরও সবার কুশল শুধাই ॥৫॥

হাসি খুশি গান আমোদের বান
ভাগ্যমন্ত অন্ন-পূর্ণা—
হও ক্ষুধাহীন, হও তৃষাহীন,
আমাকে, হে গৃহ, শঙ্কা কোরো না ॥৬॥

এখানেই থাক — পিছু নিয়ো না কো—
সুপুষ্ট হও সর্ব-অঙ্গে।
নিয়ে ধনভার আসিব আবার,
আমি বাড়ি, বাড়ো তুমিও সঙ্গে ॥৭॥

২১

অথর্ববেদ কাণ্ড ৭ সূক্ত ১২

ঋষি শৌনক দেবতা সভা ছন্দঃ অনুষ্টুপ্
১—ভুরিক্ ত্রিষ্টুপ

সভা চ মা সমিতিশ্ চা.বতাং
প্রজাপতের্ দুহিতরৌ সংবিদানে।
যেনা সংগচ্ছৈ-উপ মা স শিক্ষাত্-
চারু বদানি পিতরঃ সংগতেষু ॥১॥

বিদ্ম তে সভে নাম
নরিষ্টা নাম বৈ-অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্
তে মে সন্তু সবাচসঃ ॥২॥

এষাম্ অহং সমাসীনানাং
বর্চো বিজ্ঞানম্ আ দদে।
অস্যাঃ সর্বস্যাঃ সংসদো
মাম্ ইন্দ্র ভগিনং কৃণু ॥৩॥

যদ্ বো মনঃ পরাগতং
যদ্ বদ্ধম্ ইহ বে.হ বা।
তদ্ ব আ বর্তয়ামসি
ময়ি বো রমতাং মনঃ ॥৪॥

২১

রাষ্ট্রসভা

প্রজাপতির দুটি মেয়ে—সভা আর সমিতি—
একজোট হয়ে রক্ষা করুক আমাকে।
যার মুখোমুখি হব, তাকেই যেন শিক্ষা দিতে পারি,
জমায়েতে আমি যেন ভাল বলি, ওগো পিতারা ॥১॥

হে সভা তোমার নাম আমি জানি
সে নামটি হল আড্ডা।
সভাসদ্‌রা যে যেখানে আছেন
সবাই যেন আমার কথায় সায় দেন ॥২॥

এই যারা বসে আছে এখানে,
তাদের সবার তেজ ও বুদ্ধি আমি নিয়ে নিচ্ছি।
এই সমস্ত সংসদের মধ্যে
আমাকে ভাগ্যবান্ করুন ইন্দ্র ॥৩॥

আপনাদের মন কি এখানে নেই?
কিম্বা লেগে আছে এটাতে ওটাতে?
আমি তাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি,
আমাকেই পছন্দ করুক আপনাদের মন ॥৪॥

২২

অথর্ববেদ কাণ্ড ১৯ সূক্ত ৬২

ঋষি ব্রহ্মা দেবতা ব্রহ্মণস্পতি ছন্দঃ অনুষ্টুপ

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু
প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু
প্রিয়ং সর্বস্য পশ্যত
উত শূদ্রে-উতার্যে ॥১॥

২২

সর্বপ্রিয়ত্ব

দেবতার কাছে আমাকে কর হে প্রিয়
রাজ-রাজন্যদের কাছে প্রিয় কর।
দেখুক সকলে, আমি সকলের প্রিয়
শূদ্রের প্রিয় কর, প্রিয় আর্যেরও

——

২৩

ঋগ্বেদ মণ্ডল ১০ সূক্ত ৫৮

ঋষি বন্ধু গৌপায়ন
শ্রুতবন্ধু গৌপায়ন
বিপ্রবন্ধু গৌপায়ন

দেবতা মন-আবর্তন

ছন্দঃ অনুষ্টুপ

যত্ তে যমং বৈবস্বতং
মনো জগাম দূরকম্।
তত্ তে-আ বর্তয়ামসি-
ইহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥১॥

যত্ তে দিবং যত্ পৃথিবীং
মনো জগাম দূরকম্।
তত্ তে-আ বর্তয়ামসি-
ইহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥২॥

যত্ তে ভূমিং চতুর্ভৃষ্টিং
মনো জগাম দূরকম্।
তত্ তে-আ বর্তয়ামসি-
ইহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥৩॥

যত্ তে চতস্রঃ প্রদিশো
মনো জগাম দূরকম্।
তত্ তে-আ বর্তয়ামসি-
ইহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥৪॥

যত্ তে সমুদ্রম্ অর্ণবং
মনো জগাম দূরকম্।
তত্ তে-আ বর্তয়ামসি-
ইহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥৫॥

২৩

মন-আবর্তন

তোমার যে-মন উধাও সুদূরে
বৈবস্বত যমে,
ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-ব'র্তে ॥১॥

তোমার যে-মন সুদূরে উধাও
দ্যুলোকে পৃথিবীলোকে,
ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-ব'র্তে ॥২॥

সুদূরে উধাও তোমার যে-মন
ধরার চতুষ্কোণে,
ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-ব'র্তে ॥৩॥

সুদূরে উধাও যে-মন তোমার
দিকে দিকে দিকে দিকে,
ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-ব'র্তে ॥৪॥

যে-মন তোমার সুদূরে উধাও
সমুদ্রে-জলধিতে,
ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-ব'র্তে ॥৫॥

যত তে মরীচীঃ প্রবতো
মনো জগাম দূরকম্ ।
তত্ তে-আ বর্তয়ামসি-
ইহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥৬॥

যত্ তে অপো যদ্ ওষধীর্
মনো জগাম দূরকম্ ।
তত্ তে-আ বর্তয়ামসি-
ইহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥৭॥

যত্ তে সূর্যং যদ্ উষসং
মনো জগাম দূরকম্ ।
তত তে-আ বর্তয়ামসি-
ইহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥৮॥

যত্ তে পর্বতান্ বৃহতো
মনো জগাম দূরকম্ ।
তত্ তে-আ বর্তয়ামসি-
ইহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥৯॥

যত্ তে বিশ্বম্ ইদং জগত্-
মনো জগাম দূরকম্ ।
তত্ তে-আ বর্তয়ামসি-
ইহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥১০॥

যে-মন তোমার উধাও সুদূরে
আলোকের ঢেউয়ে ঢেউয়ে,
ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-ব'র্তে ॥৬॥

তোমার যে-মন উধাও সুদূরে
বৃক্ষলতায় জলে,
ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-ব'র্তে ॥৭॥

তোমার যে-মন সুদূরে উধাও
যে-মন উষায়, সূর্যে,
ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-ব'র্তে ॥৮॥

সুদূরে উধাও তোমার যে-মন
মহা-গিরি-পর্বতে,
ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-ব'র্তে ॥৯॥

সুদূরে উধাও যে-মন তোমার
নিখিল এ চরাচরে,
ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-ব'র্তে ॥১০॥

যত্ তে পরাঃ পরাবতো
মনো জগাম দূরকম্।
তত্ তে-আ বর্তয়ামসি-
ইহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥১১॥

যত্ তে ভূতং চ ভব্যং চ
মনো জগাম দূরকম্।
তত তে-আ বর্তয়ামসি-
ইহ্ ক্ষয়ায় জীবসে ॥১২॥

——

যে-মন তোমার সুদূরে উধাও
অজানা হতে অজানায়,
ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-ব'র্তে ॥১১॥

যে-মন তোমার উধাও সুদূরে
অতীতে ভবিষ্যতে,
ফিরিয়ে আনছি আমরা তাকে আবার
এখানে, থাকতে এখানেই বেঁচে-ব'র্তে ॥১২॥

——

২৪

অথর্ববেদ কাণ্ড ৩ সূক্ত ৩০

ঋষি অথর্বা দেবতা চন্দ্রমা, সাংমনস্য ছন্দঃ অনুষ্টুপ্
৬—প্রস্তারপঙ্‌ক্তি

সহৃদয়ং সাংমনস্যম্
অবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।
অন্যো অন্যম্ অভি হর্যত
বত্‌সং জাতম্ ইবা.ঘ্ন্যা ॥১॥

অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো
মাত্রা ভবতু সংমনাঃ।
জায়া পত্যে মধুমতীং
বাচং বদতু শন্তিবাম্ ॥২॥

মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্
মা স্বসারম্ উত স্বসা।
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা
বাচং বদত ভদ্রয়া ॥৩॥

সমানী প্রপা সহ বোঽন্নভাগঃ
সমানে যোক্ত্রে সহ বো যুনজ মি।
সম্যঞ্চোঽগ্নিং সপর্যত-
অরা নাভিম্ ইবা.ভিতঃ ॥৬॥

—–

২৪

সাংমনস্য

বিদ্বেষহীন করি তোমাদের,
একমন এক হৃদয় প্রাণ।
একে অন্যকে চাও, ভালোবাসো,
গাভীর যেমন বাছুরে টান ॥১॥

পুত্র পিতার ব্রতে ব্রতী হোক
মায়ের সঙ্গে সমান-মন।
পতির সঙ্গে বলুক পত্নী
শান্ত স্নিগ্ধ মধুবচন ॥২॥

ভাইকে করে না দ্বেষ যেন ভাই,
বোনও যেন দ্বেষ করে না বোনকে।
এক হও সবে, ব্রতী এক ব্রতে,
কথা বলাবলি কর আনন্দে ॥৩॥

সবাই সমান তৃষ্ণার জল পাক।
সবার জন্যে সমান অন্ন থাক।
বাঁধি তোমাদের এক ক'রে এক বাঁধনে ;
সবে হয়ে এক চক্রের মতো অগ্নিকে ঘের' সাধনে ॥৬॥

২৫

অথর্ববেদ কাণ্ড ১৯ সূক্ত ৯

ঋষি ব্রহ্মা দেবতা শান্তি, বহুদেবতা ছন্দঃ অনুষ্টুপ্ ও অন্যান্য

শান্তা দ্যৌঃ শান্তা পৃথিবী
শান্তম্ ইদম্ উর্ব.ন্তরিক্ষম্।
শান্তা উদন্বতীর্ আপঃ
শান্তা নঃ সন্তু-ওষধীঃ ॥১॥

শান্তানি পূর্বরূপাণি
শান্তং নো অস্তু কৃতাকৃতম্।
শান্তং ভূতং চ ভব্যং চ
সর্বম্ এব শম্ অস্তু নঃ ॥২॥

ইয়ং যা পরমেষ্ঠিনী
বাগ্‌দেবী ব্রহ্মসংশিতা।
যয়ৈ.ব সসৃজে ঘোরং
তয়ৈ.ব শান্তির্ অস্তু নঃ ॥৩॥

ইদং যত্ পরমেষ্ঠিনং
মনো বাং ব্রহ্মসংশিতম্।
যেনৈ.ব সসৃজে ঘোরং
তেনৈ.ব শান্তির্ অস্তু নঃ ॥৪॥

ইমানি যানি পঞ্চে.ন্দ্রিয়াণি
মনঃষষ্ঠানি মে হৃদি ব্রহ্মণা সংশিতানি
যৈর্ এব সসৃজে ঘোরং
তৈর্ এব শান্তির্ অস্তু নঃ ॥৫॥

২৫
শান্তি

শান্ত দ্যুলোক শান্ত পৃথিবী
শান্ত এ মহা অন্তরিক্ষ।
শান্ত হোক স্রোতস্বী সলিল
শম্ সমস্ত ওষধি-বৃক্ষ ॥১॥

শান্ত হোক হে পূর্ব-আভাস
শান্ত যা কিছু করেছি, করিনি।
শান্ত শান্ত হোক সমস্ত
শান্ত অতীত শান্ত আগামী ॥২॥

সবার ওপরে এই রয়েছেন
যে-বাগ্‌দেবতা শাণিত মন্ত্রে,
যাঁকে দিয়ে করা হল অভিচার
তাঁকে দিয়ে হোক মোদের শান্তি ॥৩॥

সবার ওপরে রয়েছে এই যে
তোমাদের মন শাণিত মন্ত্রে,
যাকে দিয়ে করা হল অভিচার
তা দিয়েই হোক মোদের শান্তি ॥৪॥

এই যে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়-মন
হৃদয়ে আমার শাণিত মন্ত্রে.
করেছি যাদের দিয়ে অভিচার,
তাদের দিয়েই হোক-না শান্তি ॥৫॥

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ
শং বিষ্ণুঃ শং প্রজাপতিঃ।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ
শং নো ভবতু-অর্যমা ॥৬॥

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ
শং বিবস্বান্-শম্ অন্তকঃ।
উত্পাতাঃ পার্থিবান্তরিক্ষা
শং নো দিবিচরা গ্রহাঃ ॥৭॥

শং নো ভূমির্ বেপ্যমানা
শম্ উল্কা নির্হতং চ যত্।
শং গাবো লোহিতক্ষীরাঃ
শং ভূমির্ অব তীর্যতীঃ ॥৮॥

নক্ষত্রম্ উল্কাভিহতং শম্ অস্তু নঃ
শং নোঽভিচারাঃ শম্ উ সন্তু কৃত্যাঃ।
শং নো নিখাতা বল্গাঃ শম্ উল্কা
দেশোপসর্গাঃ শম্ উ নো ভবন্তু ॥৯॥

শং নো গ্রহাশ্ চান্দ্রমসাঃ
শম্ আদিত্যশ্ চ রাহুণা।
শং নো মৃত্যুর্ ধূমকেতুঃ
শং রুদ্রাস্ তিগ্মতেজসঃ ॥১০॥

শান্ত মিত্র শান্ত বরুণ
শান্ত বিষ্ণু হোন, প্রজাপতি,
অর্যমা হোন শান্ত, শান্ত
ইন্দ্র এবং বৃহস্পতি ॥৬॥

শান্ত মিত্র শান্ত বরুণ
শান্ত বিবস্বান্, কৃতান্ত,
মাটিতে আকাশে যত উৎপাত
শান্ত গ্রহেরা নভে চরন্ত ॥৭॥

শান্ত হোক হে কম্পিতা ভূমি
শান্ত উল্কা ঝটিকা ঝঞ্ঝা।
শান্ত গাভীরা লোহিত-ক্ষীরা
শান্ত হে ধস্ নামে যখন যা ॥৮॥

উল্কাভিহত শম্ নক্ষত্র
শম্ হোক যত যাদু তুকতাক।
শম্ হোক মায়াপিশাচীর দল
ভুঁয়ে-পুঁতে-রাখা বিষ-পুত্তল
শান্ত উল্কা, দেশের বিপদ্ ॥৯॥

শম্ হোক যত চন্দ্রগ্রহণ
রাহুগ্রস্ত শম্ আদিত্য।
শান্ত মৃত্যু শম্ ধূমকেতু
শম্ রুদ্রেরা তেজ-প্রদীপ্ত ॥১০॥

শং রুদ্রাঃ শং বসবঃ
শম্ আদিত্যাঃ শম্ অগ্নয়ঃ।
শং নো মহর্ষয়ো দেবাঃ
শং দেবাঃ শং বৃহস্পতিঃ ॥১১॥

ব্রহ্ম প্রজাপতির্ ধাতা
লোকা বেদাঃ সপ্তঋষয়োঽগ্নয়ঃ।
তৈর্ মে কৃতং স্বস্ত্যয়নম্
ইন্দ্রো মে শর্ম যচ্ছতু
ব্রহ্মা মে শর্ম যচ্ছতু।
বিশ্বে মে দেবাঃ শর্ম যচ্ছন্তু
সর্বে মে দেবাঃ শর্ম যচ্ছন্তু ॥১২॥

যানি কানি চিত্-শান্তানি
লোকে সপ্তঋষয়ো বিদুঃ।
সর্বাণি শং ভবন্তু মে
শং মে অস্ত্বভয়ং মে অস্তু ॥১৩॥

পৃথিবী শান্তির্ অন্তরিক্ষং শান্তির্ দ্যৌঃ শান্তির্ আপঃ শান্তির্ ওষধয়ঃ শান্তির্ বনস্পতয়ঃ শান্তির্ বিশ্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ সর্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিভিঃ।
তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্বশান্তিভিঃ শময়ামোঽহং যদ্ ইহ ঘোরং যদ্ ইহ ক্রূরং
যদ্ ইহ পাপং তত্-শান্তং তত্-শিবং সর্বম্ এব শম্ অস্তু নঃ ॥১৪॥

— —

শম্ রুদ্রেরা শান্ত বসুরা
শম্ আদিত্য-অগ্নি-বৃন্দ।
শান্ত মহর্ষিরা তেজস্বী
শম্ দেবতারা বৃহস্পতিও ॥১১॥

ব্রহ্ম বিধাতা প্রজাপতি সব লোক
সব বেদ সব অগ্নি সপ্ত ঋষিরা
আমার জন্যে এনেছেন তাঁরা স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।
দিন আনন্দ-শরণ ইন্দ্র আমাকে
দিন আনন্দ-শরণ ব্রহ্মা আমাকে
বিশ্বদেবেরা দিন আনন্দ-শরণ
সব দেবতারা দিন আনন্দ-শরণ ॥১২॥

সপ্ত ঋষির জানা যত কিছু
শান্ত রয়েছে এলোকে ওলোকে
শম্ হোক তারা আমার জন্যে
শম্ হোক মোর অভয় হোক হে ॥১৩॥

পৃথিবী শান্তি, অন্তরিক্ষ শান্তি, দ্যুলোক শান্তি,
শান্তি সলিল, শান্তি ওষধিরা, শান্তি বনস্পতিরা,
বিশ্বদেবেরা আমার শান্তি, সর্বদেবেরা আমার শান্তি,
শান্তি আর শান্তি আর শান্তি।
সেই সব শান্তি দিয়ে সর্বশান্তি দিয়ে
আমি শান্ত করব
যা কিছু নিষ্ঠুর আছে এখানে, যা কিছু ভয়ঙ্কর।
যা কিছু পাপ তা শান্ত হোক শিব হোক।
সব শান্তি হোক আমাদের ॥১৪॥

বেদের কবিতা / ভাষ্য

১। ঋষি মধুচ্ছন্দার অগ্নিসূক্ত

কিংবদন্তী বলে, সমগ্র বেদকে ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব এইভাবে ভাগে ভাগে আলাদা করে সাজিয়েছিলেন বলে দ্বৈপায়ন কৃষ্ণের নাম হল বেদব্যাস। ব্যাস মানে যিনি বিশ্লেষণ করেন।

বেদব্যাস—তিনি যিনিই হোন—যখন ঋগ্বেদ সংকলন করলেন, তখন তাকে ভাগ করলেন দশটি মণ্ডলে। তার প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তটি হল ঋষি মধুচ্ছন্দার অগ্নিসূক্ত। অর্থাৎ তিনি আদিবেদ ঋগ্বেদ সুরু করলেন মধুচ্ছন্দাকে দিয়ে। তেমনি নবম মণ্ডলের প্রথমেও তিনি রাখলেন মধুচ্ছন্দার সূক্ত। নবম মণ্ডল সোমমণ্ডল—সোমসূক্তের সংগ্রহ। সোমযাগ শ্রেষ্ঠ যাগ। সোম বৈদিক সাধনার চরম লক্ষ্য। আর অগ্নি হলেন বৈদিক সাধনার আদি। প্রথম থেকে সপ্তম পর্যন্ত প্রতিটি মণ্ডল এবং প্রথমের উপমণ্ডলগুলির আদিতে অগ্নিসূক্ত এই কারণেই রেখেছেন সংকলয়িতা। সুরুতে অগ্নি, অন্তে সোম। সুরুতে ক্ষুধা, অন্তে সুধা। 'পুরুষের অনন্ত বেদন / মর্ত্যের মদিরা মাঝে স্বর্গের সুধারে অন্বেষণ' (নারী, সানাই—রবীন্দ্রনাথ)। এই নিয়ে জীবন। তাই তন্ত্র বললেন, অগ্নীষোমাত্মকং জগত্, অর্থাৎ, অগ্নি আর সুধা—এই নিয়ে বসুধা।

সাধনা এবং তদনুযায়ী সাজানো সংকলনের আদিতে এবং অন্তভাগে প্রথমেই ঋষি মধুচ্ছন্দাকে স্থান দিলেন বেদব্যাস। কেন তাঁর এই গৌরব (importance)? খুঁজলে কতগুলি কারণ পাওয়া যায়।

মধুচ্ছন্দা ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্র। এই বংশের পাঁচ পুরুষের সূক্ত পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। প্রথম পুরুষ—কুশিক ঐষীরথি। দ্বিতীয়—তাঁর পুত্র গাথী কৌশিক। তৃতীয়—তাঁর পুত্র বিশ্বামিত্র গাথিন। চতুর্থ—বিশ্বামিত্রের পুত্রেরা, মধুচ্ছন্দা অষ্টক ঋষভ কত দেবরাত পূরণ প্রজাপতি রেণু। পঞ্চম—এঁদের পুত্রেরা, যেমন মধুচ্ছন্দার পুত্র জেতা এবং অঘমর্ষণ, কতের পুত্র উৎকীল। পাঁচ পুরুষ ধরে ঋষিত্বের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন এঁরা। ঋগ্বেদের ঋষিদের মধ্যেও এরকম উদাহরণ খুব বেশী নেই।

মধুচ্ছন্দা অসাধারণ পিতার অসাধারণ পুত্র। ঋগ্বেদের সাড়ে দশ হাজার

মন্ত্রের মধ্যে থেকে ঋষি বিশ্বামিত্রের সবিতৃদেবের উদ্দেশে উচ্চারিত গায়ত্রী-মন্ত্রটিই দ্বিজত্বের দীক্ষামন্ত্ররূপে নির্বাচিত এবং গৃহীত হয়েছে, এবং আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষ এখনো পর্যন্ত তা মেনে চলেছে—এতেই প্রমাণ হয় বিশ্বামিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। কোনো এক সময় ভরতবংশীয়দের লক্ষ্য করে বলা তাঁর আত্মগরিমাময় উক্তিটি পরবর্তীকালে সারা ভারতবর্ষ সম্পর্কেই প্রযোজ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে—

বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি ব্রহ্মেদং ভারতং জনম্।
বিশ্বামিত্রের এই মন্ত্র রক্ষা করছে ভারত-জনকে।

ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে বিশ্বামিত্র এবং তদ্বংশীয়দের সূক্ত সংগৃহীত হয়েছে।

এই বিশ্বামিত্রের একশ এক পুত্রের মধ্যে মধ্যম হলেন মধুচ্ছন্দা। অর্থাৎ তাঁর ওপরে পঞ্চাশ এবং নিচে পঞ্চাশ ভাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, বরুণের বলিরূপে ক্রীত অজীগর্তের-পুত্র শুনঃশেপ দেবতার কৃপায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যখন নৃশংস পিতার কাছে আর ফিরে যেতে চাইল না, তখন বিশ্বামিত্র তাকে পুত্র বলে গ্রহণ করে নিজের পুত্রদের আদেশ দিলেন তাকে জ্যেষ্ঠ বলে স্বীকার করে নিতে। মধুচ্ছন্দার পঞ্চাশ দাদা তাতে আপত্তি করল। মধুচ্ছন্দা কিন্তু তাঁর পঞ্চাশ ছোটভাইএর সঙ্গে সানন্দে পিতার আদেশ মেনে নিলেন। ফলে তিনি লাভ করলেন পিতার আশীর্বাদ।

ঐতরেয় আরণ্যকে (১।১।৩) আছে মধুচ্ছন্দা নামটির নিরুক্তি—মধু হ স্ম বা ঋষিভ্যো মধুচ্ছন্দাশ্ছন্দতি, তন্মধুচ্ছন্দসো মধুচ্ছন্দস্ত্বম্। যাঁর ছন্দ মধুময় তিনিই মধুচ্ছন্দা। মধু সোম। আনন্দঘন চেতনা। সোম্যচেতনার অধিকারী হয়ে যিনি সোম্যা বাক্ উচ্চারণ করেন তিনিই মধুচ্ছন্দা। সোম্যচেতনা কেমন হয় তার বিবৃতি আছে সংহিতায়, উপনিষদে। ঋষি গোতম রাহূগণ তাঁর বিখ্যাত মধুতৃচে বলছেন—'ঋতকে চেয়েছি তাই, বায়ু হল মধুময়। সিন্ধুরা করে মধু-ক্ষরণ, মধু হোক ওষধিরা। রাত্রী মাধবী, মাধবী উষারা, মধু এ পৃথিবীলোক, মধুময় হোক দ্যৌ আমাদের পিতা। মধু আমাদের বনস্পতিরা, মধুর সূর্য হোক, মধুময়ী হোক আমাদের গাভীগুলি। সোম-মণ্ডলের উপান্ত্য-সূক্তেও রয়েছে ঋষি কশ্যপ মারীচের জ্যোতির্ময় অমৃত আনন্দলোকের উচ্ছল বর্ণনা।

উপনিষদ্ বলছেন, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জেনেছেন, তিনি ভয় পান না কিছুকেই। আনন্দাত্ হি এব

খল্ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্তি-অভি-সংবিশন্তি। আনন্দ থেকেই তো দেখছি এই সব কিছু জন্মাচ্ছে, জন্মে' বেঁচে থাকছে আনন্দেই, আবার চলে গিয়ে প্রবেশ করছে আনন্দেই।

এই আনন্দের সিদ্ধ ঋষি মধুচ্ছন্দা।

আর একটি রহস্য আছে তাঁর নামে। মধুচ্ছন্দস্>মধুচ্ছন্দাঃ (বাংলা বানানে বিসর্গটি দেওয়া হয় না, যেমন দুর্বাসস্>দুর্বাসাঃ, লেখা হয় দুর্বাসা)। শব্দটি উভলিঙ্গ। অর্থাৎ মধুচ্ছন্দা পৌঁছেছেন সেই ভূমিতে যেখানে চেতনা হয়ে যায় 'স্ত্রী চ পুমাংশ্চ'—অর্ধনারীশ্বর। যাস্ক নিরুক্তের এক জায়গায় (২।৯) বলেছেন শাকপূণির কাছে দেবতা আবির্ভূত হয়েছিলেন উভলিঙ্গ হয়ে। অর্থাৎ দেবতার স্ত্রী-পুরুষ নেই, 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি'। তিনি চেতনা শক্তি ও আনন্দের নির্দ্বন্দ্ব সমাহার। 'দেবতা' নামটিই তার প্রমাণ। এই দেবতারই চরম পরম রূপ হলেন স্ত্রীত্ব-পুংস্ত্ব-ভেদলেশহীন অদ্বয় অদ্বৈত নপুংসক ব্রহ্মন্। সেই ব্রহ্ম বা বৃহতের অনুভব তরঙ্গিত হয়ে হয় ছন্দস্। এই 'ছন্দস্' শব্দটিও ক্লীবলিঙ্গ। মধুচ্ছন্দা বৃহতের সেই আনন্দ-তরঙ্গ-পরম্পরা হৃদয়ে অনুভব করছেন উচ্চারণ করছেন আর হয়ে উঠছেন মধুচ্ছন্দা।

মধুচ্ছন্দার অগ্নিসূক্ত হল ঋগ্বেদের স্বরসপ্তকের প্রথম ষড়্‌জ-স্বর, সা। সা-এর মধ্যে যেমন নিহিত আছে অন্য ছটি স্বর, তেমনি এই অগ্নিসূক্তটির মধ্যে নিহিত আছে বৈদিক সাধনার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত—তার প্রক্রিয়া, উপকরণ, চলন, সিদ্ধি এবং লক্ষ্য।

সে সাধনার অন্য নাম যজ্ঞ। যজ্ঞ মানে জীবন। যজ্ঞ মানে সংগ্রাম, যাত্রা, আরোহণ। যজ্ঞ মানে নিজেকে বারবার পূর্ণাহুতি দিয়ে নিজের পূর্ণতর স্বরূপ দেবস্বরূপকে ফিরে ফিরে-পাওয়া। তার প্রক্রিয়া হল এ-সূক্তের প্রথম দুটি শব্দ 'অগ্নিম্ ঈলে.'—আমার দ্বারা অগ্নির ঈল.ন অর্থাৎ ইন্ধন, সমিন্ধন, স্তবন, পূজন। অগ্নিকে জ্বালিয়ে তোলা এবং জ্বালিয়ে রাখা। আমার অন্তরস্থ অগ্নিকে দেব-জ্যোতিকে অমৃত-শিখাকে 'নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি'কে জ্বালাতে হবে আমাকেই আমার সাধন-বীর্যে। বারে বারে জ্বালবি বাতি হয়ত বাতি জ্বলবে না, তবু। তাই অগ্নি আমার সহসঃ সূনুঃ, ঊর্জো নপাত্—বীর্যসম্ভব পুত্র।

আলায়ে ধরিয়া সাবধানে অন্তর-প্রদীপখানি, তারপর তাকে রাখতে হবে সামনে—'পুরো-হিতম্'। এই অগ্নি যখন হলেন আমার দেহ-গৃহপতি, গৃহ-স্বামী, জীবনস্বামী, তখন সুরু হল যজ্ঞ, জীবন-যজ্ঞ। তার আগে 'শুচি আসন টেনে টেনে বিধান মেনে' যজ্ঞ-বেদিতে অগ্নিগর্ভে যে ঘৃতাহুতি দেওয়া গেছে, তা শুধু এই সত্যেরই অভিনয়মাত্র। আসল যজ্ঞ সুরু তখন, যখন—

স্বদেহম্ অরণিং কৃত্বা প্রণবং চ উত্তরারণিম্।
ধ্যান-নির্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেত্-নিগূঢ়বত্॥ (শ্বেতাশ্বতর ১।১৪)

নিচের অরণি হয় এই দেহাধার
উত্তর-অরণি হয় প্রণব-ঝঙ্কার।
ধ্যান করি ধ্যান করি—নিদিধ্যাসন,
হৃদয়-সমুদ্রে চলে নিবিড় মন্থন।
আঁধারে বিদ্যুৎ-সম দেখি সচকিতা
অন্তরে লুকিয়ে আছে অন্তর-দেবতা।

এই নূতন যাত্রা-সুরুর, যজ্ঞের ঋত্বিক্ মানুষ নয়, দেবতা। অগ্নি। 'দেবম্ ঋত্বিজম্'। দেব-ঋত্বিক্। বিশেষ করে কোন্ ঋত্বিক্ তিনি? না, হোতা। হোতার কাজ হল আবাহন, ডাক দিয়ে নামিয়ে আনা সমস্ত দেবতাদের জাগ্রত উদ্বুদ্ধ যজমানের জীবন-যজ্ঞের পুরো-হিত নায়ক অগ্নিই হলেন সেই হোতা, যিনি ডাক দিয়ে দিয়ে যজমানের হৃদয়বেদিতে এনে বসাবেন 'আনুষক্' (ঋ ২।৬।৮) একে একে, সমস্ত দেবতাদের —

অগ্নি জাগ্‌লে জাগে সব দেবতা,
জাগে সোম, জাগে বায়ু, ইন্দ্র ··মাতা
অদিতি অদিতি জাগে অখণ্ডা বাক্—
পুড়ে খাক্ পুড়ে খাক্ সব পুড়ে খাক্।

এ-যজ্ঞের উপকরণ হল—'ধী' ধ্যান-চিত্ত এবং 'নমঃ' নম্র নমস্কার—বুদ্ধি ও শ্রদ্ধার একাত্ম সমন্বয়।

এ যজ্ঞের চলন কেমন?

অনুদ্বুদ্ধ যজ্ঞ চলে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে, 'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ' অন্ধ-চালিত অন্ধদের মত। সেখানে ঋত্বিক্ যজমান সবাই অচেতন, তাই সেখানে—

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নয় মন্ত্র, শুধু জিহ্বার অভ্যস্ত ব্যায়াম।

লাভ-লক্ষ্য দীন-চিত্ত স্থূলবুদ্ধি ধনী—যজমান।

ঋত্বিক্‌ও তথৈবচ, আওড়ায় জড় শব্দ, লক্ষ্য থাকে দক্ষিণার দিকে।

আগুনও জড়পদার্থ, ঘৃত চরু পুরোডাশ পশু সোমরস খেয়ে ফিকে।

উদ্‌বুদ্ধ যজ্ঞ চলে অন্ধকার থেকে আলোয়—

উদ্ বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্ পশ্যন্ত উত্তরম্।

দেবং দেবত্রা সূর্যম্ অগন্ম জ্যোতির্‌ উত্তমম্ ঋ ১।৫০।১১

আঁধারের বেড় উজিয়ে ঊর্ধ্বে

আলোর বলয় দেখতে দেখতে

আরো উঁচু আরো উঁচুতে আমরা

সব আলোকের আলোতে এলাম

উত্তম জ্যোতি পরম সূর্যে।

অগ্নি তখন দোষা-বস্তা। উজলে তোলেন রাত্রির অন্ধকার।

প্রবুদ্ধ যজ্ঞ চলে 'দিবেদিবে', আলো থেকে আরো আলোয়, দেবতা থেকে দেবতায়। এক উদ্ভাস থেকে আর এক উদ্ভাসে।

সেই সমস্ত উদ্ভাস যখন স্থির হয়ে যজমানের ধ্যানঘন জ্ঞানঘন প্রেমঘন চিত্তে এসে বসে, আর ছড়িয়ে পড়ে তার আপন দ্যুতির মত, তখন যজমানের সত্তা হয়ে যায় রত্ন-প্রভা। জীবনযজ্ঞনায়ক অগ্নি হয়ে যান তার রত্ন-ধাতা, রত্ন-দাতা। এমনটি কি আর কেউ দিতে পারে? তাই তিনি 'রত্নধাতম'। এই রত্ন ছাড়া আর একটি আশ্চর্য সিদ্ধি দেন তিনি। সেটি হল, 'চিত্রং শ্রবঃ'। চিত্র শ্রুতি, উজ্জ্বল আশ্চর্য শ্রবণ। তিনি 'কথা শোনান'। একথার মধ্যে দিয়ে সেকথা; সেই কথা, সেই উজ্জ্বল আশ্চর্য কথা, যার নাম মন্ত্র ঋক্ যজুঃ সাম। অর্থাৎ অগ্নি হলেন কবিক্রতু, ঋষিক্রতু। এই আশ্চর্য দানে সমৃদ্ধ মধু-চ্ছন্দা কবি ঋষি মধুচ্ছন্দা বলছেন, তুমি 'চিত্রশ্রবস্তম', এমন দেওয়া আর কে দিয়েছে তুমি ছাড়া?

কিন্তু এই রত্ন বা শ্রবস্ পাওয়ার থেকেও বড় পাওয়া আছে। তা হল স্বয়ং দেবতাকেই পাওয়া—সখা বন্ধু পিতা মাতা প্রিয় রূপে। 'সু-উপায়ন' সহজভাবে কাছে আসাই দেবতার সব থেকে বড় 'সু-উপায়ন', সুন্দর উপহার। শুধু আসা নয়, 'সচন', জড়িয়ে ধরা তাঁর নিবিড় স্পর্শ দিয়ে, 'যাহা কিছু আছে সকলই ঝাঁপিয়া'। হিরণ্যগর্ভ-সূক্তে দেবতাকে বলা হয়েছে 'আত্ম-দা', তিনি নিজেকে

দেন। তখন যজমান হয়ে যান অগ্নি, অগ্নি হয়ে যান যজমান। উপাস্য-উপাসকে ঘটে আশ্চর্য এক দ্বৈতাদ্বৈত অচিন্ত্যভেদাভেদ। মধুচ্ছন্দা এই আত্মদা অগ্নিকে ডেকেছেন 'অঙ্গিরস্' বলে। উপাসককে আত্মসাৎ করে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে অঙ্গার করে দিয়ে অগ্নিই হয়ে গেছেন অঙ্গিরাঃ। দান এবং গ্রহণে কোন ভেদ নেই, একাকার! এইখানে যজ্ঞ পৌঁছয় তার পরিপূর্ণতায়। তখন স্বস্তি। তবেই স্বস্তি। সু-অস্তি, চরম ভালো-থাকা।

এই স্বস্তির কূলে পৌঁছে এবং পৌঁছিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন মধুচ্ছন্দা—

স নঃ পিতেব সূনবে-অগ্নে সূপায়নো ভব।
সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে

পিতা যেমন সহজভাবে পুত্রের কাছে এসে জড়িয়ে ধরেন তাকে, তেমনি সহজে এসে জড়িয়ে ধর আমাদের, হে অগ্নি। তবেই স্বস্তি। শুধু আমার নয়, 'নঃ' আমাদের সবার স্বস্তি।

এই সর্বজনীন সামাজিক স্বস্তির উপায় হল 'সংজ্ঞান', সাংমনস্য, এক-মন এক-প্রাণ হওয়া। সমগ্র ঋগ্বেদ-সংহিতার শেষ সূক্তেও আছে Welfare Society-র কল্পনা—

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।

অর্থাৎ মধুচ্ছন্দার সূক্তটির মধ্যে বীজাকারে নিহিত হয়ে আছে সমগ্র ঋগ্বেদ। বীজ তো নয়, মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা। অঙ্কুর নয়, পুষ্পিত, স্তবকিত, ফলিত, ঊর্ধ্বপ্রসারিত অধোবিসর্পিত শ্যামতরঙ্গিত সুবিশাল অরণ্য।

এ অরণ্যের অধিকার ফিরে পেতে হবে আমাদের।

এ-সূক্তের ছন্দ হল গায়ত্রী।

ঋষি দেবতা ছন্দ। তিন নিয়ে মন্ত্র।

তিনে এক, একে তিন। ঋষি হলেন অহম্, আমি। দেবতা হলেন ত্বম্, তুমি। আর ছন্দ হল এই অহম্ আর ত্বমের মধ্যে ভাবতরঙ্গ, তরঙ্গদোলা। ত্বম্-এর টানে অহম্-এর বুকে ঢেউ ওঠে, যেন চাঁদের টানে সমুদ্রের উথালি-পাথালি। সমুদ্র আর ঢেউ তো আলাদা নয়। ঋষি আর ছন্দও তাই।

আলাদা নয়। ঋষিই স্পন্দিত নন্দিত ছন্দিত হয়ে হন ছন্দ। যেমন স্রষ্টার আত্ম-সিসৃক্ষা এঁকেবেঁকে হল এই সৃষ্টি, স্রষ্টা নিজেই হলেন তাঁর ছবির রূপ-রেখা-রং টান-টোন-ঢং, তেমনি ঋষিরও আত্ম-সিসৃক্ষা এঁকেবেঁকে হয় ছন্দ। ছন্দ ঋষির হৃদয়-স্পন্দন—

অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাঁটায় ভুবন দোলে
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
আকাশ-ভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ।

এই ছন্দের অনুভব ঋষি বামদেবের কবিতায় বড় সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে (দ্র. পৃ ৫৫)।

ঋষিকৃত্ সোমের উদ্দেশ্যে ঋষি প্রভুবসু আঙ্গিরসের বিমুগ্ধ উচ্চারণেও পাই এই 'দে দোল্ দোল্ দে দোল্ দোল্ এ মহাসাগরে তুফান তোল্'-এর অনুভব—

ইন্দো সমুদ্রম্ ঈঙ্খয়
পবস্ব বিশ্বমেজয় (৯।৩৫।২)
কি মহাকাঁপনে কাঁপাও বিশ্ব
দোলাও সিন্ধু, ইন্দু, বও॥

ঋষি মধুচ্ছন্দাও এই মহাসাগরের সাগরিক—

মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্র চেতয়তি কেতুনা। (১।৩।১২)
মহা-পারাবার ঐ যে সরস্বতী
চিনিয়ে জানিয়ে দেন আলো-ইসারায়।

সে কেমন? না,

প্রতিটি অক্ষর ঘিরে আলোর জোয়ার
নিরন্তর নৃত্যমান বাক্-পারাবার।

তাই বেদ বললেন, প্রতিটি অক্ষরই ছন্দ। এক অক্ষরও ছন্দ, সহস্র অক্ষরও ছন্দ, যদি তা হয় ঋষির উচ্চারণ।

গৌরীর্ মিমায় সলিলানি তক্ষতী···সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্—

মহাকাশ কাঁপে
সেই কাঁপনগুলিকে চেঁচে-ছুলে রূপ দিতে দিতে
অনন্ত-অক্ষর হয়ে ডেকে ওঠে বাক্—

—এ হল সৃষ্টির ছন্দ। ঋষিও ঠিক এমনি করেই বেদ সৃষ্টি করেন। তাঁর হৃদয়ই হয়ে যায় পরম ব্যোম, মহাকাশ, মহাশূন্য, অপৌরুষেয়। তাঁর বুকে যে 'সলিল', অর্থাৎ অনুভবের বিপুল ঢেউ (সৃ—সরা, চলা) ওঠে, তাকে তিনি তক্ষণ করেন, চেঁচে ছুলে এক-একটি রূপ দেন—গায়ত্রী ২৪ অক্ষর, উষ্ণিক্ ২৮, অনুষ্টুপ্ ৩২, বৃহতী ৩৬, পঙ্‌ক্তি ৪০, ত্রিষ্টুপ্ ৪৪, জগতী ৪৮।

সাতটি সুরের মধ্যে যেমন অনন্ত বৈচিত্র্য, তেমনি এই সাতটি ছন্দেরও। সেই একই গায়ত্রী, কিন্তু মেধাতিথি আঙ্গিরসের 'মরুদ্‌ভিরগ্ন আ গহি'তে বাজছে ঝড়ের দামামা, গোতম রাহূগণের 'মধু বাতা ঋতায়তে' যেন শান্ত স্নিগ্ধ পদ্মগন্ধি ভোর, কুৎস আঙ্গিরসের 'অপ নঃ শোশুচদ্ অঘম্' যেন বহ্নিপ্রপাতে ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে পড়া। বিশ্বামিত্র গাথিনের 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াত্' ধ্যানগম্ভীর সঙ্কল্পের মন্দ্রঘোষ, সুকক্ষ আঙ্গিরসের 'ত্বমস্মাকং তব স্মসি' ভক্তের প্রেমোল্লাস, মধুচ্ছন্দার 'সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে' স্বস্তির পারাবার-সৈকতে দেবালিঙ্গিত সত্তার মুকুলিত তৃতীয় নয়ন।

নিরুক্ত-শাস্ত্রের প্রথম কথাটি যাস্ক বলেছেন দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমে—'ন তু এব ন নির্ব্রূয়াত্', নির্বচন ছেড়ো না। আর চরম কথাটি বলেছেন একেবারে শেষে—'অথ-আগমো যাং যাং দেবতাং নিরাহ তস্যাঃ তস্যাঃ তাদ্ভাব্যম্ অনুভবতি' তাহলে আগম যে যে দেবতার নির্বচন করেছে তার তার সঙ্গে তন্ময়তা অনুভব করতে পারবে। এই দুটিকে মিলিয়ে নিলে তাৎপর্য দাঁড়ায়—নির্বচন হল একটি সাধনা। আর তার সিদ্ধি হল দেবাত্মভাব। যাস্ক যেন বলছেন—

১। নির্বচন করতেই থাকবে করতেই থাকবে, যতক্ষণ না দেবতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাও। অর্থাৎ দেবতার নামই হল দেবতা। আর যদি হয় 'অদিতির্ জাতম্ অদিতির্ জনিত্বম্', 'যা হয়েছে, হবে—সবই অদিতি, অদিতি', তাহলে সব নামই তো শেষ পর্যন্ত দেবনাম। সেই নামের শব্দাণুগুলিকে ভাঙতে ভাঙতে হঠাৎ পেয়ে যাবে নামের-আড়ালে-লুকিয়ে থাকা, নাম-বসন, নাম-শরীর, নামময় দেবতাকে, উদ্ভাসকে, জ্যোতিকে। তখন দেখবে, নামটি হল দেবতার জ্যোতির্জরায়ু। এই অনন্তপরমায়ু জরায়ুকে একটির পর একটি ভেদ করে যাওয়াই হল ঋষির ভাষায় আয়ুর প্রতরণ, সাঁতরে সাঁতরে চলে যাওয়া জীবন-

মরণের সীমানা ছাড়ায়ে,······দিবে দিবে······আলো থেকে আলোয়, যতক্ষণ না সেই জরায়ু থেকে ভূমিষ্ঠ হয় এক অপৌরুষেয় আকাশবৎ-ব্যাপ্ত শূন্য সর্বাধার চেতনা। সেই হল দেবতার জন্ম তোমার মধ্যে, তোমার জন্ম দেবতার মধ্যে। তারি নাম দেবতার সঙ্গে তাদ্ভাব্যের অনুভব।

২। দেবতাকে ছুঁতে না পারলে নিরুক্তের, নির্বচনের, বিশ্লেষণের, উচ্চারণের কোন অর্থ নেই। বেদ-বেদাঙ্গ-জীবনের পরম তাৎপর্ব হল 'দেবতা'—উদ্ভাস-পরম্পরা, দ্যুতিসম্ভার, বিপুলের বিদ্যুৎ-স্পর্শ-তরঙ্গ।

মানুষের দর্শন আর বিজ্ঞান, science & philosophy, যুক্তি-প্রযুক্তি-তর্ক একরকমের নির্বচন। বিশ্বজগতের জড়-এবং-চেতন-রাজ্যের অণু-পরমাণুগুলিকে ভেঙে ভেঙে দেখা—কোন্ ধাতুতে এগুলি তৈরী। 'যাস্ক' শব্দের দিব্য-মানুষ অর্থ হল—যঃ-কঃ=যস্কঃ, যে-কেউ>তার ছেলে যাস্ক, অর্থাৎ anybody's son>son of man, Common Man. সেই বিশ্বনর যেন সবাইকে ডেকে বলছেন, তোমার যুক্তিতর্ক-মন-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করে যাও, ছেড়ো না। যদি লেগে থাকতে পার, তাহলে শেষ পর্যন্ত দেবতাকে ধরা দিতেই হবে। আর বলছেন, বিশ্লেষণ সার্থক হবে না, যদি না দেবতাকে পাও, যদি না দেবতা হও।

শ্রীজীবগোস্বামীও তাঁর ছটি সন্দর্ভ—তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও প্রীতিসন্দর্ভ—জুড়ে চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করতে করতে ধাপে ধাপে এই সিদ্ধান্তে পৌছে দিয়েছেন যে—পরমতত্ত্বের পূর্ণ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে ব্যক্তিগত প্রীতিই হল মানুষের পরম পুরুষার্থ।

অনুবাদও একরকমের নির্বচন। অণু-বাদ। মন্ত্রের, শব্দের অণুগুলিকে ভেঙে ভেঙে বলা। 'শোনার কাঠি' ছোঁয়ালেই এক-একটি শব্দের মধ্যে শোনা যায় মধুচ্ছন্দা থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অসংখ্য ঋষিহৃদয়ের গুনগুন আগুন-গুঞ্জরণ। এক-একটি মন্ত্র যেন হৃদয়ের মহাকাশ, পরমব্যোম। তাইতে এক-একটি শব্দ যেন 'দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম' ছোট্ট কমলের ঘর। সে-কমলের পাপড়ি সহস্র···অনন্ত। তার মধুপানে-ভোর বেদের কবি বলেছেন—

বাচো মধু পৃথিবি ধেহি মহ্যম্ (অথর্ব ১২।১)

শব্দের মধু পৃথিবি আমাতে সঞ্চিত কর হে।

সে মধু পেতে হলে আগুনে ঝাঁপ দিতে হয়। তাই করলেন মধুচ্ছন্দা—

১। **অগ্নিম্ ঈলে.** । আগুন জ্বালাম।

এ আগুন কে? এ তো নয় আলুসেদ্ধ ভাতের আগুন, নয় স্বাহা স্বাহা হোমেরও আগুন। কেননা এঁকে বলা হচ্ছে কবি, সত্য, কবিক্রতু, 'ইদং জ্যোতির্ অমৃতং নিহিতং মর্ত্যেষু' অমৃত জ্যোতি নিহিত মর্ত্যে মর্ত্যে। এসব বিশেষণকে ধারণ করার সাধ্য কি আছে এই অধিভূত এবং অধিযজ্ঞ অগ্নির? তাহলে কে সেই অগ্নি যাঁর মধ্যে এসে সঙ্গত হবে, একনীড় হবে সমস্ত বিশেষণ, সমস্ত বর্ণনা?

সে-অগ্নি হলেন 'আধ্যাত্মিক' অর্থাৎ আত্মাশ্রিত মানে আমারই ভেতরের কোন ব্যাপার, এই দেহের মধ্যেই তিনি আছেন 'সর্বতো দীপ্তিমান্' হয়ে, 'তস্য ভাসা সর্বম্ ইদং বিভাতি' তাঁরই আলো, তাঁরই অর্থ ধার করে জ্বলছে এই আধিভৌতিক রান্নার আগুন আর পবিত্র যজ্ঞাগ্নি।

যাস্ক বললেন, 'শোনার কাঠি' ছোঁয়াও, শোনো, ঐ 'অগ্নি'-শব্দের মধ্যেই বসে আছে সে তার র-টিকে লুকিয়ে আর ই-ঈ ন-ণ এলোমেলো করে দিয়ে! 'অগ্নি' অর্থাৎ কিনা—অগ্রণী। যিনি থাকেন সবার আগে দিশারী হয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেন সবাইকে।

কে তিনি? বিশেষণের আলো ধর। কবিক্রতু। তিনি হলেন কবি এবং ক্রতু। আবার কবির ক্রতু। আবার কবির মত ক্রতুসম্পন্ন। ক্রতু মানে সৃষ্টির ইচ্ছা, সঙ্কল্প, Creative Will. স্রষ্টার সঙ্কল্পমাত্রেই সৃষ্টি। তাই ক্রতু মানে সিসৃক্ষা-ভরপুর সিসৃক্ষাশ্লিষ্ট সৃষ্টি। তাহলে 'অগ্নি' হলেন স্রষ্টা এবং/স্রষ্টার সিসৃক্ষা। স্রষ্টার এই অনন্ত সিসৃক্ষাই প্রতি মানুষের অন্তরে নিহিত হয়ে আছে অনন্ত অভীপ্সারূপে, সৃষ্টি করে চলেছে, ভেঙে ভেঙে গড়ে চলেছে তাকে প্রতি মুহূর্তে নব নব রূপে। তাই তাঁকে বলা হল 'অমৃত-জ্যোতি নিহিত মর্ত্যে মর্ত্যে।' তাই শ্রীঅরবিন্দ বললেন 'অগ্নি' হলেন Divine Will, আর রবীন্দ্রনাথের উচ্চারণে সমস্তটি একটি নিটোল রূপ পেল—

> নিত্যকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা—
> আমি শুধু তারি মাটির প্রদীপ, জ্বালাও তাহার শিখা
> নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি।

বিশ্বের প্রতিটি 'মর্ত্য' মাটির প্রদীপে নিহিত আছে তোমার অমৃত-ইচ্ছা। সমস্তটি মিলে এক দীপালি-মহোৎসব। আমি সেই দীপালির একটি ছোট্ট

প্রদীপ, তাতে তুমিই জ্বালাও তোমার ইচ্ছার শিখা—

অগ্নিম্ ঈলে. পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্…

জ্বালাও আর জ্বালাই একই কথা। তোমার ইচ্ছাই আমার অভীপ্সা আমার আত্মবীর্য হয়ে আমার মধ্যে নেমে এসেছে। তাই 'ঈলে.' (জ্বালাই) এর সঙ্গে সঙ্গে একনিঃশ্বাসে বলছেন তুমিই 'ঋত্বিক্' তুমিই 'হোতা' অর্থাৎ তুমিই জ্বালাও। √ঈড্ < √ ইন্ধ্—যাস্ক। মনে হয় বৈদিক সাধনা যতদিন জীবন্ত ছিল, উষ্ণ ছিল, ততদিন ঈড্ মানে ছিল ইন্ধ্, জ্বালিয়ে তোলা। তারপর ঈড্ মানে হয়ে গেল স্তুতি।

অগ্নির প্রতিটি বিশেষণের দুটি করে তাৎপর্য—(১) বিশ্বগত—অগ্নি এমন। (২) ব্যক্তিগত—অগ্নি আমার কাছে এমন। যেমন পুরো-হিত—(১) সামনে রাখা হয় যাঁকে, (২) আমি যাঁকে সামনে রেখেছি।

'পুরোহিত' অগ্নিরই বিস্তার। যিনি অগ্রণী, তিনিই পুরো-হিত, সম্মুখে অগ্রে স্থাপিত। এই তোমার ইচ্ছাকে সামনে রেখে সুরু করলাম জীবন-যজ্ঞ-যাত্রা। তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ সকল কর্মমাঝে। Thy will be done.

তুমি **দেব**, আলোময় লীলাময়। < √ দিব্—আলো দেওয়া, খেলা করা। সবার কাছে আছ, আমার কাছে হও—যজ্ঞের দেব, দীপক, উদ্ভাসক। 'দেবম্' একদিকে 'যজ্ঞস্য' আর একদিকে 'ঋত্বিজম্' এর সঙ্গে অন্বিত। তুমি দেবঋত্বিক্। সবার, আমার যজ্ঞসাধনার দেবতা ঋত্বিক্ তুমি। ঋতু অর্থাৎ কাল বুঝে যিনি যজন করেন, তিনি ঋতু-যজ্ > ঋত্বিক্। তুমি হোতা, < √ হ্বে, ডাক দাও দেবতাদের, < √ হু, আহুতি দাও তাঁদের। অনুবাদে 'দেবে' শব্দটি দ্ব্যর্থক—(১) দেবতাকে (২) দান করবে। তুমি রত্নধাতম। রত্ন—রমণীয় ধন। গভীরে নিহিত কর তাকে।

২॥ এই আগুন-জ্বালানোর সাধনা আজকের নয়। **অগ্নিঃ পূর্বেভির্ ঋষিভির্**… ঈলি.তঃ কথাটি ধরে নিতে হবে। আগুনকে জ্বেলেছিলেন পূর্ববর্তী ঋষিরা। **উত** আবার **নূতনেভিঃ ঋষিভিঃ ঈড্যঃ**, নূতন ঋষিরাও তাকে জ্বালবেন। পূর্বপুরুষের কীর্তি অস্পৃশ্য পবিত্র যাদুঘরে সাজিয়ে রেখে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা না করে তাকে পুনঃসৃষ্টি করবেন। তোতাপাখির মত বেদ মুখস্থ না করে তার জীবন্ত অগ্নিধারায় স্নান করবেন। নূত্ন খাতে বইয়ে দেবেন অগ্নিসরস্বতীর প্রস্র-প্রপাত।

সঃ নিত্যকালের পুরাতন সনাতন সেই আগুন **দেবান্ ইহ আ বক্ষতি.** √বহ্+লেট্ ৩।১—বক্ষতি, দেবতাদের এখানে আবহন করে আনুন। তাঁর ইচ্ছা / আমার তপের অগ্নিসোপান বেয়ে নেমে আসুক আলোর ঢল এ-দেহে এ-জীবনে এ-পৃথিবীতে। এই আমাদের উৎসর্গভূমি আনন্দভূমি অগ্নিভূমি সোমভূমি মহা-বেদনার মহা-বেদনের বেদিতে।

৩॥ নিঘণ্টুর প্রতিশব্দমালা বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, বেদের শব্দে শব্দে রয়েছে অবমের মধ্যে পরমের ব্যঞ্জনা বা অবমে-পরমে একাকার অর্থপরম্পরা······অর্থপ্রবাহ······ অর্থের ময়ূররোমা ইন্দ্রধনুচ্ছটা··· অর্থের হিরণ্যস্তূপ। এক একটি শব্দই যেন বামনবিষ্ণু বেদ, অণুমহান শরীরে ধারণ করে আছে বিপ্রহৃদয়প্রলয়পয়োধিজলে দীপ্যমান এক একটি ব্রাহ্মী অনুভূতিকে।

রয়ি মানে ধন (নিঘ. ২।১০) আবার রয়ি মানে উদক (ঐ ১।১২)। কী সে বস্তু, যার মধ্যে এই দুটি অর্থই সঙ্গত হয় ?

ধন-শব্দের মূল অর্থ হল সেই লক্ষ্য যার পানে মানুষ 'ছুটে চলে', < √ধন্—ছুটে চলা।

রয়ি শব্দটি এসেছে √রী থেকে যার অর্থ স্রবণ অর্থাৎ ক্ষরণ, ঝরা, বয়ে চলা। তাই থেকে অর্থ হল উদক অর্থাৎ জল। কিন্তু উদক-নামের মধ্যে 'রয়ি'র সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে সত্যম্, ঋতস্য যোনিঃ, পূর্ণম্, সর্বম্, গহনম্, গভীরম্, অমৃতম্ ইত্যাদি। অর্থাৎ জল শুধু জল নয়, অতল জল! প্রতি-শব্দে প্রতিশব্দে সেই অতল জলের আহ্বান! তাহলে রয়ি হল সেই/এই গহন গভীর সর্বব্যাপী অমৃত-সলিল, পূর্ণের পারাবার, রবীন্দ্রনাথ যাকে বললেন 'অসীম ধারার ঝরণাতলা'—

> নেব আজ অসীম ধারার তীরে এসে
> প্রয়োজন ছাপিয়ে যা দাও সেই ধনে
> তোমারি ঝরণাতলার নির্জনে॥ (পূজা, ১৫)

ঐ ধারাই ধন। তাই তার নাম রয়ি।

শুধু যাওয়া-আসা, স্রোতে ভাসা নয়, স্রোতাপন্ন হয়ে ঐ অসীম ধারায় ডুব দিতে চান ঋষি। তাঁর এই তীব্র চাওয়াটিও 'রয়ি', যোগের ভাষায় যার নাম সংবেগ। এই রয়িই রেতঃ, তাঁর আত্মবিসৃষ্টির বীর্য, নবজন্মের বিপুল কামনা।

তাই দেবতা তাঁর কাছে 'রেতোধাঃ'। তিনি দেবতার উশতী বধূটী। এই কামনাই তাঁর পরম সম্পদ্। তিনি সেই মহৎ ক্ষুধার আবেশে পীড়িত অমর বিহঙ্গশিশু, খুঁজে বেড়াচ্ছেন আপন বিরাট নীড় রচনার বিশ্ব। সেই বিশ্বই রয়ি—আকাশপৃথিবীব্যাপী বিরাট বিপুল অখণ্ডসংহিতা···মহাটান···বিশ্বটান··· স্বরস্রোত···অনাদি অনন্ত সঙ্গীতগান·· নিখিলের প্রাণপরিস্পন্দ···ছন্দ··· বেদ।

দেবো রয়ির্ বেদো রয়িশ্ ছন্দো রয়ির্ ঋষী রয়িঃ।
রয়িনা তরতা রয়িং বয়িনা মৃগ্যতে রয়িঃ॥

দেব রয়ি, বেদ রয়ি, ছন্দ রয়ি, ঋষি রয়ি, আর
রয়ি দিয়ে রয়ি-সিন্ধু পার হতে হতে
রয়ি খোঁজে রয়ি-পারাবার॥

অগ্নিনা রয়িম্ অশ্নবত্ অগ্নির সাহায্যে রয়িকে পাক্। লেটের প্রয়োগে আকুল প্রার্থনা ধ্বনিত হচ্ছে। কর্তা নেই, অর্থাৎ যে-কেউ। বৈদিক বাগ্-ধারায় 'রায়স্ পোষম্' (রয়ির পোষকে) একসঙ্গে পাই প্রার্থনীয় বস্তুরূপে, যেমন—

তে রায়স্ পোষং দ্রবিণানি-অস্মে ধত্ত ঋভবঃ ক্ষেময়ন্তো ন মিত্রম্ ৪।৩৩।১০
যস্মৈ ত্বং বসো দানায় বক্ষসি স রায়স্ পোষম্ অশ্নুতে ৮।৫১।৬
যস্মৈ ত্বং বসো দানায় মংহসে স রায়স্ পোষম্ ইন্বতি ৮।৫২।৬
ইন্দ্রাবরুণা সৌমনসম্ অদৃপ্তং রায়স্ পোষং যজমানেষু ধত্তম্ ৮।৫৯।৭
রায়স্ পোষং সৌশ্রবসায় ধীমহি ১০।৩৬।৭ রায়স্ পোষং যজমানেষু ধেহি ১০।১৭।৯

এখানে মধুচ্ছন্দার বাগ্‌ভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে দুটি বাক্য এক হয়ে গেছে—(১) অগ্নিনা রয়িম্ অশ্নবত্ (২) রয়িঃ চ পোষম্ অশ্নবত্ দিবেদিবে। >অগ্নিনা রয়িং পোষম্ এব অশ্নবত্···।

দিবেদিবে—(১) দিন দিন (২) আলো থেকে আলোয়।

বীরবত্-তমম্—বীর্যবত্তমম্। যেমন সুবীর=সুবীর্য।

যশসম্—ঈশনাযুক্ত।

হে অগ্নি, বিপুলের তৃষ্ণা আমাদের মধ্যে দিন দিন বাড়ুক তোমার প্রসাদে, নিয়ে যাক এক উল্লাস থেকে আর এক উল্লাসে। দিক্ নব নব দিগন্ত অভিযানের

অস্খলিত অপরাজিত অনন্তবিজয় বীর্য; দিক্ স্বাধিকার, স্বারাজ্য, সাম্রাজ্য, পরিপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠা। উরৌ দেবা অনিবাধে স্যাম…অবাধ বিপুলে রব ওগো দেবতারা। উরুং লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু…'বিরাট্-রাজ্য' পৃথিবী মোদের দাও।

৪॥ **অগ্নে** হে অগ্নি, **যম্ অধ্বরম্ যজ্ঞম্** যে অধ্বর যজ্ঞকে **বিশ্বতঃ পরিভূঃ অসি** সবদিক থেকে ঘিরে আছ তুমি **সঃ ইত্** তা নিশ্চয় **দেবেষু গচ্ছতি** দেবতাদের কাছে যায়।

√ধ্বৃ—কুটিল গতি, এঁকেবেঁকে চলা। সার্থক যজ্ঞ চলে 'ঋজুনীতী' সোজা পথে, 'অঞ্জসা' সোজাসুজি। তাই তার নাম অ-ধ্বর—ধূর্তিহীন কৌটিল্যবর্জিত অকপট সোজা। অর্থাৎ বিশেষণটি আসলে একটি প্রার্থনা—গোলকধাঁধায় ঘুরিও না আমাদের, যেতে বাধ্য কোরো না 'কুটিল কুপথ ধরিয়া'। ধূর্তির প্রতি বিরাগ কবির সহজাত। কবি চান সোজাপথে চলতে। ঋষি ভরদ্বাজ বলছেন—

সং পূষন্ বিদুষা নয় যো অঞ্জসানুশাসতি (৬।৫৪।১)

হে পূষন্ এমন বিদ্বানের সঙ্গে আমাদের মিলিয়ে দাও, যিনি সোজাসুজি বলে দেবেন।

'পরি' চতুর্দিকে 'ভূঃ' রয়েছেন যিনি, তিনি 'পরিভূঃ' পরিবেষ্টক। 'বিশ্বতঃ' সবদিক থেকে। অর্থাৎ নিশ্ছিদ্র, সুতরাং অভেদ্য পরিবেষ্টন। ঋষি আত্রেয় শ্রুতবিদের ভাষায় 'বংহিষ্ঠং নাতিবিধে অচ্ছিদ্রং শর্ম' (৫।৬২।৯), বিপুল ছিদ্রহীন অভেদ্য আনন্দভুবন। এই বেষ্টন আরো নিবিড় হয়ে নবম ঋকে হয়েছে 'সচন' আসক্ত আলিঙ্গন।

ঋষি অনুভব করছেন একটি চরাচরব্যাপী অগ্নিবলয় তাঁকে তাঁর যজ্ঞকে ঘিরে নিয়ে চলেছে ঊর্ধ্বপানে। তাই নিশ্চিত প্রত্যয়ে বলছেন, আমার এবং আমাদের যজ্ঞ নির্ভুল পৌঁছবেই দেবলোকে, জ্যোতির্ময় অনুভবের রাজ্যে। পৌঁছবে চাঁদে—জ্যোৎস্নাচ্ছন্ন আনন্দচেতনায়। পৌঁছবে বৃহস্পতিতে—বাগীশ্বরী প্রজ্ঞায়। পৌঁছবে সূর্যে—নিখিলতমসাবিদারকবিদূরক সর্ববিপ্লাবী সম্পরিপ্রভাস্বর মহাজ্যোতিতে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ঋষিও দর্শন করেছেন এই জ্যোতির্বলয়ের বিশ্বগ্রাস—

বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারম্ ঈশং তং জ্ঞাত্বা অমৃতা ভবন্তি।

বিশ্বের এক পরিবেষ্টিতা সেই ঈশ্বর, তাঁকে জানলে অমৃত হয়।

ঋষি নারায়ণের পুরুষসূক্তেও রয়েছে এই পরিভূ—সেই সঙ্গে অতিভূ—মূর্তির বর্ণনা—

স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ (১০।৯০।১)

সৃষ্টিখানা বেড়ে ঘিরে উঁচিয়ে আছেন দশ-আঙুল!

রবীন্দ্রনাথে দেখি এই অনুভব রূপ পেয়েছে কৌতুকে-অশ্রুতে মেশা এক অপরূপ উচ্চারণে—

বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ কেমনে দিই ফাঁকি।
আধেক ধরা পড়েছি গো আধেক আছে বাকি!
বাহির আমার শুক্তি যেন কঠিন আবরণ।
অন্তরে মোর তোমার লাগি একটি কান্না-ধন।

এই কান্না-ধনটিই হল অধ্বর যজ্ঞ। এইটিই আগের ঋকের 'রয়ি'—অ-কপাট সরল প্রাণের অ-কপট কান্না, তীব্রসংবেগ। আর সবই উপচার, উপাধি, আচার, অনুষ্ঠান, সংস্কার—কঠিন শুক্তি-আবরণ।

প্রাচীনা ভাষা এবং ক্রিয়াবিশেষবহুল যজ্ঞের কঠিন শুক্তি-আবরণের আড়ালে টলটল করছে ঋষির কান্না-ধন মুক্তোটি—তারি নাম বেদ।

৫॥ অগ্নির নিত্য বিশেষণগুলি 'পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ' ঋষির প্রদীপ্ত অনুভবে ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে—মরছে না—জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠছে।

তিনি **হোতা** (দ্র. প্রথম ঋক্), বিশ্বজোড়া আগুনের আধারে করে চলেছেন এক অদ্ভুত আত্মহোম, সর্বহোম—ধ্বংস, প্রলয়। আবার তিনি **কবিক্রতু**—কবি-কর্মা। তাঁর কর্ম কবির কর্ম অর্থাৎ সৃষ্টি। অণুতে পরমাণুতে পলকে প্রলয়, পলকে সৃষ্টি—এই হল তাঁর ছন্দ, তাঁর লীলা, তাঁর ভাঙাগড়ার খেলা। এই লীলার উর্ধ্বে তিনি আবার **সত্য**,—চির-অস্তিতা। সেই মহা-অস্তিতায় অটল থেকে তিনি **চিত্রশ্রবস্তম**, (চিত্র-শ্রবস্+তমপ্) ঢেলে দিচ্ছেন বিচিত্র শ্রুতি; উজ্জ্বল শ্রবঃ, পশ্যন্তী বাক্, বিস্ময়-বিজৃম্ভিত গান—আকাশভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ, বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান। শোনাচ্ছেন অম্বর-প্রাঙ্গণ-মাঝে নিঃস্বর মঞ্জীরের গুঞ্জরণ। 'বাঁধলে যে সুর তারায় তারায় অন্তবিহীন অগ্নিধারায়' সেই মহাশূন্যের নিনাদে ব্যাকুল করছেন

হৃদয়। অসূর্যম্পশ্য অন্ধ হয়ে উঠছে অনন্তসূর্যম্পশ্য।

'নিরবধি' 'বিপুলে'র কিনারে
বসে বসে কলকাঠি কি নাড়ে!
বসুমতী অশথের দোল্‌নায়
অমনিই আকাশের কোল পায়।
ঢেউ দেয় শূন্য-সমুদ্র
নড়ে বসে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র।
ছোট পানাপুকুরেতে ফেলে শ্বাস
প্রলয়পয়োধিজলোচ্ছ্বাস।
দেয়ালে দেয়ালে জগঝম্প
নেচে ওঠে কাল ভূমিকম্প।
ঝনন ঝনন বাজে প্রাণ-বীণ;
পাখা মেলে ওড়ে দৈনন্দিন॥

সেই **দেবঃ** জ্যোতির্ময় অগ্নি **দেবেভিঃ** জ্যোতির্ময় দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে **'আ'** এখানে এ-দেহে এই যজ্ঞভূমিতে **গমত্** (গম্+লেট্ ৩।১) আসুন।

ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়
তোমারি হউক জয়। (পূজা, ৩৭৩)

৬॥ এ যেন গীতার সেই প্রতিশ্রুতির পূর্বধ্বনি—ন হি কল্যাণকৃত্ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি, কল্যাণ কর্ম যে করে তার কখনো দুর্গতি হয় না। এখানে সেই কল্যাণ কর্ম হল, দেবতার উদ্দেশে নিঃশেষে আত্মদান, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় complete surrender to Divine Will. অগ্নি হলেন সর্বগ্রাসী Divine Will-এর প্রজ্বলন্ত বিগ্রহ। তাতে যে স্বেচ্ছায় নিজেকে ইন্ধন করে, অঙ্গার করে, সে-ই দাশ্বান্ (√দাশ্—দান), যার একটি চূড়ান্ত উদাহরণ হলেন ঋষি অঙ্গিরা, যিনি তাঁর নামের মধ্যেই বহন করে চলেছেন এই দহনের দলিল (দ্র. নিরুক্ত ৩।১৭, অঙ্গিরা অঙ্গারাঃ)।

অগ্নি সেই দাশ্বান্ ভক্তের কী ভদ্র অর্থাৎ ভালো করেন? না, তিনিও দেন তাঁর চূড়ান্ত দেওয়া। আত্মদান করেন, নত হন, 'নেমে' আসেন। তাঁর

এই 'নেমে' আসার প্রমাণ হল তাঁর 'অঙ্গিরাঃ' এই নামটি। এই নামটিকে অঙ্গীকার করে দেবতা হয়েছেন ঋষির স-নাম, সমান। এই নামই তাঁর অঙ্গীকারের অভিজ্ঞান। তাই অঙ্গিরা নামে ডেকে মধুচ্ছন্দা বুঝি অগ্নিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তাঁর গোপন জনান্তিক প্রতিশ্রুতি।

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে নীরবে একাকী আপন মহিমা-নিলয়ে আছেন সেই সত্যস্বরূপ, এ যেমন সত্য, তেমনি এ-ও সত্য যে—

অনন্ত এ দেশকালে অগণ্য এ দীপ্ত লোকে
তুমি আছ মোরে চাহি (পূজা, ৩৩৭)

তাঁর সীমাহীন মহামহিমা নিয়ে তিনি চেয়ে আছেন এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমারই মুখ-পানে। এ-ই হল ঐ সমুদ্রপর্বতবৎ অগাধোত্তুঙ্গ সত্যের মাধুর্য-রূপাবতার।

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে
নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে।

এমন কি,

আমি চোখ ঐ আলোকে মেলব যবে
তোমার ঐ চেয়ে দেখা সফল হবে

শুধু তাই নয়,

ফাগুনের কুসুম ফোটা হবে ফাঁকি
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি!

যদি আমার জীবনে তুমি সত্য না হও, তাহলে কি হবে তোমার ঐ বিশ্বাতীত সুগম্ভীর সত্য দিয়ে? ও তো ষোল-আনাই ফাঁকি—

সে দিনে ধন্য হবে তারার মালা
তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা
আমার এই আঁধারটুকু ঘুচলে পরে॥ (পূজা, ৭৭)

ন চেদ্ ইহ অবেদীত্ মহতী বিনষ্টিঃ (এখানে, এ-শরীরে, এ-জন্মে, এ-পৃথিবীতে না জানলে মহা-বিনাশ) শুধু আমার নয়, তোমারও। অ-দৃশ্য নিরাকার হয়ে থাকলে তোমার নিরাকরণ (প্রত্যাখ্যান, অবিশ্বাস) তো চলবেই ঘরে ঘরে জনে জনে। না দেখলে লোকে কি ভূতে বিশ্বাস করবে নাকি? সালোক্য সাযুজ্য সারূপ্য—এ তো শুধু আমাদের নয়, তোমাকেও পেতে হবে। হতে হবে পাড়ার লোক, ঘরের লোক, প্রতিবিম্ব, ছায়া। সব

চাওয়া-চাওয়ির শেষে সেই হবে তোমার ও আমাদের সর্বতোভদ্র সিদ্ধি—চরম পাওয়া। কিন্তু, কই, কিছুই তো হল না।

চিরসখার প্রতি অভিমান ঋষির হৃদয় চিরে বেরিয়ে এল একটি অন্তরঙ্গ অব্যয়ের রূপ ধরে—'অঙ্গ' ওগো।

অঙ্গ অগ্নে ওগো অগ্নি, **ত্বম্ যত্** তুমি যে **দাশুষে** যে সব দিয়েছে তার জন্য (দাশ্বস্+৪।১) **ভদ্রং করিষ্যসি** ভালো করবে, **তদ্ ইত্** সেই তো **তব সত্যম্** তোমার সত্য, **অঙ্গিরঃ**, হে অঙ্গিরা, এবং, 'তব ইত্ তত্ সত্যম্' তোমারই সত্য সে তো অঙ্গিরা। তুমিই তো সত্য করেছিলে।

আমি তো সব দিয়ে বসে আছি। কিন্তু তোমার তো সত্য রাখার নাম নেই। অথচ অঙ্গিরার বেলায় বেশ তো রেখেছিলে—এই হল ভাবার্থ।

অভিমানের সঙ্গে একটু সকৌতুক হাসি ধরা পড়ে রবীন্দ্রনাথের মত মধুচ্ছন্দার উক্তিতেও—সত্যবদ্ধ তুমি, পালাবে কোথায়? যেমন কৌতুক আছে শক্তিসাধকের তীব্রতর অভিমানোক্তিতে—

> যে-ভালো করেছ কালী আর ভালোতে কাজ নাই।
> ভালোয়-ভালোয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই।

পরের ঋকে এই আলোয় আলোয় যাওয়ার কথা।

৭॥ অগ্নি হলেন দোষা-বস্তা (<দোষা-বস্তৃ)। দোষা অন্ধকার, রাত্রি। তাকে উজ্‌লে তোলেন (√বস্) তিনি। সম্বোধনটি আসলে একটি প্রার্থনা। অন্ধকার দূর কর হে দেবতা, বাইরের এবং ভেতরের সব অন্ধকার—

> আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও।
> আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধূলার ঢাকা ধুইয়ে দাও॥
> মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও॥

দোষাবস্তঃ অগ্নে হে দোষা-বস্তা অগ্নি **বয়ম্** আমরা **ত্বা উপ ইমসি** তোমার কাছে আসি, 'উপায়ন' করি। দেবতাকে কাছে পাওয়ার উপায় হল 'উপায়ন' কাছে যাওয়া, 'উপাসন', 'উপসদ্' কাছে বসা। তাই অন্তিম ঋকে প্রার্থনা করেছেন 'সুপায়নো' ভব, এমন হও যেন সহজে তোমার কাছে যেতে পারি। কাছে যাই কী নিয়ে? **নমঃ ভরন্তঃ** প্রণতি, নম্র নমস্কার বহন করে। কিন্তু সে নমস্কার হবে ধিয়া [সহ] ধী-যুক্ত। অভ্যস্ত যান্ত্রিক অবোধ প্রণাম নয়। প্রতিবুদ্ধ সচেতন প্রণতি। 'নমঃ' ভক্তি, 'ধী' প্রতিবুদ্ধ ধ্যান-চেতনা,

জ্ঞান। বৈদিক ঋষির কাছে জ্ঞান-ভক্তি পরস্পরের পরিপূরক, তথা অবশ্যম্ভাবী সার্থক পরিণাম। বিরোধের প্রশ্নই ওঠে না।

দিবেদিবে শ্লিষ্ট। একটি অর্থ দিনে দিনে অর্থাৎ প্রতিদিন। আর একটি অর্থ উত্তরোত্তর প্রকাশের জন্য। অন্ধকার পেরিয়ে আলোয় পৌঁছে দিয়েই দোষাবস্তার কর্তব্য শেষ হবে না। তিনি আমাদের নিয়ে যাবেন আলো থেকে আলোয়, উদ্ভাস থেকে উদ্ভাসে, উত্তর থেকে উত্তম জ্যোতিতে। আমাদের দশ-বিশ পাওয়ারের বাল্‌বগুলিতে তিনি জ্বালিয়ে দেবেন অনন্তদ্যুতি পরম-জ্যোতির্ময়কে।

৮॥ সপ্তম ঋকের সঙ্গে একই ক্রিয়া 'ইমসি' দিয়ে অন্বিত। কেমন অগ্নির কাছে আসি আমরা? **দীদিবিম্** অতি উজ্জ্বল দেদীপ্যমান **অধ্বরাণাং রাজন্তম্** যজ্ঞের নিয়ন্তা, ঈশান, **ঋতস্য গোপাম্** ঋতের রক্ষক, **স্বে দমে** আপন গৃহে **বর্ধমানম্** নিত্য বাড়ছেন যিনি তাঁর কাছে।

যজমানের—এক্ষেত্রে মধুচ্ছন্দার—দেহই অগ্নির আপন গৃহ। সেই গৃহের গৃহপতি হয়ে তিনি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন তার জীবন-যজ্ঞের নিয়ামক হয়ে। আপন আধারে দেবতার জন্ম এবং ক্রমবৃদ্ধি অনুভব করছেন অগ্নিহোত্র অগ্নীভূত ঋষি মধুচ্ছন্দা।

৯॥ শেষমন্ত্রে একটি অন্তরঙ্গ অনুভব তথা প্রার্থনা উচ্চারণ করে মধুচ্ছন্দা নামটিকে সার্থক করলেন ঋষি।

সঃ অগ্নে এমন যে মহিমময় অগ্নি সেই তুমি **পিতা ইব সূনবে** পিতা যেমন পুত্রের কাছে তেমনি করে **নঃ** আমাদের কাছে **সূপায়নঃ ভব** সুপায়ন হও। উপায়ন—১) কাছে-যাওয়া, ২) উপহার। আমরা যেন সহজে তোমার কাছে যেতে পারি। তুমিও এস সহজভাবে আমাদের কাছে। নিয়ে এস আনন্দ-উপহার—স্বস্তি। **সচস্বা নঃ** জড়িয়ে ধর আমাদের **স্বস্তয়ে** যাতে স্বস্তি পাই।

———

২। ঋষি অথর্বার ভূমিসুক্ত

যে মাটিতে জন্ম নিয়েছি, যে মাটির অন্নরসে গড়ে উঠেছে, পরিপুষ্ট হচ্ছে এই দেহ-মন-প্রাণ, সেই মাটির প্রতি একাত্ম ভালবাসা মানুষের সহজ কবিচেতনার একটি লক্ষণ। যে-মানুষ মাটির যত কাছাকাছি থাকে, এই ভালবাসা তার মধ্যে তত বেশি ওতপ্রোত হয়ে মিশে থাকে। মাটি থেকে যত দূরে যাই, নাগরিক জীবনের সহস্র জটিলতার নাগপাশে এই ভালোবাসা ততই যায় হারিয়ে। মানুষের সভ্যতা এই মাটি থেকে যত দূরে সরে এসেছে ততই তার প্রাণ উঠেছে হাঁপিয়ে। তাই নগরসভ্যতার চরমে পৌছে আজ ওদেশের মানুষ এই মাটির বুকে ফেরার জন্তে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর টান তাকে নামিয়ে আনছে তার আকাশতলা বাড়ির ছাত থেকে খেতে খামারে বনে জঙ্গলে।

আজ থেকে তিন হাজার বছরেরও বেশি আগে এই পৃথিবীমায়ের বন্দনা গেয়েছিলেন অথর্ববেদের ঋষি অথর্বা। তেষট্টি ঋকের এই সুদীর্ঘ কবিতাটি বৈদিক সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল সম্পদ। জানিনা পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যে আর কোন কবি মহী-মার মহিমা এমন করে গেয়েছেন কিনা। বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্, রবীন্দ্রনাথের বসুন্ধরা, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা ইত্যাদি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

পৃথিবীমায়ের ছেলে ঋষি অথর্বা।

প্রত্ন নৃত্ন ঋষি অথর্বা	ঝলল্ দ্যুয় ঝলল নিম্ন
দৈর্ঘ্যে প্রস্থে পৃথিবীতুল্য।	ঝলল্ মৃৎ-হিরণ্য-বক্ষ।
মহাসমুদ্র-হৃত্‌স্পন্দন-	ব্যোম-সম্পুটে মৃৎ-শকুন্ত
ছন্দে অন্তরিক্ষ দুলল্।	ছন্দে মেলল স্বর্ণপক্ষ।

সমস্ত পৃথিবীই তাঁর মাতৃভূমি। বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু সেই বেদের যুগের মানুষরা জানতেন জানি না, ছটি বিশাল ভূভাগ-সমন্বিত সমুদ্রবলয়িত পৃথিবীর অনেকটাই হয়ত তাঁদের মানচিত্রে ধরা পড়ে নি, কিন্তু তাঁদের কাছে ছিল সেই অণুবীক্ষণ যাতে অণোরণীয়ান্ ফুটে ওঠে মহতো মহীয়ান্ হয়ে, অল্প হয় অনিঃশেষ ভূমা, বিন্দু হয় অনন্ত রসসিন্ধু। পৃথিবীর যতটুকু অংশের সঙ্গেই

তাঁদের চাক্ষুষ পরিচয় থেকে থাকুক না কেন, সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে—শুধু পৃথিবী কেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গেই—তাঁদের আত্মিক পরিচয় ছিল নিবিড় গভীর অন্তরতম। এই অন্তঃস্থ পরিচয়ের শক্তিতেই, এই প্রেমযোগকে বাহন করেই, সৃষ্টির প্রতিটি রূপরসবর্ণকে স্পর্শ না করেও অথবা ঈষত্‌স্পর্শ করেও তাঁরা এই সৃষ্টিকে জেনেছেন বুঝেছেন তেমনি করে, যেমনি করে সদ্যোজাত শিশু মাকে না দেখে, না জেনে, না বুঝেও গন্ধ দিয়ে স্পর্শ দিয়ে ক্ষুধা দিয়ে অনুভব করে মার সমগ্র সত্তাকে। তাই তাঁদের প্রাণের সেই অকৃত্রিম উষ্ণ উচ্চারণ আজো পর্যন্ত হয়ে আছে সমস্ত মানুষেরই উৎ-চারণের সরণি।

এই শিশুর বিস্ময় নিয়েই তাঁরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছেন এই আপন হতে আপনতর, আপনতম পৃথিবীকে—আপনাকে এই জানা তাঁদের ফুরোচ্ছে না! চড়ছেন সানুর পরে সানু (সানোঃ সানুম্ আরুহত্—১।১০।২), এগিয়ে চলেছেন ঢালুর পরে ঢালু নেমে নেমে (প্রবতো মহীর্ অনু—১০।১৪।১), প্রতিদিনের পথের ধূলায় নিত্যনবীনা নিত্যঅচেনা হয়ে উঠছে এই মধুমতী পৃথিবী। তাকে ভালোবেসে এক একটি নামে ডাকছেন, সেই এক একটি নামের শিরীষসুকোমল সরু তারে বেজে উঠছে সুদূর অজানা পরাবত্ পরমপদের ভ্রমর-গুঞ্জন, খুলে যাচ্ছে দেবীর্ দ্বারঃ, আলোর দুয়ারের পরে দুয়ার, যার ফাঁক দিয়ে দেখা-নাদেখায় মেশা হয়ে চোখে পড়ে অনন্তের সহস্রস্থূণ, হাজার-থাম আনন্দ-ভবন—সেই ছিদ্রহীন বিপুল সুখের বাসর, যাকে বিদ্ধ করতে পারে না কাল-নাগিনী (যদ্ বংহিষ্ঠং নাতিবিধে......অচ্ছিদ্রং শর্ম—৫।৬২।৯)। এক একটি নাম যেন একেকটি অনন্ত-সঙ্কেত-গর্ভ বিদ্যুৎ, এক একটি তারাভরা নীলাকাশ, যাতে চমক দিয়ে দিয়ে উঠছে মৃন্ময়ী পৃথিবীর অজানা অব্যক্ত সূক্ষ্ম ভাবময় চিন্ময় চরাচরজোড়া রূপ।

তাঁদের চেনা ভূমিকে তাঁরা ভারতবর্ষ বলছেন না, কোনো ভৌগোলিক সীমানির্দেশও করছেন না, শুধু বলছেন ইনি **পৃথিবী** মানে প্রথিতা বিস্তীর্ণা বিপুলা (√প্রথ্—বিস্তার), এঁর শেষ কোথায় কী আছে শেষে—আমরা জানি না। ইনি **উর্বী** অর্থাৎ সব-ছাওয়া নিঃসীম বিশাল (√বৃ—আবরণ), ইনিই সবাইকে ঢেকে রেখেছেন, এঁকে ঢাকবে কে? **মহী** মহিমময়ী শক্তিময়ী জ্যোতির্ময়ী চতুর্থী ব্যাহৃতি (√মহ্—মহিমা), তাঁরই মহামহিমায় জেগে আছে আমাদের হারাধনগুলি, আমাদের সেই হারিয়ে-যাওয়া আলোকধেনুরা,

পণিদের অন্ধ গুহায় বসে বসে আত্মবিস্মৃতির ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে যারা সরমার পদধ্বনির আশায় কান পেতে রেখেছে। ইনিই সেই বাগ্‌ধেনুদের প্রসবিত্রী পালয়িত্রী **গোত্রা গো গ্মা** (√গম্—গমন) **গাতু**[১] (√গৈ ও √গা (চলা) এর জড়োয়া)—শব্দময়ী কামধেনু, গানের পথ বেয়ে নিত্যকাল চলেছেন আলোর বসুধারা ছড়াতে ছড়াতে, সেই দুধ্‌লো গাই সেই ওঙ্কার যাঁকে দোহন করে করে সহস্র অনন্ত অক্ষর বার করছে আখর দিয়ে চলেছে আবহমানকালের কবি মনীষী বিপ্র নর দেবনিদ্ (দেবনিন্দক) দেবয়ু (দেবকাম) পঞ্চজন। **ক্ষা ক্ষোণি (ণী) ক্ষিতি**—আছেন স্বধায় প্রতিষ্ঠিত, ঐশ্বর্যময়ী ভুবনেশ্বরী, বিশ্বতানে বাঁধা ধ্রুবপদী (√ক্ষি—নিবাস ও ঐশ্বর্য)। **ক্ষমা ক্ষ্মা**—সর্বংসহা সইছেন সব, আবার **জ্‌মা**, খাচ্ছেন সব (√জম্—ভক্ষণ)। **অবনি**—পরম মমতায় আগলে আছেন (√অব্‌—আগলানো) সবাইকে, সব-কিছুকে, গাছপালা পোকামাকড় সাপব্যাং পশুপাখি মানুষমানুষী সবাই তাঁর আপন সন্তান। **পূষা**—পোষণ করছেন পুষ্ট করছেন যার যেমন প্রয়োজন সেই মত অন্নরস জুগিয়ে, জীবধাত্রী অন্নপূর্ণা বসুন্ধরা। **রিপ্‌**—সহস্র বাহু মেলে লেপ্‌টে জাপ্‌টে সাপ্‌টে আছেন, এক হয়ে মিশে আছেন, লিপ্ত আছেন (√রিপ্‌ = √লিপ্‌) সবার সঙ্গে পরমাসক্তি হয়ে, বলছেন, 'যেতে নাহি দিব'। **ভূ ভূমি**—হয়ে আছেন, হয়ে চলেছেন (√ভূ—হওয়া)। **ইলা**—তেজোময়ী বাক্ (√ইন্ধ্‌—সন্দীপন)। সৃষ্টির মহারহস্যের দুই প্রান্তে—অবমে আর পরমে সবচাইতে গভীরে আর সর্বোচ্চ তুঙ্গে—এই **পৃথ্বী**-ই আছেন প্রথিতা হয়ে **অদিতি** আর **নিঋ৺তি** রূপে। ইনিই অখণ্ডিতা অবন্ধনা অদীনা দেবমাতা হিরণ্যবক্ষা অদিতি, যিনি একাধারে দ্যুলোক এবং অন্তরিক্ষ, মাতা, পিতা এবং পুত্র, সমস্ত দেবতা এবং পঞ্চজন, যা হয়েছে এবং যা হবে, সব[২]। আবার ইনিই ঘোরা ভয়ঙ্করী নিঋ৺তি, ঋতচ্ছন্দকে লণ্ডভণ্ড করে খলখল হাসছেন এলোকেশী ছিন্নমস্তা শ্মশানকালিকা অভদ্রকালী, অমার অন্ধকার দিয়ে সাজানো-গোছানো বিচিত্র সৃষ্টিকে লেপে মুছে এক-আকার করে রসার অতল থেকে তুলে তুলে আনছেন কালো কালো সৃজনবিন্দু। পাশার ছক সাজিয়ে আবার

১ তু উষা 'নৃতু' অর্থাৎ নর্তকী।

২ অদিতির্ দ্যৌর্ অদিতির্ অন্তরিক্ষম্ অদিতির্ মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনা অদিতির্ জাতম্ অদিতির্ জনিত্বম্॥ ১।৮৯।১০

উল্টে ফেলছেন রাক্ষসী পাশাবতী। যা হয়ে গেছে তার শব নিয়ে নাড়াচাড়া করে উল্টে পালটে আবার সৃষ্টি করছেন সব, সব রাখছেন। যা পুরাণ, তা পুরোন হচ্ছে না, নড়ে চড়ে নতুন হয়ে উঠছে।

বৈদিক পদকোষ নিঘণ্টুতে ধরে দেওয়া এই একুশটি পৃথিবীনাম যেন বাকের, নরগূঢ়া নারায়ণীর সেই একুশটি গুহ্য পদ,[৩] গোপন ধাম, সুষুপ্ত বীজ, তিনটি লোকের সাত সাত ভূমিতে যারা সহস্রবল্‌শ বনস্পতি হয়ে, অক্ষীয়মাণ শতধার উৎস হয়ে ফুটে উঠেছে, ঝরে পড়ছে। এই নামমালা যেন সৃষ্টির-পদ্মবীজের মালা, যেন উত্তরণের অবতরণের একুশটি সানু, যা দিয়ে পরম চেতনা থেকে অচিত্তি পর্যন্ত অনায়াসে ওঠা-নামা করবে সৃষ্টির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, অবতীর্ণ দেবমানব নরনারায়ণ।

অপরূপ ভাষায় ছন্দে ছবিতে এই মহাপৃথিবীর বন্দনা গেয়েছেন অদিতি-মা নির্ঋতি-মার কোল-বেড়ুনে মহাকবি ঋষি অথর্বা। পৃথিবীকে তিনি—দেখেছেন তাই—ডেকেছেন কবি বলে। রূপে রঙে রসে মধুগন্ধে ভরা এই অপরূপ সৃষ্টির কবি আমাদের মা পৃথিবী। রচেই চলেছেন সৃষ্টির কাব্য দ্যুলোক ভূলোক অন্তরিক্ষ মিলিয়ে মিলিয়ে পর্বে পর্বে সর্গে সর্গে কল্পে কল্পে। সে সৃষ্টির ছন্দ কখনো অগ্নিগর্ভা গায়ত্রী, কখনো সূর্যকরস্নাতা উষ্ণিক্, কখনো বা পাখা মেলি মাটির বন্ধন ফেলি ঐ শব্দরেখা ধরে চকিতে উধাও দিশাহারা অতিজগতী।

এই কবি মা-টির অত্যন্ত কাছাকাছি আছেন ঋষি অথর্বা। তাই সে-কবির বাণী লাগি চুপি চুপি কান পেতে থাকা ভাল। কি জানি,

> হয়ত কোনো নতুন কাঁপন লাগতে পারে চিত্-সরোদে
> অচেনা মুখ ভাসতে পারে খুব-চেনা এই বৃষ্টি-রোদে
> চমকে দিয়ে হাত ধরে কেউ বলতে পারে হঠাৎ কখন
> ডাকছ যাকে সেই আমি তো এই মাটিরই বুকচেরা ধন।

সূক্তটি বহুচ্ছন্দা। বৈদিক ছন্দের মোটামুটি কাঠামো এই—

একপদা বিরাট্ ১০ অক্ষর, দ্বিপদা বিরাট্ ২০ অক্ষর, গায়ত্রী ২৪, উষ্ণিক্ ২৮, অনুষ্টুপ্ ৩২, বৃহতী ৩৬, পঙ্‌ক্তি ৪০, ত্রিষ্টুপ্ ৪৪, জগতী ৪৮, অতিজগতী ৫২, শক্বরী ৫৬, অতিশক্বরী ৬০, অষ্টি ৬৪, অত্যষ্টি ৬৮, ধৃতি ৭২, অতিধৃতি ৭৬।

---

৩ তে মন্বত প্রথমং নাম ধেনোস্ ত্রিঃ সপ্ত মাতুঃ পরমাণি বিন্দন্ ৪।১।১৬

এক-দুই অক্ষরের কম-বেশিতে বৈদিক ছন্দের কিছু এসে যায় না। সন্ধি ভেঙে য ও ব-কে ইয ও উব পাঠ করে অক্ষরের ন্যূনতা পূরণ করে নিতে হয়। তা সত্ত্বেও যদি পূরণ না হয় বা অতিরিক্ত থাকে, তাহলেও ক্ষতি নেই। এক অক্ষর কম বা বেশী হলে যথাক্রমে নিচৃত্‌ ও ভূরিক্‌ এবং দুই অক্ষর কম বা বেশী হলে যথাক্রমে বিরাট্‌ ও স্বরাট্‌ বিশেষণ দেওয়া হয় ছন্দটিকে।

১॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্‌। **পৃথিবীম্‌** যে প্রথিতা বিস্তীর্ণা ভূমিকে আমরা পৃথিবী নাম দিয়েছি, তাকে **ধারয়ন্তি** ধারণ করে আছে ছটি নিগূঢ় তত্ত্ব। প্রথম—**বৃহৎ সত্যম্‌**। ধর্মাধর্ম পাপপুণ্যের অতীত বিশ্বমূল বিপুল অস্তিতাই সত্য। সেই মহা অস্তিতায় পৃথিবী বিধৃতা।

তু. হে পূর্ণ তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে।

দ্বিতীয়—**উগ্রম্‌ ঋতম্‌**। সত্যের স্পন্দিত ছন্দিত চঞ্চর প্রকাশই ঋত, √ঋ—চলা। ঈশোপনিষদের 'তত্‌ ন এজতি'—সত্য। 'তত্‌ এজতি'—ঋত। সত্য যেন স্তম্ভিত সমাহিত নটরাজ শিব, ঋত তাঁর নৃত্যের তাল। 'উগ্র' ওজস্বী, ওজঃক্ষরা।

তু. বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি
সে কি সহজ গান।
মোর সংসারে তাণ্ডব তব কম্পিত জটাজালে
জীবন-মরণ নাচের ডমরু বাজাও জলদমন্দ্র হে।

সেই উগ্র রুদ্র মহা-তাল মহা-কালের কেলে বিধৃতা রয়েছে পৃথিবী।

তৃতীয়—**দীক্ষা**। √দহ্‌+ইচ্ছার্থে সন্‌>দহনের ইচ্ছা। আত্মদহনের তীব্র আকূতি।

তু. এই করেছ ভালো নিঠুর এই করেছ ভালো
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ-জীবন পুণ্য কর দহন-দানে।

সৃষ্টিযজ্ঞে পরমপুরুষের আত্মাহুতির ইচ্ছাই প্রথম দীক্ষা—
বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা আত্মহোমের বহ্নি-জ্বালা।

তারই অনুকরণ, অনুসরণ মানুষের জীবন-যজ্ঞে।

প্রকৃতির আগুনে পুরুষ ঝাঁপ দিচ্ছেন স্বেচ্ছায় প্রতি মুহূর্তে অগ্নি-রাসের

প্রচণ্ড তাণ্ডব-লাস্যে। সে নাচের ঘূর্ণির প্রতিটি চূর্ণ থেকে সৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ছে ফোয়ারার মত—তীব্রো রেণুর্ব্ অপায়ত। এই ইচ্ছা যদি থেমে যায়, তাহলে সৃষ্টি থেমে যাবে, পৃথিবী তলিয়ে যাবে মৃত্যুর অতলে। আবার মানুষের আত্মদহনের ইচ্ছা যদি স্তব্ধ হয়ে যায়,

যদি দিন কাটে তার নিশ্চিন্ত আরামে
আকণ্ঠ ইন্দ্রিয়-সুখে পরস্পর পৃষ্ঠ-কণ্ডুয়নে,

তাহলে তার শিল্প কলা সাহিত্য সংস্কৃতি দর্শন ধর্ম সভ্যতা যাবে থেমে, সমাজ চুরমার হয়ে পরিণত হবে আত্মকেন্দ্রিক অসংখ্য টুকরোর ধ্বংসস্তূপে।

চতুর্থ—**তপঃ**, দীক্ষার পরিণাম, তাপ, বিকিরণ। সমিদ্ধ হতে হতে, প্রতপ্ত হতে হতে স্থিরদ্যুতিতে জ্বলে ওঠা, জ্বলতে থাকা। ঋগ্বেদের উপান্তিম সূক্তে সৃষ্টির রহস্য এইভাবে বলা হয়েছে—

ঋতং চ সত্যং চ অভীদ্ধাত্ তপসঃ অধি-অজায়ত।

অভীদ্ধ তপস্ থেকে জন্মাল ঋত এবং সত্য। স্রষ্টার দীক্ষা এবং তপঃ থেকে যেমন সৃষ্টি, তাঁর আত্ম-সৃষ্টি, নতুন জন্ম, তেমনি সাধকের দীক্ষা এবং তপঃ থেকে তার নতুন জন্ম। তপঃ হল তার আধারে দেবজন্মের সম্ভাবনাকে সুপ্ত হিরণ্যগর্ভকে তা' দেওয়া।

পঞ্চম—**ব্রহ্ম**। √বৃহ্—বাড়া>ক্রমবর্ধমান চেতনা ও তার বাক-শক্তি, মন্ত্র, ঋগ্বেদের ঋষি ত্রিত আপ্ত্য যাকে বলেছেন ব্রহ্মী বাক্। ব্যাস-বিশাল চেতনার মহাকবিরা তাঁদের মন্ত্র দিয়ে ধারণ করে আছেন এই পৃথিবীকে। তাঁদের সবার ওপরে আছেন সেই—

তুমি আদিকবি কবিগুরু তুমি হে
মন্ত্র তোমার মন্দ্রিত সব ভুবনে (পূজা, ৪৭০)

তাঁর এক একটি মন্ত্র-মন্দ্রে সৃষ্টি হয় এক একটি শব্দতরঙ্গময় ভুবন—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য, দেহ প্রাণ-মন-বিজ্ঞান-আনন্দ-চিৎ-সৎ-এর ক্রমসূক্ষ্ম স্তর।

ষষ্ঠ—**যজ্ঞঃ**। যজ্ঞ মানে আত্মাহুতি। এই সৃষ্টিকে বেদ বলেছেন প্রজাপতির সহস্র অর্থাৎ অনন্ত-সংবৎসরব্যাপী যজ্ঞ। বলেছেন, বিশ্বসৃজাম্ অয়নম্। স্রষ্টার নিরন্তর আত্মাহুতি এ-বিশ্বের স্থিতির কারণ। স্রষ্টার অনুকরণে মানুষও করে চলেছে জীবন-যজ্ঞ। নিরুক্তকার একটি সার্থক যজ্ঞের উদাহরণ দিয়েছেন—বিশ্বকর্মা হ ভৌবনঃ সর্বমেধে সর্বাণি ভূতানি জুহবাঞ্চকার স আত্মানমপি অন্ততো

জুহবাঞ্চকার (১০।২৬)। অর্থাৎ ভুবনপুত্র বিশ্বকর্মা সর্বমেধ যজ্ঞে সর্বভূতকে আহুতি দিয়ে অবশেষে নিজেকেও আহুতি দিয়েছিলেন।

সা এই ষট্‌-তত্ত্ব তথা-শক্তি-বিধৃতা **পৃথিবী** বিরাট্‌ ভূমি **নঃ** আমাদের **ভূতস্য** যা হয়ে গেছে তার, অতীতের, এবং **ভব্যস্য** যা হবে তার, ভবিষ্যতের **পত্নী** অধীশ্বরী রানী, ঈশানী। তাঁর কাছে কী চাই ? না, তিনি **নঃ** আমাদের জন্য **উরুম্‌** সব-ছাওয়া (√বৃ—আবরণ), বিশাল **লোকম্‌** লোক, আলোকের ভুবন, আলোক-লোক (দ্র. বেদমীমাংসা ২৫২ পৃ) **কৃণোতু** করুন। উরু লোকের অবাধ বৈপুল্যে বিচরণ বৈদিক কবির প্রিয় কামনা—

বিরাট্‌ বিপুলে দুজনা
ডানা মেলে যাব, যতদূর চাব আমি ও আমার চেতনা।

রবীন্দ্রনাথেও দেখি এই অনুভব—

এই যে বিপুল ঢেউ লেগেছে
তোর মাঝেতে উঠুক নেচে
যেখানেতে অবাধ ছুটি
মেল্‌ সেথা তোর ডানা দুটি···।

ঋগ্বেদের কবি গৃৎসমদ দেবী সরস্বতীকে বলছেন—

অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তিম্‌ অম্ব নস্‌ কৃধি (২।৪১।১৬).
আমরা অপ্রশস্ত, আমাদের প্রশস্তি দাও মা।

ঋষি ভৌম অত্রি বলছেন—

উরৌ দেবা অনিবাধে স্যাম।
অবাধ বিপুলে র'ব ওগো দেবতারা। (৫।৪২।১৭, ৭৩।১৬)

যজ্ঞ হল সৃষ্টি তথা জীবন। তার সূচনা ও উপকরণ—দীক্ষা তপস্‌ এবং ব্রহ্ম। তার সিদ্ধি—উরুলোকে অর্থাৎ সত্য-ঋত-চেতনায় সবার অবাধ সঞ্চরণ।

২॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্‌। 'বধ্যতঃ' পাঠান্তর 'মধ্যতঃ'—এতে অন্বয় স্বচ্ছন্দ হয় না। বধ্যতঃ—পাঠে ব্যাকরণগত অসুবিধেটুকু (স্ত্রীলিঙ্গ বধ্যস্ত্যাঃ স্থানে পুংলিঙ্গ 'বধ্যতঃ' হয়েছে) মেনে নিলে সুসঙ্গত অর্থ হয়। একই ধাতুর অনুপ্রয়োগ বেদের ভাষার বৈশিষ্ট্য, যেমন—যজ্ঞস্য দেবম্‌ ঋত্বিজম্‌ (১।১।১) যজ্ঞ এবং ঋত্বিজ্‌ দুটিতেই যজ্‌-ধাতু রয়েছে। যথা প্রসূতা সবিতুঃ সবায় (ঋ ১।১১৩।১)—

তিনটি পদেই রয়েছে স্থ-ধাতু। এখানে √বাধ্ এবং দিবাদি √বন্ধ্ দুটি ধাতুর সমাবেশ আরো বৈচিত্র্যপূর্ণ। 'সম্বাধ'—ভিড় চাপ **মানবানাম্ অ-সম্বাধম্ বধ্যতঃ** কোনো চাপ না দিয়েই মানুষকে যিনি বাঁধছেন তাঁর। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোর উল্টোভাব। উদ্বত্ প্রবত্ নিবত্ ইত্যাদি শব্দগুলি তৈরি হয় সোজাসুজি উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে (উপসর্গাত্ ছন্দসি ধাত্বর্থে—পা)। উদ্-বত্—চড়াই। প্র-বত্—ঢালু, উৎরাই। **যস্যাঃ** যে পৃথিবীর **বহু** কতরকম গড়ন চলন, **উদ্বতঃ** কত চড়াই, খাড়া উঁচু জমি **প্রবতঃ** কত ঢালু, গড়াই, নিচু জমি, **সমম্** কত সমতল। তৃতীয় পঙ্ক্তিতে বৈদিক ভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য অনুপ্রাস লক্ষণীয়—বীর্যা বীর্ যা। **যা** যিনি **বিভর্তি** ভরণ করেন **নানাবীর্যাঃ** বিচিত্র বীর্যসম্পন্ন **ওষধীঃ** গাছপালা। প্রার্থনা করি, সেই **পৃথিবী নঃ** আমাদের কাছে **প্রথতাম্** বিস্তীর্ণা হোন, **রাধ্যতাম্** √রাধ্—সংসিদ্ধি॥ √ঋধ্—সমৃদ্ধি। ঋদ্ধা-সিদ্ধা হোন, অভ্যুদয়রূপ ঋদ্ধি ও নিঃশ্রেয়সরূপ সিদ্ধি আনুন।

যিনি মানুষকে না-বেঁধেই বাঁধেন, যাঁর আকৃতিতে কত বৈচিত্র্য, যাঁর অঙ্গ জুড়ে রয়েছে অসংখ্য শক্তিসম্পন্ন ওষধি, সেই পৃথিবী আমাদের কাছে বিস্তীর্ণা হোন এবং ধনধান্যপুষ্পে আনন্দে ভরে উঠুন।

৩॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। পৃথিবীর মোটামুটি মানচিত্রের ওপরে এখন বসাচ্ছেন সমুদ্র নদী খেত মানুষ ইত্যাদি। **যস্যাম্** যে-পৃথিবীতে রয়েছে **সমুদ্রঃ** সাগর **উত** এবং **সিন্ধু** (< √স্যন্দ্) নদী **আপঃ** জল। **যস্যাম্** যেখানে **অন্নম্** খাদ্য, শস্য **কৃষ্টয়ঃ** মানুষেরা, কৃষ্টি নিঘণ্টুতে মনুষ্য-নাম **সংবভূবুঃ** সম্ভূত হয়, জন্মায়। √কৃষ্—চাষ>কৃষ্টি=চষা জমি, মানব-জমিন। গীতার ক্ষেত্র তুলনীয়। সোনার মানুষ পৃথিবীর সোনার ফসল। **যস্যাম্** যে পৃথিবীতে **ইদম্** এই **প্রাণত্** প্রাণনশীল **এজত্** কম্পনশীল সব কিছু **জিন্বতি** শিউরে শিউরে উঠছে নড়ছে চড়ছে কিলবিল করছে গর্ভস্থ শিশুর মত। ভুবনব্যাপী প্রাণের কাঁপন, প্রাণের তরঙ্গ অনুভব করছেন ঋষি। **সা ভূমিঃ** সেই ভূমি **নঃ** আমাদের **পূর্বপেয়ে** প্রথম পানে **দধাতু** প্রতিষ্ঠিত করুন। পূর্বপেয় কথাটি শ্লিষ্ট এবং বেদে বহুপ্রযুক্ত (পূর্বপা, পূর্বপীতি ইত্যাদি)। অর্থ—পূর্ব অর্থাৎ প্রথম পান, এবং পূর্ববৎ অর্থাৎ প্রাচীনদের মত পান সোমরস অর্থাৎ আনন্দকে।

জলপূর্ণা অন্নপূর্ণা জীবধাত্রী পৃথিবী আমাদের দিন সেই আদিম চিরনবীন আনন্দে প্রতিষ্ঠা, যা পেয়েছিলেন আমাদের প্রাচীনেরা।

তু. যা পেয়েছি প্রথম দিনে সেই যেন পাই শেষে
দুহাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই শিশুর মত হেসে ॥ (পূজা ৫৮৪)

৪॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ । **যস্যাঃ পৃথিব্যাঃ** যে পৃথিবীর **চতস্রঃ প্রদিশঃ** চারটি দিক্ তথা বিদিক্। পরের পঙ্‌ক্তিটি আগের ঋকের দ্বিতীয় চরণের পুনরাবৃত্তি—এও বৈদিক কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য। **যা** যে পৃথিবী **প্রাণত্ এজত্** প্রাণনশীল কম্পনশীল সব কিছুকে **বহুধা** নানাভাবে **বিভর্তি** ভরণ করেন **সা ভূমিঃ** সেই ভূমি **নঃ** আমাদের **গোষু অন্নে অপি** গোরুতে এবং অন্নে **দধাতু** প্রতিষ্ঠিত করুন।

এ যেন সেই ঈশ্বরী পাটনীর প্রার্থনার পূর্বধ্বনি—আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।

আবার বাউল গানের মত এর রাহস্যিক অর্থও রয়েছে—

গো আলোকধেনু, বাক্-ধেনু, মানুষের অন্তর্নিহিত বাক্-জ্যোতি, যা সর্বকামধুক্ বলে ধেনুর সঙ্গে উপমিত এবং একীকৃত। **অন্ন** শুধু দেহ নয় প্রাণ-মনেরও খাদ্য। এর পরে ১৬শ ঋকে রয়েছে এই প্রার্থনার আরো স্পষ্ট রূপ—

বাচো মধু পৃথিবি ধেহি মহ্যম্।

৫॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ বা উপজগতী। **যস্যাম্** যে পৃথিবীতে **পূর্বে** আগে, বেদে 'পূর্বে' পদটি বহুত্র প্রথমা-বহুবচনান্ত, পূর্বে পিতরঃ, পূর্বে দেবাসঃ, পূর্বে কবয়ঃ ইত্যাদি, বোঝায় পূর্বকালীন, পূর্বজন, পূর্বপুরুষ। কিন্তু হোতুশ্চিত্ পূর্বে হবির্ অদ্যম্ আশত (১০।৯৪।২) এখানে 'পূর্বে' সপ্তমী-একবচন, বোঝাচ্ছে পূর্বকালে অর্থাৎ আগে। এখানে এই অর্থটিই নিতে হবে, নয়তো পুনরুক্তি হয়ে যায়, কেননা পরেই আছে পূর্বজনাঃ। **পূর্বজনাঃ** পূর্বপুরুষেরা, পূর্বজদের কথায় কথায় স্মরণ করা বেদের ঋষিদের বৈশিষ্ট্য—**বি-চক্রিরে** বিবিধ কর্ম করেছেন; **যস্যাম্** যে-পৃথিবীতে **দেবাঃ** দেবতারা **অসুরান্** অসুরদের **অভি-অবর্তয়ন্** অভিবৃত্ত করেছেন—যে-সব শ্লিষ্টধাতুর প্রয়োগে বেদের ভাষা রহস্যময় হয়ে আছে, এ-ও হয়, ও-ও হয়, সুতরাং পাঠকভেদে বিসংবাদ অনিবার্য, তারই একটি দৃষ্টান্ত এই পদটি। √বৃত্—থাকা, ঘোরা, চক্রের অস্তিত্ব, সত্য-ঋত। সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছেন, অর্থাৎ হারিয়ে দিয়েছেন—এই হল সাধারণ অর্থ। গূঢ়ার্থ—মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। দেবাসুরের যুদ্ধ চলেছে এই পৃথিবীরই বুকে, সে যুদ্ধে দেবতারা কতবার জয়ী হয়েছেন, কতবার অসুরদের মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে

এসেছেন দেবত্বে। আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে—এই **হল অসুরের 'বর্তন'**। আর—

রইল কথা তোমারি নাথ তুমিই জয়ী হলে
ঘুরে ফিরে এলাম আবার তোমার চরণমূলে।

—এ হল দেবতার অভ্যাবর্তন।

ঋগ্বেদের ঋষি অভীবর্ত আঙ্গিরসের সূক্তটি (১০।১৭৪) এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। এখানে অভি-বৃত্ শব্দটিকে মূলধন করে ঋষি যেন নিজেরই নামরহস্য বলেছেন নানাছলে।

গবাম্ গোরুদের **অশ্বানাম্** ঘোড়াদের **বয়সঃ চ** এবং পাখির, √বী—গতি ব্যাপ্তি কান্তি ইত্যাদি, ('বায়স' সর্বদাদৃষ্ট সাধারণ পাখি কাক)—অর্থাৎ সমস্ত পশুপাখির **বি-ষ্ঠা** বিচিত্র বিবিধ স্থান, আশ্রয়, আধার যে **পৃথিবী** তিনি **নঃ** আমাদের মধ্যে **দধাতু** আহিত করুন **ভগম্ বর্চঃ**। √ভঞ্জ্—ভাঙা> আধারকে ভেঙে ঢোকে দেবতার যে আবেশ তা-ই ভগ (বেমী) তু. ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়, যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে, দ্বার ভেঙে তুমি জাগায়ো আমারে, ইত্যাদি—রবীন্দ্রনাথ। আমারে ভেঙে ভেঙে করো হে তোমার তরী—অতুলপ্রসাদ। শ্রীঅরবিন্দের অর্থ সম্ভোগ < √ভুজ্। বর্চঃ < √বৃচ্—ভাঙা, তু. break তিমির-বিদার জ্যোতি। সবটা মিলিয়ে ভগং বর্চঃ-এর অর্থ দাঁড়ায় দ্বার-ভাঙা আলোর আনন্দ-আবেশ।

৬॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্ বা উপজগতী। **বিশ্বম্ভরা** 'বিশ্বকে' সবকিছুকে √ভৃ—ভরণ পোষণ পালন করেন যিনি **বসু-ধানী** 'বসু' আলোকবিত্ত নিহিত থাকে যাতে সেই বসুধা বসুন্ধরা **প্রতিষ্ঠা** সর্বাধার **হিরণ্য-বক্ষাঃ** দুটি অর্থ, হয়ত কোন পাহাড়ে সকালের আলো পড়ে ঝলমল করছিল সোনার মত, বা পাক-ধরা দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র রোদে সোনার মত ঝলমল করছিল, তাই পৃথিবীকে কবির মনে হল স্বর্ণ-বক্ষা। আবার আদিত্য-হৃদয়া চিন্ময়ী পৃথিবী। তু. সোনার বাংলা। **জগতঃ** √গম্ > যা অনবরত চলছে, চরাচর—তার **নিবেশনী** 'নি' গভীরে √বিশ্ প্রবেশ করান, তলিয়ে দেন যিনি, ঘুমপাড়ানী, দ্র. রাত্রিসূক্ত ১০।১২৭।৪, ৫ **বৈশ্বানরম্ অগ্নিম্** বিশ্বাত্মক অগ্নিকে **বিভ্রতী** ধারণ করে আছেন **ইন্দ্র-ঋষভা** ইন্দ্র যাঁর ঋষভ সেই ইন্দ্র-ধেনু **ভূমিঃ** পৃথিবী

নঃ আমাদের **দ্রবিণে** √দ্রু-দৌড়ন, যার জন্যে লোকে দৌড়য় সেই ধন, যার কাছে যা পরমকাম্য তাই তার কাছে দ্রবিণ, তাতে **দধাতু** নিহিত করুন, প্রতিষ্ঠা দিন।

৭॥ প্রস্তারপঙ্‌ক্তি ছন্দ। প্রথম দুটি চরণে ১২ অক্ষর ও পরের দুটিতে ৮ এই হল এ ছন্দের লক্ষণ।

দেবাঃ দেবতারা **অস্বপ্নাঃ** নিদ্রাবিহীন **অপ্রমাদম্** প্রমাদবিহীন হয়ে, সাবধানে **যাম্ পৃথিবীম ভূমিম্** যে প্রথিতা ভূমিকে, পৃথিবীকে **রক্ষন্তি** রক্ষা করছেন, **সা** তিনি **নঃ** আমাদের **প্রিয়ম্ মধু** প্রিয় মধু প্রগাঢ় আনন্দরস **দুহাম্**=দুগ্ধাম্ √দুহ্ +লোট্ আত্মনেপদ ৩।১ দুয়ে দিন। দুহাম্ অশ্বিভ্যাম্ পয়ো অঘ্ন্যা ইয়ম্ ১।১৬৪।২৭ এ 'দুহাম্' এই প্রয়োগটি আছে। **অথো** এবং **বর্চসা** বর্চস্ দিয়ে **উক্ষতু** অবন্ধ্য করুন আমাদের। √উক্ষ্ দ্ব্যর্থক, ছিটোন, অ-বন্ধ্য করা।

শ্যাম কল্পধেনু পৃথিবীর দুগ্ধ-মধু হল আনন্দ। তা তিনি ঝরিয়ে দিন আমাদের জন্যে, যাতে অনুভব করি, আনন্দধারা বহিছে ভুবনে। সেই সঙ্গে দিন তিমির-প্রভঞ্জন আলোকবীর্য যা আমাদের আধমরা নিষ্ফল বন্ধ্য জীবনকে ভরে দেবে কানায় কানায়। বেদের ইন্দ্র সোমপা-তম হয়ে অর্থাৎ আনন্দ-সুধাপানে বুঁদ হয়ে বৃত্রবধ করেন অর্থাৎ হানেন সমস্ত বাধা, সমস্ত আবরণ—এই ছবিটির সঙ্গে এই প্রার্থনা একসুরে বাঁধা।

৮॥ ছন্দ ত্রি-অবসানা (তিন জায়গায় থামা, দ্বিতীয় চতুর্থ ও ষষ্ঠ চরণের শেষে) ষট্‌-পদা বিরাট্ অষ্টি।

যা যে পৃথিবী **অগ্রে** সৃষ্টির আগে **অর্ণবে অধি** অর্ণবের মধ্যে √ঋ—গতি > অর্ণ—ঢেউ স্রোত চঞ্চলতা, তদ্‌যুক্ত অর্ণব, অর্থাৎ এক বিপুল চঞ্চল তার মধ্যে **সলিলম্** √স্ব—চলা > চঞ্চলতা, সম্ভাবনার থরথরানি, potency হয়ে **আসীত্** ছিল, **যাম্** যে-পৃথিবীকে **মনীষিণঃ** মনীষীরা **মায়াভিঃ** √মা—নির্মাণ, √মন্—মনন > 'মায়া' নির্মাণপ্রজ্ঞা প্রতিভা creative genius তাই দিয়ে **অনু-অচরন্** অনুসরণ অনুধাবন করেছেন, করেন। বেদে লুঙ্ লঙ্ ও লিট্ শুধু অতীত নয়, সব কালেই ব্যবহার হয়ে থাকে।

যস্যাঃ যে-পৃথিবীর **অমৃতম্** শব্দটি নেতিমুখ হলেও সদর্থক, (তু. বাং অসুখ) বিশেষ্য বিশেষণ দুই-ই হয়। বিশেষ্য অর্থে মহাসুখ আনন্দ অভয়

অনন্ত-জীবন মহাজীবন অমরতা। এখানে বিশেষণ, অমৃতস্বরূপ **হৃদয়ম্** হৃদয় মরম অন্তরতম রহস্যধানী **পরমে ব্যোমন্** যে অনিবাধ বৈপুল্য সব কিছুকে আগলে আছে সেই পরম ব্যোমে মহাশূন্যে **সত্যেন** সত্য দিয়ে, ধর্মাধর্ম পাপ-পুণ্যের অতীত বিশ্বমূল তত্ত্ব অস্তিতা দিয়ে **আবৃতম্** ঢাকা আছে, **সা ভূমিঃ** সেই ভূমি **নঃ** আমাদের মধ্যে **উত্তমে রাষ্ট্রে** উত্তম রাষ্ট্রের জন্য, লক্ষ্যার্থে সপ্তমী **ত্বিষিম্** তেজ এবং **বলম্** শক্তি **দধাতু** নিহিত করুন।

সৃষ্টির আগে এক মহাসম্ভাবনার বৈপুল্যে লীন হয়েছিল পৃথিবী। তার জন্মরহস্য প্রজ্ঞান দিয়ে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে চলেছেন মনীষীরা। তাঁর অমৃতহৃদয়রহস্য মহাব্যোমে সত্যের ঢাকন দিয়ে ঢাকা। এই উত্তুঙ্গ দার্শনিক ভাবনা থেকে এক মুহূর্তে অবলীলায় ঋষি চলে এলেন মহা-রাষ্ট্রের ভাবনায়। ঋষি পাখা মেলছেন কিন্তু মাটির বন্ধন ফেলছেন না। অথর্ববেদের বিশেষত্বই তাই—

কৌটোয় দু-পা
মহাকাশে পাখা
ধূম্রা ভোমরা ওড়ে।

৯॥ ছন্দ উপরিষ্টাত্-জ্যোতিঃ ত্রিষ্টুপ্। তিনটি ১২ অক্ষরের চরণের পরে একটি ৮ অক্ষরের চরণ—এই হল এ ছন্দের লক্ষণ।

যস্যাম্ যে-ভূমিতে **পরিচরাঃ** 'পরি' চতুর্দিকে 'চর' বিচরণশীল প্রবাহিত **সমানীঃ** সমানভাবে সবার জন্য, অবিরুদ্ধভাবে **আপঃ** জল, প্রাণের প্রতীক—বিশ্বপ্রাণ **অপ্রমাদম্** প্রমাদহীনভাবে **অহোরাত্রে** দিনরাত **ক্ষরন্তি** ঝরছে, **সা** সেই **ভূরিধারা** বহুধারা ধেনুরূপিনী **ভূমিঃ** পৃথিবী **নঃ** আমাদের জন্য **পয়ঃ** দুধ **দুহাম্** দুয়ে দিন। শেষ পঙ্ক্তি ৭ম ঋকের মত।

১০॥ ছন্দ মহাপঙ্ক্তি জগতী। ৮ অক্ষরের পাঁচটি চরণ থাকলে পঙ্ক্তি ছন্দ হয়। এখানে ছটি চরণ আছে। সবশুদ্ধ ৪৮ অক্ষর বলে জগতী।

অশ্বিনৌ অশ্বিদ্বয় **যাম্** যে পৃথিবীকে **অমিমাতাম্** √মা—মাপা+লঙ্ ৩।২ মাপেন, **বিষ্ণুঃ** বিষ্ণু **যস্যাম্** যে-পৃথিবীতে **বি-চক্রমে** বি- √ক্রম্—পা ফেলা+লিট্ ৩।১ পা ফেলেন, **শচীপতিঃ** শক্তি-পতি **ইন্দ্রঃ** ইন্দ্র **যাম্** যে-পৃথিবীকে **আত্মনে** নিজের জন্য **অনমিত্রাম্** শত্রুহীন **চক্রে** করেছেন **সা মাতা ভূমিঃ** সেই ভুঁই-মা **নঃ** আমাদের জন্য **মে পুত্রায়** পুত্র-আমার জন্য **পয়ঃ** দুধ **বি সৃজতাম্** বহুধারায় ঝরিয়ে দিন।

দেবরক্ষিতা দেবসৃষ্টা দেববেষ্টিতা পৃথিবী। এই শ্যামল মাটির ধরাতলই সেই আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন! অশ্বী-বিষ্ণু একটি প্রত্যাহার, বোঝাচ্ছে অশ্বী-উষা-সবিতা-ভগ-সূর্য-পুষা-বিষ্ণু এই সাতজনকে। এঁরা হলেন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আলোর ক্রমিক প্রকাশের তথা চেতনার উত্তরায়ণের দেবতা (দ্র. উষা-সূক্তের ভাষ্য-ভূমিকা)। সূর্যাস্ত থেকে সুরু করে শেষরাত পর্যন্ত তমোভাগ ও জ্যোতির্ভাগ অশ্বিদ্বয়ের পৃথিবী-পরিক্রমাকে লক্ষ্য করা হয়েছে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে। দ্বিতীয়ে বিষ্ণু অর্থাৎ সর্বব্যাপী (√বিষ্—ব্যাপ্তি) মাধ্যন্দিন সূর্যের তিনটি পদক্ষেপের কথা—প্রাচীমূলে, মধ্যগগনে, মহাশূন্যে।

প্রিয়া পৃথিবীকে যাতে অন্য কেউ অধিকার করতে না পারে, তার জন্য ইন্দ্র ব্যস্ত শত্রুনিধনে। সেই ভূমি আমাদের মা। আমরা, আমি তাঁর ছেলে। তাঁর যা 'পয়ঃ' শ্রেষ্ঠ আপ্যায়নী ধারা তা তিনি স্বয়ংই উজাড় করে দিন আমাদের···আমার জন্যে।

১১। চারটি ত্রৈষ্টুভ (১১ অক্ষরের) চরণ ও দুটি গায়ত্র (৮ অক্ষরের) চরণ মিলে এটি একটি নতুন ত্রি-অবসান ষট্-পদ ছন্দ। অক্ষরসংখ্যার দিক থেকে অতিশক্বরী (৬০ অক্ষর)। শেষ দুটি চরণের সন্ধি ভাঙলে আরো ২টি অক্ষর বেশী হয়, তাই শ্রীসাতবলেকর এটিকে বিরাট্ অষ্টি (২ কম ৬৪) বলেছেন।

পৃথিবি হে পৃথিবী **তে** তোমার **গিরয়ঃ** শিখরযুক্ত পাহাড়েরা, যা সমুদ্গীর্ণ অর্থাৎ উঁচু হয়ে উঠেছে তাই গিরি—যাস্ক (নি ১।২০), **হিমবন্তঃ** হিমেল **পর্বতাঃ** ঢেউ-খেলানো পাহাড়েরা, যা পর্বে পর্বে বিভক্ত তাই পর্বত (ঐ), **অরণ্যম্** অরণ্য, যা অরম্য বা গ্রাম থেকে অপ-গত, অনেক দূরে (√ঋ-গতি) তাই অরণ্য **স্যোনম্** সুখকর **অস্তু** হোক। **বভ্রুম্** পিঙ্গলা **কৃষ্ণাম্** শ্যামলী **রোহিণীম্** লাল, রাঙামাটির পৃথিবী, আবার যিনি আরোহণ করেই চলেছেন ever-progressive এ অর্থও হয় **বিশ্বরূপাম্** অনন্তরূপা **ধ্রুবাম্** স্থিরা অচঞ্চলা **ইন্দ্র-গুপ্তাম্** ইন্দ্র-রক্ষিতা **পৃথিবীম্ ভূমিম্ অধি** পৃথিবী ভূমিতে **অহম্** আমি **অজীতঃ** √জ্যা—হানি, দমন > অদম্য **অক্ষতঃ** ক্ষতহীন অনাহত **অহতঃ** অ-নিহত হয়ে **অ-স্থাম্** অধিষ্ঠান করছি।

'মহাপৃথিবীর আমি পুত্র' এই মহিমবোধ থেকে জন্ম নিল এই অনুভূতি—বনপর্বতপ্রান্তরময়ী রাঙা কালো পাটকিলে আরো কত রঙের মাটির এই পৃথিবী

ছেয়ে আমি অপরাজিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমায় মারবে কে? তু. দূর হয়ে যা যমের ভটা ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা—রামপ্রসাদ।

১২॥ ছন্দ ত্রি-অবসানা পঞ্চপদা শক্বরী। **পৃথিবি** হে পৃথিবী **যত্ তে মধ্যম্** তোমার যা মাঝখান, **যত্ চ নভ্যম্** আর যা তোমার নাভি, অথবা অব্যক্ত আদি অন্তের মাঝখানে যা তোমার ব্যক্ত আর যা তোমার নভঃস্থ অর্থাৎ অব্যক্ত **তে** তোমার **তন্বঃ** তনু থেকে **যাঃ ঊর্জঃ** যে বজ্রবীর্যসমূহ **সংবভূবুঃ** সম্ভূত হয়েছে **তাসু** তাতে **নঃ** আমাদের **ধেহি** প্রতিষ্ঠিত কর। **নঃ অভি** আমাদের অভিমুখে **পবস্ব** প্রবাহিত হও, পবিত্র কর, শব্দটিতে পবমান সোমের অনুষঙ্গ রয়েছে, পৃথিবী যেন একটি নদী, একটি নির্মল ধারা, ২৯শ ও ৩৫শ ঋকে বিমৃগ্বরী শব্দটি দ্র.। **ভূমিঃ মাতা** ভূমি আমার মা **অহং পৃথিব্যাঃ পুত্রঃ** আমি পৃথিবীর ছেলে। **পর্জন্যঃ** অন্তরিক্ষস্থান বৃষ্টির দেবতা, যত গর্জেন, তত বর্ষেন ; গর্জনে হানেন যত দুষ্টকে (৫।৮৩।২), বর্ষণে অবন্ধ্যা করেন পৃথিবীকে (ঐ ৪) ; যাস্কের নিরুক্তি—১) যিনি তৃপ্ত করেন (√তর্প্ উল্টে পরৃত্) ও যিনি 'জন্য' জনহিতকারী ২) রসের পর-ম জেতা বা জনয়িতা বা প্রকৃষ্ট অর্জয়িতা (নি ১০।১০) **পিতা** আমাদের পিতা। **সঃ** তিনি **উ** অবশ্যই **নঃ** আমাদের **পিপর্তু** √পৃ—পালন পূরণ > পালন করুন, অকৃপণ করে জীবন পূর্ণ করুন। পূর্ণতার ভাবনায় আচ্ছন্ন শেষ পঙ্‌ক্তিটিতে 'প' এর অনুপ্রাস লক্ষণীয়।

১৩॥ ছন্দ পূর্ববৎ। **যস্যাম্ ভূম্যাম্** যে-ভূমিতে **বিশ্বকর্মাণঃ** বিশ্বকর্মারা বিশ্বস্রষ্টারা, দ্র. বিশ্বকর্মা সূক্ত ১০।৮১, ৮২, বিশ্বধাতাই প্রথম বিশ্বকর্মা, তাঁর সৃষ্টিযজ্ঞের পশু তিনি নিজেই ১০।৯০।১৫ ; তাঁর যজ্ঞের অনুসরণ, অনুকরণ করেন যাঁরা, তাঁরাও বিশ্বকর্মা। দ্র. ১০।৮১।১ এর ব্যাখ্যায় যাস্কের ইতিহাস কথা—ভুবনপুত্র বিশ্বকর্মা সর্বমেধ যজ্ঞে সবকিছু আহুতি দিয়ে শেষে নিজেকেও আহুতি দিলেন (নি ১০।২৬), এর অর্থ, পৃথিবীর পুত্র নতুন স্রষ্টারা পূর্বসৃষ্টিকে পুড়িয়ে ছাই করতে করতে নিজেকেও উৎসর্গ করেন, তাই হয় উত্তরসৃষ্টির উপকরণ ও শক্তি **বেদিম্ পরি গৃহ্ণন্তি** বেদিরূপিনী পৃথিবীর একটি স্থান ঘিরে নিয়ে সেটিকে যজ্ঞবেদি রূপে গ্রহণ করেন এবং **যস্যাম্** যে-পৃথিবীতে তাঁরা **যজ্ঞং তন্বতে** √তন্—বিস্তার, সাতত্য>যজ্ঞ বিস্তার করেন, বিছোন, টানা দেন ; যজ্ঞের আর এক নাম বিতান, কেননা নিরবধি দেশে ও কালে তা

পরিব্যাপ্ত, সমস্ত সৃষ্টিই একটি অনবরত ক্রিয়মাণ যজ্ঞ, স্বর্গ-মর্ত্য-ব্যাপী তাঁতে কাপড় বোনা। **যস্যাম্ পৃথিব্যাম্** যে-পৃথিবীতে **আহুত্যাঃ পুরস্তাত্** আহুতির আগে **ঊর্ধ্বাঃ** খাড়া **শুক্রাঃ** উজ্জ্বল **স্বরবঃ** স্বরু+১।৩ স্বরু যূপবেষ্টন-রজ্জুর মধ্যে রক্ষিত কাষ্ঠখণ্ড, যূপের প্রতীক, যূপ আবার যজমানের প্রতীক, দ্র. যূপসূক্ত ৩।৮, তত্র একাদশ মন্ত্র—

বনস্পতে শতবল্‌শো বি রোহ
সহস্রবল্‌শা বি বয়ং রুহেম।

শতপ্রশাখায় বাড়ো হে বনস্পতি
আমরা বাড়ব সহস্র প্রশাখায়।

মীয়ন্তে √মি—পোঁতা > পোঁতা হয়, **সা ভূমিঃ** সেই ভূমি **বর্ধমানা** বাড়তে বাড়তে **নঃ বর্ধয়ন্ত্** আমাদেরও বাড়ান।

১৪॥ ছন্দ মহাবৃহতী। তিনটি জাগত (১২ অক্ষরের) চরণ এই ছন্দের লক্ষণ। **পৃথিবি** হে পৃথিবী **যঃ নঃ দ্বেষত্** যে আমাদের দ্বেষ করবে **যঃ পৃতন্যাত্** √স্পৃধ্ > √স্পৃত্ > √পৃত্—স্পর্ধা challenge তু. পুতনা, যে স্পর্ধা করবে **যঃ** যে **মনসা** মনে মনে কিংবা **বধেন** বধসাধন অস্ত্র নিয়ে **নঃ অভি-দাসাত্** √দস্—উপক্ষয় > আমাদের অভিমুখে ধেয়ে আসবে ধ্বংস করতে, **পূর্ব-কৃত্বরি ভূমে** পূর্ব—কৃ+করপ্+ঙীপ্ ৮।১ হে পূর্বে কৃতবতী ভূমি **তম্** তাকে **নঃ** আমাদের **রন্ধয়** √রধ্—বশ্যতা স্বীকার+ণিচ্ >বশ করো।

পূর্বকালীন ঘটনা বা পূর্বপুরুষের দোহাই পেড়ে নজির তুলে কথা বলা বেদের ঋষিদের একটি অভ্যাস।

১৫॥ ছন্দ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ ঋকের মত। **মর্ত্যাঃ** মৃত্যুগ্রস্ত কিন্তু অমৃতলক্ষ্য মানুষ **ত্বজ্জাতাঃ** ত্বত্-জাতাঃ তোমা হতে, তোমাতে লব্ধ-জন্মা, পৃথিবী সবার জননী আবার পৃথিবীতেই 'ভূমিষ্ঠ' হয় সবাই। **ত্বম্** তুমি **দ্বি-পদঃ** দুপেয়েদের বিশেষ করে মানুষকে **বিভর্ষি** ভরণ-পোষণ-ধারণ কর, **ত্বম্** তুমি **চতুষ্পদঃ** চারপেয়ে পশুদের [বিভর্ষি]। **পৃথিবি** হে পৃথিবী **ইমে পঞ্চ মানবাঃ** এই পাঁচজন, বেদে বহুত্র পঞ্চ জন জাত মানুষ কৃষ্টি ক্ষিতি চর্ষণি ব্রাত র উল্লেখ আছে। অর্থ সম্ভবত বিশ্বজন, সবাই, যেমন বাং পাঁচজন। নিঘণ্টুতে **পঞ্চ জনাঃ** মনুষ্যনাম (২।৩)। ঐ. ব্রা. মতে দেব মনুষ্য গন্ধর্ব-অপ্সরা পিতৃগণ এবং

সর্প। নিরুক্ত-মতে ১) গন্ধর্ব পিতৃগণ দেব অসুর রক্ষ: ২) চারটি বর্ণ এবং নিষাদ (৩।৮)। দ্র. বেমী ৩৭৫/২৩১°। বৃহদ্দেবতায় আরো অর্থ ১) যজমান ও ৪ জন ঋত্বিক্ ২) চক্ষু শ্রোত্র বাক্ মন প্রাণ ৩) শালামুখ্য প্রণীত গার্হপত্য উত্তর ও দক্ষিণ এই পাঁচটি অগ্নি (৭।৬৭—৭২)। five nations—শ্রীঅরবিন্দ। অন্ন-প্রাণ-মন-বিজ্ঞান-আনন্দময় কোষে জাত পাঁচ রকম চেতনা-সম্পন্ন মানুষ—কপালী শাস্ত্রী ১।৮৯।১০ এর সিদ্ধাঞ্জন ভাষ্য **তব** তোমার আপন। **যেভ্যঃ মর্তেভ্যঃ** যে মর্ত্যদের জন্য **অমৃতম্ জ্যোতিঃ** অমৃতদ্যুতি, আত্মচৈতন্যরূপী অগ্নিকে, ইদং জ্যোতির্ অমৃতং মর্ত্যেষু ৬।৯।৪, শব্দতৈরির প্রক্রিয়ার অনেকগুলি সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন ভাষাবিজ্ঞানী যাস্ক (নি ২।১—৪), তার অন্যতম হল আদিবিপর্যয় অর্থাৎ প্রথম বর্ণটির রূপান্তর, দ্যোতিঃ>জ্যোতিঃ **উদ্-যন্ সূর্যঃ** ঊর্ধ্বগামী সূর্য, চেতনার সানু থেকে সানুতে আরোহণ করতে করতে তমঃ থেকে উৎ-তম জ্যোতিতে আমাদের নিয়ে চলেছেন সূর্যদেবতা, উদ্ বয়ং তমসম্ পরি দ্র. পৃ ২৬৩ √সৃ—সরণ √স্ব/সূ—প্রেরণ √সূ—প্রসব > যে চিরচঞ্চল চিরনবীন বিশ্বজ্যোতি সর্বভূতের প্রসবিতা প্রেরয়িতা চোদয়িতা, তিনিই সূর্য। সূরচক্ষাঃ হওয়া অর্থাৎ সূর্যের চোখ পাওয়া এবং সূর্যত্বচ্ অর্থাৎ সূর্যবৎ ভাস্বরদেহ হওয়া বৈদিক সাধকের সাধের স্বপ্ন। সেই উত্তম শ্রেষ্ঠ মিত্র-জ্যোতিকে লক্ষ্য করেই চলেছে ঋষিদের আলো-খোঁজা গবেষণা সূরৈষণা। তাই সর্বানুক্রমণীকার কাত্যায়ন বললেন, দেবতা একজনই, তিনি সূর্য। অর্থাৎ সূর্য হলেন সেই পুঞ্জজ্যোতি, সেই পরম সধস্থ যেখানে সব দেবতার সমাহার। প্রাকৃতিক সূর্য হলেন সেই মহাসূর্যের প্রতীক। **রশ্মিভিঃ** কিরণসমূহ দিয়ে **আ-তনোতি** চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেন, বিশ্বচৈতন্যরূপী সূর্য মর্তমানুষের মধ্যে আত্মচৈতন্য জাগিয়ে দেন, তু.

অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য নির্ অংহসঃ পিপৃতা নির্ অবদ্যাত্
১।১১৫।৬

সূর্য উঠেছে ওগো দেবতারা সূর্য উঠেছে আজ
যা কিছু মলিন কুণ্ঠিত দীন পারাও তা হতে, কর হে পূর্ণ।

এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার
আজি প্রাতে সূর্য-ওঠা সফল হল কার।

১৬৷ ছন্দ একাবসানা (একবার-থামা) সাম্নী ত্রিষ্টুপ্ অর্থাৎ ২২ অক্ষর। **তাঃ সমগ্রাঃ** সেই সমস্ত **প্রজাঃ** প্র-জাত হয়েছে যারা তোমার সেই সন্তানেরা **নঃ** আমাদের জন্য **সং দুহ্রতাম্** সম্যক্‌রূপে, সম্মিলিত হয়ে নিজেদের দোহন করুক। দুহ্-ধাতুর এই রূপটি বিশিষ্ট, কর্মকর্তৃবাচ্যে য্ আসে নি (ন দুহস্নুনমাং যক্‌চিণৌ পা ৩।১।৮৯), র্ এসেছে (বহুলং ছন্দসি ৭।১।৮) দ্র. সায়ণ ১।১৩৪।৬। 'দুহ্রাম্' এই রূপও হয়, দুহ্রাং মে পঞ্চ প্রদিশঃ, অথর্ব ৩।২০।৯। আরো কয়েকটি ধাতুতে সম্ভবত কর্মকর্তৃবাচ্যে অনুরূপ র্ আগম হয়, যথা—

উপো **অদৃশ্রন্** তমসশ্ চিদ্ অন্তাঃ ৭।৬৭।২
অতি কাছে দেখা দিল আঁধারেরও সীমা-রা।

সোমা **অসৃগ্রম্** ইন্দবঃ ৯।১২।১
ইন্দু সোমেরা ঝরল আপনা-আপনি।

পৃথিবি হে পৃথিবী **বাচো মধু** বাকের মধু সার রস **মহ্যম্ ধেহি** আমার মধ্যে নিহিত কর। 'এই সমস্ত ভূতের রস (সার) পৃথিবী, পৃথিবীর রস জল, জলের রস ওষধি, ওষধির রস পুরুষ, পুরুষের রস বাক্, বাকের রস ঋক্, ঋকের রস সাম, সামের রস উদ্‌গীথ (ওঙ্কার)'—ছান্দোগ্য ১।১।২। সমস্ত বাক্‌কে ছন্দিত মন্ত্রিত করে, সুরে উত্তীর্ণ 'স্বরিত' করে, একপদী বাক্ ওঙ্কারে মিশিয়ে মিশে যাওয়ার, শব্দব্রহ্মীভূত হওয়ার যে পরমানন্দ, তাই হল বাচো মধু—

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা ওঙ্কার ধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।

পৃথিবীর কাছে সব কবিরই এই বাক্-মধু, এই ওতপ্রোত লয়, এই মোহন বেণুর সিদ্ধ সুর, এই সহজের প্রার্থনা—

আমাকে একটি কথা দাও যা আকাশের মত সহজ মহৎ বিশাল গভীর
—জীবনানন্দ

আরো দ্র. পৃ. ৩০

এই বাক্-মধুকে পেয়েই ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তের ঋষি হয়েছেন মধু-চ্ছন্দা। ঋষি গোতম রাহূগণ এই বাক্-মধুকে পেয়েই মধু-চ্ছন্দা হয়েছেন তাঁর অবিস্মরণীয় মধুতৃচে।

১৭॥ তিনটি ১১ অক্ষরের চরণযুক্ত ছন্দের নাম বিরাট্। এই ঋকের ছন্দ তার কাছাকাছি। **বিশ্বস্বম্** শ্লিষ্ট, ১) বিশ্‌-সূ+২।১ বিশ্বপ্রসবিনী ২) বিশ্ব-স্ব+২।১ সবার আপন **ওষধীনাম্ মাতরম্** ওষধিদের মা, √উষ্—দাহ ॥ √বস্—দীপ্তি > চেতনার প্রথম আলো-আঁধারি, উষা-উন্মেষ যাতে নিহিত, তাই ওষ-ধি **ধ্রুবাম্** স্থিরা **ধর্মণা ধৃতাম্** ধর্মের দ্বারা ধৃতা, ব্যাপক অর্থে সত্যই ধর্ম, দ্র. বেমী ১৯২/৫৩৮, এই সত্যধর্ম এবং তার কছাকাছি যাবার জন্য মানুষের নিরন্তর সাধনা—এই উভয় ধর্মেই বিধৃতা হয়ে আছেন পৃথিবী, পঙ্‌ক্তিটিতে ধ-এর অনুপ্রাস লক্ষণীয়, মহাপ্রাণ নাদবর্ণ ধ ধৃতি দার্ঢ্য ধৈর্য সংহতি ইত্যাদির দ্যোতক, **শিবাম্** মঙ্গলা **স্যোনাম্** সুখদা রমণীয়া **পৃথিবীম্ ভূমিম্** পৃথিবী-ভূমির **বিশ্বহা** সবসময়, সর্বেষু অহঃসু, সব দিনে—সায়ণ ১।১১৩।৩, ২।১৩।১৫ ই. আধুনিক বৈয়াকরণদের প্রকল্প ধা>হা, 'বিশ্বধা' সবরকমে, সবসময়ে>বিশ্বহা, দ্র. Vedic Grammar ম্যাকডোনেল § ১৭৯, বিশ্বহ এই রূপটিও আছে **অনু চরেম** অনুগত হয়ে, অনুসারে, সঙ্গে সঙ্গে চলি আমরা, যেন তাঁর অনুচর হই।

১৮॥ ছন্দ শ্রীসাতবলেকরের মতে ত্রি-অবসানা ষট্‌পদা ত্রিষ্টুপ্‌-অনুষ্টুব্‌-গর্ভা অতিশক্করী।

মহত্ √মহ্—জ্যোতি শক্তি বৈপুল্য মহিমা+শতৃ=ঐ-সম্পন্ন **সধস্থম্** সহস্থান, দেবতারা একসঙ্গে (সধ=সহ) থাকেন যেখানে, বিশ্বদেবতার সহস্রদল পদ্মের হৃত্‌কেন্দ্র পৃথিবী **মহতী** মহিমময়ী **বভূবিথ** হয়েছ। **তে** তোমার **মহান্** বিপুল তীব্র—বেগ এজথু ও বেপথু-র বিশেষণ **বেগঃ** বেগ **এজথুঃ** √এজ্—কম্পন>চাঞ্চল্য তু. agitation **বেপথুঃ** √বেপ্—কম্পন>কাঁপন। একই অর্ধর্চে তিন লিঙ্গে মহত্‌-শব্দের প্রয়োগ পৃথিবীর মহিমাকে বলিষ্ঠ রেখায় ফুটিয়ে তুলেছে। **মহান্ ইন্দ্রঃ** মহিমময় ইন্দ্র **ত্বা** তোমাকে **অপ্রমাদম্** প্রমাদবিহীনভাবে সাবধানে **রক্ষতি** রক্ষা করে চলেছেন। **সা ভূমে** সেই তুমি ভূমি **নঃ** আমাদের **হিরণ্যস্য ইব সংদৃশি** যাতে সোনার মত ঝলমল করি সেইভাবে, 'সংদৃশ্' তেজ ঝলমলানি জলুস জেল্লা, লক্ষ্যার্থে সপ্তমী, হিরণ্যরূপঃ স হিরণ্যসন্দৃক্ অপাং-নপাত্ স-ইত্‌-উ হিরণ্যবর্ণঃ' (২।৩৫।১০)—এখানে রূপ বর্ণ ও সন্দৃশ্‌-এর একত্র অথচ পৃথক উল্লেখ শব্দটির অর্থনির্ণয়ে দিগ্‌দর্শক, **প্র রোচয়** প্রকৃষ্টভাবে রুচিমান দীপ্তিমান উজ্জ্বল কর, বাংলায় অর্থবিকৃতি,

প্রয়োচনা=অসৎ প্রবৃত্তিকে উস্কে দেওয়া। **নঃ** আমাদের **কঃ-চন** কেউ **মা দ্বিক্ষত** দ্বেষ না করুক।

১৯॥ ছন্দ উরোবৃহতী (৮+১২+৮+৮) নবম ঋকে ঋষি দেখেছেন জলের অর্থাৎ প্রাণের বিশ্বরূপ। ১৯—২১ ঋকে দেখছেন অগ্নির বিশ্বরূপ। **ভূম্যাম্** ভূমিতে **অগ্নিঃ** আগুন। **ওষধীষু** গাছপালায় আগুন। **আপঃ** জল **অগ্নিম্** আগুনকে **বিভ্রতি** ভরণ করছে। **অশ্মসু** পাষাণসমূহে **অগ্নিঃ** আগুন, জড়ের গভীরে নিরেট পাষাণে আগুন রয়েছে লুকোন। যাকে নিরেট মনে করি স্থূলদৃষ্টিতে, তা-ও ব্যাপ্তিধর্মা (√অশ্—ব্যাপ্তি), ব্রহ্ম-স্বভাব। তার প্রতিটি অণুতে মাঝখানের জ্যোতির্বিন্দু স্বর্বিন্দু গো-বিন্দু সোম-বিন্দু কৃষ্ণ-বিন্দুটিকে ঘিরে ঘিরে ছন্দে ছন্দে নেচে চলেছে অভিসারিকারা। প্রতিটি অণুর কেন্দ্রে দ্যুলোক, নেমিতে ভূলোক আর মাঝখানে বিশাল অন্তরিক্ষ প্রেমের বিদ্যুতে পরিপূর্ণ। **অগ্নিঃ পুরুষেষু অন্তঃ** প্রতিটি মানুষের গভীরে রয়েছে আগুন। **গোষু** গোরুদের মধ্যে **অশ্বেষু** ঘোড়াদের মধ্যে। অশ্মে যে-শক্তি সংহত সংবৃত কুণ্ডলিত, অশ্বে তাই উন্মুক্ত বিবৃত উদ্দাম। অফুরন্ত তেজীয়ান বেগবান প্রাণ যা তীব্রগতিতে ছুটে চলেছে মুহূর্তে মুহূর্তে ব্যাপ্ত করে সচকিত করে আশপাশের সবকিছুকে, অশ্ব তারই প্রতীক **অগ্নয়ঃ** অগ্নি-সমূহ। সব কিছুই অগ্নিময়, ভূতে ভূতে নিহিত রয়েছে 'নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি'। সেই ইচ্ছা রূপকৃৎ শক্তি হয়ে অভীপ্সা হয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে 'পর্ব থেকে পর্বান্তরে, জন্ম থেকে জন্মান্তরে।

২০॥ ছন্দ পূর্ববৎ। **দিবঃ** দ্যুলোক থেকে **অগ্নিঃ** আগুন **আ তপতি** চতুর্দিককে উত্তপ্ত করে তুলছে, দিকে দিগন্তে আগুন ঝরছে। **অগ্নেঃ দেবস্য** অগ্নি দেবতার অধিকারে রয়েছে **উরু** বিশাল **অন্তরিক্ষম্** দ্যুলোক-ভূলোকের মধ্যবর্তী ভূমি। **হব্যবাহম্** হব্য-বাহন **ঘৃতপ্রিয়ম্** √ঘৃ—ক্ষরণ ও দীপ্তি> ঘৃত গলিত জ্যোতি, উজ্জ্বল রস, প্রদীপ্ত অমৃত, অগ্নিসোম। নিঃশেষে নিবেদিত এই সোম্য অগ্নি এই জলন্ত মাধুর্য ভালবাসেন অগ্নিদেবতা, তাই তিনি ঘৃতপ্রিয়। **অগ্নিম্** আগুনকে **মর্তাসঃ** মর্ত্য মানুষেরা **ইন্ধতে** √ইন্ধ্+৩।৩ জ্বালিয়ে তোলে, জ্বালিয়ে চলেছে। নিজের মধ্যে আগুনকে জ্বালিয়ে তোলা ও জ্বালিয়ে রাখা—এই মানুষের সাধনা।

২১॥ ছন্দ ১৬শ ঋকের মত। আকাশ-অন্তরিক্ষ জোড়া টকটকে লাল

আগুন রক্তাম্বরী হয়ে জড়াল শ্যামা মেয়ে পৃথিবীর কালো জানু দুটি। **অগ্নিবাসা** অগ্নিবসনা **অসিত-জ্ঞুঃ** অসিত-জানু কালো-হাঁটু **পৃথিবী মা** আমাকে **ত্বিষী-মন্তম্** তেজস্বী **সংশিতম্** সম্যক্‌রূপে শাণিত, অতিশয় ধারালো **কৃণোতু** করুন।

জানু কোলের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আগুনের রাঙা কাপড় পরা পৃথিবীমায়ের কালো কোলো শুয়ে-বসে আছেন কবি, বলছেন, আমায় শাণিত কর, নিশিত কর, তীক্ষ্ণ কর, ঠিক জায়গায় যেন হানতে পারি।

২২॥ ছন্দ ত্রি-অবসানা ষট্ পদা ত্রিষ্টুপ্-অনুষ্টুপ্-গর্ভা স্বরাট্ অতিজগতী (৫২+২)

ভূম্যাম্ পৃথিবীতে **অরং-কৃতম্** অলঙ্কৃত সুসজ্জিত সাজানো-গোছানো অথবা 'অব' অর্থাৎ শলাকা বা পাপড়িগুলি যেমন চক্রে বা ফুলে একটি কেন্দ্রকে ঘিরে সাজানো থাকে তেমনি একলক্ষ্য এককেন্দ্রিক সুষম harmonious whole, হব্য এবং যজ্ঞ উভয়েরই বিশেষণ, **হব্যম্ যজ্ঞম্** আহুতি তথা যজ্ঞকে **দেবেভ্যঃ** দেবতার উদ্দেশ্যে **দদতি** নিবেদন করে মানুষ। **ভূম্যাম্** পৃথিবীতে **মর্ত্যাঃ মনুষ্যাঃ** মর্ত্য মানুষ **স্বধয়া অন্নেন** স্বধা এবং অন্নে **জীবন্তি** বাঁচে। **সা ভূমিঃ** সেই পৃথিবী **নঃ** আমাদের **প্রাণম্ আয়ুঃ** প্রাণ তথা আয়ু **দধাতু** দিন। **পৃথিবী মা** আমাকে **জরদষ্টিম্** 'জরত্' জরা অর্থাৎ বুড়োবয়স পর্যন্ত **'অষ্টি'** ব্যাপ্তি যার জীবনের সেইরকম **কৃণোতু** করুন।

মর্ত্য মানুষের আবাসভূমি এই পৃথিবীতে চলেছে অমরত্বের, দেবত্ব-লাভের সাধনা—যজ্ঞ আত্মনিবেদন আত্মাহুতি। তা হওয়া চাই অগোছালো এলোমেলো নয়, একমুখী তন্ময় নিঃশেষ।

মৃত্যু যেমন সত্য, জীবনও তেমনই সত্য। মৃত্যুর ওপরে দাঁড়িয়ে জীবনের সাধনা করছে মানুষ। সে বাঁচছে স্বধায়। বাঁচছে অন্নে। এই দুটি তার আহার। জড় জীব উদ্ভিদ্ জগৎ থেকে সে গ্রহণ করছে তার দেহের অন্ন, তার অস্থি-মজ্জা রক্ত মাংস-চামড়ার উপকরণ। কিন্তু সে অন্নের চরম পরিপাক স্ব-ধায় আত্মবীর্যে আত্মপ্রতিষ্ঠায়। স্বধা ই অন্নের সবচাইতে মূল্যবান খাদ্যপ্রাণ। এই স্বধা রূপ ভিটামিনই তাকে দেয় অমরত্বের সন্ধান, বাঁচার মত বাঁচার শক্তি-সম্বল।

পৃথিবী-মার কাছে মানুষ চাইছে প্রাণ, চাইছে দীর্ঘ আয়ু। 'মরিতে চাহি

না আমি সুন্দর ভুবনে' এ প্রার্থনা সমস্ত বেদ জুড়েই ধ্বনিত হচ্ছে। একদিন মৃত্যু আসবেই তা জানি। কিন্তু অকালমৃত্যু যেন না হয়। বাল্য কৈশোর যৌবন প্রৌঢ়ত্বের ঘাটগুলি একে একে পার হয়ে ধীরে সুস্থে যেন বুড়ো হই। জীবনের রূপরসশব্দস্পর্শগন্ধের পূর্ণপাত্র হাতে নিয়ে বৃদ্ধবয়সের পরিপক্ক নিবিড় আনন্দঘন প্রশান্তিতে পৌছনর আগে, ওগো মা পৃথিবী, তোমার বুক থেকে যেন খসিয়ে দিও না তোমার সন্তানকে।

২৩॥ ছন্দ পঞ্চপদা ত্রিষ্টুপ্-অনুষ্টুপ্-গর্ভা বিরাট্ অতিজগতী (২ কম ৫২)। **পৃথিবি** হে পৃথিবী **তে** তোমার **যঃ গন্ধঃ** যে-গন্ধ **সং-বভুব** সম্ভূত হল, সম্ অর্থাৎ সংহত নিবিড় জমাট গন্ধ উঠছে পৃথিবীর গা থেকে। **যম্** যে-গন্ধকে **ওষধয়ঃ** গাছপালারা **যম্** যাকে **আপঃ** জল **বিভ্রতি** ধারণ করে আছে **যম্** যাকে **গন্ধর্বাঃ** নৃত্যগীতাদিনিপুণ দেবযোনিবিশেষ>অনুরূপ নন্দনচেতনাবিশিষ্ট কলাকার **অপ্সরসঃ চ** এবং গন্ধর্বের নিত্যসহচরী অপ্সরারা **ভেজিরে** ভজনা করে, **তেন** সেই গন্ধ দিয়ে **মা** আমাকে **সুরভিম্** √রভ্—আঁকড়ে-ধরা>যে-গন্ধ আঁকড়ে ধরে সেই গন্ধবিশিষ্ট **কৃণু** কর। **কঃ-চন** কেউ **নঃ** আমাদের **মা দ্বিক্ষত** দ্বেষ না করুক।

মৃত্যুর কথা মনে উঠতেই পৃথিবীর গন্ধ নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল কবিকে। গন্ধ হল পৃথিবীর বিশিষ্ট একান্ত নিজস্ব গুণ। এই গন্ধ দিয়েই পৃথিবী সবাইকে আঁকড়ে ধরে, ভরে রাখে, ভালবাসার মায়ায় জড়ায়। নন্দনলোকের বাসিন্দা গন্ধর্ব-অপ্সরাদের কবি-শিল্পী-সুরকারদের পৃথিবীর সঙ্গে বেঁধে রাখে এই গন্ধ। এই গন্ধই বুঝি পৃথিবীর কাব্যের শিল্পের সঙ্গীতের জীবনগন্ধ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর জীবনানন্দ দাশ এই দুজন মাটির কবির রচনায় এই গন্ধের নিবিড় অনুভব লক্ষণীয়।

শিশুর মতোই পৃথিবী-মায়ের অঙ্গের সুঘ্রাণে বিভোর মাটির কবি অথর্বা। তিনি চাইছেন, ঐ গন্ধ আমার শরীরে আসুক, নইলে মায়ের সঙ্গে একাত্মতা সম্পূর্ণ হবে না। ঐ সৌরভে সুরভি হব যখন তখনই 'আরভমাণা ভুবনানি বিশ্বা' বিশ্বভুবন আঁকড়ে ধরে বইব হাওয়ার মতো। তখন পৃথিবীর চোখে দেখব সবাইকে, দ্বেষ্টা বা দ্বেষ্য থাকবে না কেউ। হবে না কো সইতে তখন দ্বেষ-বিছুটির জ্বালা।

২৪॥ ছন্দ পূর্ববত্। **তে** তোমার **যঃ গন্ধঃ** যে-গন্ধ **পুষ্করম্** পদ্মে,

নীলকমলে আ-বিবেশ আবিষ্ট হয়েছে, **যম্ গন্ধম্** যে-গন্ধকে **সূর্যায়াঃ বিবাহে** সূর্যার বিবাহে **অমর্ত্যাঃ** অ-মানব দেবতারা **অগ্রে** আগে **সম্-জভ্রুঃ** সম্-√ভৃ>সম্ভাররূপে সংগ্রহ করেছিলেন···শেষ ছুটি পঙ্‌ক্তি পূর্ববৎ।

পৃথিবীর গায়ের গন্ধে ম' ম' করছে পদ্মফুলগুলি। আবার সিদ্ধ ঋষির চেতনাও দেহের এক একটি গ্রন্থিকে আশ্রয় করে পদ্মের মত বিকশিত, তু. ৬।১৬।১৩ তে অথর্বা কর্তৃক মূর্ধণ্য-কমল থেকে অগ্নিমন্থন, সেই কমলেও আবিষ্ট হয়েছে পৃথিবীর মোহন গন্ধ। অর্থাৎ সিদ্ধিও পৃথিবীরই সৌরভ।

সোমের সঙ্গে সূর্যার বিবাহ একটি নিগূঢ় রূপক। ১০।৮৫তে এই বিবাহের রাহস্যিক বিবরণ আছে, অথর্ববেদের বিবাহকাণ্ডের সূক্ত ছুটিতে (১৪।১,২) তারই বিস্তার।

২৫॥ ছন্দ সপ্তপদা শক্বরী পঙ্‌ক্তি। **তে** যঃ **গন্ধঃ** তোমার যে-গন্ধ **পুরুষেষু** প্রতিটি মানুষে **স্ত্রীষু পুংসু** নারীতে পুরুষে **ভগঃ** প্রেম সৌন্দর্য সুখ সৌভাগ্য আনন্দ **রুচিঃ** কান্তি দীপ্তি রূপ হয়ে রয়েছে, যঃ যে-গন্ধ **মৃগেষু অশ্বেষু হস্তিষু** পশুতে হাতিতে ঘোড়াতে **বীরেষু** বীরপুরুষদের মধ্যে রয়েছে, যত্ যা **কন্যায়াম্** কুমারী মেয়েতে **বর্চঃ** তেজ এবং কান্তি হয়ে রয়েছে, অর্থাৎ পৃথিবীর সুঘ্রাণই পার্থিব সব-কিছুর সার। **ভূমে** হে ভূমি **তেন** সেই গন্ধ দিয়ে **অস্মান্ অপি** আমাদেরও **সম্ সৃজ** মেশামেশি মাখামাখি করে দাও। শেষ পঙ্‌ক্তি পূর্ববত্।

২৬॥ **শিলা** বড় বড় পাথর **ভূমিঃ** মাটি **অশ্মা** নুড়ি, যা ছড়িয়ে থাকে **পাংসুঃ** ধুলো—এইসব হয়ে **সা ভূমিঃ** সেই পৃথিবী **ধৃতা** বিধৃত রয়েছে **সংধৃতা** সম্যক্‌রূপে শক্ত করে ধরা রয়েছে। **তস্যৈ হিরণ্যবক্ষসে পৃথিব্যৈ** সেই হিরণ্যবক্ষা পৃথিবীকে **নমঃ অকরম্** নমস্কার করি।

২৭॥ **যস্যাম্** যে-পৃথিবীতে **বানস্পত্যাঃ বৃক্ষাঃ** বনের রাজা বড় বড় গাছেরা **ধ্রুবাঃ** অচঞ্চল হয়ে **বিশ্বহা** সবসময় **তিষ্ঠন্তি** দাঁড়িয়ে থাকে, **ধৃতাম্** সেই ধীরা **বিশ্বধায়সম্** √ধে—পান > সবার স্তন্যদায়িনী **পৃথিবীম্** পৃথিবীকে **অচ্ছাবদামসি** ডাকি, আহ্বান করি, প্রশস্তি উচ্চারণ করি। সায়ণ অচ্ছোক্তি শব্দের ৩টি কাছাকাছি অর্থ দিয়েছেন—১) স্বচ্ছ বাক্ ১।৬১।৩ ২) আভি-মুখ্যকর নির্মল বেদবাক্য ১।১৮৪।২ ৩) অভিষ্টুতি ৮।১০৩।১৩ অর্থাৎ উদ্দিষ্ট দেবতার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য যে নির্মল প্রশস্তি, তাই অচ্ছোক্তি।

২৮॥ **ভুম্যাম্** ভুঁয়ে **উদীরাণাঃ** উত্- √ঈর্+শানচ্ উঠতে-উঠতে **উত** অথবা **আসীনাঃ** বসা অবস্থায় **তিষ্ঠন্তঃ** দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে **দক্ষিণসব্যাভ্যাম্ পদ্ভ্যাম্** ডান-বাঁ পায়ে চলতে-ফিরতে **মা ব্যথিষ্মহি** যেন টলে না পড়ি।

২৯॥ **বিমৃগ্বরীম্** বি- √মৃজ্+ক্বরপ্+ঙীপ্ বিচিত্ররূপে মার্জনী **ব্রহ্মণা বাবৃধানাম্** বৃহদ্গর্ভ মন্ত্রে বর্ধমানা **ক্ষমাম্** সর্বংসহা সর্বশক্তিময়ী **পৃথিবীম্ ভুমিম্** ভূমি-পৃথিবীকে **আ বদামি** আবদন অর্থাৎ ঘোষণা করি। **ভুমে** হে ভূমি **অন্নভাগম্** নির্দিষ্ট অন্ন **পুষ্টম্** পুষ্টি **ঊর্জম্** বীর্য **ঘৃতম্** ঘৃত তথা জ্যোতির ধারা **বিভ্রতীম্ ত্বা অভি** যিনি ধারণ-ভরণ করছেন, সেই তোমার অভিমুখে মুখোমুখি **নি ষীদেম** নিষন্ন হতে, বসে থাকতে চাই।

পৃথিবী আপনি শুচি থেকে কতভাবে শুচি করছেন আমাদের জল হাওয়া আলো উদ্ভাস দিয়ে, পৃথিবীই আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রসাধন। তাই তিনি বি-মৃগ্বরী। মন্ত্রে দেবতা বাড়েন এটি বৈদিক কবিদের সাধারণ অনুভূতি। যেমন 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে দেশমাতৃকার মূর্তি মহিমময়ী মহত্তরা হয়েছে। পৃথিবীর ভৌগোলিক রূপটি সীমাবদ্ধ হতে পারে, কিন্তু ঋষিকবির কাছে পৃথিবী অসীমা নিত্যবর্ধমানা। জীবপালিনী তাঁর সন্তানদের জন্য ধারণ করে আছেন যার যা নির্দিষ্ট খাদ্য তা-ই, গুবরে পোকার জন্যে গোবর, মেঠো ফড়িঙের জন্যে ঘাস-ফুলের রেণু; রূপান্তরের বীর্য, কানা ছেলেকে করছেন পদ্মলোচন; পুষ্টি এবং ঘৃত—লৌকিক অর্থ ঘি, বৈদিক অর্থ আলোকের ঝরণাধারা < √ঘৃ—দীপ্তি এবং ক্ষরণ। এই পৃথিবীর ধুলার আসনে বসে পৃথিবীর মুখপানে চেয়ে বসে থাকার সাধ কবির।

৩০॥ ছন্দ ত্রি-পাদ্ বিরাট্ গায়ত্রী, প্রাতিশাখ্য-মতে বিরাট্ অনুষ্টুপ্। **শুদ্ধাঃ আপঃ** বিশুদ্ধ জল, প্রাণের ধারা **নঃ তন্বে** আমাদের তনুর উদ্দেশে **ক্ষরন্তু** ঝরুক। **যঃ নঃ সেদুঃ** যা আমাদের তলানি sediment < √সদ্-বসা **তম্** তাকে **অপ্রিয়ে** অপ্রিয় শত্রুতে **নি দধ্মঃ** নিহিত করি। **পৃথিবি** হে পৃথিবী **পবিত্রেণ** 'পবিত্র' নাড়ীজাল, যজ্ঞে যার প্রতিরূপ হল মেষলোমের ছাঁকনি, তাই দিয়ে **মা** আমাকে **উত্ পুনামি** উৎপূত করি।

'বিমৃগ্বরী' বিশেষণটির যেন ব্যাখ্যা দিলেন 'শুদ্ধা ন আপস্তন্বে ক্ষরন্তু' বলে। ঐ বিশুদ্ধ প্রাণের আনন্দ-ধারা বহাও আমার দেহে-মনে-প্রাণে। হে পৃথিবী, তবেই তো তোমায় বলব বিমৃগ্বরী। যে ময়লা কিছুতেই যাবে না সেই তলানি

শত্রুরে থুই, এই উক্তি করতে বৈদিক ঋষির কোন দ্বিধা নেই। কেননা তাঁর দৃষ্টি সহজ স্বচ্ছ ব্যাবহারিক। অনুভূতির নির্জন তেপান্তরে যে বিশ্বব্যাপী একত্বের বোধ ঋষির কাছে অতি সহজে ধরা দেয়, হাটের মাঝখানে 'কোলাহলে সুরটুকু তার যায় না চেনা'। ব্যাবহারিক জীবনে প্রেম-অপ্রেমের দ্বন্দ্ব প্রতি-পদে। কাজেই সবাই যে আমার প্রিয় নয় এবং আমিও যে সবাইকার প্রিয় নই—এই সত্যের অসঙ্কোচ স্বীকৃতি বেদে খুবই সুলভ। এবং 'যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ', তাকে জব্দ অপদস্থ দমন ধ্বংস ইত্যাদি করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনেও বৈদিক ঋষির কোন আপত্তি নেই, বরং সদাজাগ্রত উৎসাহ!

অবচেতনার এবং অচেতনার ময়লাটুকু শত্রুরকে দিয়ে-থুয়ে পরিষ্কার হয়ে ঋষি বলছেন, নাড়ীশুদ্ধির দ্বারা আমি নিজেকে পবিত্র করে উর্ধ্বপানে তুলে ধরছি। পবিত্রতার চর্চা আমাকে নিয়ে যাবে না শুচিবায়ুতার দিকে। নিয়ে যাবে প্রাণশুদ্ধি মনঃশুদ্ধি চেতনাশুদ্ধির দিকে। সোমের আনন্দধারা ঝরুক আমার এই উৎ-পূত দেহের কলশে।

৩১॥ **তে** তোমার **যাঃ** যে-সব **প্রাচীঃ প্রদিশঃ** পুবের দিক **যাঃ উদীচীঃ** যে-সব উত্তরের দিক **ভূমে** হে ভূমি **তে যাঃ অধরাত্** যে-সব নিচের অর্থাৎ দক্ষিণের দিক **যাঃ চ পশ্চাত্** এবং যে-সব পশ্চিমের দিক, **তাঃ** সেগুলি **মহ্যং চরতে** পথিক আমার কাছে **স্যোনাঃ** সুখকর **ভবন্তু** হোক। **ভুবনে শিশ্রিয়াণঃ** √শ্রি+কানচ্, ভুবনকে একান্তভাবে আশ্রয় করে আছি **মা নি পপ্তম্** যেন নিপতিত না হই, দুটি অর্থ ১) হোঁচট খেয়ে পড়ে না যাই ২) পতন না হয়।

কবি ব'লে দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য নন। দিক অনন্ত, তাই বহুবচন। ঋষি শব্দের একটি অর্থই হল পথিক, √ঋষ্—গতি, কবি-ঋষি মাত্রেই চির-পথিক। চলার মহিমা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে—

চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুম্ উদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্॥ চরৈব।

চলতে চলতে মধু পায় লোকে, চলতে চলতে স্বাদু ডুমুর
সূর্যকে দেখ, কেন সে শ্রেষ্ঠ? চলতে হয় না তন্দ্রাতুর—
চলতে থাক।

৩২॥ ছন্দ মহাবৃহতী ত্রিষ্টুপ্‌।

পশ্চাত্‌ পশ্চিম অর্থাৎ পেছন থেকে **পুরস্তাত্‌** পুব অর্থাৎ সামনে থেকে **উত্তরাত্‌** উত্তর দিক থেকে **উত অধরাত্‌** এবং দক্ষিণ থেকে **নঃ** আমাদের **মা মা মা নুদিষ্ঠাঃ** ঠেলা দিও না দিও না দিও না। ঋষির কৌতুক, দেখো বাবা, গুঁতিয়ো না যেন শ্যাম কামধেনু! **ভূমে** হে ভূমি **নঃ** আমাদের কাছে **স্বস্তি ভব** স্বস্তি হয়ে থাক। **পরিপন্থিনঃ** শত্রুরা **মা বিদন্‌** যেন নাগাল না পায়। **বরীয়ঃ** উরু-তর বিশালতর যার-বাড়া-নেই **বধম্‌** বিনাশকে, আক্রমণকে **যাবয়** যবয় (সংহিতায় দীর্ঘ হয়েছে) √যু—অমিশ্রণ > পৃথক্‌ কর, হটিয়ে দাও।

৩৩॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্‌ (৮ × ৪)। **ভূমে** হে ভূমি **মেদিনা সূর্যেণ** √মিদ্‌—স্নেহ করা > মিতা সূর্যের সঙ্গে **যাবত্‌** যতদিন **তে অভি** তোমার পানে **বি পশ্যামি** তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব, **তাবত্‌** ততদিন **উত্তরাম্‌ উত্তরাম্‌ সমাম্‌** একটার পর একটা বছর **মে চক্ষুঃ** আমার চোখ **মা মেষ্ট** যেন ক্ষীণ না হয়, √মী—কমে যাওয়া নষ্ট হওয়া + লুঙ্‌ ৩।১।

সূর্য পৃথিবীর, সেই সঙ্গে আমাদেরও 'মেদী' মিত্র বন্ধু মিতা। তিনি অপলক তাকিয়ে আছেন পৃথিবীর পানে, যুগ যুগ ধরে দেখছেন তাকে, দেখা আর শেষ হয় না। তেমনি করে দেখব তোমায় বিশেষ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, বিচিত্রভাবে, নিত্য নব রূপে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ যেন না মিইয়ে যায়, চোখের জ্যোতি যেন না নেভে, চেয়ে-দেখার আনন্দরস যেন না শুকোয়। যতদিন বাঁচি, ততদিন দু চোখ ভরে যেন দেখি তোমায়। সূর্যের চোখ দাও আমায় হে পৃথিবী।

৩৪॥ ছন্দ ত্রি-অবসানা ষট্‌পদা অতিজগতী। **ভূমে** হে ভূমি **শয়ানঃ** শুয়ে শুয়ে **যত্‌** যে **দক্ষিণম্‌ সব্যম্‌ পার্শ্বম্‌ অভি** ডান-পাশে বাঁ-পাশে **পর্যাবর্তে** পরি-আ- √বৃত্‌ ঘুরি, এপাশ-ওপাশ করি, **উত্তানাঃ** চিৎ হয়ে **যত্‌** যে **পৃষ্টীভিঃ** পাঁজরা দিয়ে **প্রতীচীম্‌ ত্বা** সম্মুখীনা তোমার **অধিশেমহে** ওপরে শুয়ে থাকি আমরা, **সর্বস্য প্রতিশীবরি ভূমে** সবার মুখোমুখি শায়িনী হে ভূমি **তত্র** তখন, সেখানে **নঃ** আমাদের **মা হিংসীঃ** হিংসা কোরো না।

ডাইনে, বাঁয়ে, চিৎ হয়ে, উপুড় হয়ে যেমন করেই শুই না কেন, ভুঁই-মা বুক পেতেই আছেন, 'পরাচী' পরাঙ্মুখী নয়, 'প্রতীচী' সবাইকার দিকে মুখ

ফিরিয়ে রয়েছেন সবসময়। সবার সঙ্গে শুয়ে আছেন তিনি, তিনিই সবার শয্যা, সবার ঘুম-পাড়ানিয়া মা, সবার শয়নসঙ্গিনী। যখন নিশ্চিন্ত হয়ে আরাম করে গা এলিয়ে শুয়ে থাকব তোমার বুকে, তখন যেন ব্যথা দিও না হে ভূমি, যেন কাঁকর না ফোটে, সাপ বিছে পোকামাকড় না কামড়ায়, ঠাণ্ডা না লাগে।

৩৫॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্। **ভূমে** হে ভূমি **তে** তোমার মধ্যে **যত্** যা **বি-খনামি** খোঁড়াখুঁড়ি করি, **তত্** তা **ক্ষিপ্রম্** শীঘ্র **অপি রোহতু** ভরাট হয়ে যাক। **বিমৃগ্বরি** হে বিচিত্ররূপে মার্জনী (দ্র. ২৯ শ ঋক্) **তে মর্ম** তোমার মর্ম **তে হৃদয়ম্** তোমার হৃদয় **মা অর্পিষম্** √অর্প্—বেঁধা+লুঙ্ ১৷১ যেন বিঁধি না।

তুমি আমাদের ব্যথা দিও না—বলতে বলতেই ঋষির মনে পড়ল, আমি তো যখন-তখন পৃথিবীকে ব্যথা দিচ্ছি, মাটি খুঁড়ে এটা-সেটা পুঁতছি, ঘর বানাচ্ছি। ঋষি তাই কাঁচুমাচু হয়ে বলছেন, নিতান্ত প্রয়োজনে যেটুকু তোমায় না খুঁড়ে পারি না, সেটুকু শীগগিরই যেন ভরাট হয়ে যায়! আর খুঁড়তে গিয়ে তোমার হৃদয়ে তোমার মর্মে যেন ব্যথা না দিয়ে ফেলি। আধুনিক মানুষ তাই করছে। পৃথিবীর সঙ্গে ভাব করে নয়, তাঁর মর্মে ঘা দিয়ে দিয়ে গড়ছে তার সভ্যতার ইমারত। তাই বিক্ষুব্ধা পৃথিবী।

৩৬॥ ছন্দ বিপরীতা পঙ্‌ক্তি-র (৮+১২+৮+১২) কাছাকাছি। এখানে ৮+১১+১০+১১ অক্ষর। **ভূমে পৃথিবি** হে পৃথিবী ভূমি **তে** তোমার **গ্রীষ্মঃ বর্ষাণি শরৎ হেমন্তঃ শিশিরঃ বসন্তঃ** গ্রীষ্মাদি ছয়টি **বিহিতাঃ ঋতবঃ** নির্দিষ্ট ঋতু, **তে** তোমার **হায়নীঃ** বছরগুলি **অহোরাত্রে** দিন এবং রাত **নঃ** আমাদের জন্য **দুহ্রাতাম্** নিজেদের দোহন করুক।

দিনরাত্রির মালা গেঁথে গেঁথে এক-একটি ঋতুর রচনা। ছয়টি ঋতুর আবর্তনে সম্পূর্ণ হয় একটি বছর। কাল চলেছে এমনি করে সুনির্দিষ্ট ছন্দে বছরের পর বছর ধরে, মানুষের আয়ু তারই সুরে তালে বাঁধা। এই কাল কামধেনু হয়ে আমাদের জন্যে বর্ষণ করুক মধুপয়োধারা—ঋদ্ধি সিদ্ধি আনন্দ। মধুর হোক আমাদের দিনযামিনী, আমাদের ঋতুগুলি। সারাবছর ভাল কাটুক। পূর্ণতার প্রসাদে ভরপুর হোক সমস্ত জীবন—

নিশিদিন এই জীবনের তৃষার 'পরে ভুখের 'পরে
শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে

অপ্রত্যাশিতের চমক-ভরা কালধেনুর দুগ্ধধারা।

৩৭॥ ছন্দ ত্রি-অবসানা পঞ্চপদা শক্বরী। **যা বিম্বগ্বরী** যে বিম্বগ্বরী পৃথিবী দ্র. ২৯শ ঋক্, **সর্পম্** সর্পকে **অপ বিজমানা** √বিজ্—ভয় ও চলন, এখানে **অন্তর্ভূতণ্যর্থ**>দুটি অর্থ—১) যিনি ভয় পাইয়ে সরিয়ে দেন, ২) যিনি উসকে দেন, **যস্যাম্** যে-পৃথিবীতে **আসন্** রয়েছেন **অগ্নয়ঃ** সেই-অগ্নিরা **যে অপ্সু অন্তঃ** যাঁরা জলের মধ্যে থাকেন, **দেব-পীয়ূন্** √পীয়্-হিংসা (নি ৪।২৫)> দেবদ্বেষী **দস্যূন্** দস্যুদের, একই দস্-ধাতু থেকে উৎপন্ন তিনটি শব্দ দাস দস্যু দস্র যথাক্রমে তমঃ রজঃ এবং সত্ত্ব বা নিস্ত্রৈগুণ্যের সঙ্গে যুক্ত। অন্ধতামস দিয়ে যে উপক্ষীণ হয় বা করে সে দাস; অশুদ্ধ প্রাণের উত্তেজনা দিয়ে যে হানে সে দস্যু; স্বয়ং প্রকাশ আলোর মত যিনি অনায়াসে হানেন নিজে অটল থেকে সেই দেবতা হলেন দস্র; **পরা দদতী** দূর করে দিয়ে **পৃথিবী বৃত্রম্ ন, ইন্দ্রং বৃ ণানা** বৃত্রকে নয়, ইন্দ্রকে বরণ করে পৃথিবী **বৃষভায় বৃষ্ণে শক্রায় দধ্রে** বীর্যবান বীর্যবর্ষী শক্তিমান ইন্দ্রের হলেন, √ধৃ—অন্যতম অর্থ, কারো হওয়া।

ভালো-মন্দ শিব-অশিব দেব-দানবের লড়াই পৃথিবীর ওপর চলেছে যুগ যুগ ধরে। দুই পক্ষেরই দাবী—পৃথিবী আমার। কিন্তু পৃথিবী কাকে চান? সত্যের আলো-কে বিপুল শক্তিতে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে যে দুর্ধর্ষ বৃত্র, আব রক, সে-ই কি পৃথিবীর প্রেমের পাত্র? না। সেই বৃত্রকেও হটিয়ে দিয়ো বাঁধ-ভাঙা আলোর প্লাবন নিয়ে আসেন যে দুর্জয়, সেই ইন্দ্রই পৃথিবীর স্বয়ংবৃত বর।

সর্প দেবপীয়ূ-দস্যু এবং বৃত্র—অপশক্তির তিনটি স্তর। সর্প অবস্থায় সে কুণ্ডলিত potent passive, দস্যু অবস্থায় সে ক্রিয়াশীল এবং বৃ-ত্র অবস্থায় সে সর্বব্যাপী সব-ছাওয়া। সর্পের এই অর্থ নিলে অনুবাদ হবে 'সাপটাকে দেন হটিয়ে যিনি'। সর্পের দ্বিতীয় অর্থ হল অনন্ত মহাশক্তি, তন্ত্রে যার নাম কুল-কুণ্ডলিনী। অনন্তের সর্পরূপ দেখেছেন কবি এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিঙ্-ও—

> We vibrate to the past and thrill
> Wherewith **Eternity has curled**
> In **serpent-twine** about God's seat (OBMV)

জলের মধ্যে আগুন—বড়বানল বা বিদ্যুৎ একটি প্রাকৃতিক সত্য এবং আধ্যাত্মিক রূপক (দ্র. বেমী ৩৭৪/২৩০, ৫১০/৪৯৩)।

৩৮॥ ছন্দ ত্রি-অবসানা ষট্‌পদা জগতী পঙ্‌ক্তি বা মহাপঙ্‌ক্তি জগতী। **যস্যাম্** যে-পৃথিবীতে **সদো-হবির্ধানে** সদঃশালা আর হবির্ধান-মণ্ডপ বাঁধা হয়,

যজ্ঞের জন্য, **যস্যাম্ যূপঃ নি-মীয়তে** যেখানে যূপ পোঁতা হয় মাটির গভীরে, **যস্যাম্** যেখানে **যজুর্বিদঃ** যজুর্বেত্তা **ব্রহ্মাণঃ** ব্রহ্মা অর্থাৎ যজ্ঞের সর্বাধ্যক্ষ ঋত্বিক্‌রা **ঋগ্‌ভিঃ** ঋঙ্‌মন্ত্র দিয়ে **সাম্না** সামগান দিয়ে **অর্চন্তি** অর্চনা করেন, **যস্যাম্** যেখানে **ঋত্বিজঃ** ঋত্বিক্‌রা **সোমম্ ইন্দ্রায় পাতবে** ইন্দ্রকে সোমপান করাতে, বৈদিক্ বাগ্‌ভঙ্গি **যুজ্যন্তে** যুক্ত হন, একযোগে মেলেন—

৩৯॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্। **যস্যাম্** যে-পৃথিবীতে **সপ্ত** সাতজন **বেধসঃ** বিধাতা **ভূত-কৃতঃ** সৃষ্টিধর **পূর্বে ঋষয়ঃ** আদি-ঋষি **সত্রেণ যজ্ঞেন তপসা সহ** সত্র যজ্ঞ তপস্যা দিয়ে **গাঃ** বাণীকে **উদ্-আনৃচুঃ** √অর্চ্॥ √ঋচ্+লিট্ ৩।৩ জ্বালিয়ে তুলেছিলেন গানে গানে, ঊর্ধ্বপানে জ্বেলেছিলেন গানের শিখা—

৪০॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্। **সা ভূমিঃ** সেই ভূমি **নঃ আদিশতু** আমাদের দেখিয়ে দিন **যত্ ধনম্ কাময়ামহে** যে-ধন আমরা কামনা করি, তা কোথায় আছে। **ভগঃ** একজন আদিত্য, আনন্দের সম্ভোগের দেবতা **অনুপ্রযুঙ্‌ক্তাম্** 'অনু' পেছন থেকে, সঙ্গে সঙ্গে **প্র** সামনের দিকে এগিয়ে যেতে প্রেরণা দিন, **ইন্দ্রঃ পুরোগবঃ এতু** ইন্দ্র পুরোগামী হয়ে চলুন।

তিনটি ঋক্ একসঙ্গে অন্বিত।

এই পৃথিবী যজ্ঞভূমি যজ্ঞবেদি। সদঃশালা হবির্ধানমণ্ডপ আর যূপ এই তিনটির উল্লেখ করে যেন সামান্য তুলির আঁচড়ে সোমযজ্ঞশালার একটি ছবি আঁকলেন কবি। এই যজ্ঞশালায় চলেছে মন্ত্রের, বীর্যের, আনন্দের সাধনা। মানুষের মুখের গদ্য পদ্য আর সুর যখন দিব্য আবেশে অপৌরুষেয় হয়ে ওঠে তখন তা-ই হয় যজুঃ—যজ্ঞসাধন ছন্দোময় গদ্য, ঋক্—আগুনের কবিতা, আর সাম—বিশ্বনিখিল একাকার করা সুর, তু. তৈত্তিরীয় উপনিষদের শীক্ষাধ্যায়ে উচ্চারণের শেষকথা হল সাম আর সন্তান অর্থাৎ একটানা সর্বব্যাপী সুর—গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি। অনেক ঋত্বিক্ (কমপক্ষে ষোলজন) একযোগে মিলে একমন একপ্রাণ হয়ে এই মন্ত্রকে উচ্চারণ করেন ইন্দ্রকে সোম-পান করাতে। ইন্দ্র মন-প্রাণের অধীশ্বর, সূর্যেরই আর এক রূপ। তিনি পান করবেন সোমকে, আনন্দকে। সন্ধাভাষায় বলতে গেলে সূর্য খাবে চাঁদকে। অর্থাৎ বীর্য আর প্রজ্ঞা আনন্দকে আত্মসাৎ করে আনন্দময় হবে। এই বীর্যোজ্জ্বল প্রাণোচ্ছল প্রজ্ঞাভাস্বর আনন্দের সাধনাই বৈদিক সোমযজ্ঞ। পৃথিবী এই আনন্দযজ্ঞের বেদি।

সপ্তর্ষি হলেন একটি স্রষ্টৃসংঘ। পুরাণে এঁরা ব্রহ্মার মানসপুত্র। এঁরা সাত ভাই মিলে চম্পাকলি পৃথিবীটিকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন সত্র যজ্ঞ আর তপ দিয়ে। তপ আত্মবাদীদের সাধন, যজ্ঞ দেববাদীদের। একটি আত্মজিজ্ঞাসা, একটি আত্মনিবেদন। এই দুধারা যাঁর মধ্যে এক হয়ে মেলে তিনি হন কবির্মনীষী। সপ্তর্ষিরা তাই। সত্র দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ। অনন্ত-সংবৎসর-ব্যাপী মহাসত্র এই সৃষ্টি—যাজ্ঞিকের ভাষায় এর নাম বিশ্বসৃজাম্ অয়নম্ (বিশ্বস্রষ্টাদের অয়ন)। 'গো' বাণী বাক্ কিরণ ব্যাহৃতি, সৃষ্টির জ্যোতির্ময় বীজমন্ত্র। তাই দিয়ে সপ্তর্ষিরা 'সুর বেঁধেছেন তারায় তারায় অন্তবিহীন অগ্নি ধারায়' এই পৃথিবীরই মাটিতে দাঁড়িয়ে।

পৃথিবী আমাদের দিন গুপ্তধনের সন্ধান। √ধন্—ছোটা>'ধন' যার পেছনে মানুষ ছোটে। কামনার বস্তু। 'পুলুকামো হি মর্ত্যঃ' মানুষের অনেক কামনা। চাই ধর্ম, চাই অর্থ, চাই কাম, চাই মোক্ষ, আবার 'যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি তাহারি খানিক'ও মাগি। চাই মুক্তি, অতিমুক্তি, চাই সহজকে, 'মনের মানুষ'কে। পৃথিবী দেখিয়ে দেবেন কোথায় পাব তারে। ইন্দ্র জ্যোতির লণ্ঠন হ'তে আগে আগে চলবেন দিশারী হয়ে, পেছনে সামাল দেবেন আনন্দ-দেবতা ভগ।

৪১॥ ছন্দ ত্রি-অবসানা ষট্‌পদা ককুম্মতী শক্বরী। **যস্যাম্ ভূম্যাম্** যে-ভূমিতে **বি-ঐলবাঃ** বিচিত্র-চীৎকার-সম্পন্ন, নানারকম শব্দ ক'রে, 'ঐলব' শব্দ, চীৎকার, যথা—'গৃধ্রাঃ কুর্বত ঐলবম্' শকুনিরা চীৎকার করে, 'কুর্বাণাঃ পাপম্ ঐলবম্' বিশ্রী চীৎকার ক'রে, 'বৃকাঃ কুর্বত ঐলবম্' নেকড়েরা চীৎকার করে, অ ১২।৫।৪৭-৪৯ আরো দ্র. অ ৬।১৬।৩, ১১।২।৩০ **মর্ত্যাঃ** মানুষেরা **গায়ন্তি নৃত্যন্তি** গাইছে নাচছে **যুধ্যন্তে** যুদ্ধ করছে, **যস্যাম্** যে-ভূমিতে **আক্রন্দঃ** যোদ্ধাদের রণ-আহ্বান শোনা যায়, **যস্যাম্** যে-ভূমিতে **দুন্দুভিঃ** জয়ঢাক **বদতি** বলছে, **সা ভূমিঃ** সেই ভূমি **নঃ সপত্নান্** আমাদের শত্রুদের, সমান পতিত্ব অর্থাৎ একই জিনিষের মালিকানা নিয়ে যার সঙ্গে বিরোধ হয় সে স-পত্ন **প্র নুদতাম্** দূরে খেদিয়ে দিন **পৃথিবী মা** আমাকে **অ-সপত্নম্** শত্রুহীন **কৃণোতু** করুন।

প্রতিদিনের সাধারণ পৃথিবী। মানুষের বিচিত্র প্রাণ-ক্রিয়ার ক্ষেত্র। কেউ গাইছে, কেউ নাচছে, কেউ লড়ছে। সব ছাপিয়ে যুদ্ধের কোলাহলই যেন

প্রবল। ঐ শোনা যায় রণমদমত্ত যোদ্ধাদের চীৎকার, ঐ বেজে উঠল দুন্দুভি। বড় শত্রু চারিদিকে। হে পৃথিবী শত্রুদের দূরে খেদিয়ে দাও।

৪২॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্। **যস্যাম্** যে-পৃথিবীতে **অন্নম্** প্রধান খাদ্য **ব্রীহিযবৌ** ধান ও যব উৎপন্ন হয়, **ইমাঃ পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ** এই পাঁচজন, দ্র. ১৫শ ঋক্ **যস্যাঃ** যাঁর সন্তান **পর্জন্য-পত্ন্যৈ বর্ষ-মেদসে ভূম্যৈ** সেই পর্জন্যপত্নী বর্ষণ-মেদুরা ভূমিকে **নমঃ অস্তু** নমস্কার।

বর্ষাসিক্ত শ্যামলকোমল অন্নপূর্ণা পৃথিবীর ছবি।

৪৩॥ ছন্দ বিরাট্ অর্থাৎ ২ ক্রম আস্তারপঙ্ক্তি (৮+৮+১২+১২)

যস্যাঃ যে-পৃথিবীর **পুরঃ** নগরগুলি **দেব-কৃতাঃ** দেবতার তৈরী, **যস্যাঃ ক্ষেত্রে** যাঁর ক্ষেতে ক্ষেতে **বি-কুর্বতে** বিচিত্র কর্ম করে চলেছে মানুষ, **বিশ্ব-গর্ভাম্ পৃথিবীম্** সেই সর্বগর্ভা পৃথিবীকে **প্রজাপতিঃ** প্রজাপতি **নঃ** আমাদের জন্য **আশাম্ আশাম্** দিকে দিকে **রণ্যাম্ কৃণোতু** রমণীয়া করুন।

গ্রাম আর নগর, জনপদ আর পুর—এই দুই মিলিয়ে মানুষের সভ্যতা। পৃথিবী তার আধার। আধ্যাত্মিক অর্থে ক্ষেত্র এবং পুর দুই-ই মানবদেহের বাচক। সাধকের দেহ ক্ষেত্র, সিদ্ধের দেহ পুর। আবাদ করতে করতে এক-একটি মানবজমিনে যখন সোনা ফলে, তখন সেটি হয়ে যায় অথর্ববেদের ভাষায় হিরণ্ময়-কোশ-বিশিষ্ট দেবতার অ-যোধ্যা পুরী (১০।২।৩১)। এই সোনার মানুষগুলিই পৃথিবীর সোনার কেল্লা, শক্তিগড়।

পৃথিবী বিশ্বগর্ভা, সব কিছুর বীজ তাঁর ভেতরে। এই সবকিছুর রূপটান গায়ে মেখে তিনি এক অপরূপা আনন্দময়ী রূপসী। হে বিশ্বস্রষ্টা, চোখ খুলে দাও, দিকে দিকে দেখাও আমাদের তাঁর সেই আশ্চর্যরমণীয় আনন্দরূপ।

অথবা, পৃথিবী রণ্যা রমনীয়া মিলনযোগ্যা। মিলব তাঁর সঙ্গে দিকে দিকে, নতুন নতুন সৃষ্টি হবে, পৃথিবীর কোলে জন্ম নেবে নতুন ভাব, নতুন সুর, নতুন ছন্দের সন্তান।

৪৪॥ ছন্দ জগতী। **বহুধা** নানাজায়গায় নানাভাবে **গুহা** গোপনস্থানে **নিধিম্ বিভ্রতী** গুপ্তধন-ধারিণী **পৃথিবী মে** আমাকে **বসু** ধন, আলোকবিত্ত **মণিম্ হিরণ্যম্** সোনামানিক **দদাতু** দিন। **বসুদা দেবী** বসু-দায়িনী দেবী পৃথিবী **সু-মনস্য-মানা** ভালো মনে ভালোবেসে **রাসমানা** √রা—দান+ইচ্ছার্থে সন্>দিতে ইচ্ছুক হয়ে **নঃ** আমাদের **বসূনি** বসু-সমূহ **দধাতু** দিন।

পৃথিবী বসুমতী বসু-ধা বসু-দা। পৃথিবীর অপার অন্তর-রহস্যই সেই লুকোন ধন, নিগূঢ় জ্যোতি। তাঁর লাখমহল বিচিত্র দ্যুতিময় সেই অন্তঃপুর তিনি আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করুন, দিন আমাদের তাঁর বিচিত্র বহিঃসম্পদ্‌ও প্রসন্নচিত্তে অকৃপণ করে। আমরা চাই মণিমালা পৃথিবীর সেই আশ্চর্য মানিক যার আলোয় উজলে ওঠে জলের তলায় পাতালপুরীর পথ। আমরা খোঁজ পেতে চাই সেই গোপন ভাণ্ডারের, যেখানে লুকোন আছে হিরণ্যবক্ষা অদিতি পৃথিবীর সোনার বুকখানি। চাই সমৃদ্ধি, চাই শ্রী, দ্র. শেষ ঋক্।

৪৫॥ ছন্দ পূর্ববৎ। **বহুধা** নানাভাবে **বি-বাচসম্** বিবিধ-ভাষা-সম্পন্ন **নানা-ধর্মাণম্** বিচিত্র ধর্ম অর্থাৎ স্বভাব-সম্পন্ন **জনম্** মানুষকে **যথৌকসম্** যার যেমন 'ওকস্' আশ্রয় বাসা ঘর সেইভাবে **বিভ্রতী** পালনকারিণী **পৃথিবী ধ্রুবা ধেনুঃ ইব** অচঞ্চল গাভীর মতো **অনপস্ফুরন্তী** ছটফট না ক'রে **মে** আমার জন্য **দ্রবিণস্য সহস্রং ধারাঃ** ধনের সহস্র ধারা **দুহাম্** দোহন করুন, ঝরিয়ে দিন।

শ্যাম কামধেনু পৃথিবী। জাতি বর্ণ ভাষা আচার ব্যবহার ধর্ম নির্বিশেষে সকলের ধাত্রী। আমি যে-ধন চাই, তার জন্য আমি পৃথিবীকে দোহন করতে চাই না, তিনি আপনা থেকেই তা ঝরিয়ে দিন অজস্রধারে অনায়াসে নির্দ্বিধায়, লক্ষ্মী গোরুটির মতো একটুও ছটফট না করে, ঝটকা না মেরে।

৪৬॥ ছন্দ পঞ্চপদা শক্করী। **পৃথিবি** হে পৃথিবী **তে** তোমার **যঃ** যে **সর্পঃ** √সৃপ্ > সর্পণকারী সাপ **তৃষ্ট-দংশ্মা** তৃষ্ণার্ত শুষ্ক অর্থাৎ রুক্ষ যার দংশন **বৃশ্চিকঃ** √ব্রশ্চ্—ছেদন, কাটা > বিছে **হেমন্ত-জব্ধঃ** √জভ্ ॥ √জম্ভ্—খাওয়া, ধ্বংস করা > শীতে কাবু হয়ে **ভূমলঃ** √ভ্রম্—ঘোরা > গোল পাকিয়ে **গুহা** গুহায় গোপনস্থানে **শয়ে** √শী > শুয়ে থাকে, লৌকিক 'শেতে', বেদে প্রথম পুরুষে ত-এর লোপ হয়েছে, লোপস্ ত আত্মনেপদেষু (পা. ৭।১।৪১) আর **প্রাবৃষি** প্রবল-বর্ষণ বর্ষাকালে **ক্রিমিঃ** পোকা **যত্ যত্ জিন্বত্** যা কিছু কিলবিল ক'রে **এজতি** নড়ে-চড়ে **তত্** তা **সর্পত্** সরসরিয়ে চলতে চলতে **নঃ** আমাদের কাছে **মা উপস্থপত্** যেন এগিয়ে না আসে। **যত্ শিবম্** যা মঙ্গলকর **তেন** তাই দিয়ে **নঃ** আমাদের **মৃল.** সুখী কর।

৪৭॥ ছন্দ ষট্‌পদা অতিশক্করী। **তে** তোমার **যে বহবঃ** যে-সব **জনায়নাঃ পন্থানঃ** জন-অয়ন অর্থাৎ মানুষ যাওয়ার পথগুলি, **রথস্য বর্ত্ম** রথের রাস্তা

অনসঃ যাতবে চ এবং শকট যাওয়ার, **যৈঃ** যে-সব পথ দিয়ে **ভদ্র-পাপাঃ উভয়ে** ভালো এবং দুষ্ট উভয়েই **সম্-চরন্তি** যাতায়াত করে, **তম্ পন্থানম্** সেই পথকে **অনমিত্রম্** অমিত্র-হীন **অতস্করম্** চোরডাকাতহীন ক'রে **জয়েম** জয় করব। শেষ পঙ্‌ক্তি পূর্ববৎ।

৪৮॥ ছন্দ বিরাট্-রূপা ত্রিষ্টুপ্ (একটি ৮ অক্ষরের ও তিনটি ১১ অক্ষরের চরণ)। **মল্বম্** মলিন, হালকা, তুচ্ছ-কে **বিভ্রতী** পালনকারিণী, **গুরুভৃত্** যা গৌরবযুক্ত ভারী তাকেও পালন করেন, **ভদ্র-পাপস্য** সজ্জন ও দুর্জনের **নিধনম্** মৃত্যুকে **তিতিক্ষুঃ** সহ্য-কারিণী **পৃথিবী বরাহেণ** গ্রাম্য বরাহের সঙ্গে **সংবিদানা** সংবিদ্ যুক্তা, মিলে-মিশে ভাব করে থাকেন, আবার **সূকরায় মৃগায়** বুনো শুয়োরের জন্যও **বি জিহীতে** ফাঁক হয়ে যান, তার মাটি খোঁড়ায় সহযোগিতা করেন!

৪৯॥ ছন্দ জগতী। প্রথম চরণে 'মৃগাঃ' পদটি ছন্দকে ব্যাহত করছে, অর্থের দিক থেকেও এটি অপ্রয়োজনীয়, 'পশবঃ' তো রয়েইছে। পদটি কি প্রক্ষিপ্ত?

পৃথিবি হে পৃথিবী **তে** তোমার **যে** যে-সব **আরণ্যাঃ মৃগাঃ পশবঃ** বন্য পশুরা, যেমন **পুরুষাদঃ** মানুষ-খেকো **সিংহাঃ ব্যাঘ্রাঃ** বাঘ-সিংগি **বনে হিতাঃ** বনে থাকে এবং **চরন্তি** ঘুরে বেড়ায়, তাদের এবং **উলম্** উল-কে, কারো আন্দাজ শেয়াল **বৃকম্** নেকড়েকে **দুচ্ছুনাম্** বিপদ্ উৎপাত অনিষ্টের উপদেবতাকে **ঋক্ষীকাম্** তন্নামক অপদেবতাকে **রক্ষঃ** রাক্ষসকে **অস্মত্** আমাদের থেকে **অপ বাধয়** দূরে খেদিয়ে দাও।

৫০॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্। যে-সব **গন্ধর্বাঃ অপ্সরসঃ** গন্ধর্ব-অপ্সরারা, খারাপ অর্থে যারা মানুষের ওপর ভর করে, **যে অ-রায়াঃ চ** আর যারা দান করে না > √রা-দান, কৃপণ, **কিমীদিনঃ** অপদেবতা-সজ্ঞ MMW, অথবা সব কিছুতে যারা 'কিম্ ইদম্' এটা কী—বলতে থাকে অর্থাৎ সংশয়াত্মা তার্কিক শ্রদ্ধাহীন, তাদের এবং **তান্** যত সব **পিশাচান্** মাংস-ভোজী পিশাচদের **সর্বা রক্ষাংসি** সমস্ত রাক্ষসদের **ভূমে** হে ভূমি **অস্মত্** আমাদের থেকে **যাবয়** পৃথক কর, খেদিয়ে দাও।

৪৬ থেকে ৫০ পর্যন্ত একই ভাব। পৃথিবীর পক্ষপাত নেই। পোকামাকড় সাপ বিছে সাধু-অসাধু গুরু-লঘু গেঁয়ো-বুনো রাক্ষস-পিশাচ অপদেবতা-উপদেবতা

ভালো মন্দ সবাইকে সবকিছুকে **ভরণ** করছেন সমানভাবে।

তু. যত ক্ষুদ্র, যত ক্ষীণ, যত অভাজন
যত পাপীতাপী, মেলি ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমল্ বক্ষে বাঁধিবারে চায়
(স্বর্গ হইতে বিদায়, চিত্রা)

কিন্তু আমরা মানুষরা তফাৎ থাকতে চাই ঐ মন্দের থেকে। ঐসব উপদ্রব যেন আমাদের গায়ের ওপর এসে না পড়ে। ওরাও থাকুক, আমরাও থাকি—একটু দূরে দূরে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান!

৫১॥ ছন্দ ত্রি-অবসানা ষট্পদা শক্বরী। **যাম্** যে পৃথিবীতে **দ্বিপাদঃ পক্ষিণঃ** দুপেয়ে পাখিরা **হংসাঃ** হাঁস **সুপর্ণাঃ** সুন্দর পাখাওলা পাখি, 'সোনালি ডানার চিল', গরুড়; **শকুনাঃ** চিল Pondicherry Eagle—MMW, যে কোনো পাখি বা বড় পাখি, **বয়াংসি** ছোট পাখি **সম্** ঝাঁকে ঝাঁকে **পতন্তি** ওড়ে-ফেরে, **যস্যাম্** যে পৃথিবীতে **রজাংসি কৃণ্বন্** ধুলো করতে করতে **বৃক্ষান্ চ্যাবয়ন্ চ** এবং গাছেদের নাড়া দিতে দিতে **মাতরিশ্বা বাতঃ** মাতরিশ্বা বায়ু **ঈয়তে** ধেয়ে চলে, **বাতস্য** এবং সেই হাওয়ার **প্র-বাম্ উপ-বাম্ অনু** √বা—বওয়া, চলা>গতি অনুসারে **অর্চিঃ** অগ্নিশিখা **বাতি** হেলে-দোলে,

৫২॥ ছন্দ পঞ্চপদা অতিজগতী। **যস্যাম্ ভূম্যাম্ অধি** যে-ভূমিতে **কৃষ্ণম্ অরুণম্ চ** একটি কালো একটি রাঙা **সংহিতে** জোট-বাঁধা **অহোরাত্রে** দিন আর রাত **বিহিতে** বাঁধা নিয়মে চলে **সা** সেই **বর্ষেণ বৃতা-আবৃতা** বর্ষা দিয়ে ঘেরা ও ছাওয়া **পৃথিবী ভূমিঃ নঃ** আমাদের **ভদ্রয়া** ভদ্রবুদ্ধিতে, ভালোবেসে **প্রিয়ে ধামনি-ধামনি** প্রিয় ধামে ধামে **দধাতু** রাখুন।

৫৩॥ ছন্দ **অনুষ্টুপ্**। **দ্যৌঃ** দ্যুলোক **পৃথিবী অন্তরিক্ষম্ চ** এবং তাঁদের মধ্যবর্তী **অন্তরিক্ষ**, তথা **অগ্নিঃ সূর্যঃ আপঃ বিশ্বেদেবাঃ চ** অগ্নি সূর্য অপ্ অর্থাৎ প্রাণ এবং বিশ্বদেবতারা **সম্** সকলে মিলে **মে** আমাকে **ইদং ব্যচঃ** বি- √অঞ্চ্—গতি>এই বিবিধ বিচরণ, এই ব্যাপ্তি এবং **মেধাম্** গভীরে অনুপ্রবেশের ক্ষমতা **সম্ দধুঃ** সম্প্রদান করেছেন।

নিসর্গসুন্দরী পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে ডুব ডুব ডুব রূপ-সাগরের অতলে ডুবে যাচ্ছেন কবি, ছড়িয়ে যাচ্ছেন অসীমার নিঃসীম বিস্তারে।

বিপুলা পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছেন। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠছে এ-দেখার চোখ-মন যাঁরা দিয়েছেন সেই দেবতাদের প্রতি।

৫৪॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্। **ভূম্যাম্** পৃথিবীতে **অহম্ নাম উত্তরঃ** আমি হচ্ছি গিয়ে সবার উঁচুতে, **সহমানঃ অস্মি** √সহ্—অভিভব>পরাভূত করছি সবাইকে, **অভীষাট্ অস্মি** অভি- √সহ্ > মুখোমুখি হয়ে জয় করছি সব কিছু **বিশ্বাষাট্ [অস্মি]** বিশ্ব—√সহ্ > বিশ্ববিজয়ী সর্বজিৎ আমি **আশাম্ আশাম্** প্রতিটি দিককে **বিষাসহিঃ** বি- √সহ্ > পৃথক্‌ভাবে জয় করছি।

ঋষির মধ্যে জাগছে অপরূপ মহিমবোধ—আমি অপরাজিত, আমি সম্রাট্, আমি পৃথ্বীরাজ। সহ্-ধাতুর পৌনঃপুনিক প্রয়োগের দ্বারা দিগ্বিজয়ীর অনুভবটি পরিস্ফুট।

৫৫॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। **দেবি** হে দেবী **অদঃ যত্** ঐ যে **দেবৈঃ উক্তা** দেবতাদের দ্বারা উচ্চারিত হয়ে **পুরস্তাত্** সামনে **প্রথমানা** ছড়াতে ছড়াতে **মহিত্বম্** মহিমাকে **বি-অসর্পঃ** বিসর্পিত করলে, **তদানীম্** তখন **সু ভূতম্** সুন্দরের কল্পনা **ত্বা** তোমাতে **আ-অবিশত্** আবিষ্ট হল, **চতস্রঃ প্রদিশঃ** চার-দিককে **অকল্পয়থাঃ** গড়লে তুমি।

বৈদিক দর্শন বলে, শব্দ থেকে সৃষ্টি। দেবতার উচ্চারিত 'ভূঃ' এই মন্ত্র পৃথিবীসৃষ্টির বীজ। ঋষি যেন চোখের সামনে দেখছেন একটি ছোট্ট মন্ত্রাঙ্কুর থেকে বিকশিত হলেন পৃথিবী, তারপর বেড়ে চললেন। তাঁর বিপুল মহিমা বিদ্যুতের মত এঁকে-বেঁকে ছড়িয়ে গেল সর্বত্র, আর সেই মহাপৃথিবীর বিপুল গর্ভে প্রবেশ করল এসে 'সুভূতম্' সুন্দরের কল্পনা। 'সু' সুন্দর অনায়াস, 'ভূতম্' যা হয়েই রয়েছে। সৃষ্টিমাত্রেই নতুন, আবার যা ছিল গোপন গুহাহিত তারি আবিষ্কার। নূতনে-পুরাণে মিলিয়ে সৃষ্টি এক অপরূপ সনাতন রহস্য, যাকে রবীন্দ্রনাথ বললেন, নিত্যকালের তুই পুরাতন, তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী। পৃথিবী মা হয়ে নির্মাণ করবেন ভাবী সৃষ্টি-শিশুর শরীর, তাই মহাশিল্পী বিশ্বপ্রজাপতি তাঁর ভেতরে আবিষ্ট করলেন সৃষ্টিবীজ সু-ভূতম্। পৃথিবী কবি হলেন।

৫৬॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্। **ভূম্যাম্ অধি** ভূমিতে **যে গ্রামাঃ** যত গ্রাম **যত্ অরণ্যম্** যত বন **যাঃ সভাঃ** যত সভা **যে সং-গ্রামাঃ** যত মানুষের মেলা

সমিতয়ঃ এবং সমিতি **তেষু** সেখানে সেখানে **চারু** সুন্দর করে **তে বদেম** তোমার কথা বলব।

কবি পৃথিবীর চারণ কবি হতে চান ঋষি অথর্বা। পৃথিবীর মহিমা-গান তিনি গেয়ে বেড়াবেন সর্বত্র।

৫৭॥ ছন্দ জগতী। **ভুবনস্য গোপা** ভুবনের রক্ষিত্রী **বনস্পতীনাম্ ওষধীনাম্ গৃভিঃ** ওষধি-বনস্পতিদের আঁকড়ে ধরে **মন্দ্রা** আনন্দমাতাল **অগ্রেত্বরী** অগ্রগামিনী পৃথিবী **অশ্বঃ রজঃ ইব** ঘোড়া যেমন ধুলো (ঝাড়ে) তেমনি করে **তান্ জনান্** সেইসব জাতিকে **বি দুধুবে** √ধু—ঝেড়ে ফেলা> ঝেড়ে ফেলেছেন **যে** যারা **যাত্ অজায়ন্ত** যবে থেকে জন্মেছে তবে থেকে **পৃথিবীম্ আক্ষিয়ন্** √ক্ষি—থাকা, প্রভুত্ব করা>পৃথিবীতে গেড়ে বসেছিল।

কত জাতি এল-গেল ; পক্ষিরাজিনী পৃথিবী তাদের গা থেকে ঝেড়ে ফেললেন ধুলোর মত, ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু বুকে ধরে রাখলেন তাঁর প্রিয় সন্তান অরণ্যকে। সহস্র বাহু দিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে আনন্দের গান গেয়ে গেয়ে এগিয়ে চলেছেন সৃষ্টি-পালিকা পৃথিবী।

৫৮॥ ছন্দ পুরস্তাদ্-বৃহতী। **যত্ বদামি** যা বলি **মধুমত্ তত্ বদামি** তা মধুর বলি, **যত্ ঈক্ষে** যা দেখি **তত্ মা বনন্তি** তা আমাকে খুশী করে। **ত্বিষীমান্** তেজস্বী **জূতিমান্** বেগবান **অস্মি** আমি। **দোধতঃ অন্যান্** √দুধ্—ক্রুদ্ধ হওয়া+শতৃ ২।৩>ক্রুদ্ধ শত্রুদের **অব-হন্মি** অবহনন করছি, পেড়ে ফেলছি, কুটছি। দোধত্—দ্বিতীয় অর্থ √ধু—কাঁপা+যঙ্লুক্ শতৃ> দ্বিধাযুক্ত (বেমী) এই অর্থ নিলে অনুবাদ হবে—দোমনাদের হানছি মরণ।

মাধুর্য এবং বীর্যের অনুভূতি একসঙ্গে। সন্ধাভাষায় এইটিই হল চন্দ্র-সূর্যের মিলন। তু. মধুমত্ত ইন্দ্রের বৃত্রবধ, দেবীসূক্তের 'আরভমাণা ভুবনানি বিশ্বা' এবং 'অহং রুদ্রায় ধনুর্ আ তনোমি'—যুগপৎ। মধুরের অনুভূতি ছেয়ে ফেলছে আমাকে, জিহ্বা মধুবাক্ উচ্চারণ করছে (তু. জিহ্বা মে মধুমত্তমা), চোখ দেখছে মধুরূপ (তু. ভদ্রং পশ্যেম অক্ষভির্ যজত্রাঃ), সেই সঙ্গে সমস্ত সত্তায় নামছে বিপুল তেজ বিপুল বেগের জোয়ার। মধুর সমুদ্রে প্রতিটি ঢেউয়ের মাথায় জলজ্বল করছে সূর্য। সেই সূর্যোজ্জ্বল মধুসমুদ্র প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে চলেছে ক্রোধান্ধ শত্রুর আক্রমণ বিধ্বস্ত করতে করতে, যা কিছু দুর্বল

দ্বিধাকম্পিত টলমল তাকে ভেঙে চুরমার করে দিতে দিতে। এক বিপুল হাঁ সমস্ত না-কে গ্রাস করে ফেলছে।

৫৯॥ ছন্দ **অনুষ্টুপ্**। **শন্তি-বা** শম্ > শন্তি=শান্তি তদ্‌যুক্তা **সুরভিঃ** সুগন্ধি, গন্ধ পৃথিবীর প্রাণরস, দ্র. ঋক্ ২৩-২৫, এই সুরভি বিশেষণটিই বুঝি পুরাণে নাম হয়ে দেবগাভী সুরভি হয়েছে, আসলে পৃথিবীই আমাদের সেই দেবদত্তা কামধেনু **স্যোনা** সুখদা **কীলালোধ্নী** 'কীলাল' সুমধুর পানীয়বিশেষ, অমৃতের সগোত্র, তদ্বিশিষ্ট যাঁর উধন্' পালান, **পয়স্বতী** দুগ্ধবতী **ভূমিঃ** পৃথিবী **পয়সা সহ** দুধ দিন, সেই সঙ্গে **মে অধি ব্রবীতু** আমার হয়ে বা আমাকে ভালো বলুন।

ভূমি-মার প্রসন্নতা যেন পাই, সেই সঙ্গে তাঁর 'প্রসাদ'ও। চাই তাঁর ভালো ছেলেটি হয়ে থাকতে। কিন্তু শুধু 'কথা' দিয়ে ভোলালে চলবে না, দুধ চাই। তোমার সঙ্গে ভাবে থাকতে চাই, তাই বলে অভাব দিও না। 'এদিক-ওদিক দুদিক রেখে' চুমুক দেব দুধের বাটিতে।

৬০॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। **বিশ্বকর্মা** বিশ্বধাতা **অর্ণবে অন্তঃ রজসি** জল-থৈ-থৈ সমুদ্রের গভীর লোকে **প্রবিষ্টাম্ যাম্** প্রবিষ্ট যাঁকে **হবিষা** হবিঃ দিয়ে **অনু ঐচ্ছত্** অন্বেষণ করেছিলেন, **যত্** যে **গুহা নিহিতম্** গোপনে লুকোন **ভুজিষ্যম্ পাত্রম্** ভোগের পাত্র **মাতৃমদ্ভ্যঃ** মাতৃ-যুক্ত অর্থাৎ যারা পৃথিবীকে মা বলে মনে করে তাদের কাছে **ভোগে** ভোগের জন্য **আবিঃ অভবত্** আবির্ভূত হল।

চলচ্চিত্রের flash-back-এর মতো কবি এক ঝলকে তুলে ধরলেন পৃথিবীর জন্ম-লগ্নটি। ঢেউ ঢেউ ঢেউ ঢেউ চারিদিকে ঢেউ। তারি তলায় ডুবে আছেন পৃথিবী, যেন একটি পরিপূর্ণ ভোগের থালি ডুবে আছে জলের তলায়। বিশ্বকর্মা নিজেকে আহুতি দিয়ে দিয়ে জলমগ্না পৃথিবীকে খুঁজে-বেড়াচ্ছেন। অবশেষে আবির্ভূতা হলেন তিনি তাঁর সন্তানদের ভোগের সাধ মেটাতে। যারা তাঁকে মা বলে জানে না, তাদের কাছে ভোগবতী পৃথিবী চিরকালই অদৃশ্য থেকে যান। তারা তাঁকে পায় না, তাদের ভোগ হয় না, তারা শুধু কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি করে মরে।

৬১॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। **ত্বম্ অসি** তুমি হচ্ছ **জনানাম্ আবপনী** √বপ্—ছড়ানো কামানো বেছে নেওয়া>মানুষকে ছড়িয়ে দিচ্ছ বীজের মতো

মুঠো মুঠো করে, আবার ঝাড়াই-বাছাইও করছ, কখনো তুলে ফেলে দিচ্ছ নির্মূল করে, **অদিতিঃ** সর্বদেবতাময়ী অদিতি তুমি, অখণ্ডিতা অবন্ধনা অসীমা, **কাম-দুঘা** সবার কামনা পূর্ণ করছ সুরভি নন্দিনী কামধেনু, **পপ্রথানা** √প্রথ্—বিস্তার+কানচ্>বেড়েই চলেছ, সীমাবদ্ধ নও, অনন্তা। **তে যত্ ঊনম্** তোমার যা ন্যূন, কম **তে তত্** তোমার সেই কমতি **ঋতস্য প্রথম-জাঃ প্রজাপতিঃ** ঋতের প্রথম জাতক প্রজাপতি **আ পূরয়াতি** সর্বতোভাবে পূর্ণ করুন, করে চলেছেন··· ।

পৃথিবীর, তথা সৃষ্টির, সবচেয়ে বড় রহস্য, সে হল অপূর্ণ। একটি পূর্ণতার স্বপ্নকে নিয়ে সে এগিয়ে চলেছে, প্রজাপতির প্রসাদে একটু একটু করে তার ন্যূনতা ভরে উঠছে। এই অপূর্ণতার বেদনাই পৃথিবীর সৃষ্টির শিল্পের প্রাণ। পরিপূর্ণ পূর্ণতা সে কোনোদিন পাবে কি ? পেলে বাঁচবে কি ? 'পূরয়াতি' এই নিত্য-বর্তমান লেট্ পদটির মধ্যে কি তারই ইঙ্গিত ? নিত্যকাল সে শুধু আসিছে ?

ঋত সৃষ্টির ছন্দ। তারই ঘন বিগ্রহ হলেন প্রজাপতি। তাই তিনি ঋতের প্রথম সন্তান।

৬২॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। **পৃথিবি** হে পৃথিবী **তে উপস্থাঃ প্রসূতাঃ** তোমার কোলে যাদের জন্ম তারা **অস্মভ্যম্** আমাদের কাছে **অনমীবা** অমীব-হীন, 'অমীব' রোগ দুঃখ ভয় **অ-যক্ষ্মা** যক্ষ্মাহীন **সন্তু** হোক। **বয়ম্** আমরা **নঃ দীর্ঘম্ আয়ুঃ** আমাদের দীর্ঘ আয়ু জুড়ে **প্রতিবুধ্যমানাঃ** প্রতিবুদ্ধ হতে হতে, 'প্রতিবোধ' উপলব্ধি তু. 'প্রতিবোধবিদিতং মতম্' (কেনোপনিষদ্) প্রতিবোধ দিয়ে জানলে তবেই জানা হল ব্রহ্মকে, **তুভ্যম্** তোমার উদ্দেশে **বলি-হৃতঃ** বলি-হৃত্ বলি-বহনকারী (দ্র প্রাণসূক্ত ১৮, ১৯) বলি খাজনা, নৈবেদ্য **স্যাম** হব।

চেতনার তুঙ্গে উঠেও ব্যাবহারিক দৃষ্টি কখনোই হারাচ্ছেন না কবি, কেননা তাঁর সত্য সবটাকে নিয়ে। রাজরাজেশ্বরী পৃথিবীর অনুরক্ত প্রজা হয়ে বাঁচতে চাই। ভালবেসে সব খাজনা দিতে চাই। তার জন্যে চাই বোধিদীপ্ত সুদীর্ঘ জীবন। উজ্জ্বল বোধ নিয়ে, নিত্য নতুন চেতনা নিয়ে জেগে উঠব নূতন যুগের ভোরে। কিন্তু এমন সুন্দর জীবন যেন রোগের পোকায় না খেয়ে দেয়। রোগের পোকারা—বিশেষ করে ঐ যক্ষ্মারোগটির—তোমারই সন্তান জানি, তাই বলি, তাদের সামলে-সুমলে রেখো মা।

৬৩॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্। **মাতঃ ভূমে** ওগো মা ভূমি **ভদ্রয়া** ভদ্রবুদ্ধিতে ভালবেসে **মা** আমাকে **সুপ্রতিষ্ঠিতম্ নি ধেহি** গভীরে সুপ্রতিষ্ঠিত কর। **কবে** হে কবি **দিবা সংবিদানা** দ্যুলোকের সঙ্গে একমন হয়ে **মা** আমাকে **শ্রিয়াম্** শ্রী-তে **ভূত্যাম্** ঐশ্বর্যে **ধেহি** রাখ।

শেষ মন্ত্র। সুদীর্ঘ পৃথিবী-প্রশস্তির উপযুক্ত উপসংহার। পৃথিবীর তিনটি পরিচয় বড় করে তুলে ধরলেন। পৃথিবী মা, পৃথিবী দ্যুলোকের সখী, পৃথিবী কবি। তাঁর কাছে চাইলেন তিনটি জিনিস—এককথায় সব। অটল প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্বধা, আপনাতে-আপনি-থাকা। ভূতি, অর্থাৎ প্রাচুর্য বাড়বাড়ন্ত সম্পদ ঐশ্বর্য সমৃদ্ধি অভ্যুদয়। আর শ্রী—যে বস্তুটিকে আশ্রয় করে থাকলে সম্পদ্ শোভাময় হয়, সেই অন্তরের আলোটি, সেই পরম শ্রেয়ঃ, সেই নিঃশ্রেয়স, সেই সুন্দর।

৩। ভৌম অত্রির পৃথিবী-সূক্ত

ঋষি অথর্বার বিপুলায়তন ভূমি-সূক্তের পাশাপাশি রাখা চলে ঋগ্বেদের ঋষি ভৌম অত্রির ছোট্ট পৃথিবী-সূক্তটিকে।

ভৌম অত্রি ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের প্রধান ঋষি। তাঁর পরিচয় পারিবারিক গোত্রনামে নয়। তাঁর পরিচয়, তিনি ভৌম, ভূমি-মায়ের ছেলে। তিনি সোজাসুজি অনুভব করেছেন পৃথিবীমায়ের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর বন্ধন, তাই পৃথিবীকেই তিনি মা বলে ডেকেছেন। হতে পারে শৈশবে মাতৃহীন হয়ে অত্রি আত্মীয়স্বজনের অনাদরে পৃথিবীর কোলে-পিঠে মানুষ হয়ে পৃথিবীকেই মা বলে জেনেছিলেন। হতে পারে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঋষি মহিদাস ঐতরেয়-র মতো তিনি ভূমি-মায়ের আরাধনা করে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। অথবা হয়ত কোনো নিবিড় আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মুহূর্তে লৌকিক পরিচয়ের গণ্ডী এক নিমেষে উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে বিরাট পৃথিবীর অঙ্গজ, অতি আপন প্রিয় সন্তান-রূপে দেখেছিলেন এবং সে-অনুভব আর কোনদিন ম্লান হয় নি তাঁর জীবনে। যাই হয়ে থাক, ঋগ্বেদ-সংহিতার ঋষিদের মধ্যে তাঁর এই পরিচয় অনন্য যে তিনি

ভৌম। অত্রিদৃষ্ট একটি মন্ত্রের ব্যাখ্যায় (৫।৪২।১৬) সায়ণও মন্তব্য করেছেন, পৃথিবী যদিও সবাইকার নির্মাত্রী তবু তিনি বিশেষ করে অত্রির মা, কেননা তিনি যে ভৌম। অত্রের্ভৌমত্বাদ্ বিশেষেণ মাতা। সে মন্ত্রটি হল,

দেবোদেবঃ সুহবো ভূতু মহ্যং
মা নো মাতা পৃথিবী দুর্মতৌ ধাত্

প্রতি দেবতাকে ডেকে যেন পাই সহজে
অপ্রসন্না হন না যেন মা পৃথিবী।

এর পরেই একপদা দশাক্ষরী বিরাট্‌ছন্দের একটি ঋকে অত্রি গেয়ে উঠেছেন একটি অতুলন প্রার্থনা—

উরৌ দেবা অনিবাধে স্যাম।
অবাধ বিপুলে র'ব ওগো দেবতারা।

অনিবার্যভাবে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের গানের পঙ্‌ক্তি, 'এই যে বিপুল ঢেউ লেগেছে তোর মাঝেতে উঠুক নেচে। যেখানেতে অগাধ ছুটি মেল সেথা তোর ডানা দুটি।' সেই অবাধ অগাধ বৈপুল্যের পারাবারেই ডানা মেলেছেন পৃথিবীর ছেলে অত্রি।

ঋগ্বেদে পৃথিবীর মন্ত্র এবং উল্লেখ অনেক থাকলেও পৃথিবীর উদ্দেশে গোটা সূক্ত আছে মাত্র একটিই, এবং সেটির রচয়িতা হলেন ভৌম অত্রি। পঞ্চম মণ্ডলের শেষের দিকে রয়েছে অত্রিদৃষ্ট চারটি সূক্তের একটি গুচ্ছ (৮৩-৮৬)—যথাক্রমে পর্জন্য পৃথিবী বরুণ এবং ইন্দ্রাগ্নীর বন্দনা। পর্জন্য-সূক্তে অত্রি বজ্র-সচকিত দামিনী-দমকিত ঝঞ্ঝাঝঙ্কৃত এক প্রবল বর্ষণ-দিনের ছবি এঁকেছেন দশটি ঋকে। তারপর সেই বর্ষার পটভূমিকায় ত্রিলোকেশ্বরী পৃথিবীর রূপ দেখেছেন পৃথিবীসূক্তে অনুষ্টুপ্ ছন্দের তিনটি ঋকে। এই দুটি সূক্ত সম্ভবত একই দিনে অথবা খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে লেখা। দুটি মিলিয়ে একটি ছবি, একটি ভাব, একটি ব্যঞ্জনা। তাই পৃথিবী-সূক্তটি পড়ার আগে পর্জন্য-সূক্তটি একটু ছুঁয়ে দেখা ভালো।

কেমন ছিল সে দিনটি? পর্জন্য-বৃষের ডাকে থরথরিয়ে কেঁপে উঠেছিল পৃথিবী, গাছপালার ওপরে সপাসপ এসে পড়ছিল ঝড়ের চাবুক, বিদ্যুৎ ছুটেছিল আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত, আকাশ ভেঙে নেমেছিল

অজস্র অঝোর অফুরন্ত বৃষ্টি। ভূমি-মায়ের কোলে বসে বসে অত্রি দেখছিলেন—দ্র. পৃ ১৪৪-৪৫। এই পর্জন্যসিক্তা পর্জন্যপত্নী পৃথিবীর বন্দনা এই সূক্ত।

১॥ **বট্ ইত্থা**—বৈদিক বাগ্‌ভঙ্গি। দুটি শব্দেরই অর্থ 'সত্য' (নিঘ. ৩।১০, সায়ণ ১।১৪১।১)। দুটি মিলে অর্থ দাঁড়ায় সত্যিই, সত্যিসত্যিই। **পর্বতানাম্ খিদ্রম্ বিভর্ষি** পর্বতকে ছিন্নভিন্ন করার বল ধারণ করে আছ, পর্ব যার আছে, সে পর্বত। একটা অংশের সঙ্গে আর একটার জোড় গেঁথে চলে পর্বত। মেঘও পর্বত, পাহাড়ও পর্বত। 'খিদ্র' যা দিয়ে খিন্ন বা ছিন্নভিন্ন করা যায় সেই বল—নিরুক্ত ১১।৩৭। √খিদ্ খামচানো, বেমী ৫০১।৪৬৬। পাহাড়ের মতো মেঘকে ছিন্নভিন্ন করে দিলে, সত্যি, কি অসীম বল তোমার হে **প্রবত্বতি** 'প্রবত্' প্র+বতি (উপসর্গাচ্ছন্দসি ধাত্বর্থে পা ৫।১।১১৮) ঢালু, গড়ানে মাটি। তদ্-যুক্তা, প্রবত্ + মতুপ + ঙীপ্ (প্রবণোদকবতি—সায়ণ) পর্জন্যের ঢেলে-দেওয়া অজস্র জল ঝরণা হয়ে নামছে পৃথিবীর ঢালু বেয়ে। তার ঝরঝর নিনাদে মুখরিত দশ দিক্। হে **মহিনি** মহতী, মহিমময়ী, বিরাট্ তোমার **মহ্না** মহিমা দিয়ে **ভূমিম্** ভূমিকে **প্র জিনোষি** প্রাণবন্ত করছ, অন্তর্বত্নী ভূমি শিউরে শিউরে উঠছে অজস্র অফুরন্ত বিপুল প্রাণের স্পন্দনে। 'মাটির আঁধার-নিচে কে জানে ঠিকানা মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা'।

ঠিক আগেই পর্জন্যসূক্তের শেষ ঋক্‌টিতে পর্জন্যকে উদ্দেশ করে অত্রি বলেছেন 'ঢের বর্ষালে, থামো এবার।' সেই প্রার্থনা শুনেই যেন পর্জন্য ক্ষান্তবর্ষণ! পর্জন্যপত্নী পৃথিবীও মেঘের পাহাড়গুলি ছিঁড়ে-খুঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছেন। তারপর নামাচ্ছেন বিপুল প্রাণের ঢল।

২। হে **বিচারিণি**, বিবিধচরণশীলা (সায়ণ), বিবিধচারিণী, চঞ্চরা, চঞ্চলা, **স্তোমাসঃ** স্তোমেরা, গানেরা—বজ্রের গর্জন, মেঘের গুরুগুরু, হাওয়ার শনশন, বৃষ্টির ঝমঝম, ঝরণার গমগম, এই সব গান—**ত্বাং প্রতি স্টোভন্তি** তোমাকে লক্ষ্য করে, তোমার উদ্দেশে বেজে বেজে উঠছে **অক্তুভিঃ** ঝলকে ঝলকে (বেমী)। √অঞ্জ্—প্রকাশ। বিদ্যুতের চমকানির সঙ্গে সঙ্গে দিকেদিকে বাজছে পৃথিবীর স্তবগান। প্রকৃতি স্তুতিমুখর।

হে **অর্জুনি** শ্বেতশুভ্রা রজতোজ্জ্বলা বিদ্যুন্ময়ী রূপালি পৃথিবী, **যা** যে তুমি,

যখন তুমি **হেষন্তং বাজং ন** উদ্দাম বেগে ছুটে-চলা ঘোড়ার মতো (হ্রেষা-ধ্বনিকারী ঘোড়ার মতো—সায়ণ ও গ্রিফিথ) **পেরুম্** সব-ছাওয়া বিদ্যুৎকে (বেমী— √পী কেঁপে ওঠা, √পৃ পূর্ণ করা), পূরক মেঘকে (সায়ণ), **অস্যসি** ক্ষেপণ কর, ছুঁড়ে দাও, ধাওয়াও।

বিদ্যুতের ঘোড়াগুলিকে দুরন্ত বেগে আকাশময় ছুটিয়ে বেড়াচ্ছেন অশ্বিনী চিত্রাঙ্গদা অপরূপা পৃথিবী।

৩। 'দৃল্.হা চিত্'—একটি সুপ্রচলিত বৈদিক বাগ্ভঙ্গি (১।৬৪।৩, ৭১।২, ১২৭।৪, ৩।৪৫।২, ৪।৩১।২, ৫।৩৯।৩, ৮৬।১, ৮।২১।১৬, ৪০।১, ৪৫।১৩, ৯।৯১।৪)। অর্থ, যা দৃঢ় (বহুবচন অথবা একবচন) তাকেও অথবা তাকেই (১।১২৭।৪ সায়ণ)। 'দৃল্.হা' সর্বত্রই কর্মপদের বিশেষণ। **যা** যে পৃথিবী **দৃল্.হা চিত্ বনস্পতীন্** বড় বড় গাছেদের, তারা অত্যন্ত সুদৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও, **ওজসা** সবলে **ক্ষময়া** মাটির সঙ্গে **দর্ধর্ষি** √ধৃ+যঙ্লুক্+২।১ আঁকড়ে ধরে থাক, **যত্** যখন **তে** তোমার **অভ্রস্য বিদ্যুতো দিবো বৃষ্টয়ঃ** মেঘের বিদ্যুতের দ্যুলোকের বৃষ্টিরা **বর্ষন্তি** ঝরে পড়ে।

বনস্পতিরা অত্যন্ত মজবুত হওয়া সত্ত্বেও তুমি তাদের সবলে আঁকড়ে ধর মাটির সঙ্গে, পাছে তারা বৃষ্টিতে গলে যায়, পড়ে যায়। পৃথিবীর মাতৃহৃদয়ের স্নেহব্যাকুলতা, হারাই হারাই ভয় গো তাই বুকে চেপে রাখতে যে চাই। দ্যুলোকের অমৃত-বর্ষণে অভিষিক্ত পৃথিবীর বনস্পতি-হেন পুত্রেরা যেন মাটিকে ভুলে না যায়, তাই পৃথিবী তাদের আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরেন—এই ধ্বনিও রয়েছে। মেঘের বৃষ্টি বেয়ে বিদ্যুতের চমকানি দিতে দিতে দ্যুলোক থেকে নেমে আসছে এক চরাচরব্যাপী বিপুল আলোর প্লাবন। অত্রি বলছেন, এ আলোয় যেন ভেসে না যাই, মা পৃথিবী ধরে রেখো।

ছেড়ে দিবে তুমি
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি
যুগযুগান্তের মহা মৃত্তিকা-বন্ধন
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে? করিব গমন
ছাড়ি লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ-ক্রোড়খানি?
এখনো মিটে নি আশা,
এখনো তোমার স্তন-অমৃত-পিপাসা

মুখেতে রয়েছে লাগি, তোমার আনন
এখনো জাগায় চোখে সুন্দর স্বপন,
এখনো কিছুই তব করি নাই শেষ,
সকলি রহস্যপূর্ণ, নেত্র অনিমেষ
বিস্ময়ের শেষ তল খুঁজে নাহি পায়,
এখনো তোমার বুকে আছি শিশুপ্রায়
মুখপানে চেয়ে। জননী, লহ গো মোরে
সঘনবন্ধন তব বাহুযুগে ধরে।

(বসুন্ধরা, সোনার তরী)

মেঘের বৃষ্টি যেন—'শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে তোমারি সুরটি আমার মুখের পরে বুকের পরে।' বিদ্যুতের বৃষ্টি যেন—'হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত।' কেনোপনিষদের ঋষি ব্রহ্মানুভূতির অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতা ও সর্বপ্লাবিতা বোঝাতে বিদ্যুতের উপমান ব্যবহার করেছেন—'বিদ্যুতো ব্যদ্যুতত্ আ ইতি ইত্' বিরাটের অনুভূতি কেমন? না, ঐ যে বিদ্যুৎ চমকে উঠল, ঠিক তেমনই। আর দ্যুলোকের বৃষ্টি হল—আলোকের ঝরণাধারা।

৪। ঋষি অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির দ্যাবাপৃথিবী সূক্ত

এই মাটির পৃথিবী আমাদের মা। ঐ আলোঝলমল আকাশ ঐ দ্যৌ আমাদের পিতা। শুধু আমাদের নয়, দেবতাদেরও জনকজননী এই দ্যাবাপৃথিবী। তাঁরা দেবপুত্রা। দেবতারা তাঁদের পুত্রকন্যা।

ঋগ্বেদে পৃথিবী-সূক্তের এবং মন্ত্রের বিরলতার কারণ পৃথিবীর প্রতি বৈদিক ঋষির ঔদাসীন্য নয়, দ্যুলোকের সঙ্গে নিত্যসঙ্গতারূপে পৃথিবীকে দেখার অভ্যাস। তাই, আলাদা করে নয়, দ্যুলোকের সঙ্গে একসঙ্গে তাঁরা দ্যুময়ী পৃথিবীর বন্দনা করেছেন বেশ কিছু সূক্তে এবং মন্ত্রে।

তাঁদের পৃথিবী সব সময়েই দ্যুলোকের নিত্যসখী নিত্যসহচরী এক আলোর পৃথিবী। তার প্রতিটি গুহায় কন্দরে গর্তে গোষ্পদে রন্ধ্রে ছিদ্রে নিহিত রয়েছে এই আলোর গুপ্তধন, এই বসু। তার শ্যাম অঙ্গ জড়িয়ে জড়িয়ে উঠছে এক অপরূপ আলোর লতা, আলোর মঞ্জরী। আলোর দুলাল দেব্-দেবতার খেলার উঠোন এই পৃথিবী। তার অণুপরমাণুতে বাজছে আলোর মঞ্জীর। ঐ সুদূরের আলোর বাঁশি তাকে ডাক দিয়েছে কোন্ সকালে, সেই ডাকে সাড়া দিতে দিতে সে নিজেই হয়ে উঠছে এক আলোর বাঁশি। একই বৃন্তে দুটি শ্বেত আর নীলকমল এই দ্যাবাপৃথিবী—'সযোনী' একই তাদের জন্মস্থান, 'সমোকসা' একই তাদের আশ্রয়। অথচ মিলছে না দুজনে—'বিযুতে' অন্তরিতা, 'অসশ্চতা' 'অসশ্চন্তী' অ-সক্তা। বিশাল অন্তরিক্ষের দুই কূলে আছড়ে পড়ছে তাদের কান্না। দুই কূলে (রোধসী) দুটি অশ্রুভরা বেদনা (রোদসী)। এই অসীম রোদন দেখতে দেখতে বাক্-এর বরপুত্র ঋষি বাচ্য প্রজাপতি বলছেন—

সমান্যা বিযুতে দূরেঅন্তে ধ্রুবে পদে তস্থতুর্ জাগরূকে।
উত স্বসারা যুবতী ভবন্তী আদ্ উ ব্রুবাতে মিথুনানি নাম ৩।৫৪।৭

দুয়ে এক তারা, মাঝখানে ব্যবধান।
সীমানা দূরে কোথায়।
ধ্রুবপদে আছে দাঁড়িয়ে তন্দ্রাহীন।
নিত্যযুবতী আপন দুবোন
পরস্পরকে ডাকে ধরে জোড়ানাম।

নাম পর্যন্ত এক দুজনের! দ্বিবচনে এই জোড়ানামের একটি তালিকা দিচ্ছেন নিঘণ্টু—

স্বধে আপনাতে আপনি আছেন **ধিষণে চম্বৌ** সোমপাত্র, অমৃতপাত্র, মধুপাত্র, যে-মধুর লোভে কবিচিত্ত গুনগুন করে, 'বোস্-না, ভ্রমর, এই নীলিমায় আসন লয়ে, অরুণ-আলোর স্বর্ণরেণুমাখা হয়ে'। **পুরন্ধী** এ জীবন পূর্ণ করেন, জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেন দান, তাই তাঁদের কাছে ঋষির প্রার্থনা, 'পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ' (১।২২।১৩) ভরপুর করো ভরপুর করো আমাদের। (আরো দ্র. পৃ. ৪২)। **রোদসী** প্রজাপতির কান্নায় তাঁদের সৃষ্টি হয়েছিল (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।২।৯।৪), আজও পর্যন্ত সে কাঁদন থামে নি, অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে বাজে, অন্তরে মোর তোমার লাগি একটি কান্না-ধন।

অথচ আবার **রজসী** আনন্দ-রঙীন লোক (√রঞ্জ্—রাঙানো, নন্দিত হওয়া)। উপলব্ধির দুটি মেরু—সর্বং দুঃখম্ আর আনন্দাত্ হি-এব। দুটিই সত্য। হাসি-কান্না হীরা-পান্না দোলে ভালে। যস্য ছায়া-অমৃতং যস্য মৃত্যুঃ। **ক্ষোণী সদসী সদ্মনী** বিশ্বজনের নিবাসভূমি, আপন ঘর, আবার সাধনার পীঠ, যজ্ঞশালা। **অম্ভসী নভসী** সৃষ্টির বাষ্পরেণুকণার ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা (দ্র. উপনিষৎপ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, অনির্বাণ পৃ ৮৪-৮৫)। **ঘৃতবতী** উজ্জ্বলরসবতী, আলোক-ঝরণা। **বহুলে** প্রচুর, বিচিত্র, অনেক, অনন্তরূপা। **গভীরে গম্ভীরে** অতল রহস্যের খনি। **ওণ্যৌ** অবনি, আগলে আছেন রক্ষা করছেন সবাইকে সব-কিছুকে, 'অবসা অবন্তী' (১।১৮৫।৪) প্রসাদ দিয়ে পালেন সবায়। **পার্শ্বে** দুটি পাশ, একই সত্তার এপিঠ-ওপিঠ, পরম আর অবম, পূর্ণতাকামী মানুষের এক পাশ থাকে পৃথিবীর দিকে ফেরানো, অন্য পাশ দ্যুলোকের দিকে, পৃথিবীর সন্তান বলে সে পায় 'যন্ত্রণার স্নায়ু' কিন্তু দ্যৌএর সন্তান বলে সেই সঙ্গে পায় 'স্বপ্নের চোখ'; এই দুটিকে পাশাপাশি কাছাকাছি রাখতে চেয়ে ঋষি অগস্ত্য বলছেন, 'ভূতং দেবানাম্ অবমে অবোভিঃ' (১।১৮৫।১১) আলোর প্রসাদ দিতে দিতে তোমরা দুজনে চলে এস দেবতাদের সবচেয়ে তলায়, নিচুতে, আমাদের নাগালের ভেতরে, আমাদের কাছাকাছি, আমাদের পাশে। **মহী উর্বী পৃথ্বী** মহতী বিশালা বিপুলা। **অদিতী** অখণ্ডা অনন্তা। **অহ্নী** অহননীয়া, 'অতপ্যমানে' (১।১৮৫।৪) কেউ তাঁদের পীড়িত করতে পারে না, আবার কুণ্ডলিনী মহাকাল-নাগিনী, কবি-পুত্রের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে উন্মোচন করে চলেছেন একটার পর একটা নির্মোক **দূরে-অন্তে** সীমানা-দূরে-কোথায়। **অপারে** অপারা, বিস্ময়ের অকূল পারাবার।

নামগুলি বেশির ভাগই স্ত্রীলিঙ্গ অর্থাৎ পৃথিবীপ্রধান। পৃথিবীর মধ্যে মিশে গেছেন, পৃথিবী জুড়ে রয়েছেন দ্যৌ। এই দ্যুময়ী পৃথিবীর দর্শন ঋষি বামদেবের মনে একটি অদ্ভুত শব্দের জন্ম দিয়েছে—দ্যবী! (৪।৫৬।৫)। ঋষি গৃৎসমদ আবার শুধু 'পৃথিবি' বলে ডেকেই ক্ষান্ত—

স্তুষে যদ্ বাং পৃথিবি নব্যসা বচঃ (২।৩১।৫)

সদ্য-রচন বচনে, তোমাদের স্তব গাই হে পৃথিবী যখন

জানেন, এ ডাকে দ্যৌষ্পিতারও সাড়া না দিয়ে উপায় নেই। ঋষিদের কাছে

কখনো তাঁরা পিতা এবং মাতা, কখনো পিতার মধ্যে মাতা মিশে গিয়ে 'পিতরা', কখনো মাতার মধ্যে পিতা মিশে গিয়ে 'মাতরা'। আলোচ্য সূক্তে যেমন পাচ্ছি 'নিত্যং ন সূনুং পিত্রোর্ উপস্থে' (২) বাবা-(মা-)র কোলে চিরশিশুর মতো, বা

'পিতা মাতা চ রক্ষতাম্ অবোভিঃ (১০)
প্রসাদ দিয়ে রক্ষা করুন পিতা এবং মাতা, বা
'ইদং দ্যাবাপৃথিবী সত্যমস্তু পিতর্ মাতর্ যদ্ ইহোপব্রুবে বাম্' (১১)
তোমাদের কাছে আমার এ নিবেদন
সত্য হোক হে দ্যৌ-পিতা পৃথিবী-মা,

তেমনি দীর্ঘতমার সূক্তে 'সুরেতসা পিতরা' (১।১৫৯।২) সুবীর্য পিতা-(মাতা)র সঙ্গে সঙ্গে 'মহী মাতরা' (ঐ) মহতী মাতা-(পিতা)। আবার

উভা তরেতে অভি মাতরা শিশুম্ (১।১৪০।৩)
শিশুর পানে দুই মা ছোটেন ত্রস্তে।

আবার দুজনেই দুজনের মধ্যে লীন এটি বোঝাতে বামদেবের বিচিত্র শব্দ-সৃষ্টি 'মাতরাপিতরা' (৪।৬।৭)। দুজনে একেবারে অভিন্ন এক হয়ে গেছেন দীর্ঘতমার একটি মন্ত্রে একবচন 'অস্য' পদের মধ্যে—

স বহ্নিঃ পুত্রঃ পিত্রোঃ পবিত্রবান্ পুনাতি ধীরো ভুবনানি মায়য়া।
ধেনুং চ পৃশ্নিং বৃষভং সুরেতসং বিশ্বাহা শুক্রং পয়ো অস্য দুক্ষত ১।১৬০।৩

শতরূপা ব্রহ্মানন্দময়ী পৃথিবী হলেন পৃশ্নি ধেনু। দ্যুলোক সুবীর্য বৃষভ। দুয়ে মিলে এক। এই বৃষধেনুর উজ্জ্বল পয়োধারা দিনের পর দিন দোহন করে চলেছেন তাঁদের নবজাত শিশুপুত্র বহ্নি। আমারই মধ্যে আমারই শরীরে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন এই অদ্ভুত কুমার অগ্নি। আমাকে ছাঁকনি করে শুদ্ধ, পূত, মার্জিত করে চলেছেন যা কিছু হয়ে চলেছে তাকে, তাঁর আশ্চর্য প্রতিভা দিয়ে (দ্র. বেমী ৪৯৫।৪৫৭৬)।

এই মহিমময়ী ঋতম্ভরা সবার শান্তিবিধায়িনী শ্রীবিশাল্য কবি দ্যাবাপৃথিবীকে মানুষ জন্ম দেয় তার নিজের মধ্যে, অন্য সমস্ত দেবতারই মতো। তাঁদের জন্ম দিয়ে সে নিজেও জন্মায় নতুন এক বিশাল চেতনার পাখি হয়ে। এই জন্ম যার হয় নি, তার কাছে দ্যাবাপৃথিবী জরাজীর্ণ আদ্যিকালের দুই বুড়োবুড়ী। আর যার হয়েছে, তার কাছে তাঁরা নিত্যতরুণী। অপার বিস্ময়মাখা তার দুই চোখে

পলক পড়ে না, দ্যাবাপৃথিবীর অনন্ত তারুণ্যও আর ফুরোয় না। যদি বা ফুরোয়, মানবশ্রেষ্ঠ অর্ধদেব অদ্ভুতকর্মা ঋভুরা তাঁদের সাধনা দিয়ে ফিরিয়ে আনেন সে-তারুণ্য। তাঁদের অন্তরের নিত্যজাগ্রত অগ্নি বারবার জ্বলে উঠে নতুন করে তোলে দ্যাবাপৃথিবীকে।

'দীদ্যানঃ শুচির্ ঋষ্বঃ পাবকঃ পুনঃ পুনর্ মাতরা নব্যসী কঃ' (৩।৫।৭) তীক্ষ্ণোজ্জ্বল দাউ দাউ সে-আগুন / মাতা ও পিতাকে বারে বারে করে নতুন, আরো নতুন। এইখানেই মানুষের মহিমা। পুত্র হয়েও সে পিতা, দেবতার জনক। এই মহিমবোধ ভুঙ্গে উঠেছে অম্ভৃণকন্যা বাকের অন্তিম ঘোষণায়—

> পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা
> এতাবতী মহিনা সং বভুব ১০।১২৫।৮
>
> ছাড়িয়ে আকাশ ছাড়িয়ে বিশাল এ-পিথিমি
> ছড়িয়ে আছি কি মহিমায় বিপুল আমি

ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলে যে পনেরজন মহাকবির সূক্ত সংকলিত হয়েছে, মৈত্রাবরুণি অগস্ত্য তাঁদের একজন। এঁদের সাধারণভাবে বলা হয় শতর্চী অর্থাৎ একশটি করে ঋকের দ্রষ্টা। সবার না হলেও এঁদের অনেকেরই ঋক্‌সংখ্যা একশ'র কাছাকাছি বা ওপরে। অগস্ত্য হলেন প্রথম মণ্ডলের অন্তিম ঋষি। ১৬৫-১৯১ এই ২৭টি সূক্ত নিয়ে তাঁর উপমণ্ডল। এই সূক্তগুলির ঋক্‌সংখ্যা হল ২৩৯। অর্থাৎ অগস্ত্য শুধু শতর্চী নন, প্রায় সার্ধদ্বিশতর্চী। বেশির ভাগ সূক্তেই ঋষি তাঁর চিহ্ন রেখেছেন ভণিতা বা / এবং তাঁর প্রিয় ধুয়া দিয়ে।

প্রথম চারটি সূক্তের শেষ ঋক্‌টি একটি ধুয়া, তাতে তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন 'মান্দার্য মান্য কারু' অর্থাৎ মন্দার (নামক স্থান?) এর মানের পুত্র কবি বলে। তারপর প্রায় প্রতিটি সূক্তেই ঐ ধুয়ার শেষ চরণটি 'বিদ্যাম-ইষং বৃজনং জীর-দানুম্' অন্তিম ধুয়া-রূপে ব্যবহার করেছেন। এই সূক্তেরও শেষ ঋকে ধুয়াটি রয়েছে। তা ছাড়া আছে এই সূক্তের নিজস্ব ধুয়া, 'দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাত্'।

কোথাও কোথাও উল্লেখ করেছেন 'অগস্ত্য' এই স্ব-নাম (১৮০।৮, ১৮৪।৫)

এবং 'মানাসঃ' 'মানেভ্যঃ' ইত্যাদি পদের দ্বারা স্ব-কুলের উল্লেখ করেছেন (১৮২।৮, ১৭১।৫, ১৬৯।৮)।

অগস্ত্যের আধ্যাত্মিক জন্ম যুগ্মদেবতা মিত্র-বরুণের আবেশে, ঠারে-ঠোরে তার বিবরণ আছে ৭।৩৩।১৩তে। তাই তাঁর পরিচয় মৈত্রাবরুণি অর্থাৎ মিত্র-বরুণ-পুত্র বলে (দ্র. 'বেদ ও শ্রীঅরবিন্দ')।

অগস্ত্যের একটি মন্ত্র 'অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্' তাঁর ঈশোপনিষদের অন্তিম মন্ত্র রূপে গ্রহণ করেছেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য।

১॥ **অয়োঃ**=অনয়োঃ, এই দুটি অর্থাৎ দ্যৌ ও পৃথিবীর মধ্যে **কতরা পূর্বা** কোনটি আগে, **কতরা অপরা** কোনটি পরে, **কথা** কি প্রকারে, কেমন করে (কিম্+থা, থা হেতৌ চ ছন্দসি পা ৫।৩।২৬) **জাতে** জন্মাল, **কবয়ঃ** হে কবিরা ক্রান্তদর্শীরা **কঃ বি বেদ** [তোমাদের মধ্যে] কে বিশেষ করে জানে? **যত্ হ নাম** যা-কিছু **বিশ্বম্** সব **ত্মনা**=আত্মনা (আ-লোপ, মন্ত্রেষু আঙি আদের্ আত্মনঃ পা ৬।৪।৪১), নিজেকে দিয়ে **বিভৃতঃ** ধারণ করে আছে, **অহনী** দিন-রাত **চক্রিয়া ইব** চক্রযুক্ত অথবা চক্রের মতো **বি বর্তেতে** গড়িয়ে চলেছে।

তু. ইন্দ্রায় গিরো অনিশিতসর্গা অপঃ প্রেরয়ং সগরস্য বুধ্নাত্।
যো অক্ষেণেব চক্রিয়া শচীভির্ বিষ্বক্ তস্তম্ভ পৃথিবীম্ উত দ্যাম্
(১০।৮৯।৪)

অতল সমুদ্র হতে ঘুম-ভাঙা গানের ফোয়ারা
ইন্দ্রের উদ্দেশে ছোটে অফুরন্ত অক্ষীণ ধারায়—
যিনি তাঁর শক্তিবলে (রথের) দুধারে
অক্ষে দু-চাকার মতো বেঁধেছেন দ্যুলোক-ভূলোক।

২॥ **দ্বে** দুজনে **অ-চরন্তী** অচঞ্চল হয়ে **ভূরি** কত, প্রচুর **চরন্তম্** বিচরণশীলকে, **অ-পদী** পা-হীন হয়ে **পদ্-বন্তম্** কত পা-যুক্তকে **গর্ভম্** গর্ভরূপে **দধাতে** ধারণ করে আছেন। **পিত্রোঃ** বাবা-মার **উপস্থে** কোলে **নিত্যম্ সূনুম্ ন** আপন বা নিত্যকালীন পুত্রের মতো **দ্যাবা…পৃথিবী** হে দ্যাবাপৃথিবী **নঃ** আমাদের **অভ্বাত্** অভ্ব থেকে **রক্ষতম্** রক্ষা কর।

অভ্ব (পুং) মহত্-এর প্রতিশব্দ, নিঘ ৩।৩। <অ-√ভূ, অভাবনীয়, অসম্ভূতি। সায়ণের অর্থ মহা-ভয়। তিনটি অর্থ সম্ভব—

১) দ্যাবাপৃথিবীর বিপুল বিস্তার অনুভব করতে গিয়ে ঋষি হারিয়ে যাচ্ছেন তার মহা-মহিমায়। তাই বলছেন, ঐ মহা-বিপুলের পূর্ণগ্রাস থেকে আমাকে রক্ষা করো। তু. সখ্যে তে-ইন্দ্র বাজিনো মা ভেম—তোমার বন্ধুত্বে আমরা যেন ভয় না পাই, হে বজ্রবলিষ্ঠ ইন্দ্র। এক তুমি, তোমা মাঝে আমি একা **নির্ভয়ে** থাকতে চাই।

২) আমাদের ব্যাবহারিক প্রাত্যহিক জীবনকে পদে পদে মহাভয় থেকে মুক্ত করো।

৩) অ-ভ্ব্ —অসম্ভূতি, অব্যক্ত, মহা-অজানার গহ্বর থেকে বাঁচাও। বিপুল না-এর মধ্যে হারিয়ে যেতে দিও না।

৩॥ **অদিতেঃ দাত্রম্** অদিতির দানকে **হুবে** আহ্বান করি (হ্বে-ধাতুর সম্প্রসারণ হয়েছে, বহুলং ছন্দসি পা ৬।১।৩৪)। কেমন হবে সে দান? **অনেহস্** পাপহীন দোষহীন উপদ্রবহীন>অবাধ, **অনর্বম্** অক্ষয় **স্বর্-বত্** জ্যোতিঃ-যুক্ত **অবধম্** মৃত্যুহীন **নমস্-বত্** নমস্কার-যুক্ত, প্রণতি-জাগানো, অর্থাৎ সে দান উদ্ধত করবে না, মাথা নত করে দেবে, তু. নমস্যন্তো দিব আ পৃষ্ঠস্ অস্থুঃ ১।১১৫।৩। **রোদসী** হে দ্যাবাপৃথিবী **জরিত্রে** তোমাদের কবির, স্তোতার জন্যে **তত্** সেই দান **জনয়তম্** সৃষ্টি কর।...

৪॥ **দেব-পুত্রে** ওগো দেব-পুত্র-সম্পন্না **রোদসী** দ্যাবাপৃথিবী, **অ-তপ্যমানে** তাপিত না হয়ে, অক্লান্তভাবে **অবসা** অবস্ দিয়ে, 'অবস্' প্রসাদ, রক্ষণ, আগলে থাকা, grace, দয়া **অবন্তী** রক্ষা করে চলেছ, সমধাতুজ কর্ম করণ ইত্যাদি বেদের বিশেষত্ব। তোমাদের **অনু** অনুগত অনুচর **স্যাম** হতে চাই আমরা। **দেবানাম্ উভে** দেবতাদের মধ্যে তোমরা দুজনে **অহ্নাম্ উভয়েভিঃ** দিনের দুইভাগ দিয়ে অর্থাৎ দিনে-রাতে......।

৫॥ **সংগচ্ছমানে** ঐক্যবদ্ধ **সম্-অন্তে** সমান-সীমানা-যুক্ত **যুবতী** তরুণ-বয়স্ক **জামী স্বসারা** আপন দুটি ভাই-বোন **পিত্রোঃ উপস্থে** বাবা-মার কোলে **ভুবনস্য নাভিম্** সৃষ্টির কেন্দ্রকে **অভিজিঘ্রন্তী** আদরে শুঁকছ।...

ঋষির দর্শন ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। লৌকিক মা-বাবাকে ছাপিয়ে রয়েছেন পৃথিবী-মা এবং দ্যৌষ্পিতা। আবার তাঁদেরও ক্রোড়ীকৃত করে রয়েছেন তাঁদের মা-বাবা—অদিতি আর বরুণ, অখণ্ডিত অসীম অনন্ত ব্যাপ্তি (বৃ—ছেয়ে থাকা) —One Infinite Indivisible Pervasion. সেই অসীম-অসীমার কোলে

বসে দ্যাবাপৃথিবী সৃষ্টি-শিশুটিকে আদর করছেন তার নাভি শুঁকে শুঁকে—সৃষ্টিতত্ত্বের তিনপুরুষের সহজ ছবি।

৬॥ 'ঋতেন' উভয়ান্বিত। **সু-প্রতীকে** সুন্দর দেখতে তু. দর্শত-শ্রী, রণ্ব-সন্দৃক্ **যে** যে দুজন **অমৃতম্ দধাতে** অমৃতকে ধারণ করে আছেন সেই **উর্বী** বিশাল **সদ্মনী** সর্বাধার **ঋতেন বৃহতী** ঋতে বর্ধমান **জনিত্রী** জনক-জননীকে **দেবানাম্ অবসা** দেবতার দয়া যাতে পাই সেইজন্য, হেতুতে তৃতীয়া **ঋতেন** সত্যমন্ত্র দিয়ে **হুবে** আহ্বান করি।...

৭॥ **অস্মিন্ যজ্ঞে** এই যজ্ঞে **নমসা** প্রণতি দিয়ে **উপ ব্রুবে** কাছে এসে বলি, প্রার্থনা করি, স্তব করি তাঁদের যাঁরা **উর্বী** বিশাল **পৃথ্বী** বিস্তীর্ণ **বহুলে** কতরকম **দূরে-অন্তে** দূর-সীমানা। **যে** যাঁরা দুজন **সুভগে** সু-ভগা প্রেম-সৌন্দর্য-আনন্দের প্রতিমূর্তি **সু-প্র-তূর্তী** অনায়াসে বিজয়ী তু. বিশ্বতূর্তি< √তুর্ব্—পরাভূত করা **দধাতে** সব কিছুকে ধারণ পোষণ করেন।...

৮॥ **সদম্ ইত্** সবসময়ই **যত্ কত্ চিত্** যা কিছু, কিম্-শব্দের ক্লীবে কত্-রূপটি লক্ষণীয় **আগঃ** দোষ **চকৃম** করেছি আমরা **দেবান্ বা** হয় দেবতার কাছে **সখায়ম্ বা** না হয় বন্ধুর কাছে **জাস্-পতিম্ বা** কিম্বা কুলের যিনি প্রধান তাঁর কাছে, **ইয়ম্ ধীঃ** এই ধ্যান-সম্ভূত স্তব **এষাম্** এই সব দোষের **অবযানম্** প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ **ভূয়াঃ**=ভূয়াত্, হোক, এই প্রার্থনা, আশীর্লিঙ্ ২।১।...

৯॥ **উভে** উভয়ে **নর্যা** নরের পক্ষে হিতকর, মানুষের বন্ধু, তু. জন্য ২।৬।৭ **শংসা** √শংস্-চাওয়া> (মানুষের) ভালো চান যাঁরা, তাঁরা **মাম্** আমাকে **অবিষ্টাম্** রক্ষা করুন √অব্+লুঙ্ ৩।২। **উভে** উভয়ে **ঊতী** ঊতি-স্বরূপিণী <অব্+ক্তিন্ দয়া grace কৃপা-র বিগ্রহ **অবসা** দয়া দিয়ে **মাম্** আমাকে **সচেতাম্** জড়িয়ে ধরুন √সচ্—সক্ত হওয়া, লগ্ন হওয়া। **অর্যঃ** অ-রি অর্থাৎ যে দেয় না [আমিই সেই দীন কৃপণ] তাকেও, কর্মে ষষ্ঠী **সুদাস্-তরায়** যিনি আরো দেন, প্রচুর দেন, তাঁর উদ্দেশে **চিত্** প্রশংসা-বোধক অব্যয়, **দেবাঃ** হে দেবতারা **ইষা মদন্তঃ** এষণায় মেতে **ইষয়েম** চাইব আমরা, স্বার্থে ণিচ্।

১০॥ **সুমেধাঃ** সুমেধা আমি **অভি-শ্রাবায়** সবাইকে শুনিয়ে **দিবে পৃথিব্যৈ** দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশে **তত্** সেই অর্থাৎ এই **প্রথমম্** প্রথম, অ-পূর্ব

ঋতম্ সত্যমন্ত্র **অবোচম্** বললাম। **পিতা মাতা চ** পিতা দ্যৌ এবং মাতা পৃথিবী **অভীকে** কাছে এসে **অবদ্যাত্** মলিনতা থেকে **দুঃ-ইতাত্** কুপথে গমন থেকে **পাতাম্** বাঁচান **অবোভিঃ** অজস্র দয়া দিয়ে **রক্ষতাম্** রক্ষা করুন। তু. তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে (পূজা ৪৮৮)

১১॥ **পিতঃ মাতঃ দ্যাবাপৃথিবী** হে পিতা মাতা দ্যাবাপৃথিবী **বাম্** তোমাদের দুজনের কাছে **যত্ ইহ** এই যে **উপ-ব্রুবে** প্রার্থনা করছি, তা **সত্যম্ অস্তু** সত্য হোক। **অবোভিঃ** দয়া করে **দেবানাম্** দেবতাদের মধ্যে **অবমে** সবচেয়ে নিচে, অর্থাৎ আমাদের সবচেয়ে কাছে **ভুতম্** হও। **ইষম্** তীব্র চাওয়াকে **বৃজনম্** √বৃজ্ >বেঁকিয়ে দেওয়ার বিপুল শক্তিকে **জীর-দানুম্** ক্ষিপ্র-দান শীঘ্র-দ দেবতাকে **বিদ্যাম্** পেতে চাই আমরা।

৫। ঋষি ভৌম অত্রির পর্জন্য-সূক্ত

ভৌম অত্রির পৃথিবী-সূক্তের ভাষ্য-ভূমিকা দ্রষ্টব্য। দশ ঋকের সূক্তের এটি আংশিক অনুবাদ। পর্জন্য শব্দের অর্থ ভূমিসূক্তের দ্বাদশ ঋকে দ্রষ্টব্য।

১॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। **কনিক্রদত্** ডাক দিতে দিতে √ক্রন্দ্+যঙ্লুক্+শতৃ+১।১ **জীর-দানুঃ** শীঘ্র-দান, যার দান সর্বত্র এনে দেয় প্রাণচাঞ্চল্য **বৃষভঃ** বর্ষণকারী, বৃষভতুল্য পর্জন্য **ওষধীষু** গাছপালাতে **রেতঃ গর্ভং দধাতি** প্রাণবীজকে গর্ভরূপে নিহিত করছেন। 'তণ্ডুলান্ ওদনং পচতি'-র মতো প্রয়োগ। বর্ষার ধারাসারে ওষধীর প্রাণবীজ। প্রাণ পেয়ে বেঁচে উঠছে, চারায় চারায় গজিয়ে উঠছে গাছপালা।

২॥ ছন্দ জগতী। **বৃক্ষান্** গাছগুলোকে **বি হন্তি** আঘাতে আঘাতে আলাদা করে ফেলছে, ভাঙছে **উত** এবং **রক্ষসঃ** রাক্ষসদের **হন্তি** মারছে। **মহা-বধাত্** মহা বিনাশ আনছে যে পর্জন্য বা বধ-সাধনের মহাস্ত্র যার হাতে তার থেকে, তাকে **বিশ্বম্ ভুবনম্** সমস্ত ভুবন **বিভায়** ভয় পাচ্ছে।

৩॥ ছন্দ জগতী। **যত্** যখন **পর্জন্যঃ** পর্জন্য **নভঃ** আকাশকে **বর্ষ্যম্**

বর্ষাব'-বর্ষার' **কৃণুতে** করে তোলেন, তখন **দূরাত্** দূরে **সিংহস্য** সিংহের, মেঘের—সায়ণ **স্তনথাঃ** মুহুর্মুহু গর্জন **উদ্ ঈরতে** ওঠে।

৪॥ ছন্দ জগতী। **বাতাঃ** হাওয়ারা **প্র বান্তি** বেগে বইছে। **বিদ্যুতঃ** একের পর এক বিদ্যুৎ **পতয়ন্তি** ছুটছে পড়ছে, স্বার্থে ণিচ্। **ওষধীঃ** ওষধিরা **উত্ জিহতে** উঠছে √হা (হ্বাদি)+১.৩। **স্বঃ** আকাশ, অন্তরিক্ষ **পিন্বতে** ফুলে উঠছে, উপচে পড়ছে।

৮॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। হে পর্জন্য, তোমার **মহান্তম্ কোশম্** মহান্ আধারটিকে **উত্ অচ** ('অচা' সংহিতায় দীর্ঘ) ওপরে তোলো √অঞ্চ্—গতি > অন্তর্ভূত-ণ্যর্থ **নি সিঞ্চ** নিচে ঢালো। **বি-সিতাঃ** ১) √সি-বাঁধা > মুক্তবন্ধন ২) √স্যন্দ্—বওয়া > দিকে দিকে প্রবাহিত **কুল্যাঃ** জলধারা-রা **পুরস্তাত্ স্যন্দন্তাম্** বয়ে এগিয়ে যাক। **ঘৃতেন** জল দিয়ে **দ্যাবাপৃথিবী** দ্যুলোক-ভূলোককে **বি-উন্ধি** ভালো করে ভিজিয়ে দাও √উন্দ্—ভেজানো। **অঘ্ন্যাভ্যঃ** যারা অহননীয়া সেই গোরুদের জন্য **সু-প্র-পানম্** ভালোভাবে প্রচুর পানীয় জল **ভবতু** হোক।

৯॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্। **পর্জন্য** হে পর্জন্য **কনিক্রদত্** গর্জন করতে করতে **স্তনয়ন্** বজ্রধ্বনি করতে করতে **যত্** যখন **দুষ্কৃতঃ** দুষ্কৃতকারীদের **হংসি** আঘাত হান, তখন **পৃথিব্যাম্ অধি** পৃথিবীতে **যত্ কিম্ চ** যা কিছু আছে **ইদম্ বিশ্বম্** এই সব **প্রতি মোদতে** তাতে নন্দিত হয়।

৬। ঋষি অথর্বার বৃষ্টি-সূক্ত

বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে অথর্ববেদ বৈদিকসাহিত্যে অনন্য। ঋগ্বেদে প্রায় অনুরূপ বৈচিত্র্য থাকলেও দৈবতসূক্তের বাহুল্যে তার চেহারা তত স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে না, অন্তত প্রথম পাঠকের কাছে। কিন্তু অথর্ববেদ হাতে ধরা মাত্রই সমস্বরে কথা কয়ে ওঠে জ্যেষ্ঠ ব্রহ্ম থেকে সুরু করে কনিষ্ঠতম তৃণটি পর্যন্ত। 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা, পূর্ণের পদপরশ তাদের পরে'—এরই জলন্ত উদাহরণ অথর্ববেদ। অথর্ববেদের বুকখানি

আলো করে জলছেন হিরণ্যবক্ষা অদিতি মা পৃথিবী। এই ভূমিসূক্তটিকে মধ্যমণি করে গাঁথা অথর্ববেদের ধূল-মাণিকের হার। অথর্ব-পৃথিবীর ওপর দিয়ে চলেছে অজস্র মানুষের, দেবতার, কামনার, ভাবের, দৃশ্যের মিছিল। চলেছে রাজা, চলেছে ব্রহ্মচারী-ছাত্র দেব দেবতার আসন টলিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দাপিয়ে কাঁপিয়ে, চলেছে বিদ্রোহী বেপরোয়া ব্রাত্য। চলেছে কৃষক, চলেছে বণিক, চলেছে নিশীথরাতে গোপন অভিযানে সপত্নীমর্দনী ওষধি তুলতে স্বামিসোহাগকামিনী সুচরিতা সুললিতা প্রত্যাখ্যানভয়ঙ্করী কুলবধূ।

অথর্ববেদ যেন ভবের মেলা। একদিকে তার রব উঠছে—পুষ্টি দাও, স্বাস্থ্য দাও, স্বস্তি দাও, বিজয় দাও, সাপের বিষ ঝেড়ে দাও, কুস্বপনের দোষ কাটাও, সারাও কুষ্ঠ, সারাও তক্মা, সারাও যক্ষ্মা, মাথাভর্তি চুল হোক, ভালয়-ভালয় খোকা হোক। অথর্ববেদেনী তাদের কাছে বেচছে জড়িবুটি কবচতাবিজ ওষুধপালা।

আর একদিকে বাউল বসে গাইছে শোনো দেহতত্ত্বের গান—

> অচিনপুরী আটটি চাকা নয়টি দরোজা,
> দেবপুরী সে ব্রহ্মপুরী যায় না তারে বোঝা।
> আলোয় ঢাকা সোনার কুঠরী তার ভিতরে ভায়,
> যে জানে সেই পুরীর খবর পুরুষ বলে তায়।

(দ্র. অথর্ববেদ ১০।২।৩০-৩২)

ভবের মেলা চলে। অথর্ব-ঠাকুমার অক্ষয় ঝুলি ফুরোয় আর ভরে। কালচক্র ঘোরে। গ্রীষ্মো হেমন্তঃ শিশিরো বসন্তঃ শরদ্ বর্ষাঃ (ঐ ৬।৫৫)। বিদ্যুৎ চমকায়, মেঘ গর্জায়, ঝড় ওঠে, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের পর দ্যুলোক ভূলোক অন্তরিক্ষ ছেয়ে নেমে আসে

শান্তি শান্তি শান্তি
বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি।

সেই আনন্দধারাপ্লাবিতা অজগরী-নির্ঝরিণী-মাল্যভূষিতা অনন্তপ্রসবিনী মহানন্দা মেঘলা পৃথিবীর প্রতিকৃতি এঁকেছেন মহাকবি ঋষি অথর্বা তাঁর বৃষ্টিসূক্তে।

১॥ ছন্দ জগতী। **নভস্-বতীঃ** জোলো বাষ্পে ভরা, বৈদিক প্রথমা বহুবচন (বা ছন্দসি পা ৬।১।১০৬) **প্রদিশঃ** দিক্-বিদিক্ **সম্ উত্ পতন্তু** একসঙ্গে উড়ুক। **বাত-জূতানি** বায়ু-প্রেরিত < √জূ (জবতে, জূনাতি)—

ঠেলা দেওয়া, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া **অভ্রাণি** মেঘেরা **সম্ যন্তু** মিলিত হোক। **নদতঃ মহ-ঋষভস্য নভস্বতঃ** শব্দ-কারী মহাবৃষভরূপী মেঘের **বাশ্রাঃ আপঃ** ধেনু-রূপিণী জলধারারা **পৃথিবীম্ তর্পয়ন্তু** পৃথিবীকে তৃপ্ত করুক।

২॥ ছন্দ জগতী। **তবিষাঃ** মহা-বল **সু-দানবঃ** সুদানু, অকৃপণদান, বহুবচন বিশেষণ দুটি থেকে বিশেষ্য মরুদ্‌গণ সহজেই অনুমেয়। **সম্ ঈক্ষয়ন্তু** একসঙ্গে দেখা দিন < √ঈক্ষ্+ণিচ্+লোট্ ১।৩ নিজেদেরকে দেখান। **অপাং রসাঃ** জলের সারভাগ **ওষধীভিঃ** ওষধিদের সঙ্গে **সচন্তাম্** মিশে যাক। **বর্ষস্য সর্গাঃ** বর্ষার বর্ষণ **ভূমিম্** মাটিকে **মহয়ন্তু** আনন্দে মাতাক< √মহ্—নন্দিত করা। **বিশ্বরূপাঃ ওষধয়ঃ** যতরকমের গাছপালা সব **পৃথক্** নানাভাবে **জায়ন্তাম্** গজাক।

৩॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। **গায়তঃ** যার মনটা সবসময় গুনগুন করছে সেই গায়কদের, কবিদের, আমাদের **নভাংসি** মেঘরাশি **সম্ ঈক্ষয়স্ব** দেখাও।

তু. But God has a few of us
whom he whispers in the ear
The rest may reason and welcome :
'tis we musicians know
(Abt Vogler, Robert Browning, OBMV)

আবার 'গায়তঃ' যারা গান গাইছে তাদের। অর্থাৎ মেঘ দেখতে দেখতে গান গেয়ে উঠছি আমরা কবিরা, আমাদের আরো দেখাও, আরো গান জাগুক। **অপাং বেগাসঃ** জলের তোড় **পৃথক্** নানা দিকে **উত্ বিজন্তাম্** উৎসারিত হোক। তৃতীয়-চতুর্থ পঙ্‌ক্তি পূর্বঋকের পুনরাবৃত্তি।

৪॥ ছন্দ পুরস্তাদ্ বৃহতী। দ্র. ভূমিসূক্ত ৫৮শ ঋক্। **পর্জন্য** হে পর্জন্য **ঘোষিণঃ মারুতাঃ গণাঃ** নির্ঘোষকারী মরুদ্‌গণেরা **পৃথক্** একে একে প্রত্যেকে **ত্বা উপ গায়ন্তু** তোমার কাছে, উদ্দেশে বা সঙ্গে গান করুক, দোহার দিক। **বর্ষতঃ বর্ষস্য** বর্ষণকারী বৃষ্টির **সর্গাঃ** ধারা **পৃথিবীম্ অনু বর্ষন্তু** পৃথিবীর ওপর ঝরে পড়তে থাকুক।

৫॥ ছন্দ জগতী। 'ত্বেষো অর্কঃ' এই অংশটির অন্বয় এবং ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। সায়ণ এখানে দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা ধরে নিয়ে পদ দুটিকে নভঃ-র বিশেষণ করে অর্থ করেছেন দীপ্তিমদ্ (ত্বেষঃ) উদকম্ (অর্কঃ) তদ্‌যুক্তং

নভঃ, অর্থাৎ উজ্জ্বল-জল-যুক্ত বাষ্পকে। কিন্তু মরুদ্‌গণের **অর্ক** অর্থাৎ গান (গানের সূর্য) বেদে প্রসিদ্ধ। সুতরাং 'ত্বেষো অর্কঃ' অংশটিকে এই বাক্যের সঙ্গে অনন্বিত অথচ বাক্যমধ্যে উপন্যস্ত একটি আকস্মিক বিস্ময়োক্তি ধরে নিলে বিভক্তির অদলবদল ছাড়াই অর্থ সুসঙ্গত হয়। Whitney-র 'brilliant is the song' অনুবাদটি এক্ষেত্রে সায়ণের ব্যাখ্যার চেয়ে অধিকতর গ্রাহ্য মনে হয়।

'নভঃ' শব্দটিকে ব্যাখ্যাতারা একটি অর্থেই নিয়েছেন—বাষ্প, জলকণা, vapour, mist। পদটিকে শ্লিষ্ট ধরলে আর একটি অর্থও আসে—আকাশে। তাহলে 'নভ উৎপাতয়' এই অংশটির অর্থ হবে 'বাষ্পকে আকাশে ওড়াও'।

মরুতঃ হে মরুদ্‌গণ **সমুদ্রতঃ** সমুদ্র থেকে **নভঃ** বাষ্পকে **উত্‌ ঈরয়ত** উর্ধ্বে প্রেরণ কর **নভঃ** আকাশে **উত্‌পাতয়াথ** ওড়াও উত্‌—√পত্‌+ণিচ্‌+লেট্‌ ২।৩। তৃতীয়-চতুর্থ পঙ্‌ক্তি প্রথম ঋকের মত।

৬॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্‌। **পর্জন্য** হে পর্জন্য **অভি ক্রন্দ** উদ্দেশে ডাক দাও, **স্তনয়** বজ্র-স্বরে গর্জন করো, **উদধিম্‌** সমুদ্রকে **অর্দয়** তোলপাড় করো **ভূমিম্‌** মাটিকে **পয়সা** জল দিয়ে **সম্‌ অঙ্‌ধি** সম্যক্‌রূপে অঞ্জনবৎ লেপে দাও √অঞ্জ্‌+লোট্‌ ২।১। **ত্বয়া সৃষ্টম্‌** তোমার ঢালা **বহুলম্‌ বর্ষম্‌** প্রচুর বর্ষণ **আ-এতু** আসুক। **আশার-এষী** শরণেচ্ছুক **কৃশ-গুঃ** ক্ষীণরশ্মি [সূর্য] **অস্তম্‌** বাড়ি **এতু** যাক।

মহাসমুদ্র মন্থন করে উঠছে কুণ্ডলীকৃত রাশি রাশি মেঘ। মুহুর্মুহু বজ্রনির্ঘোষে কম্পিত হচ্ছে দিগ্‌দিগন্ত। ধারাসম্পাতস্নিগ্ধ ঘনকৃষ্ণ মাটিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন নিবিড়কজ্জললিপ্ত দিগ্‌দিগন্তটানা সহস্র নয়ন মেলে সে তাকিয়ে আছে তার দিব্য বরেণ্য অতিথি পর্জন্যের পানে। ভুবনদহন সূর্যের প্রতাপ মেঘের আড়ালে লুপ্ত। কৃশ গো অর্থাৎ ক্ষীণ কিরণগুলি কোনমতে গুটিয়ে-সুটিয়ে সে এখন খুঁজছে আশার, আশ্রয় (সায়ণের ব্যাখ্যাই এখানে কাব্যসম্মত এবং যুক্তিযুক্ত। Whitney-র 'অল্প গরু নিয়ে শরণার্থী রাখাল ঘরে যাক' রুচিকর নয়)। শেষ হল তার দিন। সে তবে এখন অস্ত যাক। সূর্যহীন আকাশ-পৃথিবী জুড়ে সুরু হোক পর্জন্যের মহোৎসব। তারি আবাহন মহাবরষার প্রমত্ত মণ্ডূক পর্জন্যাবিষ্ট ঋষি অথর্বার কণ্ঠে।

৭॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্‌। **সুদানবঃ** সু-দানু মরুতেরা **বঃ** তোমাদের **সম্‌ অবন্তু**

একযোগে, সম্যক্‌রূপে পালন করুন, **উত** এবং **অজগরাঃ উত্‌সাঃ** অজগর-বৎ নির্ঝরিণীরাও। **মরুদ্‌ভিঃ** মরুদ্‌গণের দ্বারা **প্রচ্যুতাঃ** চালিত **মেঘাঃ** মেঘেরা **পৃথিবীম্‌ অনু** পৃথিবীর ওপরে **বর্ষন্তু** বর্ষণ করুক।

গ্রীষ্মের দাবদাহদগ্ধ ধরিত্রীর মাটি মানুষ গাছপালা পশুপক্ষী সবার দিকে তাকিয়ে ঋষি বলছেন, এবার তোমরা বাঁচবে। এসেছে সু-দানু মরুতেরা তাদের দান উজাড় করে ঢেলে দিতে। উপত্যকা বেয়ে উদ্দাম বেগে ধেয়ে আসছে সহস্র অজগরীর মত নির্ঝরিণীরা, শষ্পে শস্যে পত্রে পুষ্পে ভরে তুলতে শ্যামল ধরণীর দগ্ধ বুক। মরুদ্‌গণের তীব্র ঝোড়ো নাড়া খাওয়া মেঘেরা বর্ষাতে বর্ষাতে নেমে আসছে অন্তরিক্ষের সিঁড়ি বেয়ে। শেষ জলবিন্দুটি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর ওপর অবিরলধারে বর্ষণ ঢেলে যাবে তারা।

'মরুদ্‌ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘাঃ .....পৃথিবীম্‌ অনু'—এটি হল ৭-৯ এই তিনটি ঋকের ধুয়া—বর্ষন্তু, সং যন্তু আর প্রাবন্তু এই তিনটি ধাতু দিয়ে তিনবার তিন-রকম করে বাজিয়ে তোলা। বর্ষন্তু—বর্ষণ করুক। সং যন্তু—একজোট হয়ে আসুক। প্রাবন্তু—অনুকূল হোক, প্রসাদ দিক। তিনটি ঋকের অন্তিম শব্দ 'অনু' (নিরন্তর) যেন অবিশ্রান্ত বর্ষার রিমিঝিমির মতো একটি একটানা নেপথ্যসঙ্গীতের আবহ সৃষ্টি করেছে।

৮॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্‌। **আশাম্‌-আশাম্‌** দিকে দিকে **বি দ্যোততাম্‌** বিদ্যুৎ চমকাক, **দিশঃ দিশঃ** দিক হতে দিকে **বাতাঃ** বায়ু-রা **বান্তু** বয়ে যাক।

৯॥ ছন্দ পঙ্‌ক্তি। **আপঃ** জল **বিদ্যুত্‌** বিদ্যুত্‌ **অভ্রম্‌** মেঘ **বর্ষম্‌** বারিধারা......বাকি অংশ ৭ম ঋকের মত।

সুদানু শব্দটি এখানে যেমন মরুদ্‌গণের দ্যোতক, তেমনি জল, বিদ্যুৎ, মেঘ, বারিধারারও বিশেষণ। সমস্ত প্রকৃতিই আজ সুদানু, উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছে তার অজস্র সম্পদ্‌ গ্রহিষ্ণু উন্মুখ উৎসুক পৃথিবীর কাছে। এ তো শুধু বর্ষা নয়—এ এক অপরূপ দেওয়া-নেওয়ার খেলা।

১০॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্‌। **যঃ অগ্নিঃ** যে-অগ্নি **অপাম্‌ তনূভিঃ** জলের তনু-গুলির সঙ্গে **সংবিদানঃ** মিলে-মিশে **ওষধীনাম্‌ অধিপা** ওষধিদের রাজা **বভূব** হয়েছেন, **সঃ জাতবেদাঃ** সেই জাতবেদা অগ্নি **নঃ** আমাদের জন্যে **প্রজাভ্যঃ** আমাদের সন্তানদের জন্যে **দিবস্‌ পরি** দ্যুলোক হতে **অমৃতম্‌ প্রাণম্‌ বর্ষম্‌**

অমৃতস্বরূপ প্রাণস্বরূপ বৃষ্টি **বনুতাম্** জয় করে আনুন √বন্ (তনাদি)—জয় করা win।

সাধারণ বুদ্ধি দেখে, জলে-আগুনে নিত্য বিবাদ। ঋষিকবি তাঁর বিজ্ঞান-দৃষ্টি মেলে দেখছেন, জলে-আগুনে নিত্য মিতালি। জলের যত তনু, যত শরীর, যত বিচিত্র রূপ আছে, প্রতিটির সঙ্গেই নিত্যসঙ্গত হয়ে রয়েছে অগ্নি। অগ্নির তেজস্ক্রিয়া জলকে করে তুলছে অনন্তবীর্যা সৃষ্টিধরী। দুয়ে মিলে গড়ে তুলছে বিচিত্র বৃক্ষলোক। তাই অগ্নি হলেন 'ওষধীনাম্ অধিপা'—ওষধিদের রাজা। সেই অগ্নি, যিনি নিখিল চরাচরের প্রতিটি অণুর জন্মরহস্য জানেন বলে জাতবেদা, তাঁর কাছে ঋষির প্রার্থনা—সমস্ত বাধা জয় করে আমাদের জন্যে দ্যুলোক থেকে নিয়ে এস নবজীবন-রসায়ন বৃষ্টি। তাইতে বাঁচব আমরা, আমাদের সন্ততিরা। সৃষ্টির অঙ্কুরে জীবনপৃথিবী ভরে-তোলা মহামৃত্যুঞ্জয় সেই তো প্রত্যক্ষ অমৃত।

১১॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। **প্রজাপতিঃ** প্রজাপতি **আ সলিলাত্ সমুদ্রাত** চারিদিকে-জল সমুদ্র থেকে **আপঃ** জল **ঈরয়ন্** চালিত করে **উদধিম্** সমুদ্রকে **অর্দয়াতি** তোলপাড় করুন √অর্দ্+ণিচ্+লেট্ ৩।১। **বৃষ্ণঃ অশ্বস্য** বর্ষক ব্যাপক ঋষভতুল্য অশ্বতুল্য মেঘের **রেতঃ** *সৃষ্টিসামর্থ্য* **প্র প্যায়তাম্** প্রকৃষ্ট পরিমাণে বাড়ুক। **এতেন স্তনয়িত্নুনা** এই গর্জনকারী মেঘের সঙ্গে **অর্বাক্** নিচে **এহি** এস।

একের মধ্যেই সব, বিন্দুর মধ্যেও সিন্ধু—এই বিশ্বদৃষ্টি বৈদিক ঋষির মজ্জাগত। যে-কোন ভাব, যে-কোন ঘটনা তাঁর কাছে কোনো বিচ্ছিন্ন একক ভাব বা ঘটনা নয়—নিখিল প্রক্রিয়ার একটি অংশ, যার মধ্যে ধরা পড়ছে, ধরা দিচ্ছে সমগ্র। বৃষ্টির মধ্যে লৌকিক চোখ দেখে প্রকৃতির খেলা, ঋষির চোখ দেখে প্রকৃতিপুরুষের অর্ধনারীশ্বর লীলামূর্তি। মেঘ শুধু 'ধূমজ্যোতিঃসলিল-মরুতাং সন্নিপাতঃ' (একটু ধোঁয়া একটু আলো খানিকটা জল খানিক বা') নয়, সে পর্জন্য-মরুতের লীলাসহচর, নটরাজের নৃত্যদিগঙ্গনে সে তাল-মাতাল মৃদঙ্গবাদক। বৃষ্টি নয় শুধু প্রকৃতির ঋতুগত যান্ত্রিক কার্যকারণসংঘাত, মুমূর্ষু মৃতা পৃথিবীর সর্বাঙ্গে সে হল দেবতার অমৃতবর্ষণ। আর এই বর্ষণে শুধু যে পর্জন্য এবং মরুদ্‌গণেরই একচেটিয়া ভূমিকা তা নয়—এতে অনায়াসে যোগ দিয়েছেন অগ্নি, প্রজাপতি, বরুণ সবাই, কেননা তাঁরা সেই প্রকৃতিসখা প্রকৃতি-

শরীর পরমপুরুষেরই এক-একটি নামরূপ। দেবতাতিসিদ্ধ (সবই দেবতা এই উপলব্ধি যাঁর কাছে সহজ) ঋষি তাঁর অনন্তাবগাহী মনের পটে যে-কোন দেবতাকে মূর্তি দিতে পারেন যখন খুশি, যেমন খুশি, যে-কোন প্রসঙ্গে, যে কোন ভূমিকায়। 'যা তেনোচ্যতে সা দেবতা'—ঋষি যা বলেন, যা রচেন, দেবতা তা-ই। ঋষির শুদ্ধ মনোভূমিই দেবতার জনমস্থান।

বৃষ্টি দিয়ে ভূমিকে অবন্ধ্যা, উৎ-শিলীন্ধ্রা (ব্যাঙের-ছাতা-জাগা) করে যে মেঘ, সে যেন আকাশজোড়া কোন বীর্যবর্ষী মহাতুরঙ্গ। 'অশ্ব' শব্দটি এখানে যৌগিকও বটে (√অশ্—ব্যাপ্তি>যা ছেয়ে রয়েছে অর্থাৎ মেঘ), আবার যোগরূঢ়ও বটে, অর্থাৎ ঘোড়া। 'বৃষন্' মানে বর্ষক। 'বৃষন্ অশ্ব' একযোগে অর্থ হল বীর্যবর্ষী মেঘতুরঙ্গ। আবার সে-বীর্যের উৎস হল এই ধরণীরই সমুদ্রজল। বিশ্ব-পালক প্রজাপতি সমুদ্রকে অর্দন করে, উথালপাথাল করে, সেই জল পাঠিয়ে দেবেন আকাশপানে, তাইতে পুষ্ট হবে কামধুক্ মেঘতরঙ্গের সৃষ্টিসম্পদ্। পঞ্চম ঋকে মরুদ্গণের যে ভূমিকা, এখানে প্রজাপতির তা-ই।

'স্তনয়িত্নু' বজ্রগর্জী মেঘ। 'এতেন' বিশেষণটি আমাদের একেবারে সেই মেঘমন্দ্রিত দিনটির মধ্যে সশরীরে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছে। 'এই যে মেঘ ডাকছে'—মেঘের গুরুগুরু ডমরুধ্বনির মাঝখানে বসেই সূক্ত উচ্চারণ করছেন ঋষি। ঐ মেঘের সঙ্গে সঙ্গে, হে দেবতা, তুমিও 'হেথায় এস নেমে'—এই হল তাঁর প্রার্থনা।

১২॥ ছন্দ পঞ্চপদা অনুষ্টুব্‌গর্ভা ভুরিক্ ত্রিষ্টুপ্। **নঃ** আমাদের **পিতা** পালক রক্ষক **অসুরঃ বরুণ** অসুর হে বরুণ **অপঃ নিষিঞ্চন্** জল নিষেক করতে করতে **নীচীঃ অপঃ অব সৃজ** নিচের দিকে নিম্নধারায় জল ঢেলে দাও। **অপাম্** জলের **গর্গরাঃ** গর গর ধ্বনিকারী ঘূর্ণিগুলো **শ্বসন্তু** ফুঁসুক। **পৃশ্নি-বাহবঃ** ছিটছিট-বাহু-যুক্ত **মণ্ডূকাঃ** ব্যাঙেরা **ইরিণা অনু** ইরিণগুলির পাশে পাশে, ইরিণ শ্লিষ্ট ১) জলধারা ২) মরু, **বদন্তু** ডাক দিক।

বায়ু···মরুত্···পর্জন্য···প্রজাপতি···মেঘ সব একাকার হয়ে এবার যাঁর ছবি ফুটে উঠল, তিনি হলেন জগৎ-পিতা অসুর বরুণ। প্রাচীন বৈদিক ভাষায় অসুর দেবতারই নামান্তর। যিনি বিকিরণ করেন (√অস্—ক্ষেপণ, বিকিরণ) তাঁর জ্যোতি শক্তি প্রসাদ মহিমা মাধুর্য, তিনিই অসুর। মেঘতুরঙ্গের রশ্মি ধারণ করে সেই মহাসারথি অসুর বরুণই ঝরাচ্ছেন বৃষ্টিধারা—গর গর শব্দে

পাক খেতে খেতে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে ঝরণা, নদী, সমুদ্র। ঋষি বলছেন, থেমো না দেবতা, আরো ঢালো। কানায় কানায় ভরে যাক পুকুর নদী নালা দেহমনপ্রাণ। 'ইরিণ' অর্থাৎ 'কাল ছিল মরু, আজ জলধারা'-গুলির পাশে বসে পায়ে-ছিটছিটি আনন্দে ডগমগ ব্যাঙেরা গলা ফুলিয়ে ডাক দিক।

ছুটন্ত স্রোতের গরগর ধ্বনি কবির মনের মধ্যে বেজেই চলেছে। তার বহিঃপ্রকাশ দুবার সপ্তম ও নবম ঋকে অজগর-শব্দে, একবার এইখানে গর্গর-শব্দে।

অনুবাদ বিকল্প—দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির পরে—

ঘুরে ঘুরে ঘুরে
গর গর গর
ফুঁসুক ফুলুক।

ঋক্‌টি একটু এলোমেলো। বরুণ শব্দটি ছন্দের মধ্যে আসে না। অর্থের দিক থেকে বিন্যাস এইরকম—

অপো নিষিঞ্চন্নসুরঃ পিতা নঃ
বরুণ অব নীচীরপঃ সৃজ।
শ্বসন্তু গর্গরা অপাং
বদন্তু পৃশ্নিবাহবো
মণ্ডূকা ইরিণা অনু

১৩॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্‌। ঋগ্বেদে ঋষি বসিষ্ঠের বিখ্যাত মণ্ডূকসূক্তের (ঋ ৭।১০৩) আরম্ভ এই ঋক্‌টি দিয়ে। মণ্ডূকসূক্তরচনার ইতিহাস যাস্ক বলেছেন তাঁর নিরুক্তে—ঋষি বসিষ্ঠ বর্ষণকামনায় পর্জন্যের স্তব করেছিলেন। ব্যাঙেরা তাঁকে সানন্দে অনুমোদন করেছিল। তাদের সেই আনন্দধ্বনি শুনে বসিষ্ঠ তাদের স্তব করলেন (নিরুক্ত ৯।৬)।

বসিষ্ঠের এই মণ্ডূকস্তুতি থেকে ঋষি অথর্বা একটি-দুটি ঋক্ আত্মসাৎ করেছেন। এরকম আত্মীকরণের দৃষ্টান্ত বৈদিক-সাহিত্যে ভুরি ভুরি। ঋষিদের রচনার কপিরাইট ছিল না, সূর্যেরই মতো তা ছিল সর্বসাধারণের।

সংবত্‌সরম্‌ সারাটি বছর গর্তের মধ্যে শুয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে **মণ্ডূকাঃ** ব্যাঙেরা নীরবে তপস্যা করছিল বৃষ্টির জন্যে, যেন **ব্রাহ্মণাঃ ব্রতচারিণঃ** ব্রতধারী অস্থিচর্মসার মৌনী ব্রাহ্মণ। **শশয়ানাঃ** পদটি শ্লিষ্ট < √শ্বি—

শুকিয়ে যাওয়া, আবার √শী—শুয়ে থাকা। এখন বৃষ্টি নেমেছে। তাদের ব্রত শেষ। তাই মৌন ভেঙে সমস্বরে তারা ডাকছে **বাচম্ প্র অবাদিষুঃ**। পর্জন্যদেবতার কানে গিয়ে পৌঁছচ্ছে সেই হর্ষপ্রমত্তমণ্ডূকসূক্ত (মণ্ডূক = মন্দূক অর্থাৎ মত্ত—মুদিত)। মেতে উঠছেন তিনিও। √জিন্ব্—প্রীত করা। আবার মণ্ডূকদের ডাক পর্জন্যের দ্বারাই জিন্বিত বা প্রেরিত—এরকম অর্থও হয়। পর্জন্যের সাড়া পেয়ে, ছোঁয়া পেয়ে ডেকে উঠছে ব্যাঙেরা।

১৪॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্। এই ঋকৃটিও ঋগ্বেদের মণ্ডূকসূক্তের সংযোজনরূপে পরিগণিত হয়ে স্থান পেয়েছে খিল-অংশে। নিরুক্তকারও এটিকে উপনিবদ্ধ করেছেন প্রথম ঋকের ব্যাখ্যার পরেই।

মণ্ডূকি হে ব্যাঙী **উপ প্রবদ বর্ষম্** বর্ষার গান গাও **তাদুরি** হে তাদুরি **বর্ষম্ আ বদ** বর্ষাকে ঘোষণা কর।

বর্ষার আবাহনে মণ্ডূকের সঙ্গে মণ্ডূকীকেও যোগ দিতে বলছেন কবি—ব্যাঙ-ব্যাঙী মিলিতকণ্ঠে বর্ষামঙ্গল গাক। তাদুরী বা তদুরী > দাদুরী।

হ্রদস্য মধ্যে হ্রদের মধ্যে **চতুরঃ পদঃ বিগৃহ্য** চার পা ছড়িয়ে **প্লবস্ব** প্লবন করো। জল-টইটম্বুর হ্রদের মধ্যে কখনো লাফাচ্ছে, কখনো ভাসছে, কখনো আরামে চার পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে সাঁতার কাটছে ব্যাঙ অথবা ব্যাঙী—ভরা বর্ষার একটি অতিপরিচিত ছবি। একটিমাত্র √প্লু ধাতু দিয়ে লাফানো, ভাসা, সাঁতার কাটা, লম্বা হওয়া—এই চারটি কাজ সেরেছেন কবি। তিনিও যেন 'বিগৃহ্য চতুরঃ পদঃ' মহানন্দে ভাসছেন আকণ্ঠ-ভরা ভাষা-বর্ষার হ্রদে।

১৫॥ ছন্দ শঙ্কুমতী অনুষ্টুপ্। ঐ √প্লু-ধাতুরই টানে চলে এল দুটি প্লুতস্বর, সম্বোধনের সুদীর্ঘ টান—খণ্ণখা-আ-আ-ই, খৈমখা-আ-আ-ই, যেন হ্রদের ওপর দিয়ে দুলতে দুলতে চলে গেল শব্দতরঙ্গ দূরে বহুদূরে। খণ্ণখা, খৈমখা, এবং তাদুরী বা তদুরী—এগুলি হল এক এক জাতের স্ত্রী-ব্যাঙের নাম, বলছেন সায়ণ। খণ্ণখা এবং খৈমখা সম্বোধনে হয় **খণ্ণখে, খৈমখে**। প্লুত একারের উচ্চারণ করার সময় তাকে ভেঙে করা হয় প্লুত অ+ই।

'পিতরঃ' এখানে যৌগিক, যোগরূঢ় নয়। বর্ষা নামাবে ব্যাঙেরা, তা থেকে পৃথিবী হবে শস্যশালিনী, তাইতে বাঁচব আমরা। তাই ব্যাঙেরা পরোক্ষভাবে হল আমাদের পিতা অর্থাৎ পালয়িতা, রক্ষক। **মরুতাম্** মরুদ্গণের **মনঃ ইচ্ছত** মনকে বশ করো। **বর্ষম্** বর্ষাকে **বনুধ্বম্** জয় করো।

১৬॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। ঋগ্বেদের ঋষি অত্রির পর্জন্যসূক্তের একটি পঙ্‌ক্তির (ঋ ৫।৮৩।৮১) প্রতিধ্বনি করে সূক্তের উপসংহার করছেন কবি। 'মহান্তং কোশম্ উদ্ অচা নি ষিঞ্চ'—অত্রির এই পঙ্‌ক্তিটিতে শুধু নি-এর জায়গায় অভি বসাতেই ধরণীর অভিষেকের একটি ছবি ফুটে উঠল। বিপুল মেঘের মঙ্গলঘট থেকে বারি ঢালছেন পর্জন্য-মরুত্ ধরণীর শিরে। অভিষেক-উৎসবে চারিদিকে থেকে থেকে জ্বলে উঠছে বিজলী আলো সবিদ্যুতং ভবতু। আর্দ্র হাওয়ার চামর দুলছে দশ দিগ্বধূর কঙ্কণকিঙ্কিত হস্তে বাতু বাতঃ। জল ঝরছে তো ঝরছেই—বহুধা বিসৃষ্টাঃ—বিশেষ্য 'আপঃ' অধ্যাহার করে নিতে হবে। এই থৈ থৈ জলেই জ্বলবে যজ্ঞের আগুন যজ্ঞম্ ভবতাম্। শষ্পশস্যফলপুষ্পবতী পৃথিবী নিজেকে উৎসর্গ করবে ঊর্ধ্ব আকাশের পানে একটি স্নিগ্ধশ্যাম স্তবশিখার মতো। তার প্রমুদিতকলেবরের রোমহর্ষ অনন্ত ওষধি হয়ে ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিগন্তে আনন্দিনীঃ ওষধয়ঃ ভবন্তু।

৭। ঋষি অনিল বাতায়নের বাত-সূক্ত

ঋষির অনুভবের প্রগাঢ়তা অনুসারে ঋগ্বেদের ঋক্‌গুলিকে যাস্ক তিন ভাগে ভাগ করেছেন—পরোক্ষকৃতা অর্থাৎ দেবতা যেখানে আঁখির আড়ালে, প্রত্যক্ষকৃতা অর্থাৎ দেবতা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন আঁখির আগে, আর আধ্যাত্মিকী অর্থাৎ দেবতা যেখানে ঋষির সত্তার তন্তুতে তন্তুতে অনুপ্রবিষ্ট, প্রকটিত, আবির্ভূত, অর্থাৎ যেখানে ঋষি-দেবতা একাকার। এইসব আধ্যাত্মিক ঋকে ঋষির 'অহম্' হয়ে গেছে এক মহা-অহম্, দিব্য অহম, পরম অহম্, বিশ্ব-অহম্। যেমন রাজর্ষি ত্রসদস্যুর (অর্থাৎ দস্যুত্রাস) একটি মন্ত্র—

অহম্ ইন্দ্রো বরুণস্ তে মহিত্বা
উর্বী গভীরে রজসী সুমেকে।
ত্বষ্টেব বিশ্বা ভুবনানি বিদ্বান্ত্
সম্ ঐরয়ং রোদসী ধারয়ং চ (৪।৪২।৩)

ইন্দ্র বরুণ আমি।
আমি গভীর বিশাল অপরূপ সেই মহিমায় দুটি ভূমি।
ধরে আছি রোদসীকে।
জেনে স্রষ্টার মতো চালনা করছি নিখিল এ সৃষ্টিকে।

যে দেবতাত্মানুভূতির সাধনায় ব্যাপৃত থেকে ঋগ্বেদের ঋষিরা সূক্তকর হয়েছেন, তার পরম সিদ্ধি এই উজ্জ্বলতম ঋকৃগুলিতে ধরা রয়েছে।

এইসব ঋক্ ছাড়াও ঋষির দেবাহন্তা-র (দেব+অহম্+তা, অর্থাৎ আমিই দেবতা এই ভাব) চিহ্ন থেকে গেছে আর একটি জায়গায়, সেটি হল ঋষিনাম। ঋগ্বেদে, বিশেষ করে দশম মণ্ডলে, বহুত্র ঋষিনাম আর দেবতানাম এক অথবা প্রায়-এক। এর রহস্য কী? নতুন জন্মের অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে নতুন নাম নিতেন নবজাতক ঋষি? না, একটি বিশেষ অনন্ত-মুহূর্তে ঋষি অনুভব করতেন, আমার নামগোত্র সব অনেক আগে থেকেই পরমদেবতার একটি বিশেষ নামরূপের সুরে বাঁধা হয়ে পড়েছিল উপলব্ধির অপেক্ষায়। তার ছোঁয়া লাগামাত্র সেই নিষ্প্রাণ বর্ণরাশি রঙিন সুরে বেজে উঠল, আমার নাম হয়ে উঠল দেবতার, মহাদেবতার নাম! আমার নামাক্ষরে নেমে এল সেই অক্ষর অবর্ণ অবাঙ্মনসগোচর নিখিলের রাজাধিরাজ।

ঋষি অনিল বাতায়নের নামগোত্র এই শ্রেণীর। তাঁর দেবতা হলেন বাত অর্থাৎ হাওয়া অর্থাৎ প্রাণ। এই দেবতার—মৃদুমন্দ ধীরললিত সরসর মর্মর··· মূর্তি নয়—ঝোড়ো ভৈরব রূপ দেখেছেন এঁকেছেন হয়েছেন ঋষি। এ ঝড় বইছে শুধু বাইরে নয়, অন্তরেও। শুধু ঋষির অন্তরে নয়, নিখিলের অন্তরে। এ ঝড় রুদ্রদোলনে দোলাচ্ছে ঘুমন্ত সৃষ্টিশিশুর দোলনা। এ ঝড় মাতিয়ে তুলছে তার প্রাণসখী কারণসলিলকে সৃষ্টির উদ্দাম উল্লাসে। পুরোন সৃষ্টির জট-পড়া জটার বাঁধন খুলে খুলে প্রলয়নাচন নাচছে মত্তপ্রভঞ্জন তাণ্ডবনর্তন নটরাজ। এ ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতো উড়ে যাচ্ছে পুরোন জরানো জীর্ণ বিবর্ণ বিস্বাদ। যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে! যবে দুর্দম ঝড়ে আগল খুলে পড়ে কার সে নয়ন 'পরে নয়ন যায়গো ঠেকি, মহা-আপন সে কি! আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার পরাণসখা বন্ধু হে আমার!

এই ঝড় নবজন্মের নবযৌবনের নববসন্তের নতুন প্রাণের আদিম প্রাণের ঝড়, নিখিলের পরাণবঁধুয়া, সৃষ্টির চিত্রাঙ্গদা যাকে আহ্বান করে—

ওরে ঝড় নেমে আয় আয় আয় রে আমার
শুকনো পাতার ডালে······ —

রবীন্দ্রনাথের বর্ষশেষ কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, সেই সঙ্গে শেলীর 'পশ্চিম প্রভঞ্জনের প্রতি' (Ode to the West Wind)।

১॥ **বাতস্য রথস্য** বায়ুর রথের **মহিমানম্** মহিমাকে **নু** এখন······ বাক্যটি শেষ করতে না দিয়েই যেন হুড়মুড়িয়ে এসে পড়েছে ঝড়······**অস্য ঘোষঃ** এর নির্ঘোষ, ঝড় রথ এবং রথ-শব্দ তিনটিই এক, তিনে মিলে এক মহা-হুহুঙ্কার **রুজন্** ভাঙতে ভাঙতে **স্তনয়ন্** শব্দ করতে করতে **এতি** আসছে। **অরুণানি কৃণ্বন্** সব কিছু লাল করতে করতে **দিবি-স্পৃক্** আকাশ ছুঁয়ে **ভাতি** বিরাজ করছে।

২॥ **বি-স্থাঃ** বিশেষ বা বিবিধভাবে স্থিত পর্বত প্রভৃতি স্থাবর **বাতস্য অনু** বায়ুর অনুকূলে **সম্ প্র ঈরতে** একসঙ্গে চলেছে ঈর্+লট্ ১ ৩, **যোষাঃ সমনম্ ন** মেয়েরা যেমন সমনে—মেলায় উৎসবে, অভিসারে যায়, তেমনি করে **এনম্ আ গচ্ছন্তি** এর অর্থাৎ বায়ুর কাছে চলেছে। **তাভিঃ সরথম্** তাদের সঙ্গে একই রথে **সযুক্** যুক্ত সঙ্গত মিলিত বন্ধু হয়ে **অস্য বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা** এ নিখিল সৃষ্টির অধিরাজ **দেবঃ** জ্যোতির্ময় দেবতা **ঈয়তে** চলেছে।

৩॥ **অন্তরিক্ষে পথিভিঃ** অন্তরিক্ষের পথে পথে **ঈয়মানঃ** চলতে চলতে **কতমত্ চন অহঃ** কোনো দিনই **ন নি বিশতে** বিশ্রাম করে না। **অপাং সখা** জলের বন্ধু **ঋত-বা প্রথম-জা** ঋতবান্ প্রথম জাতক (দ্র. ভূমিসূক্ত ৬১) **ক স্বিত্** কি জানি কোথায় **জাতঃ** জন্মেছে **কুতঃ** কোথা থেকে, কেমন করে **আ বভুব** আভূত, চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়েছে।

৪॥ **দেবানাম্ আত্মা** দেবতাদের প্রাণ, আত্মা **ভুবনস্য গর্ভঃ** সৃষ্টির অঙ্কুর **এষঃ দেবঃ** এই দেবতা **যথা-বশম্** যেমন-ইচ্ছে √বশ্—চাওয়া wish **চরতি** বিচরণ করছেন। **অস্য** এঁর **ঘোষাঃ ইত্** শব্দই শুধু **শৃণ্বিরে** শোনা যায় **ন রূপম্** রূপ নয়। **তস্মৈ বাতায়** সেই বাতের উদ্দেশে **হবিষা** হবিঃ দিয়ে **বিধেম** অর্চনা করব আমরা।

৮। ঋষি ঐরম্মদ দেবমুনির অরণ্যানী-সূক্ত

রহস্যে-ভরা নিবিড় গভীর গহন মহা-বন, অরণ্যানী। সুরভি পশুমাতা অন্নপূর্ণা দেবী অরণ্যানী। স্বয়ং অভয়া, কিন্তু ভয়কারণসঙ্কুলা, 'ভেতরে তার ঢুকতে গেলে গা ছমছম করে'। স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে এই মহাদেবীর বর্ণনা-বন্দনা রচেছেন ঋষি ঐরম্মদ দেবমুনি। ইরম্মদ মানে বিদ্যুৎ, বজ্রানল। তাহলে তিনি কি বাণীর বিদ্যুৎদীপ্ত (দ্র. পৃ ৩০-৩১) ছন্দোবাণবিদ্ধ কোনো বনবাসী বা তপোবনবাসী দেবাবিষ্ট মুনি? বজ্রানলে বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা বনপথে চলেছেন অপূর্ব সন্ন্যাসী?

১॥ **অরণ্যানি অরণ্যানি** ওগো অরণ্যানী, অরণ্যানী, **যা অসৌ** যে-তুমি ঐ **প্র নশ্যসি ইব** যেন হারিয়ে যাচ্ছ, **কথা** কেন (কিম্+থাল্, থা হেতৌ চ ছন্দসি পা ৫।৩।২৬) **গ্রামম্** গ্রামকে **ন পৃচ্ছসি** চাইছ না, খুঁজছ না, কাউকে শুধোচ্ছ না কোথায় গ্রাম? অরণ্যানী যেন একটি বেপরোয়া ডাকা-বুকো মেয়ে, একলা চলেছে বনপথ দিয়ে। লোকবসতিহীন ঘন বনানীর তন্ময় বর্ণনা। **ত্বা** তোমাকে **ভীঃ** ভয় **ন বিন্দতি** পায় না **ইব** বুঝি? বাগ্‌ভঙ্গি লক্ষণীয়। আমরা ভয়কে পাই না, ভয়ই আমাদের পেয়ে বসে!

বিন্দতি-র শেষ ইকারটি বিতর্ক (অনুমান, সন্দেহ, পর্যালোচনা ইত্যাদি) বোঝাতে প্লুত অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক। অবসানে স্বরবর্ণ থাকলে সেটি অনুনাসিক হবে, এই হল অধিকাংশ আচার্যের মত। কিন্তু শাকল-সম্প্রদায়ে শুধুমাত্র অবসানে ত্রিমাত্রিক স্বরকেই অনুনাসিক উচ্চারণ করা হয় (ঋ প্রাতিশাখ্য ১.৬৩-৬৪):

'ইব' শব্দের অর্থ যাস্ক বলেছেন পরিভয় অর্থাৎ আশঙ্কা। মনে হয়, মৃদু আপত্তি, অননুমোদন, বিস্ময় ইত্যাদি সবই ইব-র দ্বারা উক্ত হচ্ছে। নানারকম অর্থে নিপতিত হয় বলেই এদের নাম নিপাত। এখানে ইব মানে বুঝি, বাপু, বটে, সেকি, আচ্ছা, ওমা ইত্যাদি অনেক কিছু।

২॥ **যত্** যখন **চিচ্চিকঃ** চিক-চিক শব্দকারী পোকা **বদতে বৃষারবায়** বৃষবত্ রব-যুক্ত শব্দরত প্রাণী—সায়ণ-মতে ঝিল্লি-র, (জনৈকা প্রত্যক্ষশ্রোত্রীর

মতে পাহাড়ী ঝিঁঝির ডাক ষাঁড়ের মতনই বটে) উদ্দেশে **উপ-অবতি** সায় দেয়, তখন মনে হয়, **অরণ্যানিঃ** অরণ্যানী, হ্রস্ব-ই বৈদিক, **ইব** যেন এমন কোন গায়ক, যে **আঘাটিভিঃ** আঘাটি কাণ্ডবীণা (সায়ণ), তৎসমূহের দ্বারা **ধাবয়ন্** √ধাব্—১) দৌড়ন, ২) ধোওয়া, সুরকে দৌড় করাচ্ছে বা স্বর শুদ্ধ করছে অর্থাৎ গলা সাধছে বা আলাপ করছে। সেই অরণ্যানী **মহীয়তে** মহিত মহিমান্বিত পূজিত হচ্ছেন, অর্থাৎ সেই অরণ্যানীর মহিমা গাই আমি।

৩॥ **উত ইব** মনে হচ্ছে যেন **গাবঃ** গোরুরা **অদন্তি** খাচ্ছে, **উত বেশ্ম ইব** মনে হচ্ছে যেন একটা বাড়ি **দৃশ্যতে** দেখা যাচ্ছে। **উতো ইব** আর মনে হচ্ছে যেন **সায়ম্** সন্ধেবেলা **অরণ্যানিঃ** অরণ্যানী **শকটীঃ** মাল-বওয়া গাড়ীগুলোকে **সর্জতি** উগরে চলেছে।

দিনের বেলা লোকে শকটী নিয়ে বনের মধ্যে ঢোকে কাঠ মধু ইত্যাদি সংগ্রহ করতে। সন্ধে হলে ফিরে আসে।

৪॥ **অঙ্গ** ঐ যে, ঐ শোনো, অয়্ **এষঃ** কেউ একজন **গাম্** গোরুকে **আ হ্বয়তি** ডাক দিচ্ছে। **অঙ্গ এষঃ** ঐ কে **দারু** কাঠ **অপ-অবধীত্** কাটল, চিরল। **সায়ম্** সন্ধেবেলা **অরণ্যান্যাম্** অরণ্যানীতে **বসন্** যে থাকে সে **মন্যতে** মনে করে **অক্রুক্ষত্** কেউ যেন চেঁচিয়ে উঠল √ক্রুশ্—চীৎকার করা। নানারকম পশুপাখির ডাক শুনে লোকটি ভয় পেয়ে মনে করবে চোর-ডাকাতের হা রে রে রে (দ্র. সায়ণ)।

৫॥ **অরণ্যানিঃ** অরণ্যানী **ন বৈ হন্তি** যোটেই মারেন না, **চেত্ন** যদি না **অন্যঃ** অন্য কেউ, বাঘ চোর প্রভৃতি—সায়ণ **অভিগচ্ছতি** সামনা-সামনি আসে। **স্বাদোঃ ফলস্য** কত স্বাদু ফল বন-ভরা, তার থেকে কিছু **জগ্ধ্বায়** খেয়ে-টেয়ে, বৈদিক অসমাপিকা ক্রিয়া ত্বা+য (ক্ত্বা+ল্যপ্!) **যথাকামম্** যেমন খুশি, তু. যথাবশম্ বাতসূক্ত ৪ **নি পদ্যতে** শুয়ে পড়ে দ্র. প্রাণসূক্ত ২৫।

৬॥ **আঞ্জন-গন্ধিম্** অঞ্জন অথবা অঞ্জন তৈরি হয় যা থেকে সেই কস্তুরী প্রভৃতির গন্ধ-যুক্ত **সুরভিম্** সুগন্ধি **অ-কৃষীবলাম্** কৃষীবল অর্থাৎ কৃষক-হীন **বহু-অন্নাম্** প্রচুর খাদ্যশালিনী, অন্ন-পূর্ণা **মৃগাণাম্ মাতরম্** পশু-মাতা **অরণ্যানীম্** অরণ্যানীকে **অহম্** আমি **প্র অশংসিষম্** প্রশংসা অর্থাৎ স্তব করলাম, করি।

৯। ঋষি বৈদর্ভি ভার্গবের প্রাণ-সূক্ত

বৈদিক ঋষি প্রাণের উপাসক, আনন্দের উপাসক। তাঁর জীবনের দর্শনের সাধনার কাব্যের স্থায়ী সুর হল প্রাণের আনন্দ। তাঁর দেবতা হলেন যুবা, বয়োধাঃ—চির-তরুণ, চির-তারুণ্যের দাতা। জীবনানন্দ তাঁর স্বভাব-ধর্ম; এই জীবনানন্দের যা চূড়ান্ত রূপ, বেদের ভাষায় তারি নাম অমৃত। অমৃত অর্থাৎ মৃত্যুহীন অন্তহীন ছেদহীন ভেদহীন চরাচরজোড়া বিপুল প্রাণের প্লাবনে একাকার হয়ে মিশে যাওয়ার, মিশে থাকার বিস্মিত নন্দিত পুলকিত স্নিগ্ধ প্রশান্ত অনুভূতি।

ঋষি বৈদর্ভি ভার্গবের প্রাণ-সূক্ত এই বিশ্বরূপ সর্বেশ্বর সর্বাধার প্রাণের দর্শন-বন্দন। ঋষি দেখছেন ওষধিতে ওষধিতে অঙ্কুরিত মুকুলিত মঞ্জরিত সহস্রশাখায়িত প্রাণ। পশুতে প্রাণ মানুষে প্রাণ দেবতায় প্রাণ। বজ্র প্রাণের নির্ঘোষ, বিদ্যুৎ প্রাণের চমকানি, বৃষ্টি প্রাণের আসার। এমন কি ব্যাধিও প্রাণ, মৃত্যুও প্রাণ। স ভূতো ভব্যং ভবিষ্যৎ—যা হয়েছে যা হচ্ছে আর যা হবে সমস্তই প্রাণ। একটি পা জলে ডুবিয়ে রেখে মহাকাশে পাখা মেলেছে সেই প্রাণ-হংস। নিজের আধখানি দিয়ে সৃষ্টি করছে বিশ্বভুবন, অন্য আধখানি ঢেকে রেখেছে অতল রহস্যের অন্ধকারে।

১॥ **ইদম্ সর্বম্** এই সব **যস্য বশে** যার ইচ্ছাধীন, যঃ যে **সর্বস্য** সবার **ঈশ্বরঃ ভূতঃ** প্রভু হয়েছে, **যস্মিন্** যাতে **সর্বম্** সব **প্রতিষ্ঠিতম্** প্রতিষ্ঠিত আছে, **প্রাণায়** সেই প্রাণকে **নমঃ** নমস্কার।

২॥ বিশ্বব্যাপী বিশ্বেশ্বর প্রাণের পর পাঁচটি ঋকে বর্ষারূপী প্রাণের দর্শন। **প্রাণ** হে প্রাণ **ক্রন্দায় তে** মেঘগর্জনরূপী তোমাকে **নমঃ** নমস্কার। **স্তনয়িত্নবে তে নমঃ** বজ্রগর্জনরূপী তোমাকে নমস্কার। **প্রাণ বিদ্যুতে তে নমঃ** হে প্রাণ, বিদ্যুৎ-রূপী তোমাকে নমঃ। **প্রাণ বর্ষতে তে নমঃ** হে প্রাণ, বর্ষণরূপী তোমাকে নমঃ।

মেঘ ডেকে উঠল, বিদ্যুৎ চমকাল, বাজ পড়ল, বৃষ্টি নেমে এল—ঋষি দেখলেন, সবই প্রাণ।

৩॥ **যত্** যখন **প্রাণঃ** প্রাণ **স্তনয়িত্নুনা** বজ্র-রবে **ওষধীঃ** গাছপালাদের **অভি-ক্রন্দতি** হাঁক পাড়ে, ডাক দেয়, তখন তারা **প্র বীয়ন্তে** নিষিক্ত হয়, √বী—গর্ভাধান (তু. বাং বিয়োনো ?) **গর্ভান্ দধতে** গর্ভ ধারণ করে **অথো** এবং তারপর **বহ্বীঃ** প্রচুর হয়ে **বি** বিবিধ বিচিত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে **জায়ন্তে** জন্মায়।

৪॥ **ঋতৌ আগতে** ঋতু এলে **যত্** যখন **প্রাণঃ** প্রাণ **ওষধীঃ অভি-ক্রন্দতি** পূর্ববৎ, **তদা** তখন **ভূম্যাম্ অধি** ভূমিতে **যত্ কিম্ চ** যা-কিছু আছে **সর্বম্** সব **প্র মোদতে** প্রমুদিত হয়।

৫॥ **যদা** যখন **প্রাণঃ** প্রাণ **মহীম্ পৃথিবীম্ অধি** বিশাল পৃথিবীর ওপর **বর্ষেণ অবর্ষীত্** বৃষ্টি দিয়ে বর্ষণ করে (বৈদিক বাগ্‌ভঙ্গি, সমধাতুজ করণ, তু. কী সাজে সেজেছ) **তত্** তখন **পশবঃ** পশুরা **প্র মোদন্তে** প্রমুদিত হয় এই ভেবে, **নঃ** আমাদের **মহঃ** শক্তি তাকত দাপট জোর **ভবিষ্যতি** হবে **বৈ** নিশ্চয়।

৬॥ **প্রাণেন অভি-বৃষ্টাঃ ওষধয়ঃ** প্রাণের দ্বারা বৃষ্টিসিক্ত ওষধিরা, জল-ক্রীড়ার ধ্বনি, প্রাণ যেন বৃষ্টির পিচকিরি দিয়ে নাইয়ে দিচ্ছে তার প্রিয়া ওষধিদের **সম্ অবাদিরন্** সমস্বরে বলছে, **নঃ** আমাদের **আয়ুঃ** আয়ুকে **প্র-অতীতরঃ বৈ** প্রতরণ করেছ, সব বাধা ঠেলে পার করে দিয়েছ, তৄ+ণিচ্+লুঙ্ ২।১, **নঃ সর্বাঃ** আমাদের সবাইকে **সুরভীঃ** সুরভি **অকঃ** করেছ, কৃ+লুঙ্ ২।১। বৃষ্টি-নাওয়া পৃথিবীর সোঁদা গন্ধ। দ্র. ভূমিসূক্ত ২৩-২৫।.

৭॥ বাকি সূক্ত 'প্রাণময় সমস্ত জগৎ' এই অনুভূতির উচ্চারণ। **আয়তে তে** যে-তুমি কাছে আসছ সেই তোমাকে **নমঃ** নমস্কার। **পরা-অয়তে তে নমঃ** যে-তুমি দূরে চলে যাচ্ছ, সেই তোমাকে নমস্কার। **প্রাণ** হে প্রাণ **তিষ্ঠতে তে নমঃ** যে-তুমি দাঁড়িয়ে আছ · **উত** এবং **আসীনায় তে নমঃ** যে-তুমি বসে আছ···।

৮॥ **প্রাণ** হে প্রাণ **প্র-অনতে তে নমঃ** প্রাণ-স্বরূপ তোমাকে নমঃ, √অন্—নিঃশ্বাস নেওয়া, **অপ-অনতে তে নমঃ** অপানরূপী তোমাকে নমঃ। **পরাচীনায় তে নমঃ** যে-তুমি পরাঙ্-মুখ, ওদিকে মুখ ফিরিয়ে আছ···। **প্রতীচীনায় তে নমঃ** যে তুমি প্রত্যঙ্-মুখ, এদিকে মুখ ফিরিয়ে আছ···। **সর্বস্মৈ তে** তোমার সব কিছুকে, বা সব-রূপী তোমাকে **ইদম্ নমঃ** এই নমস্কার করছি।

৯॥ **প্রাণ**···**তে যা** তোমার যেটি **প্রিয়া তনূঃ** প্রিয় শরীর, শ্রেষ্ঠ অংশ, স্বাস্থ্য **তে যা প্রেয়সী** তোমার যেটি প্রিয়তর শরীর, অজরতা, অমরতা **অথো** এবং **তব** তোমার **যত্** যেটি **ভেষজম্** ভৈষজ্যগুণসম্পন্ন অংশ **তস্য** তার থেকে **নঃ** আমাদের **ধেহি** দাও **জীবসে** বাঁচার জন্য।

১০॥ **পিতা প্রিয়ম্ পুত্রম্ ইব** পিতা যেমন প্রিয় পুত্রকে তেমনি **প্রাণঃ**···**প্রজাঃ** প্রাণীদের **অনু বস্তে** অনুকূল হয়ে ঢেকে রাখে, যে যেমন তার তেমন বসন হয় প্রাণ। **যত্ চ প্রাণতি** যে প্রাণন করে, **যত্ ন চ** এবং যে করে না, **সর্বস্য** তাদের সবার **প্রাণঃ হ** প্রাণই **ঈশ্বরঃ** প্রভু। জড়ও প্রাণের অন্তর্ভুক্ত।

১১॥ **প্রাণঃ মৃত্যুঃ** প্রাণ মৃত্যু, তু. মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ·· তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই, যস্য ছায়া অমৃতং যস্য মৃত্যুঃ। **প্রাণঃ তক্মা** প্রাণ তক্মা নামক রোগ—সমস্ত ব্যাধির প্রতীক। **দেবাঃ** দেবতারা **প্রাণম্** প্রাণকে **উপ-আসতে** উপাসনা করেন। **প্রাণঃ হ** প্রাণই **সত্য-বাদিনম্** সত্যবাদীকে **উত্তমে লোকে** উত্তম লোকে **আ দধত্** রাখে।

১২॥ **প্রাণঃ বিরাট্** প্রাণই বিরাট্ **প্রাণঃ দেষ্ট্রী** প্রাণই দেষ্ট্রী দেশনা-দাত্রী Destiny নিয়তি? **সর্বে** সকলে **প্রাণম্** প্রাণকে **উপ-আসতে** উপাসনা করে। **প্রাণঃ হ** প্রাণই **সূর্যঃ চন্দ্রমাঃ** সূর্য এবং চাঁদ। **প্রাণম্ প্রজাপতিম্ আহুঃ** প্রাণকে প্রজাপতি বলে।

১৩॥ **প্রাণাপানৌ ব্রীহি-যবৌ** প্রাণ এবং অপান হল ধান আর যব। **অনড্বান্ প্রাণঃ উচ্যতে** ষাঁড়কে প্রাণ বলা হয়। **যবে হ** যবের মধ্যে **প্রাণঃ আহিতঃ** প্রাণ আহিত আছে। **ব্রীহিঃ অপানঃ উচ্যতে** ধানকে বলা হয় অপান।

১৪॥ **পুরুষঃ** মানুষ **গর্ভে অন্তরা** গর্ভের মধ্যে **অপ-অনতি প্র-অনতি** প্রাণন ও অপানন করে। **প্রাণ** হে প্রাণ **যদা** যখন **ত্বম্** তুমি **জিন্বসি** স্পন্দিত হও, ঠেল **অথ** তখন **সঃ** সে **পুনঃ** আবার **জায়তে** জন্মায়।

১৫॥ **প্রাণম্ মাতরিশ্বানম্ আহুঃ** প্রাণকে মাতরিশ্বা বলে, **বাতঃ হ প্রাণঃ উচ্যতে** আবার বায়ুকেও প্রাণ বলা হয়। **প্রাণে হ** প্রাণেতেই **ভূতম্** অতীত **ভব্যম্ চ** এবং ভবিষ্যৎ। **প্রাণে**···**সর্বম্** সব **প্রতিষ্ঠিতম্** প্রতিষ্ঠিত।

১৬॥ **যদা** যখন **প্রাণ** হে প্রাণ **ত্বম্** তুমি **জিন্বসি** স্পন্দিত হও, ঠেল, তখন **আথর্বণীঃ** মানুষের হিতকারী **আঙ্গিরসীঃ** অভিচার-সাধন **দৈবীঃ** দৈব অর্থাৎ প্রাকৃতিক, আপনি-হওয়া **উত** এবং **মনুষ্যজাঃ** মানুষের-করা, চাষে বা বাগানে, **ওষধয়ঃ** গাছপালারা **প্র জায়ন্তে** প্রকৃষ্টভাবে জন্মায়।

১৭॥ প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি পঞ্চম ঋকের পুনরাবৃত্তি। তৃতীয়টি ষোড়শ ঋকের। **অথো** এবং **যাঃ কাঃ চ বীরুধঃ** যে-কোন লতা, ঝোপ **প্র জায়ন্তে** ···।

১৮॥ **প্রাণ**·· **যঃ** যে **তে** তোমার **ইদম্** এটি **বেদ** জেনেছে, **যস্মিন্ চ** এবং যাতে **প্রতিষ্ঠিতঃ অসি** তুমি প্রতিষ্ঠিত আছ, **সর্বে** সকলে **অমুষ্মিন্ উত্তমে লোকে** ঐ উত্তম লোকে প্রতিষ্ঠিত **তস্মৈ** তার উদ্দেশে **বলিম্** খাজনা প্রণামী **হরান্** বহন করবে, √হৃ—বহন করা+লেট্ ৩।৩। প্রাণের প্রতিষ্ঠা গভীর অনির্বচনীয় অতল শূন্যতায়, কুহূর কুহরে।

১৯॥ **প্রাণ**· **যথা** যেমন **ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ** এই সমস্ত প্রাণিবর্গ **তুভ্যম্** তোমার উদ্দেশে **বলিহৃতঃ** বলি-হারী হয়, বলি বহন করে (>সাবাস অর্থে বাং বলিহারি ?) এবং তেমনি **যঃ সু-শ্রবঃ** যে সু-শ্রবা **ত্বা** তোমাকে **শৃণবত্** শুনতে পারে (শক্যার্থে লেট্) **তস্মৈ** তার উদ্দেশে **বলিম্ হরান্** পূর্ববৎ।

প্রাণের সঙ্গে যার 'জানাশোনা' আছে, সেও প্রাণের মতোই সবার পূজ্য। তু. ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।

২০॥ **অন্তর্-গর্ভঃ** বিশ্বভুবনের প্রাণবীজ অভ্যন্তরে নিয়ে **দেবতাসু** দেবতাদের মধ্যে **চরতি** বিচরণ করে। **ভূতঃ** জন্মে' **আ-ভূতঃ** চারিদিকে সব হয়ে **সঃ উ** সে আবার **পুনঃ জায়তে** পুনর্জন্ম নেয়। নিত্য-নূতন জন্ম-পরিজিঘৃক্ষু প্রাণ! তার নূতনত্বের ক্ষুধা মেটে না কিছুতেই! **সঃ ভূতঃ** সে অতীত, সে **ভব্যম্** যা হবার যা হওয়া উচিত, সে **ভবিষ্যৎ** যা হবে। **পিতা** সবার পিতা সে **পুত্রম্** প্রতিটি পুত্র, জাতক, প্রাণীর মধ্যে **শচীভিঃ** নানারকম বিচিত্র শক্তি নিয়ে **প্র বিবেশ** প্রবিষ্ট হয়।

২১॥ **সলিলাত্** অব্যক্তের মহাপারাবার থেকে **উত্-চরন্** উড়ন্ত **হংসঃ** প্রাণ-রূপী হংস **একম্ পাদম্** একটি পা **ন উত্খিদতি** তোলে না। **অঙ্গ** অভিমুখীকরণার্থ নিপাত, শোনো, **যত্** যদি **সঃ** সে **তম্** সেই পা-টিকে **উত্খিদেত্** তুলত, **ন এব অদ্য স্যাত্** তাহলে 'আজ'ও হত না, **ন শ্বঃ**

স্যাত্ 'কাল'ও হত না, **ন রাত্রী ন অহ্নঃ স্যাত্** রাতও হত না দিনও নয়, **কদা চন** কখনোই **ন বি-উচ্ছেত্** ভোর হত না।

'পাদ' শব্দটি শ্লিষ্ট, ১) পা ২) এক-চতুর্থাংশ। কোন তত্ত্বই পূর্ণ প্রকাশিত নয়, কিছুটা ব্যক্ত কিছুটা অব্যক্ত। তু. পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদ্ অস্যামৃতং দিবি, একপাদ এর বিশ্বভুবন, অমৃত ত্রিপাদ দ্যুলোকে। প্রাণের এই ব্যক্তাব্যক্ত রূপটিকে ঋষি ফোটালেন জলে-এক-পা-ডোবানো উড়ন্ত হাঁসের চিত্রকল্প দিয়ে। এই উড়ন্ত হাঁস, পাখা-মেলা নিখিলকে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথও তাঁর বলাকায়।

সায়ণের মতে এখানে প্রাণ ও সূর্যের একীকরণ হয়েছে। সূর্যই হংস। তিনিই অজ এক-পাদ, তং সূর্যং দেবম্ অজম্ একপাদম্ (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।১।২।৮)। নিহিত অন্য চরণটি তুলে নিয়ে তিনি যদি ঊর্ধ্বাও হয়ে যান, তাহলে সূর্য-ঘড়ির অভাবে দিন-রাত আজ-কাল মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে অন্ধকার মহা-একাকারে।

২২॥ **অষ্টাচক্রম্** আটটি-চাকা-যুক্ত **এক-নেমি** একটি নেমিযুক্ত **প্র পুরঃ** সামনের দিকে **নি পশ্চা** পেছন দিকে **সহস্রাক্ষরম্** হাজার>অনন্ত অক্ষ বা অক্ষর-যুক্ত প্রাণ **বর্ততে** আবর্তিত হয়ে চলেছে। **অর্ধেন** এক অংশ দিয়ে **বিশ্বম্ ভুবনম্** সমস্ত সৃষ্টিকে **জজান** জন্ম দিয়েছে, **অস্য** এই প্রাণের **যত্ অর্ধম্** যে বাকি অংশ **সঃ কতমঃ কেতুঃ** কোন চিহ্নটি [দিয়ে চিনব তাকে]?

অনেকগুলি বৈদিক ভাব-প্রতিমা একসঙ্গে মিলেছে ঋকটিতে—পুরুষসূক্তের পুরুষ (১।৯০), অস্যবামীয় সূক্তের (১।১৬৪) সহস্রাক্ষরা গৌরী, ব্রহ্মপ্রকাশন সূক্তের অষ্টাচক্রা নবদ্বারা পুরী (অথর্ব ১০।২।৩১) ইত্যাদি :

দেবতা হলেন পরিভূ, চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে থাকেন। এইটিই পুরুষ-সূক্তের 'স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা…', তিনি ভূমিকে সবদিক থেকে বেড়ে', বেড়ে আছেন দশ-আঙুল। তু. বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারম্…(শ্বেতাশ্বতর ৩।৭)। প্রাণ হলেন সেই তত্ত্ব, সেই পুরুষ, যিনি নেমি হয়ে ঘিরে আছেন সব। শুধু আছেন নয় **বর্ততে** চলছেন। এই বিশ্বভুবন বিপুল প্রাণের একচক্রা রথনগরী।

তার মধ্যে আছে পরস্পর অন্তঃপ্রবিষ্ট আটটি চক্র—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন

তপঃ সত্য অথবা দেহ প্রাণ মন বিজ্ঞান আনন্দ চিৎ সৎ এই সপ্তলোক বা চেতনার সাতটি স্তর এবং তদূর্ধ্ব 'অক্ষর' বা 'নাসদীয়' স্তর। চক্র শব্দের অর্থও 'বর্ততে'র মতোই, ক্রিয়াশীল (কৃ+যঙ্‌লুক্), সৃষ্টিশীল, creative, active, in action. স্পন্দনশীল বিপুল বিশ্বের অধীশ্বর এই প্রাণ-সলিলকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বিশ্বলোকের বিপুল ঢেউ' (আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, পূজা ৩৫৬)। নাসদীয় অক্ষর স্তরে এসে সেই প্রাণ যেন স্তব্ধ সংহত, যেন সাতটি সমুদ্র নাচতে নাচতে এক মহা-অজানার মহা-মোহানায় এসে স্থির হয়ে গেছে। তখন 'বর্ততে' মানে 'আছে'। √বৃত্—ঘোরা, থাকা।

বাকেরও আছে ঐ আটটি স্তর—১) দেহাশ্রিত বৈখরী ২-৩) প্রাণ ও মন আশ্রিত মধ্যমা ৪-৭) বিজ্ঞান আনন্দ চিৎ ও সত্ আশ্রিত পশ্যন্তী, আর ৮) অক্ষর-আশ্রিত পরা। পরা বাক্ আর অক্ষর স্তরের প্রাণ-ব্রহ্ম এক, ঋষি ত্রিত আপ্ত্য যাকে বলেছেন ব্রহ্মী বাক্।

চাকার সঙ্গে থাকে অক্ষ—দুই চাকার যোগদণ্ড। সহস্র অর্থাৎ অনন্ত অক্ষ-যুক্ত এই অর্থে মত্বর্থীয় র-প্রত্যয় করে সহস্রাক্ষর শব্দটি নিষ্পন্ন (সায়ণ), অথবা অনন্ত অক্ষি-যুক্ত। তু. পুরুষসূক্তের পুরুষ সহস্রাক্ষ। তৃতীয় অর্থ সহস্র-অক্ষর-যুক্ত। বাক্‌ও সহস্রাক্ষরা।

অর্থাৎ যিনি প্রাণ তিনিই পুরুষ তিনিই বাক্। তাঁর যা ব্যক্ত, তার ছোঁয়া পাই সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। যা অব্যক্ত, হাঁসের সেই ডোবানো পা-টি, তাকে কি ধরা যায়, জানা যায় ?

২৩॥ **অস্য বিশ্বজন্মনঃ** এই সমস্ত জাত প্রাণীর **বিশ্বস্য চেষ্টতঃ** সমস্ত ক্রিয়াশীল প্রাণীর **যঃ ঈশে** যিনি প্রভু হয়ে আছেন, **প্রাণ তস্মৈ তে** হে প্রাণ, সেই তোমাকে **অন্যেষু ক্ষিপ্রধন্বনে** শত্রুদের প্রতি যিনি ক্ষিপ্র-ধনু সেই তোমাকে **নমঃ অস্তু** নমস্কার।

২৪॥ প্রথম দুটি চরণ পূর্ববৎ, শুধু 'বিশ্ব'-র বদলে প্রতিশব্দ 'সর্ব'। **ধীরঃ** ধীর **অতন্দ্রঃ** তন্দ্রাহীন **প্রাণঃ** প্রাণ **ব্রহ্মণা** বিপুল চেতনা নিয়ে **মা অনু** আমার সঙ্গে **তিষ্ঠতু** থাকুন। তু. সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে (অগ্নিসূক্ত ১।১।৯), Abide with me.

২৫॥ **নমু** [লোকে] তো **তির্যক্** বাঁকা হয়ে **নি পদ্যতে** শুয়ে পড়ে, **কিন্তু সুপ্তেষু** ঘুমন্তদের মধ্যে, সবাই ঘুমোলে পরে **উর্ধ্বঃ** খাড়া হয়ে **জাগার**

জেগে থাকে প্রাণ। **সুপ্তেষু** সবাই ঘুমোলে **অস্য** এর **সুপ্তম্** ঘুম **কঃ চন** কেউ **ন অনু শুশ্রাব** কারো কাছ থেকে শোনে নি।

২৬॥ **প্রাণ** হে প্রাণ **মত্** আমার কাছ থেকে **মা পরি-আ-বৃতঃ** পরি-আবর্তন কোরো না, মুখ ফিরিও না, √বৃত+লুঙ্ ২।১। **মত্-অন্যঃ** আমার থেকে আলাদা **ন ভবিষ্যসি** হোয়ো না। **প্রাণ** হে প্রাণ **জীবসে** বাঁচবার জন্যে **ত্বা** তোমাকে **ময়ি** আমাতে **বধ্নামি** বাঁধছি **অপাং গর্ভম্ ইব** অগ্নির মতো, 'অপাং গর্ভঃ' অগ্নির নাম-বৎ বিশেষণ, দ্র. বৃষ্টিসূক্ত ১০, ভূমিসূক্ত ৩৭।

যেমন অগ্নিকে আমার সত্তার অঙ্গীভূত করে নিয়েছি, তেমনি তোমারও সঙ্গে বেঁধেছি আমাকে, প্রাণ।

১০-১২। ঋষি কুত্স আঙ্গিরসের অগ্নি উষা ও সূর্য সূক্ত

ঋষি অগস্ত্যের মতো ঋষি কুত্স আঙ্গিরসও প্রথম মণ্ডলের পনের জন শতর্চী মহাকবির একজন। শুধু শতর্চী নন, দ্বিশতর্চী। ৯৪-৯৮ এবং ১০১-১১৫ এই কুড়িটি সূক্তের (১০৫ এর ঋষি বিকল্পে ত্রিত আপ্ত্য) ইনি স্রষ্টা। নবম মণ্ডলেও ৯৭ তম সূক্তের ১৪টি ঋক্ এঁর রচনা। সব মিলিয়ে ২২৬টি ঋক্।

প্রথম মণ্ডলের সূক্তগুলিতে কুত্স যেসব দেবতার প্রশস্তি গেয়েছেন, তাঁরা হলেন প্রধানত অগ্নি ইন্দ্র বিশ্বে-দেবাঃ ঋভুগণ দ্যাবাপৃথিবী অশ্বিদ্বয় উষা রুদ্র এবং সূর্য। দুটি বাদে কুত্সের সমস্ত সূক্তই সমাপ্তিতে একটি ধুয়ার দ্বারা চিহ্নিত—

তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তাম্
অদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ

বাকের দেবীসূক্ত এবং গোতম রাহূগণের মধুতৃচের মতো কুত্সের সূর্য সূক্তের একটি পঙ্ক্তিও অতিপ্রসিদ্ধ। সেটি হল 'সূর্য আত্মা জগতস্ তস্থুষশ্ চ' —দাঁড়িয়ে আছে যা, চলছে, সবার আত্মা সূর্য।

একটি ঋকে (৯৫।৪) কুত্স জাতবেদা অগ্নিকে বলেছেন মহাকবি, যেমন মহাকবি রবীন্দ্রনাথের রচনায় বারবার দেখি পরমদেবতার উপলব্ধি মহাকবি আদিকবি কবিগুরু রূপে।

বৈদিক পদকোষ নিঘণ্টুতে কুত্স শব্দটিকে বজ্রের প্রতিশব্দ ধরা হয়েছে। অমোঘ বজ্রবাণী যিনি উচ্চারণ করেন সেই বজ্রকবিই হলেন কুত্স। আবার প্রচোদিত করেন, নাড়া দেন, ঠেলা দেন, জাগিয়ে দেন বলেও কুত্স (√চুদ্ > কুত্ + স)।

অগ্নিদেবতা হলেন সেই আগুন যা একলা রাতের অন্ধকারে পথের আলো হয়ে জ্বলে, সেই জাগ্রত প্রদীপ্ত আত্মচৈতন্য যা ঋষির পূর্বজীবন পূর্বসংস্কার পূর্বভাষাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে নায়ক হয়ে অগ্রণী হয়ে তাঁকে নিয়ে চলে সূর্যের দিকে।

উষা হলেন মহাবির্ভাবের সূচনা। সূর্যকান্তা সূর্যঘোষা সূর্যযোষা উষা।

সূর্য হলেন তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়। মহা-অজানার অনন্তবিথার মণিহারের ধুকধুকি।

১০। অগ্নি

১॥ **নঃ** আমাদের **অঘম্** পাপ দোষ মালিন্য তু. অংহস্ **অপ** দূরে যাক **শোশুচত্** জ্বলে পুড়ে যাক, অভ্যস্ত √শুচ্ (দীপ্তি, দাহ)+লেট্ ৩।১। **অগ্নে** হে অগ্নি **রয়িম্ আ** রয়িকে লক্ষ্য করে, আমাদের মধ্যে সৃষ্টির আকূতি জাগিয়ে, আত্মাকে নিঃশেষ করে করে আত্মরূপায়ণের অনন্ত ধারায় উচ্ছলিত হবার তীব্র সংবেগ জাগিয়ে **শুশুগ্ধি** জ্বলজ্বল্ জ্বলে ওঠ, অভ্যস্ত √শুচ্ +লোট্ ২।১। প্রথম পঙ্‌ক্তিটি ধুয়ারূপে পুনরাবৃত্ত হয়েছে প্রতি ঋকের শেষে। কুৎসের অভ্যস্ত ধুয়ার এটি ব্যতিক্রম।

২॥ **সুক্ষেত্রিয়া** সুন্দর ক্ষেত্র-কামনায়, সুপ্রতিষ্ঠা চেয়ে **সুগাতুয়া** সুন্দর 'গাতু' অর্থাৎ গান-ভরা পথ চেয়ে **বসূয়া চ** এবং বসু চেয়ে **যজামহে** তোমার যজন করি আমরা। তিনটি শব্দেই নিজের জন্য কামনা অর্থে ক্যচ্ (=য) প্রত্যয় হয়েছে, তারপর অ+টাপ্ যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ সুক্ষেত্রিয়া ইত্যাদি শব্দের তৃতীয়ার একবচনে বিভক্তিলোপে রূপ।

বৈদিক ঋষির দেবযান সরণি—দেবতার কাছে যাওয়ার পথ—হল গাতু

< √গম্ এবং √গৈ। তু. 'অতারিষ্ম তমসস্ পারম্ অস্য দেবয়ন্তো প্রতি স্তোমং দধানাঃ' দেবতাকে চেয়ে গান গেয়ে গেয়ে এ-আঁধা আমরা এলুম পেরিয়ে। ক্ষেত্র < √ক্ষি (নিবাস ও ঐশ্বর্য) প্রতিষ্ঠা, স্বধা, 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে'—এই দাঁড়িয়ে থাকার ভূমিটিকে স্পর্শ করা। বসু আলোকবিত্ত, একটির পর একটি উদ্ভাস—অন্ধকারকে সূচীবিদ্ধ-করা বজ্রমানিকের ছটা, চিত্ত-ঝল্‌মল্-করা হঠাৎ আলোর ঝলকানি, আলোক-লাবণ্য-বন্যা।

৩॥ **যত্** যাতে **এষাম্** এই সব স্তোতাদের মধ্যে **প্র ভন্দিষ্ঠঃ** ভন্দনা-কারীদের মধ্যে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, by far the greatest হতে পারি আমরা। নিঘণ্টুতে ভন্দ্ ধাতুর অর্থ জ্বলা এবং অর্চনা করা, দুটি অর্থ একত্র হয়ে দাঁড়ায় 'নিশিদিন আলোকশিখা জ্বলুক গানে'। ইষ্ঠন্-প্রত্যয়ের বিশিষ্ট বৈদিক প্রয়োগ, তুশ্ছন্দসি পা ৫।৩।৫৯, তুর্ ইষ্ঠেমেয়ঃসু পা ৬।৪।১৫৪। **অস্মাকাসঃ সূরয়ঃ চ** এবং যাতে অস্মদীয় সূরিরা প্রভন্দিষ্ঠ হতে পারে। অস্মদ্ + অণ্ > আস্মাক, তস্মিন্-অণি চ যুষ্মাকাস্মাকৌ পা ৪।৩।২, প্রত্যয়লোপে অস্মাক + ১।৩। সূর আদিত্য (নিরুক্ত ৪।২৩), গবেষণা ও সূরৈষণা, আলো-খোঁজা ও সূর্য-খোঁজা বৈদিক ঋষির সাধনা। সেই সাধনায় যাঁরা প্রাগ্রসর তাঁরা সূরি, নিঘণ্টুতে স্তোতার প্রতিশব্দ (৩।১৬৮)।

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে সগোত্র কবিদের সঙ্গে এক অশ্রুতপূর্ব অগ্নিবীণা-ঐকতানে বেজে উঠতে চান বজ্রকবি কুৎস।

৪॥ **অগ্নে** হে অগ্নি **বয়ম্** আমরা **যত্** যাতে **তে** তোমার **সূরয়ঃ** সূর্য-কবি হয়ে **প্র-জায়েমহি** প্রজাত হতে পারি, নতুন কবি···কবিতর···কবিতম জন্ম পাই। **প্র তে** ব্যাকুলতায় পুনরাবৃত্তি।

৫॥ **যত্** যেহেতু, এই যে **অগ্নেঃ** অগ্নির **সহস্-বতঃ** সহস্ অর্থাৎ 'পরাভূত করার শক্তি'-সম্পন্ন **ভানবঃ** ভানু অর্থাৎ প্রভা-সমূহ **বিশ্বতঃ** সর্বত্র **প্র যন্তি** প্রেতি অর্থাৎ সামনে চলার শক্তিরূপে ছড়িয়ে পড়ছে, অতএব···।

৬॥ **বিশ্বতোমুখ** হে সর্বত্র-মুখ, যেদিকে তাকাই তোমাকেই দেখি, অগ্নিময় সমস্ত ভুবন, **ত্বম্ হি** তুমি যে **বিশ্বতঃ** সবদিক থেকে **পরিভূঃ অসি** পরিবেষ্টন করে রয়েছ। দ্র. প্রাণসূক্ত ২২।

৭॥ **বিশ্বতোমুখ···নাবা-ইব** যেন নৌকো করে **দ্বিষঃ** দ্বেষ্টা ও দ্বেষকে **অতি পারয়** পেরিয়ে, নিয়ে যাও **নঃ** আমাদের।

৮। **সঃ** সেই-তুমি **নাবয়া সিন্ধুম্ ইব** যেমন নৌকো করে নদী পেরোয় তেমনি করে **অতি পর্ষ** পেরিয়ে নিয়ে যাও গো। √প্ +মিনতিতে লেট্ ২।১ **স্বস্তয়ে** যাতে স্বস্তি পাই।

১১। উষা

বৈদিকদের উষা হলেন সৌন্দর্যময়ী মহিমময়ী ঐশ্বর্যময়ী আকাশদুহিতা আলোকললনা ঋষিহৃদয়ললামভূতা রূপসী কিশোরী ভোর। তামসী রাত্রির বুক চিরে, বিশ্বসংসার ভরে বেজে-ওঠা 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি'। এ ভোর প্রাকৃতিক পৃথিবীর সঙ্গে প্রাকৃতিক সূর্যের মিলনমুহূর্ত নয়, এ হল ব্যক্তির জীবনে ঘরে সূর্য-ওঠা-সফল-করা দ্বার-খুলে-দেওয়া ভোর অর্থাৎ—শ্রদ্ধার আবেশ, 'পাবার আগে কিসের আভাস', Faith and Hope, 'ওরে মন হবেই হবে'—এই প্রত্যয়-ভরা আশার মঞ্জীর-গুঞ্জরণ। এ উষা মানুষকে দেবতার দক্ষিণতম দান, আলোকজীবনের আলোকজনমলগনের নিশ্চিত আশীর্বাদ—অরুণরঙা আলোক-তিলক। তাই এঁর আরেক নাম দক্ষিণা। নিত্য-সুরের মহাগুরুর কাছ থেকে এই দক্ষিণা পেয়েই সুরু হয় মানুষের অধ্যাত্মজীবন, যা লৌকিকজীবনের ঠিক উল্টো। উষার দিগ্‌দাহ রাঙিয়ে তোলে শুধু বহির্গগনই নয়, অন্তর্গগনও। তাই দেবতার দান এই উষার আবির্ভাবই মানুষের যথার্থ 'দীক্ষা'—সুরের আগুনের নাড়া-বাঁধা বিশ্বতানের ধ্রুবপদের ওস্তাদের কাছে, ঊর্ধ্বলোক থেকে প্রথম শক্তিপাত, প্রথম আলোর তীরের নেমে আসা নির্ভুল নিশানায় সত্তার গভীরতম অন্ধকারে, আধারের / আঁধারের অণু-পরমাণু কম্পিত করে বজ্রিণীর প্রথম বজ্রঘোষণা, 'জাগো হে সুপ্ত সবিতা, ওঠো, চলো।' এ-আহ্বানে মানুষের বজ্র-সত্তা প্রকৃতির গভীরে জাগে জাগরণের প্রথম শিহরণ, Quickening--

কে তুমি রয়েছ দেব অন্তরে আমার?

আমারই ভেতর থেকে আমার দেবসত্তার জন্মের যে মহা বিস্ময় তার প্রথম আভাস, প্রথম পাখির ডাক, প্রথম গান, প্রথম আলোর বাঁশি হলেন উষা।

তাই উষার বর্ণনায় বেদের কবির উল্লাসের অন্ত নেই, তাঁর সৌন্দর্য-চেতনা এখানে সহস্র দল মেলে বিকশিত।

আবার সমষ্টির জীবনে এ উষা হলেন সেই 'নতুন যুগের ভোর' যার আশাপথ চেয়ে আছে মানুষের সভ্যতা যুগ যুগান্ত ধরে। এক একজন মানুষের মধ্যে সাময়িকভাবে যা রূপ নিয়েছে, দ্যুলোকে ভূলোকে সেই মহামিলনের গাঁটছড়া একদিন বাঁধা হবে বলে প্রতিদিন মোহড়া দিয়ে চলেছে প্রকৃতি একটি অভিনব সপ্তপদীর মধ্যে দিয়ে। তার প্রথম পদ হলেন অশ্বিদ্বয়—অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আলোর অভিযান। দ্বিতীয় পদ হলেন এই উষা—প্রথম আলোর আবির্ভাব। তৃতীয় সবিতা—পৃথিবীতে অন্ধকার, কিন্তু আকাশে রশ্মিচ্ছটা, তিমির পরাভূত। চতুর্থ ভগ—সূর্য উঠি-উঠি। পঞ্চম সূর্য—স্পষ্ট নিশ্চিত সূর্যোদয়। ষষ্ঠ পূষা—পূর্ণ পুষ্ট সর্বপোষক সূর্য। সপ্তম বিষ্ণু—বিশ্বব্যাপ্তকিরণ মধ্যগগনের সূর্য।

মানুষের সভ্যতায় এখনো চলেছে অশ্বিদ্বয়ের কাল—নেপথ্যসাধনা, সর্বপ্লাবী আলোর স্বপ্নদর্শন বুকে ধরে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে কেটে চলা। এই অন্ধকারের বুক চিরে উষা আসুন সর্বজনের জন্যে আলোর আশীর্বাদ নিয়ে, যে-সূর্য সবার, তাঁকে উজলে তুলুন, এই হল বেদের ঋষির প্রার্থনা—

উষো অদ্যেহ সুভগে বি-উচ্ছ
হে রূপসী ভোর, ওঠ ফুটে ওঠ আজকে এখানে এখনই।

১॥ অনুবাদে ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতার পঙ্‌ক্তি ও পদগুচ্ছই প্রমাণ করে দেয় ঋকৃটির সঙ্গে তাঁর ভাব-সাদৃশ্য।

শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ সকল আলোর সেরা আলো **ইদম্ আ-অগাত্‌** এল ঐ **বিভ্বা** বিভু সর্বব্যাপী সব-ছাওয়া, **চিত্রঃ** উজ্জ্বল আশ্চর্য, **প্রকেতঃ** তিমিরাচ্ছন্ন সব-কিছুকে উজলে তুলে (অন্ধকারাবৃতস্য সর্বস্য পদার্থস্য প্রজ্ঞাপকঃ—সায়ণ) **অজনিষ্ট** জন্মাল।

সব একটি বৈদিক মূল-শব্দ (key-word)। √সু>সব—ঠেলা, নাড়া, জাগানো, চালানো, জন্ম দেওয়া। যেখানে যত অচলায়তন, দেহের প্রাণের মনের বুদ্ধির জড়তা, তাকে ঠেলা দেন, নাড়া দেন যে দেবতা, তিনিই সবিতা, এই জনমে ঘটান তিনি জন্ম জন্মান্তর। বেদে ইন্দ্রেরও একটি পরিচয় হল, তিনি

'অচ্যুতচ্যুত্', **অনড়কে** নড়িয়ে দেন। এই ইন্দ্রেরই বাণী হল 'চরৈব' চলতেই থাকো, থেমো না। এই চলার বাণী বারে বারে ভাষা পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, গানে, বিশেষ করে বলাকায়—মনে হল এ পাখার বাণী দিল আনি… পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে বেগের আবেগ। নিখিলের মর্মে সুষুপ্ত এই বেগের আবেগকে যে দেবতা তাঁর রুদ্র ঠেলায় জাগিয়ে দেন, সেই চিরচঞ্চল একর্ষি পথিকই হলেন সবিতা পূষা সূর্য। আবার সেই সবিতারও **প্রসূতা** প্র-সবিত্রী হলেন উষা। উষা তাঁর রাঙা আলোর জীয়নকাটি দিয়ে অন্তরে অন্তরে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দেন প্রসুপ্ত সূর্যকে, যাঁর প্রতীক হলেন ঐ আকাশ-তিলক সূর্য। অন্তরে বাইরে উষার দীপ্ত অভ্রান্ত অমোঘ আবির্ভাবে মাতোয়ারা ঋষি গাইছেন 'ভোর হল বিভাবরী'।

যথা……**এবা** যাতে……তাই। রাত্রি নিজেই **যোনিম্ অরৈক্** (আরৈক্ এই দীর্ঘটি ছন্দের জন্য, √রিচ্ খালি করা, ছাড়া) ঠাঁই ছেড়ে দিল উষাকে, যাতে সে সবিতার মা হয়ে সর্বপ্রচোদক সবিতাকে প্রচোদিত করতে পারে। **সবায়** সব অর্থাৎ প্রচোদনার জন্য। পরবর্তী স্বরবর্ণ 'এ'র সঙ্গে জড়ামড়ি এড়াবার জন্য 'য়'কে অনুনাসিক করে দেওয়া হয়েছে। √রা ধাতুর একটি অর্থ দান ; তার থেকে রাত্রি (বেদে রাত্রী) শব্দের অর্থ দাত্রী করা চলে।

২॥ উষার **রুশত্** প্রদীপ্ত উজ্জ্বল **বৎস** বাছুরটি হলেন সূর্য সবিতা স্বয়ং। **শ্বেত্যা** শুক্লা, উষার আর এক নাম। উষা ও রাত্রি দুজনে **সমান-বন্ধু** একই সূর্যের বা ঋতের বাঁধনে বাঁধা। দুজনেই দেবী, তাই **দ্যাবা** উজ্জ্বলা, এবং **অমৃতা** অমৃতময়ী। **অনূচী** একে অপরের **অনু চরতঃ** পেছনে পেছনে চলেছে। উষাও **বর্ণম্ আমিনানা** নিঃশেষে মুছে দেয় রাত্রির কালো রূপ রং, রাত্রিও তাই, নিঃশেষে মুছে দেয় উষার ঐশ্বর্যে ঝলমল দিনের সমস্ত রং।

৩॥ **কিন্তু** তাই বলে তাদের মধ্যে রেষারেষি নেই, **ন মেথেতে**। **স্বস্রোঃ** দুই বোনের **সমানো অনন্তঃ অধ্বা**একই অনন্ত কাল-পথ। **দেবশিষ্টে** দিব্য আইন মেনে **অন্যা অন্যা** একজনের পর আরেকজন **চরতঃ** চলেছে। দুজনেই **সুমেকা** রূপসী। কিন্তু **বি-রূপা** দুজনের রূপ দুরকম, একটি শুক্লা একটি কৃষ্ণা। তা সত্ত্বেও তারা কিন্তু **সমনস্** সমান-মন এক-মন। দ্বিবচনে সুমেকে, বিরূপে, সমনসা। মূলের 'মেথেতে' এবং অনুবাদে 'দ্বন্দ্ব' পদটি দ্ব্যর্থক। তাদের

মিলনও নেই সংঘর্ষও নেই। **ন তস্থতুঃ** দাঁড়িয়েও থাকে না তারা। চলে, চলে, শুধু চলে। এই চির-চলন্ত সৃষ্টির একজোড়া চঞ্চরীক তারা—আলো আর কালো।

৪—৬ তিনটি ঋক্ মিলে একটি তৃচ। তার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে যে ভাবটি, তা উচ্চারিত হয়েছে প্রতি ঋকের শেষে একটি ধ্রুবপদে—**উষা অজীগর্ ভুবনানি বিশ্বা**। 'অজীগঃ—শ্লিষ্ট ক্রিয়াপদ, গৃ-ধাতুর অভ্যস্ত লুঙের রূপ।' √গৃ মানে জাগরণ এবং গান, দ্র. Vedic Gram, Macdonell P. 380। এই দুটি ভাব বেদের ঋষি তথা উদ্বুদ্ধ চিত্তের কাছে খুবই ঘনিষ্ঠ। 'জার' (গ > জ) শব্দের অর্থ যে-বঁধু গান গেয়ে ঘুম ভাঙায়—'তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও'। 'গির্' মানে নতুন জীবনের ভোরে জেগে উঠে মানুষ যে-গান গায়, 'ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া তোমায় গান শোনাব'। এই দুটি শব্দই শ্লিষ্ট গৃ-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন।

উষার আলোর গানে জেগে উঠছে বিশ্বভুবন, ঋষির হৃদয় থেকে উৎসারিত হচ্ছে আলোর ভাষা, বন্ধ দিগন্তের অন্ধ কপাট খুলে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে জ্যোতির্বিশাল অন্তরের অসীম বিস্তার, গানে গানে আলোয় আলোয় এগিয়ে চলেছে সৃষ্টি, যাচ্ছে যাচ্ছে যেতে যেতে যাচ্ছে······

এই তৃচের ভাব-সাদৃশ্য দেখি রবি-গানে রবি-গানে, যথা—

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি॥
তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়,
তখন তারি ধুলায় ধুলায় জাগে পরম বাণী॥
তখন সে যে বাহির ছেড়ে অন্তরে মোর আসে,
তখন আমার হৃদয় কাঁপে তারি ঘাসে ঘাসে।
রূপের রেখা রসের ধারায় আপন সীমা কোথায় হারায়,
তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি॥

(পূজা ২৬)

৪॥ উষা **ভাস্বতী** জ্যোতির্ময়ী, **সূনৃতানাম্** সূনৃতাদে-র দিশারী। সূনৃতা হলেন সুন্দরী রূপসী নৃত্য-চঞ্চলা বিদ্যুন্ময়ী ঋতচ্ছন্দা বাক্, অমৃতের ভাষা, আলোর ভাষা, স্বর্লোকের অপরূপা আনন্দিনী সুরের সুর-ধুনী। হৃদয়ে হৃদয়ে

ঘুমিয়ে আছেন এই সুর-কুণ্ডলিনী। উষার অরুণ-আলোর সোনার কাঠির স্পর্শে তিনি জেগে ওঠেন। তখন মূক 'গির্'-গিরি লঙ্ঘন করে, কবি হয়, ঋষি হয়। তার জাগ্রত প্রবুদ্ধ সেই বাককে উষাই পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যান পরম লক্ষ্যের পানে, ঋষি শুধু তাঁর বাঁশী হয়ে, বীণা হয়ে, অপৌরুষেয় হয়ে বাজান তাঁর রাগিণী।

যে দেবতা উষা হয়ে পথ দেখান সুনৃতা-দের, তিনিই আবার সরস্বতী হয়ে ঠেলা দেন তাদের, তাই সরস্বতীকে বলা হয়েছে 'চোদয়িত্রী সূনৃতানাম্'। তিনিই আবার সোম-রূপে 'ঋষিকৃত্', ঋষি করেন, অগ্নি-রূপে 'চিত্রশ্রবস্তমঃ, দেন সেই পরমা শ্রুতি যা শোনার জন্যে ঋষি কান পেতে থাকেন আপন হৃদয় গহন দ্বারে।

আলোকময়ী বাক্-দিশারী সেই উষা **অচেতি** (√চিত্—কর্মবাচ্যে লুঙ্) চেনা দিলেন। তাঁকে বুঝলাম, জানলাম, উপলব্ধি করলাম, তিনি ধরা দিলেন, হৃদয়ে প্রকাশ হলেন। চিত্-ধাতুর অর্থ সংজ্ঞান, সম্যক্ জ্ঞান। এ জ্ঞান শুধু বুদ্ধি দিয়ে জানা নয়, হৃদয় দিয়ে চেনা, revelation.

চিত্রা শ্লিষ্ট ও উভয়ান্বিত। একবার উষার বিশেষণ—উজ্জ্বল, আশ্চর্যময়ী। আর একবার 'দুরঃ' এর বিশেষণ—চিত্রা (=চিত্রাণি) **দুরঃ বি আবঃ** তিনি বিবৃত করলেন, খুলে দিলেন একটির পর একটি উজ্জ্বল আশ্চর্য জ্যোতির দুয়ার।

জগৎ জগৎকে **প্রার্প্যা** (দীর্ঘটি ছন্দের জন্য, প্র—ঋ+ণিচ্+ল্যপ্) প্রেতির পথে চালিয়ে দিয়ে **নঃ** আমাদের কাছে **রায়ঃ** তাঁর ধনরাশি, আলোর অনন্ত ঐশ্বর্য **বি অখ্যত্** প্রকাশ করলেন।

৫॥ 'জিহ্ম-শী' এঁকেবেঁকে গুটিসুটি হয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে যে মানুষটা—ঘুমন্ত মানুষের কৌতুক-চিত্র। যে 'কুটিল কুপথ ধরিয়া দূরে সরিয়া আছে পড়িয়া'—তাকেও লক্ষ্য করা হল। **জিহ্মশ্যে** তেমন মানুষকে **চরিতবৈ** প্রেতির পথে চলবার জন্যে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিলেন উষা। **ত্বম্** অনুদাত্ত 'ত্ব' শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন, অর্থ 'তুমি' নয়, কাউকে **আভোগি** সম্যক্ ভোগ, কাউকে **ইষ্টি** কাউকে **রৈ** ধনের জন্য, চতুর্থী-একবচনে যথাক্রমে আভোগয়ে, ইষ্টয়ে রায়ে—উদ্যোগী হতে উদ্বুদ্ধ করলেন। **দভ্রং পশ্যদ্ভ্যঃ উর্বিয়া বিচক্ষে** যারা অল্প দেখে তাদের উরু>উর্বিয়া বৃহৎ-কে অনন্তকে দেখাতে, **মঘোনী** মহিমময়ী উষা সুরে সুরে জাগিয়ে তুললেন বিশ্বভুবন।

৬॥ **ত্বম্** কাউকে উদ্বুদ্ধ করলেন **ক্ষত্রায়** বীর্য অর্জনে, **ত্বম্** কাউকে **শ্রবসে** বা পরমা শ্রুতি অর্জনে। ইষ্টি শব্দের অর্থ এষণা। যজ্ঞ মাত্রেই এষণা, অন্বেষণ, তাই ইষ্টি বলতে বোঝায় যজ্ঞকে। কিন্তু এখানে 'মহী' বিশেষণ দেওয়ায় বিশেষ করে এষণা অর্থ ই লক্ষিত হচ্ছে। **মহীয়ৈ ইষ্টয়ে**—বিপুল এষণার দিকে। **অর্থ**—যার দিকে মানুষ √ঋ ছুটে চলে—লক্ষ্য, উদ্দেশ্য। তার দিকে **ইত্যৈ** যাওয়ার জন্য। **জীবিতা** (=জীবিতানি) জীবনধারণের উপায়, জীবন-ব্রত, জীবন-চর্যা **বিসদৃশা** (=বিসদৃশাণি) প্রত্যেকের আলাদা আলাদা। **অভিপ্রচক্ষে** সেটিকে উদ্ভাসিত করে তুললেন উষা আর সেই উদ্ভাসনের দিকে চোখ মেলতে, এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করলেন, তাঁর আলোর গান শুনিয়ে।

৭॥ দেবতার প্রত্যক্ষদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ঋষির চিন্ময় চোখে উদ্ভাসিত হল অনাদ্যন্তপ্রবাহিণী সৃষ্টির পরম তাৎপর্য। সেই সঙ্গে জাগল বিশ্ব-বিপ্লাবিনী করুণার আকুলতা।

'দ্যৌ' আলোঝলমল আকাশ। সেই **দিবঃ** দ্যৌ-এর **দুহিতা** নন্দিনী হলেন উষা। সেই অমৃত-আলোর মহা-পারাবার ছুয়ে ছুয়ে তিনি আনছেন আমাদের জন্যে আলোকের এই ঝরণা-ধারা। তাঁকে দেখলাম, তিনি দেখা দিলেন **প্রতি অদর্শি**, আমার জীবন-জিজ্ঞাসার প্রত্যক্ষ উত্তর হয়ে তিনি ঝললেন আলোর অক্ষরে, অ-ক্ষর আলোর ক্ষরন্ত প্রস্রবণ হয়ে। **এষা** এই যে অন্তর ভরে, ঐ যে আকাশ ভরে—

> আকাশ হৃদয় হল, হৃদয় আকাশ—
> নিখিল-রাঙানো একি জ্যোতিঃ প্রকাশ !
> ঘুচে যায় দেশ কাল পাত্র ব্যবধান
> ঢেউ তোলে ঢেউ ভাঙে নিত্য বর্তমান।
> হোথা নয়, হেথা হেথা ; আজ—কাল নয়—
> সৃষ্টি-জোড়া সৃষ্টি-ছাড়া অনন্ত প্রত্যয় !

√বস্—আলো, প্রকাশ > **বি উচ্ছন্তী** যিনি প্রকাশ হচ্ছেন, আঁধারকে হটাতে হটাতে ফুটে উঠছেন ঝলমলিয়ে। উষা শব্দটিও এই ধাতু থেকেই নিষ্পন্ন—আবিঃস্বরূপা, প্রকাশময়ী, ঝলমলন্তী। তাঁর এ আবির্ভাবের যেন শেষ নেই—নব নব রূপে এসো প্রাণে।

কি অপরূপ রূপ তাঁর। **যুবতিঃ** অভিনবযৌবনা, আকাশ-সরসীর নব-

নবোন্মেষশালিনী সরস্বতী পদ্মিনী তিনি! **শুক্রবাসাঃ** আলোর প্রদীপ্ত উজ্জ্বল বসন ঝলমল করছে তাঁর সর্বাঙ্গে, সেই বসন-দ্যুতিতে আকাশ পৃথিবী আলোয় আলা। **বিশ্বস্য পার্থিবস্য বস্বঃ** সমস্ত পার্থিব বসুর **ঈশানা** ঈশ্বরী তিনি। পৃথিবীর ঐশ্বর্য ভাণ্ডার—যার পরিচয় পাই অথর্ববেদের পৃথিবী-সুক্তে—তার সোনার চাবিকাঠিটি আছে উষারই হাতে।

উষার দাক্ষিণ্য পায় নি যে, সেই ধন
তার কাছে শুধুমাত্র লোভের ইন্ধন।
যে পেয়েছে, তার কাছে সমস্ত পৃথিবী
অনন্ত অক্ষয় অফুরন্ত এক জ্যোতি,
আলোর কারায় স্বেচ্ছাবন্দী দিব্য সুধা
ভোগবতী ভগবতী অনন্ত বসুধা ॥

বিশ্ব এখন নিদ্রামগন গভীর অন্ধকার। তাই গভীর করুণায় আর্তিতে আকুলতায় গলে গিয়ে ঋষি বলছেন ওগো **সুভগা** সুন্দরী সুমঙ্গলী উষা, আর দেরি নয়, ওঠ ফুটে ওঠ **অদ্য** আজ এক্ষুণি **ইহ** এখানে। সমস্ত পৃথিবী ভাসিয়ে দাও আলোর প্লাবন-বন্যায়, সবাই জাগুক। সবাই পাক তোমার আলোর প্রসাদ।

৮॥ এইটি এবং দশম ঋকটি শ্রীঅরবিন্দের দিব্য জীবনের প্রথম অধ্যায়ের শিরোমন্ত্র। কী ভাবনা, কী উপলব্ধি, কী উল্লাস নিয়ে তাঁর দিব্যজীবনদর্শন সুরু হয়েছিল তার আভাস পাই এখানে।

এ সৃষ্টি আর কিছু নয়, কুজ্ঝটি-কুহেলি-ধূম-ধূম্র-নীহারিকার মধ্যে থেকে একটির পর একটি ভোরের মালা গাঁথা অনাদ্যন্তস্বপ্নদর্শনপ্রবন্ধ (a series of infinite dream-visions)—

বিশ্বময় ঠেলাঠেলি কলহ বিবাদ
ক্রুদ্ধ যুদ্ধ অনর্থক বাদ-বিসংবাদ---
উদ্দেশ্যবিহীন ব্যর্থ কর্ম-পরম্পরা—
তারি মধ্যে অকস্মাৎ কারো চিত্তে পরা-
প্রকৃতির দর্পণে ছায়া ফেলে যে প্রত্যূষ-
ধ্যানমগ্ন স্বপ্নাবিষ্ট পরম পুরুষ।
তখন এ কোলাহল কোথায় মিলায়

দূরবনপ্রান্তলীন নীলাঞ্জনছায়।
বিরহ-শয়ন ছেড়ে জেগে ওঠে ঘুম
শূন্য ভরে ফুটে ওঠে আকাশ-কুসুম।

এই **কুসুম্ভরঙীনা আকাশ-কুসুমই** হলেন স্বপ্নদ্রষ্টার উষা। এ উষা বারবার আসেন, ধরা দেন দ্রষ্টার স্রষ্টার চিত্তে, আবার চলে যান, যাবার আগে রাঙিয়ে দিয়ে যান আর-একটু নতুন রঙে এই সৃষ্টিখানি। এই উষা—নিত্যকাল সে শুধু আসিছে। এই চিরনবীনা যখন যাঁর কাছে ধরা দেন, তখন সে-আবির্ভাবের আশ্চর্য বিস্ময়ে তাঁর মনে হয়, এমনটি আর কখনো হয় নি, হবে না। তিনি ভাবেন, আমার কাছে আবির্ভূতা এই উষাই হলেন **পরায়তীনাম্ আয়তীনাম্ শশ্বতীনাম্ প্রথমা**—অতীত এবং অনাগত সমস্ত উষাদের প্রথমা। তখন হিরণ্যগর্ভ প্রজা-পতির কল্পলোকে চলে তাঁর নিত্য আনাগোনা, সেখান থেকে প্রজাপতির মতো ঝলক ঝলক স্বর্ণরেণু কুড়িয়ে এনে তিনি ছড়িয়ে দেন শ্যামল মাটির ধরাতলে, আকাশে বাতাসে লাগে নব-জীবনের নব-জন্মের হোলি। যে জেগে ছিল সে আনন্দে পাখা মেলে 'উচ্চরণ' হয়ে উচ্চরণ করে মহাকাশে সূর্যাভিসারে সোমাভিসারে। যে মরে গিয়ে ডুবেছিল হতাশার অতল কুহরে, সে বেঁচে ওঠে নিরন্তর আলোর আবীর-বর্ষণে।

৯॥ উষার তিনটি **ভদ্রম্ অপ্নঃ** ভালো কাজ। প্রথমত তিনি তাঁর সূর্য-চোখ বুলিয়ে দিয়েছেন সবার ওপরে, তিমিরাবরণ ঘুচে গিয়ে ঝলমল করে উঠেছে সৃষ্টি। **বি আবঃ** অনাবৃত করলে, ঢাকন খুলে দিলে **সূর্যস্য চক্ষসা** সূর্য-আঁখি দিয়ে, সূর্যপ্রকাশ দিয়ে। উষা তাকালেন আর আলো হয়ে গেল সব। দ্বিতীয়ত যে-সব **মানুষ** মনস্বান্ যজমানেরা **যক্ষ্যমাণ** যজ্ঞ করবে বলে সঙ্কল্প করেছে তাদের উষা জাগিয়ে দিয়েছেন। পূর্ব ঋকে **জীবম্ উদীরয়ন্তী**-র বিস্তার এটি।

আর তৃতীয়ত **অগ্নিং সমিধে** অগ্নিসমিন্ধনের জন্যে **যত্ চকর্থ** যা করেছ। প্রতিটি মানুষের অন্তরে সুপ্ত আছেন অগ্নি—আত্মচৈতন্যের অমৃত বহ্নিশিখা, ইদং জ্যোতির্ অমৃতং মর্ত্যেষু। তাকে মানুষ যখন নিজের চেষ্টায় জ্বালিয়ে তুলতে চায়, তখন বারে বারে জ্বালবি বাতি হয়ত বাতি জ্বলবে না। কিন্তু দেবতা যখন জ্বালান, তখন এক মুহূর্তেই তা দপ করে জ্বলে ওঠে, আর নেবে না। এই অগ্নি-দীক্ষাই সুদক্ষিণা উষার আশীর্বাদ অধ্যাত্মজীবনের শুরুতে।

দেবেষু দেবতাদের মধ্যে তুমিই এই তিনটি সৎকৃত্য করেছ, অথবা

দেবেষু দেবতাদের জন্যে করেছ—**লক্ষ্যার্থে সপ্তমী**—দেব-সৎকার করেছ এই তিনটি কৃত্য দিয়ে—দুটি অর্থই সম্ভব।

১০॥ এক অনাদ্যন্ত বর্তমানে দাঁড়িয়ে ঋষি তাঁর অনুভবের ডানা মেলে স্পর্শ করছেন মানুষের সভ্যতার তথা সৃষ্টির গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত। তিনি দেখছেন সব-ছাওয়া এক বিপুল উষাকে—নবারুণরাগরঞ্জিতসহস্রকোটি-জ্যোতির্বাহু প্রসারিত করে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, কুক্ষিগত করে অতীতের আর ভবিষ্যতের সমস্ত উষাদের। উষার বিশ্বরূপ দেখছেন ঋষি। 'যাহা কিছু আছে সকলই ঝাঁপিয়া, ভুবন ছাপিয়া, জীবন ব্যাপিয়া' আলোক-অলক এলিয়ে বিরাজমানা এই মঘোনী (মহিমময়ী) মহাকালিনী উষা। একটির পর একটি অন্ধকার ভেদ করে তাঁর নিত্য নব আবির্ভাব।

কিয়াত্যা=কিয়ত্যা, সংহিতায় দীর্ঘ হয়েছে। সন্ধিটি দুরকম ভাবে ভাঙা যায়, কিয়তি+আ, অথবা কিয়তী+আ। প্রথমটি বোঝাবে কাল-পরিমাণ, কবে। কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে, সে আজকে নয়, সে আজকে নয়—এইখানে 'কবে'র যে-অর্থ, তাই। সায়ণ বলছেন, অনেন উষসোঽনন্তত্বম্ উক্তম্। দ্বিতীয়টি বোঝাবে দেহ-পরিমাণ, কতখানি। **যত্** যে। **সময়া** সামীপ্যবোধক অব্যয়, **ভবাতি**—শক্যার্থে লেট্, কাছাকাছি হতে পারেন। এ উষা কতখানি অর্থাৎ কি বিরাট্, অথবা কবেকার পুরাণী চিরন্তনী উষা তিনি, যে কাছাকাছি হতে পারেন—কাদের? **যাঃ** যারা, যে-সব উষা **বি-ঊষুঃ** (লিট্) অতীতে প্রকাশ হয়েছিল, **যাঃ চ** এবং যারা **নূনম্** এখন, এবার **বি-উচ্ছান্** (লেট্) নিশ্চয় প্রকাশ হবে। √বস্=√উচ্ছ্—অর্থ 'বিবাস' বা (তমো-) বর্জন, অর্থাৎ অন্ধকারকে হটিয়ে আলোর প্রকাশ, রাত পুইয়ে আলো ফোটা।

পূর্বাঃ পুরাতনী উষাদের **বাবশানা** √বশ্—কামনা>চেয়ে চেয়ে, তাদের জন্যে আকুলিব্যাকুলি করে, হেদিয়ে। **অনু** অনুরূপ **কৃপতে** √কৃপ্—সামর্থ্য >সামর্থ্য ধরেন, সামর্থ্য প্রকাশ করেন। তাদেরই মতন এ উষাও শক্তিধরী, অর্থাৎ তাদের উত্তর-সাধিকা>তাদের ন্যূনতা পূরণ করছেন, শ্রীঅরবিন্দের অর্থ। **প্রদীধ্যানা** √দীধী—দীপ্তি >অত্যন্ত দীপ্তিশালিনী, অথবা 'প্র'—সামনে, দীপ্তির পর দীপ্তি ছড়িয়ে। **অন্যাভিঃ** অন্যদের সঙ্গে, অর্থাৎ আগামিনী উষাদের সঙ্গে **জোষম্ এতি** সানন্দে মিলিত হন।

১১॥ **যে মর্ত্যাসঃ** যে-সব মানুষ **পূর্বতরাম্** আগের-আগের (অথবা, অতিপ্রাচীন—সায়ণ) **উষসম্** উষাকে **বি-উচ্ছন্তীম্** প্রকাশিত হতে **অপশ্যন্** দেখেছিল, **তে** তারা **ঈয়ুঃ** চলে গেছে। **অস্মাভিঃ উ** আবার আমাদের দ্বারাও **নু** এখন **প্রতিচক্ষ্যা** প্রতিচক্ষণীয়া, দর্শনীয়া **অভূত্** হয়েছেন উষা। **তে উ** আবার তারাও **আ যন্তি** আসছে, **যে** যারা **অপরীষু** ভবিষ্যতে **পশ্যান্** (লেট্) দেখতে পাবে। 'অপরী'—সুমঙ্গলী, সমানী ইত্যাদির মতো বৈদিক স্ত্রীলিঙ্গ (পাণিনি ৪।১।৩০)। লৌকিক সংস্কৃতে হয় 'অপরা'। বিশেষ্য নেই, সায়ণ বলছেন 'রাত্রিষু'। খুবই সঙ্গত। একের পর এক রাত চিরে উষার আবির্ভাব দেখবে ভবিষ্যতের মানুষ।

১২॥ পর-পর কয়েকটি বিশেষণে উষার ভাব-মূর্তি গড়ে তাঁর বোধন করছেন ঋষি—জাগো হে বিদ্বেষনাশিনী শত্রুনাশিনী আনন্দময়ী পরমা 'উমা'। বন্দে……সুখদাং বরদাং মাতরম্।

যাবয়দ্-দ্বেষা দ্বেষ-বিদ্বেষ ঘুচিয়ে চলেছেন যিনি। ভরদ্-বাজ (=বাজম্ভর, শক্তিধর), জমদ্-অগ্নি (আগুনখেকো), মন্দয়ত্-সখ (বন্ধু নন্দন) ইত্যাদির মতো সমাস। 'দ্বেষস্' আদ্যুদাত্ত হলে বোঝায় দ্বেষ, অন্তোদাত্ত হলে দ্বেষ্টা। এখানে সমাসে দ্বেষস্-এর স্বর লুপ্ত, কাজেই দ্বেষ এবং দ্বেষ্টা দুই অর্থই করা যায়। তবে অন্যত্র অবিকল এই অর্থে—

যুযোধি-অস্মদ্ দ্বেষাংসি (২।৬।৪)

আমাদের যত দ্বেষ-বিদ্বেষ ঘুচিয়ে দাও হে ঘুচিয়ে দাও—

এখানে 'দ্বেষাংসি' আদ্যুদাত্ত। √যু বেদের দ্ব্যর্থক ধাতুগুলির একটি, অর্থ মিশ্রণ এবং অমিশ্রণ। এখানে হবে 'অমিশ্রণ' অর্থাৎ আলাদা করে দেওয়া, ঘুচিয়ে দেওয়া। উপনিষদেও এই একই প্রার্থনা—মা বিদ্বিষাবহৈ, আমরা দুজন (গুরু-শিষ্য) যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।

দ্বেষ মানুষের অধঃপ্রকৃতির একটি স্বাভাবিক কিন্তু অত্যন্ত অবাঞ্ছিত ধর্ম। উত্তরণ-কামী মানুষ চায় নিঃশেষে এর থেকে মুক্তি—

বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি।……

……কেন এ হিংসাদ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,

কেন এ মান-অভিমান। (পূজা ১২৬)

ঋতপা—সৃষ্টির চলার ছন্দ হল ঋত < √ঋ—চলা। সত্য হল সৃষ্টির

ধ্রুবপদ, আর ঋত তার বিশ্বতান। সেই ঋতের পালিকা, রাখালিনী হলেন উষা। সব দেবতাই তাই। তাঁর, তাঁদের জন্মই হল ঋতে, তাই উষা **ঋতেজাঃ**—ঋতজাতা, ঋতের দুহিতা। যেমন অগ্নি হলেন প্রথমজা ঋতস্য—ঋতের প্রথম জাতক।

সুম্নাবরী—সুম্ন মানে সুখ, আনন্দ, শান্তি, প্রসাদ, দাক্ষিণ্য। 'সুম্নাবরী' গোদাবরী বিভাবরী ইত্যাদির মত স্ত্রীলিঙ্গ। অর্থ—সুখিনী, সুখদা, সুদক্ষিণা, বরদা। অনুবাদে ও ভাষ্যে 'উমা' শব্দটি বৈদিক অর্থে (প্রসাদময়ী বরদা) ব্যবহার করা হয়েছে। **সূনৃতাঃ ঈরয়ন্তী**—দ্র. ৪র্থ ঋক্—নেত্রী সূনৃতানাম্। এখানে উষা-সরস্বতী একাকার। সূনৃতা বাক্‌কে ঈরণ করছেন প্রেরণ করছেন যিনি—inspiring Speech Divine. **সুমঙ্গলী** সুকল্যাণী। 'অপরী' ইত্যাদির মতো স্ত্রীলিঙ্গ। দ্র. ১১শ ঋক্।

দেববীতিং বিভ্রতী—√বী—সম্ভোগ। দেবভোগ্য আনন্দ-সুধা উষা বহন করে নিয়ে আসছেন সবার জন্যে। **শ্রেষ্ঠতমা**—'ইষ্ঠন্' এবং 'তমপ্' দুটি শ্রেষ্ঠত্ববাচক প্রত্যয় একসঙ্গে। ব্যাকরণের বাঁধ-ভাঙা অনুভূতির ভাষা।

তু. জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম,
এমন ধন আর নাহি যে তোমা-সম। (পূজা ১৮২)।

১৩॥ ১০ম ও ১১শ ঋকের ভাবানুবৃত্তি।

দেবী ও উষা দুটি শব্দের কার্যত একই অর্থ—জ্যোতির্ময়ী, কেননা √দিব্ ও √বস্ দুটি ধাতুরই অর্থ জ্যোতিঃপ্রকাশ। **শশ্বত্‌পুরা** শব্দগুম্ফটির অর্থ অনাদিকাল থেকে। **বি-উবাস** বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। **অথো** আবার **মঘোনী** মহিমময়ী **অদ্য** আজ **ইদম্** এই **বি-আবঃ**। 'আবঃ' ক্রিয়াপদটিকে আলাদা করে দেখলে মনে হয় যেন √বস্ (>আবস্) ও √বৃ (>আবর্) ধাতুর আশ্লেষ ঘটেছে। অনাবৃত করছেন, উজলে তুলছেন এই সব। সংহিতায় অবশ্য √বৃ-তে 'ব্যাবর্ মঘোনী' হবার কথা। **অথো** আবার **উত্তরান্ দ্যূন্ অনু** আগামী দিনগুলিতেও দিনের পর দিন ধরে **বি-উচ্ছাত্** ফুটবেন।

অজরা জরাহীন চিরযৌবনা **অমৃতা** অমৃত-স্বরূপিণী মৃত্যুহীন তিনি। **স্বধাভিঃ স্বধা** অর্থাৎ আত্মসমাহিতি নিয়ে **চরতি** চলেছেন। দেবতামাত্রেই স্বধাবান্ আত্মন্বী—আপনি আছেন আপনাতে, আবার সেই সঙ্গে **চরন্**

নিত্যগতিশীল। দেবতা একই সঙ্গে static ও dynamic, সত্য ও ঋত, 'জগত্' ও 'তস্থিবান্' এককথায় 'অসুর'। √অস্ মানে থাকা, আবার বিকীর্ণ করা। মহদ্ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্, সব দেবতার মধ্যেই রয়েছে সেই মহত্ অসুরত্ব অর্থাৎ স্বধা ও বিকিরণ, থাকা ও চলা। এক একটি দেবতা যেন এক একটি সূর্যের মতো ; জলছেন স্থির হয়ে, আবার আলো হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছেন গগনে গগনে ভুবনে ভুবনে হৃদয়ে হৃদয়ে।

১৪॥ **দিবঃ** দ্যুলোকের, আলোকিত আকাশের **আতাসু** যা আতত অর্থাৎ বিস্তৃত সেই দিকে দিকে **অঞ্জিভিঃ** √অঞ্জ্—প্রকাশ, অভিব্যক্তিতে, ঝলকে ঝলকে **বি-অদ্যোত্** বিদ্যোতিত, প্রকাশিত হলেন উষা। দিবঃ (<দ্যৌ) —অদ্যোত্ —একই চরণে স্থিত দুটি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত সাম্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উজ্জ্বল আলো-ঝলমল্ নভে উজলে উঠল উষা।

দেবী জ্যোতির্ময়ী আলোকরূপিণী উষা—এককথায় আলো। **কৃষ্ণাম্** কালো **নির্ণিজম্** রূপ, প্রদীপ্ত আবরণটিকে। রাত্রি কালো হলেও 'বিভাবরী' জ্যোতির্ময়ী। সেই কালো-রূপটি সরিয়ে দিয়ে উষা প্রকাশ করলেন তাঁর দেবী রূপ, আলো-রূপ। অর্থাৎ রাত্রি ও উষা একই দেবীর কালোবসন ও আলোবসন। সূর্যের সম্বন্ধেও এই একই কথা বলেছেন ঋষি—অনন্তম্ অন্যদ্ রুশদ্ অস্য পাজঃ কৃষ্ণম্ অন্যদ্ হরিতঃ সং ভরন্তি, অর্থাৎ, সূর্যের কিরণ-ঘোড়ারা একদিকে ধরে আছে ঝলমলে তেজ, অন্যদিকে কালো তেজ। হিরণ্যগর্ভ সম্পর্কেও এই একই কথা—যস্য ছায়া অমৃতং যস্য মৃত্যুঃ, অমৃতও তাঁর ছায়া, মৃত্যুও।

অরুণেভিঃ অশ্বৈঃ উভয়ান্বিত। **প্রবোধয়ন্তী**-র সঙ্গেও যাবে, **সুযুজা**-র সঙ্গেও যাবে। **অশ্ব** ব্যাপনশীল কিরণ-ঘোড়া, √অশ্—ব্যাপ্তি। উষার রাঙা আলো মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপ্ত করে বিশ্বভুবন, জাগিয়ে তোলে সবাইকে। তাই তিনি 'অরুণেভিরশ্বৈঃ প্রবোধয়ন্তী'। সেই রাঙা কিরণগুলিই উষার রথের ঘোড়া। সেই ঘোড়া দিয়ে সুন্দর করে যোতা তাঁর রথ, তাঁর বরাভয় বিশ্ববিপ্লাবী জ্যোতি। উষা **আ-যাতি** আসছেন **সুযুজা রথেন** তাঁর জগৎ-জাগানো রশ্মি-তুরঙ্গ-বাহিত অপরূপ আলোর রথে। আলোই তাঁর রূপ, আলোই তাঁর রথ, আলোই তাঁর বাহন। অন্ধকার রাতের বুক চিরে অরুণবর্ণা উষার আবির্ভাব যেন টগবগিয়ে রথ হাঁকিয়ে বিশ্বভুবন তাতিয়ে-মাতিয়ে এক

অশ্বিনী রথিনী বিচিত্রাঙ্গনার অমোঘ আগমনী। সেই আগমনী-গান শুনে জেগে উঠতে বাধ্য সবাই—

উষা অজীগর্ ভুবনানি বিশ্বা।

১৫॥ দেবী রিক্তহাতে আসছেন না, আসছেন **পোষ্যা** =পোষ্যাণি পুষ্টি-দায়ক **বার্যাণি** বরণীয়তম যত সম্পদ্ **আবহন্তী** বহন করে নিয়ে। বেদের ঋষির মধ্যে শ্রেয়-প্রেয়ের দ্বন্দ্ব নেই, কেননা তাঁর সত্য সবটাকে নিয়ে। দিব্যং বসু' স্বর্গের ধন আর 'পার্থিবং বসু' মর্ত্যের ধন—দুই ধনেরই তিনি অর্থী। দুই-ই তাঁর কাছে বার্য, বরণীয়, সাগ্রহে গ্রহণীয়। তিনি পূর্ণজীবনের বাঁচুনি। যা কিছু পরিপুষ্ট করে এই পূর্ণজীবনকে, তার কিছুই তাঁর কাছে বর্জনীয় নয়। তাই তাঁর দেবতা ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী।

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি বৈদিক অনুপ্রাসের নমুনা। উষা 'চেকিতানা চিত্রং কেতুং কৃণুতে'। √কিত্॥ চিত্ ধাতুর অর্থ সংজ্ঞান। এখানে **চেকিতানা** অন্তর্ভূত-ণ্যর্থ অর্থাৎ causative। সবাইকে জানাতে জানাতে চেনাতে চেনাতে **চিত্রং কেতুং** আশ্চর্য উজ্জ্বল আলোর ইসারা **কৃণুতে** করেন, দেন। উষা নিজেই তাঁকে চিনিয়ে দেন 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' দিয়ে। উষার আলোয় চিনি উষাকেই।

ঈয়ুষীণাম্ শশ্বতীনাম্ বিগত বহু উষার **উপমা** চূড়ান্ত পর্যবসান, **বিভাতীনাম্ শশ্বতীনাম্** নিত্য ফুটে চলেছে যে-সব উষা তাদের **প্রথমা** অগ্রনায়িকা, সেরা **উষা বি-অশ্বৈত্** প্রকাশিত হলেন। ব্যাকরণে √শ্বি-র অর্থ বলা হয়েছে গতি ও বৃদ্ধি। কিন্তু 'শ্বেত' শব্দের প্রমাণে √শ্বি-র অর্থ উজ্জ্বল হওয়া, সাদা হওয়াও হয়। উষা বি-অশ্বৈত্—রাত পোয়াল, ফর্সা হল।

অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে উষার জ্যোতির্মালিকার উজ্জ্বলতম জ্যোতি হলেন আমার কাছে আবির্ভূতা এই উষা—দ্রষ্টার অনুভবের দিক থেকে (subjectively) একথা খুবই সত্য। এ-ঋকের ভাবসাদৃশ্য আছে ৮ম ও ১০ম ঋকের সঙ্গে।

১৬॥ উষার আলোয় উদ্ভাসিত উদ্দীপ্ত মুখখানি মানুষের দিকে ফিরিয়ে বজ্রকণ্ঠে হাঁক দিলেন কুত্স আঙ্গিরস—

উত্ ঈর্ধ্বম্ ওঠ্ রে সবাই। উত্- √ঈর্ মানে উর্ধ্বে গমন করা, ওঠা। জড়তা ছেড়ে, নিশ্চেতনার নিশ্চিন্ত শয়ন ছেড়ে জাগো সব মানুষেরা।

জ্যোতিরুদ্গমন কর—চল আলোর পানে, উর্ধ্বপানে। চোখ মেলে দেখ। **নঃ জীবঃ অসুঃ** আমাদের জীবন আমাদের প্রাণ **আ-অগাত্** এসেছে। এসেছেন আমাদের প্রাণস্বরূপিণী জীবনদায়িনী উষা। **তমঃ** অন্ধকার **অপ** দূরে **প্র** পালিয়ে **অগাত্** গেল। **আ** চারিদিক থেকে **জ্যোতিঃ** আলো **এতি** আসছে। আসছে আলোর বিপুল বন্যা দিক্‌দিগন্ত ভাসিয়ে, চরাচর হাসিয়ে। সেই আলোর মিছিলের শেষে আসছেন রাজাধিরাজ—উত্তম-জ্যোতি সূর্য। **সূর্যায় যাতবে পন্থাম্** সূর্যের যাওয়ার পথ **অরৈক্** (দ্র. প্রথম ঋক্) অবাধ, অবারিত করে দিয়েছে এই আলো, নিঃশেষে সব অন্ধকার ঝেঁটিয়ে উড়িয়ে পুড়িয়ে। **যত্র** যেখানে **আয়ুঃ** জীবনসীমা, ভব-পারাবার **প্র-তিরন্তে** সাঁতরে পার হয়ে মহাজীবনের কূলে গিয়ে পৌছয় অক্লান্ত সন্ধানী সংগ্রামী মানুষেরা, সেখানে **অগন্ম** আমরা পৌছলাম।

শেষের পঙ্‌ক্তিটি 'য়ুরেকা' বা 'পেয়েছি পেয়েছি'-র মত একটি আনন্দধ্বনি, মনে করিয়ে দেয় ঋষি প্রগাথ ঘোর কাণ্বের সেই বিখ্যাত উক্তিটি—

অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম
অগন্ম জ্যোতির্ অবিদাম দেবান্। (৮ ৪৮।৩)

পিয়েছি সোমকে, হয়েছি অমৃত,
গিয়েছি আলোয়, জেনেছি দেবতা।

১৭॥ **বিভাতীঃ উষসঃ** একের পর এক ফুটে উঠছেন যে সর্বকাশিনী উষারা, তাঁদের **স্তবানঃ** অবিরাম স্তবগানে মুখর **উষসঃ রেভঃ** উষার কবি, গায়ক **বাচঃ বহ্নিঃ** বাণী-বাহক হয়ে **স্যূমনা** অনায়াসে, অনবরত, সুতোর মতো ওতপ্রোত **বাচঃ** বাণী-পরম্পরা **উদ্-ইয়র্তি** উচ্চারণ করে চলেছে। উষসঃ এবং বাচঃ দুটি পদই উভয়ান্বিত, একবার দ্বিতীয়ার বহুবচন-রূপে, একবার ষষ্ঠীর একবচন-রূপে।

ঋষিকবির উপলব্ধিতে প্রথমপুরুষ উত্তমপুরুষ একাকার হয়ে গেছে, বাগ্‌ভঙ্গির মধ্যেও তা ফুটে উঠেছে।

অপৌরুষেয় মন্ত্রের জন্মের ব্রাহ্মমুহূর্তে ঋষির হৃত্‌সমুদ্র উষার আলোয় রাঙা এক অথৈ বাণীর পারাবার, যাকে বিশ্বামিত্র-পুত্র ঋষি মধুচ্ছন্দা বলেছেন 'মহো অর্ণঃ', মহার্ণব, যেখান থেকে ঢেউয়ের মতো উছলে উঠছে, ফোয়ারার

মতো উৎসারিত হয়ে চলেছে বাণীর পর বাণী। সেই বিচিত্র অর্থে-অর্থে-মেশামেশি গণ্ডী-কোথায়?-হারিয়ে-গেছে বাণীর পারাবার যে কেমন, তার একটি নমুনা হল এ-ঋকের প্রথম চরণ, বিশেষ করে, 'স্যূমনা' শব্দটি।

√সিব্—অর্থ তন্তুসন্তান, সুতো দিয়ে বুনে চলা, সেলাই করা। তার থেকে নিষ্পন্ন 'স্যূমন্' শব্দের অর্থ হবে অনুস্যূতি, ওতপ্রোত ভাব, পরস্পর সংশ্লিষ্টতা>একটির পর একটি, ক্রমান্বয়ে, অনবরত>অনায়াসে, অক্লেশে। এর সঙ্গে মিলে যায় নিঘণ্টুতে উল্লিখিত স্যূমক এবং স্যোন শব্দের অর্থ—সুখ (৩।৬)। অনায়াসে অক্লেশে ঋষি উচ্চারণ করে চলেছেন বাণী-পরম্পরা, সূক্ত ('সু' অনায়াস ও সুন্দর 'উক্ত' উক্তি)। 'বহ্নি' শব্দের যৌগিক এবং রূঢ় দুটি অর্থই এখানে বর্তমান। ঋষি হলেন বাণীর বাহক, তাই তিনি √বহ্+নি>বহ্নি। অলৌকিক আনন্দের তথা বাণীর ভার তিনি বক্ষে বহন করছেন, করতে করতে হয়ে উঠছেন বহ্নি—আগুন।

অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার।
তার নিত্য জাগরণ। অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।
(ভাষা ও ছন্দ, রবীন্দ্রনাথ)

ছবিটি হল—তলায় একটি টইটম্বুর জলাধার থাকলে যেমন ফোয়ারার মুখে স্বত-উৎসারিত হয় জল, তেমনি কবির ভরা হৃদ্যসমুদ্র থেকে স্বত-উৎসারিত হচ্ছে বাণী তাঁর অগ্নিবীণাসম দেহ-যন্ত্রের মুখ দিয়ে :

তত্ তাই **মঘোনি** হে মহিমময়ী, **অদ্যা** অদ্য আজ **গৃণতে** তোমার 'গৃণত্' স্তোতা, কবির কাছে **উচ্ছ** ফুটে ওঠ। **অস্মে** আমাদের জন্যে, আমাদের মধ্যে **প্রজাবত্ আয়ুঃ** প্রজা-যুক্ত সন্তান-যুক্ত সন্তত (continuous), একটির পর একটি আয়ুঃ, জীবন-পরম্পরা, অনন্ত জীবন, অমৃতত্ব **নি** গভীরে **দিদীহি** জল-জ্বলিয়ে ঝলমলিয়ে তোলো। √দী—দীপ্তি।

Reveal vistas of Life in the depth of our selves. এই ব্যাবহারিক জরাব্যাধিক্লেশদুঃখার্ত জন্মমৃত্যুদিগ্ধ জীবনের তলায় তলায় বয়ে চলেছে দেখা না-দেখায় মেশা বিদ্যুল্লতার মতো অখণ্ড অনন্ত মহাজীবনের ঋজুবালুকা নদী। দেখাও, হে জ্যোতির্ময়ী, তোমার আলোয় দেখি তার পূর্ণরূপচ্ছবি।

১৮॥ যাজ্ঞা এবং দান, চাওয়া এবং দেওয়া—দেবতা ও মানুষের সাধারণ ধর্ম। মানুষ ভালোবেসে চায় দেবতাকে, তাই সে দেবয়ু। চায় বলেই দেয়, যা কিছু তার আছে, তাই সে দাশ্বান্। দেবতাও ভালবেসে চান আমাদের, তাই তিনি অস্ময়ু। আর তাঁর দানও বিচিত্র, অফুরন্ত। তিনি সুদানু, জীরদানু, গো-দা, গো-দাবরী, সুম্নাবরী, অশ্বদা, সর্ব-দা।

দেবতাকে মানুষের সবচেয়ে বড় দান হল সোম আর সাম—আনন্দ আর গান। দেহলতা নিঙড়ে নিঙড়ে দেবতাকে আনন্দ-দানের প্রতীকী যাগ হল সোমযাগ—সোমলতা নিঙড়ে নিঙড়ে রস বার করে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া। এই যাগ যিনি করেছেন, তিনি হলেন সোমসুত্বা, সোমসবনকারী। √সু—নিষ্পিষ্ট করা, to crush. সোমের সঙ্গে চলে সাম, সুনৃতা অর্থাৎ ঋতচ্ছন্দা বাক্‌কে (দ্র. ৪র্থ ঋকের ভাষ্য) আশ্রয় করে। জীবনযজ্ঞভূমি থেকে সুরু করে পরম ব্যোমের দিকে ক্ষিতি-অপ্-তেজো-মরুৎ-ব্যোমের স্তরে স্তরে উঠে গেছে সুনৃতা বাক্ ক্রমশ সূক্ষ্ম, সর্বব্যাপী, সর্বানুস্যূত হতে হতে। দৈনন্দিন প্রাত্যহিক জট-পাকানো জটিলা কুটিলা বাকের মধ্যে থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে কবিতার ছন্দে, যেন পাষাণ-শয্যায় স্বপ্ন-ভঙ্গ হল নির্ঝরের, মৃন্ময়ী হল অপ্-ময়ী প্রাণময়ী। তারপর সে জ্বলে ওঠে আগুনের মতো বিদ্যুতের মতো সূর্যের মতো। তখন সে তেজোময়ী। তারপর সে হয় আরো সূক্ষ্ম—হাওয়ার মতো। দিগ্‌বিদিকে দিগ্‌বসনা দিগম্বরী হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সর্ব-গা হয়ে—যেমন রামপ্রসাদের গান। এই অনুভবের কথা ঋষিকা বাক্ বলেছেন তাঁর দেবীসূক্তে---

অহমেব বাত ইব প্র বামি
আরভমানা ভুবনানি বিশ্বা

বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে বিশ্বভুবন
স্রষ্টা আমি চলছি বয়ে হাওয়ার মতন।

এই ভূমিকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ কোনো ব্যর্থতার মুহূর্তে আক্ষেপ করে বলেছিলেন---

আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

বলেছিলেন, তুলসীদাসকে আমি ঈর্ষ্যা করি। আমার ঐ দরোয়ান সারাদিন পরিশ্রমের পর সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে শুচিশুদ্ধ হয়ে যে বইটি নিয়ে বসে, সেটি হল তুলসীদাসের রামায়ণ। আমার কবিতা তো অতদূর যায় নি।

কবিতা যদি না-ও গিয়ে থাকে, গান গিয়েছে। তাঁর গান সর্বত্রগামী হয়েছে, সত্য হয়েছে নিজের গান সম্পর্কে তাঁর সেই বিস্মিত অনুভূতি—

আজি এ কোন গান **নিখিল প্লাবিয়া**
তোমার বীণা হতে আসিল নাবিয়া।

এই **বায়োঃ ইব** হাওয়ার মতন **সূনৃতানাম্ উদর্কে** ঋতচ্ছন্দা বাকের অবসানে, পরিণামে কবি-যজমানের পরম-প্রাপ্তি হল দেবভূমিতে পৌঁছে দেবতাকে পাওয়া, দেবতা হয়ে বসা—

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্

সেই পরমব্যোমে মহাশূন্যে, সূক্ষ্মতম অণুতম মহত্তম পরা বাকের পরিপূর্ণ শূন্যতায়—যেখান থেকে ঝরে সমস্ত ঋক্ সাম যজু কবিতা গান কথা—এই হৃদয়-সমুদ্রে, যেখানে বসে আছেন সমস্ত দেবতারা এক হয়ে একাসনে।

দেবতার পরম দান হল আত্মদান। তিনি আত্ম-দা, নিজেকে দেন। তাই **সূনৃতানাম্ উদর্কে** গানের অবসানে যজমান **তাঃ অশ্নবত্** সেই তাঁদের পাক্ **যাঃ উষসঃ** যে উষারা হলেন **গোমতীঃ** ভোর-সকালী রাঙা রোদের-গরুর ঐশ্বর্যে ঝলমল, **অশ্বদাঃ** অশ্বদায়িনী, অশ্ব যার প্রতীক সেই ওজো-দায়িনী (দ্র. ১৪শ ঋকের ভাষ্য), **সর্ববীরাঃ** সমস্ত বীর্যের আধার, বাজিনীবতী, বজ্রবীর্যধরী এবং যে-উষারা **দাশুষে মর্ত্যায় বি-উচ্ছন্তি** প্রকাশিত হন অ-কৃপণ মানুষের কাছে।

১৭॥ উষা **দেবানাং মাতা** দেব-মাতা। কেননা, নতুন জীবনের ভোর হওয়ার পরেই একে একে সব দেবতার জন্ম হয় উদ্বুদ্ধ মানুষের ঋষিচেতনায়। জন্ম মানে আবির্ভাব। অব্যক্ত অচেনার রাজ্য থেকে এক-একটি দেবতা শিশুর মতো আবির্ভূত হন সত্যদ্রষ্টা সত্যশ্রুৎ ঋষির আপ্যায়িত ইন্দ্রিয়ের সামনে। তখন তাঁরে চিনি, তখন তাঁরে জানি।

তাই উষা হলেন **অদিতেঃ অনীকম্** আদি দেবমাতা অদিতির 'অনীক' মুখ। দেবতারা নিত্যতত্ত্বরূপে বিরাজমান যে অখণ্ডা অবন্ধনা অবিভাজ্যা একেশ্বরীর বিপুল বৃহৎ হিরণ্য-গর্ভে, তিনিই অদিতি। সেই অদিতি যেন তাঁর

রহস্যকায়াটি অব্যক্তের মধ্যে ঢেকে রেখে শুধু মুখের ঘোমটাটি খুলে দিলেন—এই মুখই উষা। অদিতিই মুখ বাড়ালেন উষার মধ্যে দিয়ে, আর অমনি আলোয় আলো হয়ে গেল দেবযান পথ, ভাস্বর ভাস্কর্যের একটি সোপান-সেতুর মতো, মানুষটির জীবনে যজ্ঞ সুরু হল। তাই তিনি **যজ্ঞস্য কেতুঃ** যজ্ঞ-প্রকাশ, যজ্ঞ কী কেমন, অভ্রান্ত আলোর ইসারায় তা দেখিয়ে দেন।

উষা হলেন **বৃহতী** বিরাট্ অসীমা, এবং **বিশ্ববারা**। দুটি অর্থ। √বৃ—বরণ, √বৃ—আবরণ। বিশ্ব অর্থাৎ সব কিছুকে আবৃত করে, ছেয়ে আছেন; এবং 'বিশ্বের' সবার তিনি বরণীয়া।

তাঁর কাছে ঋষির তিনটি প্রার্থনা। প্রথম **বি ভাহি,** বিভাত হও প্রকাশ হও। Reval thyself to me. তুমি না চেনালে পরে, কে তোমারে চিনতে পারে। দ্বিতীয়, **ব্রহ্মণে নঃ প্রশস্তিকৃদ্** বি-উচ্ছ। 'নঃ' আমাদের 'ব্রহ্মণে' মন্ত্রে 'প্রশস্তিকৃত্' প্রশস্তি দিয়ে 'বি-উচ্ছ' আঁধার হটিয়ে ফোটো। বৃহতের উদ্দীপনায় জাগা বৃহতী বাকৃই ব্রহ্ম অর্থাৎ মন্ত্র। সেই মন্ত্রে দাও প্রশস্তি বিপুল প্রসার। আমার বাক্ যেন ছড়াতে ছড়াতে ছড়িয়ে যায় বৈখরী মধ্যমা পশ্যন্তী পেরিয়ে ক্ষিতি-অপ্-তেজো-মরুৎ (পূর্বমন্ত্র ভাষ্য দ্রষ্টব্য) ছাড়িয়ে তোমার আলোর পাখার স্পন্দনে স্পন্দিত হতে হতে শূন্যতার সহচরী হয়ে মহাব্যোমে।

আর একটি অর্থও হতে পারে। আমাদের মন্ত্রের উদ্দেশে প্রশস্তি উচ্চারণ কর। বল, 'এ গান আমার ভাল লেগেছে।'

সরস্বতীর কাছে এই ধরণের প্রার্থনা করেছেন আরো এক ঋষি—

অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি।
অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তিম্ অম্ব নস্ কৃধি

আমাদের কেউ পোঁছে না (প্রশস্তি>পোঁছা ?) মা, তুমি আমাদের প্রশস্তি কর।

ঋষির তৃতীয় প্রার্থনা, **আ নো জনে জনয়** অর্থাৎ জনে নঃ আ জনয়। এ যেন আজানজ শব্দটিকে ভেঙে বলা। আজানজ শব্দের অর্থ, দেবলোকে যে জন্ম নিয়েছে—born in the world of gods—MMW, জন মানে এখানে দেবজন দেবকুল। সেই দেবকুলে আমাদের আজাত কর, সঞ্জাত কর, নতুন জন্ম দাও। আমাদের দেবতা কর। অর্থাৎ ১৮শ ঋকের শেষ কথা যা ছিল তা-ই এখানে আর এক ভঙ্গিতে বলা হল।

২০॥ কুত্সের সূক্তগুলি উপসংহারে একটি সাধারণ ধুয়া দিয়ে চিহ্নিত। সেটি হল—

তত্ নঃ মিত্রঃ বরুণঃ মামহন্তাম্ (দীর্ঘটি ছন্দের জন্য)
অদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ।

আমি যা উচ্চারণ করলাম, তা মিত্র বরুণ অদিতি এই তিন অনন্তের দেবতা, এবং সিন্ধু অর্থাৎ অন্তরিক্ষ পৃথিবী দ্যৌ এই তিন লোকদেবতা 'মমহন্তাম্' (অভ্যস্ত মহ্ ধাতুর লোটের রূপ), মহিত করুন, মান্য করুন। √মহ্—বড় করা, মান দেওয়া। পিতামহ ('বড়' বাবা অর্থাৎ বাবার বাবা), মাতামহী (বড়-মা), মহৎ—ইত্যাদি শব্দের মধ্যে ধাতুটি বর্তমান রয়েছে।

ঈজান যে যজন করে। **শশমান**— √শম্ > যে শ্রম করে বা যে শান্ত থাকে ; অথবা √শংস্ > শংসমান > শশমান (নিরুক্ত ৬।৮) যে স্তব করে। যথাক্রমে সোমযাগের যজমান, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা, হোতা ও উদ্গাতাকে লক্ষ্য করা হল। এদের জন্য উষারা বহন করে নিয়ে আসেন যে **চিত্রম্** উজ্জ্বল আশ্চর্য **ভদ্রম্** ভালো সুন্দর **অপ্নঃ**। নিঘণ্টুতে অপ্নঃ শব্দের তিনটি অর্থ দেওয়া হয়েছে, কর্ম, অপত্য ও রূপ। পঞ্চদশ ঋকে গেছে উষার 'পোষ্য বার্য' পুষ্টিদায়ক বরণীয় ধন আহরণের কথা। অপ্নস্ মানেও তাহলে মানুষ যা পেতে চায় (<আপ্) সেই বাঞ্ছিত বিত্ত—আলোর কর্ম, আলোর সন্তান, আলোর রূপ (হিরণ্যশরীর)। উষার এই দানকে মঞ্জুর করুন মিত্র বরুণ অদিতি ও আকাশ-পৃথিবী-অন্তরিক্ষ। Amen.

১২। সূর্য

১॥ **দেবানাম্ চিত্রম্ অনীকম্** দেবতাদের উজ্জ্বল আশ্চর্য মুখ, বা রশ্মি-সমূহের উজ্জ্বল আশ্চর্য পুঞ্জ **মিত্রস্য বরুণস্য অগ্নেঃ** মিত্র-বরুণ-অগ্নির **চক্ষুঃ** চক্ষুরিন্দ্রিয়স্বরূপ বা প্রকাশক **জগতঃ তস্থুষঃ চ আত্মা** জঙ্গম এবং স্থাবরের আত্মা **সূর্যঃ উদ্ অগাত্** সূর্য উদিত হয়েছেন। **দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষম্** দ্যুলোক ভূলোক ও অন্তরিক্ষকে **আ-অপ্রাঃ** পরিব্যাপ্ত করেছেন, √প্রা + লুঙ্ সিচ্ + দ্।

২॥ **দেবীম্ রোচমানাম্ উষসম্** জ্যোতির্ময়ী আলোঝলমল উষাকে **অভি** লক্ষ্য করে **সূর্যঃ**···**যোষাম্ মর্যঃ ন** তরুণীকে লক্ষ্য করে কোন উজ্জ্বল তরুণের মতো, √স্ম-ঝলসে ওঠা >স্মর্য>মর্য (বেমী), **পশ্চাত্** পেছন-পেছন **এতি** চলেছেন। **যত্র** যখন **দেবয়ন্তঃ** দেবকাম, দেব+আত্মকামনায় ক্যচ্+ শতৃ+১।৩ **নরঃ** নরেরা, 'নৃত্যন্তি কর্মসু' (নিরুক্ত) কর্মে যারা নাচে, আত্মবীর্যে যাদের কর্ম নৃত্যের মতো ফোটে তারা **ভদ্রং প্রতি** ভদ্র সূর্যের উদ্দেশে **ভদ্রায়** ভালো চেয়ে **যুগানি বি তন্বতে** যুগগুলি বিছিয়ে দেয়, বিতানে অর্থাৎ যজ্ঞে নিয়োজিত করে। যুগ শব্দের তিনটি অর্থ—কাল, জোয়াল, যুগল। তদনুসারে যুগানি বিতন্বতে যথাক্রমে অর্থ হবে—যথাকালে যজ্ঞ করে, যজ্ঞের উদ্দেশ্যে লাঙ্গল দেয়, যুগলে যজ্ঞ করে। সপত্নীক যজমানই যজ্ঞে অধিকারী।

৩॥ **সূর্যস্য** সূর্যের **ভদ্রাঃ** ভদ্র, ভালো, সুকল্যাণ **হরিতঃ** হিরণ্যবর্ণ **চিত্রাঃ** উজ্জ্বল, অপরূপ **এতগ্বাঃ** বিচিত্রবর্ণ **অশ্বাঃ** ব্যাপনশীল কিরণ-ঘোড়ারা **অনু-মাদ্যাসঃ** অনু-মদিত হতে হতে, অনু √মদ্—সানন্দ সমর্থন **নমস্যন্তঃ** নমন-যুক্ত হয়ে বা নমস্কার জাগিয়ে **দিবঃ পৃষ্ঠম্** আকাশের গায়ে **আ** সর্বত্র **অস্থুঃ** স্থিত হল। **সদ্যঃ** একদিনেই, তক্ষুণি **দ্যাবাপৃথিবা** দ্যুলোক-ভূলোককে **পরি যন্তি** প্রদক্ষিণ করে তারা।

৪॥ **সূর্যস্য** সূর্যের **তত্ দেবত্বম্** সেইটিই দেবত্ব **তত্ মহিত্বম্** সেইটিই মহিমা, যে **কর্তোঃ মধ্যা** করতে করতে মাঝখানে **বিততম্** যা ছড়ানো তাকে **সম্ জভার** সংহৃত করেন।

মানুষের কর্মের ঠিক মাঝখানে অস্তগামী সূর্য তার কিরণ গুটিয়ে নেয়, এই ব্যাখ্যায় সূর্যের মহিমা ফোটে না। সূর্যের কাজ আলো দেওয়া, সেই স্ব-কর্মের মধ্যবিন্দুতে চরমসীমায় পৌঁছেও সূর্য তাঁর ছড়ানো রশ্মিজালকে গুটিয়ে নিতে সুরু করেন, অর্থাৎ চরমে উঠেও আত্মসংযম—এইটিই তাঁর মহিমা।

যদা ইত্ যখনই **সধস্থাত্** এই পৃথিবীলোক থেকে [তুলে নিয়ে] **হরিতঃ** হিরণবর্ণ কিরণ-ঘোড়াদের **অযুক্ত** [অন্যত্র] যুতে দেন, **আত্** অমনিই **রাত্রী** রাত্রি **সিমস্মৈ** সর্বত্র **বাসস্** কাপড়খানি অর্থাৎ অন্ধকার **তনুতে** বিছিয়ে দেয়।

৫॥ **মিত্রস্য বরুণস্য** মিত্র ও বরুণের **অভিচক্ষে** দর্শনের জন্য, প্রকাশের

জন্য **সূর্যঃ**···**দ্যোঃ উপস্থে** আকাশের কোলে **তত্ রূপম্ কৃণুতে** ঐ রূপ প্রকাশ করেন, করছেন; আবির্ভূত হচ্ছেন। **অস্য** এঁর **হরিতঃ** হিরণ-কিরণেরা **অন্যত্** একটি, একদিকে **অনন্তম্ রুশত্ পাজঃ** অনন্ত উজ্জ্বল তেজ **অন্যত্** অন্যটি, আরেকদিকে **কৃষ্ণম্** অনন্ত কালো তেজ **সম্ ভরন্তি** বহন করছে।

মিত্র—অনন্ত ব্যক্ত, আলো। বরুণ—অনন্ত অব্যক্ত, কালো। সূর্যের মধ্যে দুটিই আছে। মিত্র-বরুণ উভয়কে দেখতে পাওয়াই হল 'সূর-চক্ষাঃ' সূর্য-চক্ষু হওয়া।

৬॥ **দেবাঃ** ওগো দেবতারা **অদ্য** আজ **সূর্যস্য** সূর্যের **উদিতা** উদয়ে, উদিতি + ৭।১ ডা, সুপাং সুলুক্···পা ৭।১।৩৯ **অংহসঃ** অংহস্ অর্থাৎ চিত্তের দৈন্য সঙ্কোচ গ্লানি থেকে **নিঃ** নিঃশেষে মুক্ত করে **পিপৃত** উত্তীর্ণ কর, পূর্ণ কর। **অবদ্যাত্** মলিনতা থেকে নিঃ [পিপৃত]··· ।

নঃ আমাদের **তত্** এই প্রার্থনা **মিত্রঃ বরুণঃ অদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী দ্যৌঃ** এই ছয় দেবতা **মামহন্তাম্** মান্য করুন, Amen. উষা-সূক্তের ২০শ ঋক্ দ্র.।

১৩। ঋষি গৃত্সমদের অগ্নি-সূক্ত

উপমা, উপমা। কাকে বল উপমা?
সে কি শুধু রূপারোপ? সে কি তাজা রূপও না?

এই রূপক-ছুঁইছুঁই রূপসী উপমার মালা গেঁথে দেবতাকে পরিয়েছেন ঋগ্বেদের অনেক কবি। তার মধ্যে জলজল করছে গৃত্সমদের এই সূক্তটি, যেখানে দেবতাকে অঙ্গে অঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন ঋষি। প্রতি অঙ্গে প্রিয়দেবতার ন্যাস করে দেবসর্বাঙ্গ হয়েছেন। তাছাড়া অর্থগৃধ্নু কৃপণ, ছাগল, এমনকি কুকুরকে পর্যন্ত দেবতার উপমান করেছেন তিনি। এ যেন যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে। উচ্চ-নীচ ভেদ নেই। উপমার ছলে দেবতার বিশ্বরূপায়ণ। রামকৃষ্ণকথামৃতের মতো।

সৃষ্টির মধ্যে যে দুই-দুই রয়েছে, তা যেখানে এক হয়ে মিশতে সুরু করে, সেই রহস্যময় আলো-আঁধারির অসীম পাথার, সেই দ্যুলোকের সুরু-সীমানার মহাভূমির দেবতা হলেন অশ্বিদ্বয়। তাঁদের একটি কালো, একটি ধলো। একটি তমোভাগ, একটি জ্যোতির্ভাগ। সৃষ্টিমূল বিরোধাভাসের অপরূপ শ্লিষ্ট যুগল যমজমূর্তি। যা কালো, তাই ধলো। যা আঁধার, তাই আলো। দুই-ই সেই পরমার্থ।

১॥ **গ্রাবাণা ইব** দুটি যজ্ঞ পাষাণের মতো **তত্ ইত্ অর্থম্** সেই অর্থটিকেই **জরেথে** গাইছ তোমরা দুজন।

তদ্ বা ত্যদ্ শব্দ দিয়ে পরম পরোক্ষ অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করা হয়, যেমন 'এষ স্য সোমঃ' এই সেই সোম, 'ওম্ তত্ সত্' হ্যাঁ সেই সত্য, ইত্যাদি। অর্থ< √ঋ-গতি, যার দিকে চলেছে মানুষ, চলেছে সৃষ্টি—

দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি
এই বন চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।

যত্ সানোঃ সানুম্ আরুহত্......তদ্ ইন্দ্রো অর্থং চেততি (১।১০।২), শিখর থেকে শিখরে আরোহণ করতে করতে ইন্দ্র আবিষ্কার করেন সেই পরমার্থকে। সর্বেন্দ্রিয়ে ইন্দ্রাবিষ্ট ইন্দ্রকল্প পুরুষও ঋষিচেতনার তুঙ্গ থেকে তুঙ্গতর স্তরে আরোহণ করতে করতে ক্রমশ আবিষ্কার করেন জীবনের, সৃষ্টির পরমার্থকে।

ত্বং বৃথা নদ্য ইন্দ্র সর্তবে-অচ্ছা সমুদ্রম্ অসৃজো রথাঁ ইব
বাজয়তো রথাঁ ইব
ইত উতীর্ অযুঞ্জত **সমানম্ অর্থম্ অক্ষিতম্**
ধেনূর্ ইব মনবে বিশ্বদোহসো
জনায় বিশ্বদোহসঃ (১।১৩০।৫)

ইন্দ্র তুমি অনায়াসে ছুটিয়ে দিলে রথের মতো
দুর্ধর্ষ রথের মতো নদীর পরে নদী
তারিণী সেই তীব্রগতি স্রোতস্বিনীর দল
মিলিয়ে দিল ক্ষয়-নেই-যার লক্ষ্যকে সেই এইখানে একযোগে

সব পাওয়া দেয় পাইয়ে যারা মানুষকে সেই কামধেনুদের মতো
পেল নতুন জন্ম যে-জন তার কাছে সব-ঝরিয়ে-দেওয়া
কামধেনুদের মতো।

সেই পরম অর্থটিকেই বাজিয়ে তোলে সোম ছেঁচার দুটি পাথর। যজ্ঞ পরমকে পাওয়ার প্রস্তুতি, সাধন। তাই যজ্ঞের সব উপকরণ, সব অনুষ্ঠানেই পরমের ব্যঞ্জনা। হে যুগ্মদেবতা অশ্বিদ্বয়, তোমরাও গাইছ (√জৄ-স্তুতি) সেই পরমার্থের-ই গান, কেন না তোমরাও সেই পরমদেবতারই একটি রূপ।

নিধিমন্তম্ বৃক্ষম্ অচ্ছ গুপ্তধন-যুক্ত বৃক্ষের অভিমুখে **গৃধ্রা ইব** যেমন দুজন অর্থগৃধ্নু আসে, তেমনি করে এস। গাছের তলায় গুপ্তধন পুঁতে রাখার প্রাচীন প্রথার ইঙ্গিত। তু. পঞ্চতন্ত্রে ধর্মবুদ্ধি পাপবুদ্ধির গল্প।

বেদের দেবতা 'অস্ময়ু' আমাদের জন্য উতলা। তাঁর কামনার গভীরতা এবং আমাদের অন্তর্নিহিত গুপ্ত ঐশ্বর্য—দুটিকেই বোঝাচ্ছেন এক প্রথা-বহির্ভূত উপমা দিয়ে। ভ্রমর যেথায় হয় বিবাগী নিভৃত নীলপদ্ম লাগি, বা, আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি—এ-জাতীয় মধুর শিরীষসুকুমার সূক্ষ্মোক্তি নয়, একেবারে গাদ্যিক তীব্র নিরেট বাস্তব উপমা। ধনের টান বড় টান, বিশেষ করে লোভীর কাছে। সেই অকৃত্রিম খাঁটি টানে দেবতা আসছেন ঋষির কাছে। তু. শ্রীরামকৃষ্ণের তিন টানের উপমা।

বিদথে যজ্ঞে **উকথ-শাসা** উক্থমন্ত্র শংসন করে এমন দুজন **ব্রহ্মাণা ইব** ঋত্বিক্-ব্রহ্মার মতো এবং **জন্যা** জনহিতকর **দূতা ইব** দুজন দূতের মত, তোমরা দুজন **পুরুত্রা** বহুজায়গায় **হব্যা** আহূত হও। ঘরে ঘরে তোমাদের ডাক পড়ে।

সর্বত্র আকারান্ত দ্বিবচনগুলি বিশিষ্ট বৈদিক প্রয়োগ, সুপাং সু-লুক্…… পা ৭।১।৩৯।

২॥ **প্রাতর্যাবাণা** সকালে আগমনকারী **রথ্যা** রথারোহী **যমা বীরা ইব** দুই যমজ বীরের মতো তোমরা **যমা অজা ইব** যমজ দুটি ছাগলের মতো, পশুর সঙ্গে দেবতার উপমা ঋষিদের প্রিয়, তু. ১৬৫ **তন্বা শুম্ভমানে** উজ্জ্বল তনু-বিশিষ্ট **মেনে ইব** দুটি রমণীর মতো **বরম্** যে তোমাদের বরণ করে, যাকে তোমরা বরণ কর, তাকে **আ সচেথে** আলিঙ্গন কর। দেবতাকে প্রিয়া-রূপে দেখছেন ঋষি। **জনেষু** সবার মধ্যে **ক্রতু-বিদা** ক্রতুবিদ্ কর্মজ্ঞ **দম্পতী ইব** দুই স্বামী-স্ত্রীর মতো তোমরা।

৩॥ আগের ঋকের বিস্তার। ইঙ্গিতময় ছবির মতো শুধু শিং আর খুর দিয়ে দেবতার দ্রুত আগমনের ছবি ফোটালেন। **প্রথমা** হে প্রথম যুগল, দ্যুস্থান দেবতাদের মধ্যে অশ্বিদ্বয়ই প্রথম, **শৃঙ্গা ইব** দুটি শৃঙ্গের মতো **শফৌ ইব** দুটি ক্ষুরের মতো **তরোভিঃ** সবেগে **জর্ভুরাণা** ধাবমান হয়ে √ভৃ > √ভুর্—গতি + যঙ্‌লুক্ + কানচ্ **নঃ অর্বাক্** আমাদের অভিমুখে **গন্তম্** এসো। **উস্রা** হে যুগল কিরণ **বস্তোঃ প্রতি** ভোরকে লক্ষ্য ক'রে **চক্রবাকা ইব** দুটি চক্রবাকের মতো, চখাচখী রাত্রির অন্ধকারে আলাদা হয়ে থাকে, ভোর হলে মিলে যায়, অধ্যাত্মজীবনের উষায় হয় সব বিরোধাভাসের অবসান, সাদা-কালোর দ্বন্দ্বের অবসানে ছন্দে নানান রং জাগে—এই ব্যঞ্জনা, **শক্রা রথ্যা ইব** শক্তিমান দুই রথীর মতো **অর্বাঞ্চা যাতম্** এদিকে এসো।

৪॥ **নাবা ইব** জোড়া নৌকার মতো **যুগা ইব** দুটি রথ-জোয়ালের মতো **নভ্যা ইব** দুটি রথচক্রনাভির মতো **উপধী ইব** দুটি উপধির মতো, উপধি চক্রনাভি ও নেমির মধ্যবর্তী অংশ **প্রধী ইব** দুটি প্রধির মতো, প্রধি রথনেমি। 'দেবতার বাহনও দেবতাই'—নিরুক্তকারের এই উক্তির দৃষ্টান্ত।

নঃ তনূনাম্ অরিষণ্যা আমাদের শরীরের অহিংসক **শ্বানা ইব** দুটি কুকুরের মতো, **ক্ষগলা ইব** দুটি বর্মের মতো **অস্মান্** আমাদের **বি-স্রসঃ** বিস্রংসন, তনুশৈথিল্য, disintegration থেকে **পাতম্** রক্ষা কর।

৫॥ **বাতা ইব অজুর্যা** দুটি হাওয়ার মতো জরাহীন, **নদ্যা ইব রীতিঃ** দুটি নদীর মতো স্রবণশীল হয়ে, **অক্ষী ইব** দুটি চোখের মতো **চক্ষুষা** দর্শনশক্তি নিয়ে **অর্বাক্ যাতম্** এসো। **হস্তৌ ইব** দুটি হাতের মতো **তন্বে** শরীরের পক্ষে **শংভবিষ্ঠা** অতিশয় সুখদায়ক হয়ে, শম্-ভূ + ইষ্ঠন্ + ১।২ **পাদা ইব** দুটি পায়ের মতো **বস্যঃ** < বসীয়স্ আরো আলোর **অচ্ছ** অভিমুখে **নঃ নয়তম্** আমাদের নিয়ে চল।

৬॥ **ওষ্ঠৌ ইব** দুটি ঠোঁটের মতো **আস্নে** মুখের হয়ে **মধু বদন্তা** মধুবাক্ বলতে বলতে **নঃ জীবসে** আমরা যাতে বাঁচি, তার জন্যে **স্তনৌ ইব** দুটি স্তনের মতো **পিপ্যতম্** বর্ধিত হও, আপ্যায়িত কর। **নাসা ইব** দুটি নাসার মতো **নঃ তন্বঃ** আমাদের তনুর **রক্ষিতারা** রক্ষক হয়ে **কর্ণৌ ইব** দুটি কানের মতো **সুশ্রুতা** শোভন-শ্রবণকারী **ভূতম্** হও **অস্মে** আমাদের জন্যে।

৭॥ **হস্তা ইব** দুটি হাতের মতো **নঃ** আমাদের **শক্তিম্ অভি সম্-দদী**

অভিমুখ হয়ে সম্যক্ শক্তিদায়ক হয়ে **ক্ষামা ইব** দ্যুলোক-ভূলোকের মতো **নঃ** আমাদের জন্য **রজাংসি** সমস্ত লোক, সমস্ত জ্যোতিঃ **সম্ অজতম্** সমবেত কর। **অশ্বিনা** হে অশ্বিদ্বয় **ইমাঃ** এই-সব **যুষ্ময়ন্তীঃ গিরঃ** তোমাদের-চাওয়া বাণীদের **ক্ষ্ণোত্রেণ** শান দিয়ে **স্বধিতিম্ ইব** বজ্রের মতো **সম্ শিশীতম্** সম্যক্‌রূপে শাণিত কর।

৮॥ **অশ্বিনা** হে অশ্বিদ্বয় **এতানি** এইসব **বাম্** তোমাদের **বর্ধনানি** বৃদ্ধিকারক **ব্রহ্ম স্তোমম্** মন্ত্র, স্তোত্র **গৃৎসমদাসঃ** গৃৎসমদেরা **অক্রন্** করেছে। **নরা** হে নায়কদ্বয় **তানি জুজুষাণা** সেই মন্ত্র আস্বাদন করতে করতে **উপ যাতম্** কাছে এস। **সুবীরাঃ** সুবীর্য হয়ে আমরা **বিদথে** যজ্ঞে বা সভায় **বৃহৎ** বড় ক'রে **বদেম** তোমাদের ঘোষণা করতে চাই।

১৪। ঋষি বসিষ্ঠের বরুণ-সূক্ত

দেবতার প্রতি ঋষির ব্যক্তিগত ভালোবাসার প্রকাশ ঋগ্বেদের বহু সূক্তে। দেবতা শুধু মহিমার মহাভূমিতে বিচরণশীল কোন নভশ্চর নন, নন শুধু চকিত বিস্ময়ের ঝলক তুলে উধাও কোন বিমানবাহন গ্রহান্তরের মানুষ। তিনি আমার ভালবাসার ধন। অন্তম, অন্তরতম। নেদিষ্ঠ, নিকটতম। আপ্য, আপনতম। আত্মা। তিনি প্রভু পিতা মাতা পুত্র কান্ত কান্তা প্রিয়সখা। ঋষি মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ বলছেন, একদিন তোমার সঙ্গে সেই যে এক-নৌকায় দুলেছিলাম, কোথায় গেল আমাদের সেই সব সখ্য? সেদিন আমার সুদিন ছিল, তুমি আমার চোখের সামনে খুলে দিয়েছিলে আলোঝলমল আকাশের পরে আকাশ, ফুটিয়েছিলে ভোরের পরে ভোর। তুমি আমায় কবি করেছিলে। আর কি সেদিন আসবে না?—

আ যদ্ রুহাব বরুণশ্ চ নাবং
প্র যত্ সমুদ্রম্ ঈরয়াব মধ্যম্।
অধি যদ্ অপাং স্নুভিশ্ চরাব
প্র প্রেঙ্খম্ ঈঙ্খয়াবহৈ শুভে কম্ (৭।৮৮।৩)

নায়ে যখন চড়ব দুজন—আমি, বরুণ,
বেয়ে বেয়ে যাব যখন মাঝ-দরিয়ায়,
ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় যখন চড়ব, আহা
দুলব দোলায় আনন্দে ?

ঋষি বসিষ্ঠের এই আর্তিময় বরুণ-সূক্তগুলির অন্যতম বর্তমান সূক্তটি। প্রথম ঋকে বরুণের মহামহিমার একটি চরত্-ধ্রুব (static-dynamic. দ্র. ৩।৫৪।৮) ছবি এঁকে তারপরই সেই মহা-প্রভুর পায়ে আর্তিতে লুটিয়ে পড়ছেন ঋষি, ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ, আরো কী তোমার চাই (পূজা ৩৫)। দাস্য ও সখ্যের সমন্বয়ে ঋগ্বেদেও এ সূক্তটি তুলনাহীন।

১॥ **উর্বী** বিশাল **চিত্** ১) তবু ২) প্রশংসার্থক, কি বিশাল **রোদসী** দ্যুলোক ভূলোককে **যঃ** যিনি **বি তস্তম্ভ** বিযুক্ত করে স্তম্ভিত করে রেখেছেন **অস্য** এঁর অর্থাৎ বরুণের **মহিনা** মহিমায় **জনূংষি** জন্মগুলি **ধীরা** (=ধীরাণি) ধীর, শেশ্ ছন্দসি বহুলম্ পা ৬।১।৭০ **তু** বাক্যালঙ্কার। **বৃহন্তম্** বৃহৎ **ঋষ্বম্** উঁচু মহান **নাকম্** আকাশ তথা আদিত্যকে **নক্ষত্রম্** এবং নক্ষত্রকে **দ্বিতা** দুদিকে **প্র নুনুদে** প্রণোদিত প্রচোদিত করছেন, **ভূম চ** এবং ভূমিকে, ভূমাকে **পপ্রথত্** বাড়িয়ে চলেছেন।

২॥ **স্বয়া তন্বা উত** নিজের দেহের সঙ্গেই **তত্** বিষয়টি **সম্ বদে** বলাবলি করি, **কদা নু** কবে **বরুণে** বরুণের মধ্যে **অন্তঃ ভুবানি** অন্তর্ভূত হব, ঢুকে যাব ? **অ-হৃণানঃ** রাগ না করে **মে হব্যম্** আমার আহুতি **কিম্ জুষেত** সে কি আস্বাদন করবে ? **কদা** কবে **সু-মনাঃ** মন ভালো হয়ে গিয়ে **মৃলীকম্** আনন্দ-বিধায়ক তাকে **অভি খ্যম্** সম্মুখে দেখব ? √খ্যা+লুঙ্ ১।১।

৩॥ **বরুণ** হে বরুণ, **দিদৃক্ষু** তোমাকে দেখতে ইচ্ছুক হয়ে, বিভক্তিলোপ, সুপাং সুলুক্…**চিকিতুষঃ** যাঁরা জানেন তাঁদের **বিপৃচ্ছম্** জিগ্যেস করতে **উপো এমি** কাছে যাই, **তত্ এনঃ** সেই দোষের কথা **পৃচ্ছে** জিগ্যেস করি। **কবয়ঃ চিত্** সেই বিদ্বানেরাও **সমানম্ ইত্** একই কথা **মে আহুঃ** আমাকে বলেন, **অয়ম্ বরুণঃ হ** এই বরুণ, জেনো, **তুভ্যম্** তোমার ওপর **হৃণীতে** রাগ করেছেন।

৪॥ **বরুণ** হে বরুণ **কিম্** কী সে **জ্যেষ্ঠম্** অত্যন্ত বড় **আগঃ** অপরাধ **যত্** যে **স্তোতারম্** যে তোমার স্তোতা তাকে **সখায়ম্** যে তোমার সখা তাকে

জিঘাংসসি মারতে চাইছ? **দূল.ভ** হে দুর্দভ, দুর্দম, দুর্জয় **স্বধাবঃ** হে স্বধা-বান্, স্ব-প্রতিষ্ঠ, মতুবসো রু সম্বুদ্ধৌ ছন্দসি, পা ৮।৩।১ **মে তত্** আমাকে তা **প্র বোচঃ** স্পষ্ট বলে দাও, **অনেনাঃ** পাপহীন হয়ে **তুরঃ** ত্বরা-যুক্ত হয়ে **নমসা** প্রণতি নিয়ে **ত্বা** তোমার কাছে **অব ইয়াম্** উপস্থিত হই।

৫॥ **নঃ** আমাদের **পিত্র্যা** পিত্র্য, পৈতৃক, দ্র. ধীরা, ১ম ঋক্ **দ্রুগ্ধানি** দ্রোহগুলি **অব সৃজ** আমাদের থেকে বিযুক্ত কর। **বয়ম্** আমরা **তনূভিঃ** শরীর দিয়ে যা=যানি যে-সব অপরাধ **চকৃম** করেছি **অব** (সৃজ) তা থেকেও মুক্ত কর। **রাজন্** হে রাজা **পশুতৃপম্ তায়ুম্ ন** পশুতৃপ্ত চোরের মতো **বত্সম্ ন** বাছুরের মতো **বসিষ্ঠম্** বসিষ্ঠকে **দাম্নঃ** দড়ি থেকে **অব সৃজ** মুক্ত কর।

পশুচোরের মত দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে আমাকে। আমি বদ্ধ নিরুপায়, গো-বৎসের মতো। আমাকে বন্ধনমুক্ত কর।

৬॥ **বরুণ…সঃ** সে **স্বঃ দক্ষঃ** আমার নিজের দক্ষতা, পুরুষকার **ন** নয়, **সা** সে হল **ধ্রুতিঃ** ধ্রুব নিয়তি, দৈব। যেমন, **সুরা…মন্যুঃ** ক্রোধ **বিভীদকঃ** পাশা **অচিত্তিঃ** অজ্ঞান, এর কোনটার ওপরেই আমার হাত নেই! **কনীয়সঃ** ছোট-র **উপারে** কাছাকাছি, উপরে? **জ্যায়ান্** বড় কেউ **অস্তি** আছে। সেই তাকে দিয়ে সব কিছু করায়। **স্বপ্নঃ চন** ঘুমও, স্বপ্নও **অনৃতস্য** অনৃতের, অন্যায়ের **প্রযোতা ইত্** মিশ্রয়িতা হয়ই। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন-র পূর্বধ্বনি!

৭॥ **মীল্.হুষে** যিনি মীঢ্বান্ বর্ষণ করেন, ঢেলে দেন, √মিহ্-বর্ষণ, তাঁর প্রতি **ভূর্ণয়ে দেবায়** ক্রুদ্ধ দেবতার প্রতি, অর্থাৎ অনুগ্রহ-নিগ্রহ-শক্তিসম্পন্ন দেবতার প্রতি **দাসঃ ন** ভৃত্যের মতো **অহম্** আমি **অনাগাঃ** অন্-আগস্, দোষমুক্ত, ত্রুটিহীন হয়ে **অরম্ করাণি** একচিত্ত একমুখ হব, অলঙ্কৃত করব নিজেকে। **অর্যঃ দেবঃ** উদার দেবতা **অচিতঃ** অচেতনদের **অচেতয়ত্** চেতনা দিয়েছেন। **কবিতরঃ** আরো বড় কবি, কবি-গুরু সেই দেবতা **গৃত্সম** কবিকে আমাকে **রায়ে** পরম ধনের পানে **জুনাতি** নিয়ে চলেছেন।

৮॥ **স্বধাবঃ বরুণ** ওগো স্বধা-বান বরুণ, **তুভ্যম্ সঃ অয়ম্ স্তোমঃ** তোমার উদ্দেশে সেই এই গান **হৃদি** তোমার হৃদয়ে **উপশ্রিতঃ চিত্ অস্তু** আশ্রয় পাক। **নঃ ক্ষেমে** আমাদের ক্ষেমে **শম্ অস্তু** শান্তি থাক **উ** এবং

নঃ যোগে শম্ অস্তু আমাদের যোগে শান্তি থাক। যা পাইনি তা পাওয়া —যোগ। যা পেয়েছি তা রাখা ক্ষেম। **যূয়ম্** তোমরা তুমি **স্বস্তিভিঃ** অফুরন্ত স্বস্তি দিয়ে **সদা** সর্বদা **নঃ** আমাদের **পাত** রক্ষা কর।

শেষ পঙ্‌ক্তিটি বসিষ্ঠের প্রিয় ধুয়া, সপ্তম মণ্ডলের বহু সূক্তে আছে।

১৫। ঋষি মেধাতিথি কাণ্বের ঋভু-সূক্ত

ঋগ্বেদে ১১টি সূক্ত আছে যার দেবতা হলেন ঋভুরা। ঋষি যথাক্রমে মেধাতিথি কাণ্ব (১।২০), কুৎস আঙ্গিরস (১।১১০,১১১), দীর্ঘতমা ঔচথ্য (১।১৬১), গাথিন বিশ্বামিত্র (৩।৬০), বামদেব গৌতম (৪।৩৩—৩৭) এবং মৈত্রাবরুণি বসিষ্ঠ (৭।৪৮)। এঁদের মধ্যে বামদেব গৌতম একাই পাঁচটি ঋভুসূক্তের দ্রষ্টা।

কে এই ঋভুরা? কী তাঁদের পরিচয়?

ইন্দ্র মিত্র বরুণ সূর্য পূষা প্রভৃতি দেবতারা হলেন এক-একটি নিত্যতত্ত্বের তথা শক্তির জ্যোতির্ময় বিগ্রহ, সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত দেবত্বের মহিমায় সমাসীন, চিররহস্যাবৃত স্বয়ম্ভু সত্তা। এঁরা ধরা দেন অনুভবী মেধাবী মনীষী ঋষির কম্প্র হৃদয়তন্ত্রে, অনুগ্রহ করেন জরামৃত্যুআধিব্যাধিশোকতাপপ্রপীড়িত অসহায় বিপন্ন আর্ত আতুরকে, আলোর অঙ্গুলি হয়ে পথ দেখান অমৃতপথসন্ধ পান্থকে, সর্বব্যাপী হয়ে বিরাজ করেন সর্বভূতে জলে স্থলে অন্তরিক্ষে অরণ্যানীতে, সূর্যোজ্জ্বল নিবিড়নীলিম আকাশে, শ্রাবণগগনে ঘোর ঘনঘটায়, প্রমত্ত প্রচণ্ড প্রভঞ্জনে। ঋগ্বেদ এই প্রভু বিভু দেবতাদের মহিম্নঃ-স্তোত্রমালা।

কিন্তু এ স্তোত্র কি শুধু মহাকায় মহামহিম অধৃষ্য চিরসুদূর দেবতার উদ্দেশে বামন মানুষের ভক্তিনম্র সসম্ভ্রম উচ্চারণ? উজ্জ্বল স্বর্গের উদ্দেশে দীন ম্লান মর্ত্যের সবিনয় আবেদন নিবেদন? না। এ স্তোত্রমালায় দেবতার পাশাপাশি জেগে আছে মানুষেরও মহিমা। বিধাতার দেওয়া মৃত্যুদণ্ড কপালে নিয়ে এই পৃথিবীর মাটিতে জন্ম-নেওয়া ধুলো-কাদায় বেড়ে ওঠা মানুষ তার আপন তপস্যা-বলে তার সুপ্ত দেবত্বের উদ্বোধন ঘটিয়ে লৌকিক এষণার ঘূর্ণাবর্তের মহাটান

কাটিয়ে অর্জন করেছে দেবত্বের মহাসন—এইখানেই বেদের বিশেষত্ব। মানুষ দেবতা হবে, নতুন জন্ম, দিব্যজন্ম, নতুন জীবন, দিব্যজীবন লাভ করবে—এই হল বেদের সাধনা। ঋভুরা হলেন এই সাধনা এবং সিদ্ধির মূর্ত বিগ্রহ। তাঁরা মানুষ হয়েও দেবতা। এবং দেবতা হয়েও মানুষ। স্বর্গ-মর্ত্যের সেই চিরবাঞ্ছিত মিলন ঘটেছে তাঁদের মধ্যে। রভ্‌ধাতুর অর্থ আঁকড়ে ধরা। অমরত্বের সাধনার নাছোড়-বান্দা নিরলস অক্লান্ত সাধক ঋভুরা—toilers to the sea of Infinity.

মরমিয়া ঠারে এঁদের পরিচয় লিপি লেখা আছে বৈদিকসাহিত্যের এখানে ওখানে। ঋগ্বেদ বলছেন, ঋভুরা সুধন্বার তিনপুত্র—ঋভু, বিভ্বা এবং বাজ। তাঁরা 'সূরচক্ষসঃ' সূর্যচক্ষু, তাঁরা 'মর্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ' মর্ত্য হয়েও লাভ করেছেন অমৃতত্ব (১।১১০।৪)। নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন ঋভুরা আদিত্যরশ্মি। তাঁরা 'উরুভাসঃ' বিপুলবিভাময়, তাই ঋভু।

তার মানে ঋভুরা হলেন 'সুধন্বা' অর্থাৎ সেই মহাধানুকীর নিক্ষিপ্ত তিনটি আলোর তীর, তিনটি উজ্জ্বল বোধশক্তি—'ঋভু' অর্থাৎ অনলস সাধনা, বিভ্বা অর্থাৎ পরিব্যাপ্ত সর্বভূতময় চৈতন্য, এবং 'বাজ' অর্থাৎ বজ্রতেজ। জড়ত্বনাশা এই তিনটি মহাশক্তি দিয়ে তাঁরা কাজ করে চলেছেন মাটির বুকে, চোখে তাঁদের সর্বভেদী সৌরদৃষ্টি। সেই দৃষ্টির আলো ফেলে ফেলে নিরীক্ষণ করছেন অতীতকে, রং বদলে দিচ্ছেন বর্তমানের, গড়ে তুলছেন অনাগতকে। তাঁরা স্রষ্টা, তাঁরা শিল্পী, এই পৃথিবীর বুকে তাঁরা অমরাবতীর রূপকার।

কেমন করে?

ঋগ্বেদ বলছেন ঋভুদের পাঁচটি কর্মের কথা। তক্ষণ করে করে অর্থাৎ কেটে-ছুলে তাঁরা তৈরি করেন দুটি ঘোড়া, একটি রথ, একটি গরু। জোয়ান করে তোলেন থুথ্‌ড়ে বুড়ো মা-বাপকে। আর সবার শেষে একটি নতুন পাত্রকে ভেঙে চারখানা করে দেন!

মানুষের সভ্যতার সুরু থেকেই এই আজব কারিগর ঋভুরা যুগে যুগে গড়ে চলেছেন এই তিনটি খেলনা—একজোড়া ঘোড়া, একটি তিনচাকার রথ আর একটি গরু—কোন এক স্বপ্নে দেখা স্থির ভবিষ্যতের জগৎজোড়া আনন্দমেলা গড়ে তুলতে, ভরে তুলতে।

ঘোড়া দুটি ইন্দ্রের, রথটি অশ্বিদ্বয়ের, আর গরুটি হলেন বিশ্বরূপা কামদুঘা ধেনু বাক্‌-মা অদিতি।

পরমদেবতার সূর্যসঙ্কাশ জ্যোতির্বিগ্রহই হলেন ইন্দ্র—দিব্যমনের অনন্ত-বর্ণ আলো। ঘোড়া তাঁর কিরণাবলী, কিরণমালা, যা দিয়ে যা হয়ে তিনি নেমে আসেন দুরন্ত বেগে অন্ধকার বন্ধ্যা পৃথিবীর আনাচকানাচ ভরে তুলতে অবিরাম আলোকবর্ষণধারে। তাঁর সেই অফুরন্ত কিরণমালার আধখানা আলো, আধখানা কালো—অনন্তম্ অন্যদ্ রুশদ্ অস্য পাজঃ কৃষ্ণম্ অন্যত্-হরিতঃ সং ভরন্তি (১।১১৫।৫)। এই দুটি রঙের মধ্যেই আছে সমস্ত রং—তাই ইন্দ্রের ঘোড়ারা অনন্ত হয়েও একজোড়া। এই ঘোড়াদুটিকে মন দিয়ে তৈরি করে ঋভুরা বাক্ দিয়ে জুড়ে দেন ইন্দ্রের রথে—ইন্দ্রায় বচোযুজা ততক্ষুর্ মনসা হরী (১।২০।২)।

মানুষের অমৃতাভিসারের যুগল সারথি অশ্বিদ্বয়। তাঁদের রথের তিনটি চাকা—একটি চন্দ্র, একটি সূর্য, আর একটি নিগূঢ় গোপন অশব্দ অলখ অচিন। সেই রথে চড়ে অশ্বীরা আসেন অমৃতসন্ধ মানুষকে নিয়ে যেতে অহোরাত্রের অন্ধ আবর্তন পেরিয়ে সেই অলখ অচিন নিভৃত গোপন মধুচেতনার রাজ্যে। অশ্বীদের এই রথখানিও তৈরি করে দেন ঋভুরা।

এর অর্থ কী?

নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন দেবতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাহন প্রহরণ সবই দেবতা। অর্থাৎ ইন্দ্রের ঘোড়া ইন্দ্রই, ইন্দ্রের বিভূতি, ইন্দ্রেরই বিশিষ্ট প্রকাশ, তাঁরই দুরন্ত দুর্বার অপ্রতিরোধ্য বজ্র-আহ্বান, তাঁরই অমোঘ আবির্ভাবের ঝোড়ো বিদ্যুৎ। অশ্বীদের রথও তাঁদেরই নিরন্তবর্ষী বেগবতী প্রবাহিণী করুণামূর্তি। ঋভুরা দেবকৃত্, সাধনবীর্যে ফুটিয়ে তোলেন এই মাটির বুকে লুকিয়ে-থাকা দেবতাকে—এই হল তাঁদের তক্ষণ। চিদ্-গর্ভ এই মাটিকে কেটে-ছেনে তাঁরা গড়েন দেবতার অশ্ব-শরীর, রথ-শরীর। অথৈ চৈতন্যের বুক উথাল-পাথাল করেন মন্ত্র-মন্থনে। চিৎ-শক্তিতরঙ্গ তুরঙ্গ হয়ে, রথ হয়ে উঠে আসে সে মহাসমুদ্র থেকে, নেমে আসে, ঝলমলিয়ে তোলে অন্ধকারাচ্ছন্ন এ দেহ-মন-প্রাণ-পৃথিবী। এককথায় দেবতার আবির্ভাবকে, আগমনকে ঋভুরা ত্বরান্বিত করেন তাঁদের তপঃশক্তি দিয়ে। তাঁদের তপস্যা দিয়ে গড়া পক্ষীরাজে চড়ে দেবতা আসেন এই পৃথিবীর রাজকন্যাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে আলোকের আনন্দের রাজ্যে।

ঋভুদের তৃতীয় কর্ম হল গো-তক্ষণ। গো মানে আলো। বিশ্বের প্রথম

জ্যোতিঃ সেই অসীমা অবন্ধনা বিশ্বজননী অদিতি। তিনি অনন্তরূপা অনন্ত-প্রসবিনী কামদুঘা পরা বাক্। সেই 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি' ঋভুরা নিজে শুনেছেন, তাই শোনাতে চান সমস্ত মানুষকে। তাই তাঁরা তাঁদের অনন্তপ্রসবী মধুহৃদয়ের মধু দিয়ে গড়ে চলেন অদিতিমায়ের বাক্-প্রতিমা। তাঁদের প্রেমের টানে অনন্ত-চেতনার অচিন পাখি এই খাঁচার ভেতর বারে বারে আসা-যাওয়া করে, সখী হয়ে ধরা দেয় উদ্বাহু অমৃতপিপাসুর বাহুবন্ধনে, সীমার মাঝে বাজায় আপন সুর।

বুড়ো মা-বাপকে জোয়ান করে তোলা—ঋভুদের চতুর্থ কর্ম। এই বুড়ো মা-বাপ হলেন দ্যৌ আর পৃথিবী। জরাজীর্ণ দুটি যূপকাষ্ঠের মতো তাঁরা শুয়ে ছিলেন—সৃষ্টিক্লান্ত, হতবীর্য, মৃত্যুম্লান। ঋভুরা আনলেন নবীনের মন্ত্র, আবার ফুল ফুটল ধরার ঘাসে ঘাসে, নবারুণরাগে রঞ্জিত হল আকাশ। দ্যুলোকে ভূলোকে লাগল প্রাণবসন্তের হাওয়া, মিলল তারা নবীন বিবাহডোরে, আকাশে বাতাসে মাটিতে অরণ্যে সুরু হল নবসৃষ্টির রূপোল্লাস।

যুগে যুগে এমনি করেই ঋভুরা আসেন একঘেয়ে সৃষ্টির কাঠামোকে বদলে দিতে, ঘটাতে সমগ্রের বিস্ময়কর নবজন্মান্তর। তাঁদের সে সম্মোহন স্পর্শে সৃষ্টি তার প্রতিদিনের পথের ধূলার সাজ খুলে ফেলে হয় নবীনা।

এই প্রথম চারটি কর্মের পরে ঋভুরা সিদ্ধ করেন তাঁদের চরম পঞ্চম কর্মটি। এই পঞ্চমই লক্ষ্য, প্রথম চারটি যেন তার প্রস্তুতি।

প্রথম বিশ্বশিল্পী ত্বষ্টার সযত্নে তৈরী-করা একটি নতুন চমস বা দেবতাদের সোমপানের পাত্রকে তাঁরা ভেঙে চার টুকরো করে দেন।

শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, শারীরচেতনাময় মানুষের এই দেহই হল দেবতার পানপাত্র। তাকে ঋভুরা ভেঙে ভেঙে গড়েন আরো তিনটি তনু—প্রাণতনু, মনতনু আর 'ideal body' অর্থাৎ সত্ত্বতনু বা দিব্যতনু বা ভাগবতীতনু বা ব্রাহ্মী তনু। এই একে চার, চারে এক তনু ভরে ভরে দেবীভূত মানুষ তখন পান করে আনন্দসুধা, দিব্যমদিরা, মহামধু—দ্যুক্ষ সোম।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি, 'হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান'—এই হল প্রথম পানপাত্র। আর—

পাত্রখানা যায় যদি যাক ভেঙে চুরে
হৃদয় আমার সহজ সুধায় দাও না পূরে—

এইটি হল চমসের চতুর্ধাকরণ।

ঘোড়া ছুটিয়ে রথ হাঁকিয়ে দেবতা এসে গেছেন, এই শ্যামল মাটির ধরাতল আর ঐ আলোকমাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন এক হয়ে মিশে গেছে এক সীমা-অসীমায় লুপ্তভেদ বিপুল চৈতন্যের পারাবারে, সেইখানে অসহ্য আনন্দে ডুবতে ডুবতে ভাসতে ভাসতে স্খলিতসর্বসংস্কার ছিন্নসর্বগ্রন্থি ভিন্নসর্বসংশয় বিশ্বাত্মভূত অনির্মোক নগ্ন দেবমানব শুধু চারমুখে নয়, অনন্তমুখে সহস্র-সর্বাঙ্গে পান করছে কোন এক বিপুল মশক হতে ঝরে পড়া নিরন্তবর্ষণ মধুধারা।

এই মহাপানোৎসবের দ্রষ্টা কবি স্রষ্টা শিল্পী নরোত্তম ঋভুরা।

১॥ **অয়ম্** এই **রত্নধাতমঃ স্তোমঃ** অতিশয় রত্ন-ধাতা স্তোম, গান **বিপ্রেভিঃ** বিপ্রগণের দ্বারা **আসয়া** মুখে মুখে **অকারি** কৃত হয়েছে **দেবায় জন্মনে** মনে হয় বাক্যাংশটি শ্লিষ্ট। 'দিব্যজন্মের জন্য' এবং 'যাঁরা দিব্যজন্ম পেয়েছেন তাঁদের উদ্দেশে'—এই দুটি অর্থই সম্ভব। অর্থাৎ ঋষি বলছেন, 'আমরা দিব্যজন্ম চাই, তাই যাঁরা সেই দিব্যজন্ম পেয়েছেন তাঁদের উদ্দেশে রচনা করেছি এই গান। এই গানের মধ্যে দিয়েই আমরা নিঃসন্দেহে পাব সেই রত্ন—সেই দ্যুতিময় অটুট প্রগাঢ় পরম উপলব্ধি।' গো অশ্ব বসু ইত্যাদির মতো রত্নও বেদের একটি পারিভাষিক শব্দ। 'রত্ন অমৃতচেতনার দীপ্তি, উপনিষদের ভাষায় প্রজ্ঞানঘনতা'। (দ্র. বেমী পৃ ৩৬৭-৩৬৯)

২॥ **যে** যাঁরা **ইন্দ্রায়** ইন্দ্রের উদ্দেশে **মনসা** মন দিয়ে **বচোযুজা হরী** বাক্ দিয়ে যোতা দুটি ঘোড়া **ততক্ষুঃ** তক্ষণ করেছেন, **শমীভিঃ** শমী দিয়ে **যজ্ঞম্** যজ্ঞকে **আশত** ব্যাপ্ত করে আছেন।

মনই বাঁধন, মনই সাধন। স্বধাবান্ (আত্মপ্রতিষ্ঠ) মনের স্বধিতি (ছুরি) দিয়ে, মৌন মনের অবিচল তীক্ষ্ণ তপস্যা দিয়ে ঋভুরা তক্ষণ করেন, চেঁচে-ছুলে তৈরি করেন ইন্দ্রের ঘোড়া। তারপর সেই শূন্য অশব্দ মন স্পন্দিত হয়, জাগে মন্ত্র—অনুচ্ছিষ্টা অনাঘ্রাতা সৌর-সৌরভময়ী বিশ্বংপশ্যা আহ্লাদিনী বাক্। সেই বাকের বিপুল শক্তি ইন্দ্রাশ্বকে যুক্ত করে ইন্দ্ররথে, টানে রথ, আনে রথ, দেবতার অনড় মানসপ্রতিমা সচল হয়ে মহাবেগে নেমে আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে, জয়ধ্বনি জাগে গগনে গগনে, পুঞ্জীভূত তেজঃকণা ছড়িয়ে পড়ে মর্ত্যভূমির ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে, অন্ধ চোখ মেলে, বধির শোনে মধুর ধ্বনি, পঙ্গু করে দুর্গমগিরিকান্তারমরু-লঙ্ঘন।

সৃষ্টিমাত্রেই যজ্ঞ। যজ্ঞমাত্রেই সৃষ্টি। আত্ম-হোমের মধ্যে দিয়ে নতুন-আমার সৃষ্টি। এই সৃষ্টির ক্রিয়া চলেছে বিশ্বভুবনে, আবার জনে জনে। এই সৃষ্টি-যজ্ঞকে ঋভুরা ছেয়ে দিয়েছেন শমী দিয়ে। শমী একটি দ্ব্যর্থ শব্দ—মানে শ্রম, কর্ম, আবার প্রশম, শান্তি। ঋভুদের অবিরাম অশ্রান্ত তপস্যা যেন কোন পক্ষী-মাতার প্রসারিত বিশাল ডানার মতো ছেয়ে রয়েছে আমাদের এই আপাত-ব্যর্থ জীবনযজ্ঞকে, যেন এক বিগলিতকরুণা জাহ্নবী-যমুনার মতো বয়ে বয়ে তাকে নিয়ে চলেছে এক বিপুল শান্তির পারাবারের দিকে।

৩॥ নাসত্য অশ্বিদ্বয়ের নাম। **নাসত্যাভ্যাম্** তাঁদের জন্যে যে রথটি ঋভুরা গড়ে দিয়েছেন সেটি **পরিজ্‌মা** সর্বতোগামী, **সুখম্** অনায়াস—সূর্যরশ্মির মতো। আলোর রথ, জ্যোতীরথ। সর্বপ্লাবী, সর্বভেদী, সর্ববেধী। ঋভুরা নিজেরাই সেই রথ—সেই মহাধানুকী মহাব্যাধ সুধন্বার নিক্ষিপ্ত তিনটি আলোর তীর—সন্ধান করে করে ফিরছেন মানুষের মধ্যে নিহিত হিংসায় উন্মত্ত আত্মবিস্মৃত পশুটিকে।

সবর্ হল (১) অমৃত (২) বেমী-মতে স্বর্ অর্থাৎ আলো। **সবর্দুঘা** অমৃতনিস্যন্দিনী আলোকপয়স্বিনী ধেনু হলেন অদিতি।

৪॥ √বিষ্—ব্যাপ্তি। 'বিষ্টি' ব্যাপ্ত অর্থাৎ ছেদহীন কর্ম। **বিষ্টী** সেইরকম কর্মের দ্বারা **ঋজূয়বঃ** ঋজু-য়ু, ঋজুত্বকামী, যাঁরা সোজা পথে চলেন **সত্যমন্ত্রাঃ ঋভবঃ** সত্য-মন্ত্র ঋভুরা **পিতরা** পিতা-মাতাকে দ্যাবা-পৃথিবীকে **যুবানা** জোয়ান **অক্রত** করেছেন।

৫॥ সত্যমন্ত্র ঋজুসাধক ঋভুরা তপস্যাবলে দেব-পদবী লাভ করেছেন, হয়েছেন উজ্জ্বল স্বচ্ছ সর্বব্যাপ্ত চৈতন্যের অধিকারী। তাই তাঁরা দেবতাদের সধমাদ অর্থাৎ আনন্দের সহভোক্তা। তাঁদের **মদাসঃ** অর্থাৎ আনন্দ-পরম্পরা, আনন্দ-সন্দোহ, আনন্দের পর আনন্দ **সম্ অগ্মত** সঙ্গত হচ্ছে মিশে যাচ্ছে দেবতাদের আনন্দের সঙ্গে, একই সোমপান-উৎসবের তাঁরা শরিক। সেই দেবতাদের একজন হলেন 'মরুত্বান্ ইন্দ্র' অর্থাৎ মরুৎ-সহায় ইন্দ্র। ইন্দ্রের দুটি রূপ—নিষ্কেবল্য অর্থাৎ কেবল, একা, এক, স্বধাবান্, আপনাতে আপনি সমাহিত, আর 'মরুত্বান্' অর্থাৎ মরুৎ-সহায়, মরুদ্বন্ধু, শক্তিমান্, বেগবান্, যে রূপে তিনি মাতেন ঝড়ের তাণ্ডবে, জীর্ণ পুরাতনকে ভেঙে গুঁড়িয়ে নূতনের কেতন ওড়ান। সৃষ্টিনেশায় মাতাল এই ইন্দ্র যেন ঋভুদেরই স্বপ্ন-স্বরূপ। কোন

এক আনন্দ-ঝরঝর জাগ্রৎ-স্বপ্নের ভূমিতে তাঁরা, তাঁদের এই স্বপ্ন-স্বরূপ যেন আনন্দে গলে গলে এক হয়ে মিলে-মিশে যাচ্ছে তাঁদের সুদূর-পারের স্বপ্নদোসর আদিত্যদের সঙ্গে—এক সীমাহীন অনন্ত অখণ্ড অজস্রদ্যুতি মহামহিমার সঙ্গে।

৬॥ **ত্বষ্টা** আদিস্রষ্টা। তাঁর **নিষ্কৃতম্** অতি-যত্নে-রচা **ত্যম্ নবম্ চমসম্** সেই অভিনব চমস বা রসের পেয়ালা এই দেহখানিকে—বাউলগানের মতোই ঠারেঠোরে বলা—তোমরা **চতুরঃ** চারখানা **অকর্ত** করেছ। যে কোন সৃষ্টির আগেই চাই 'তক্ষণ' বা চাঁচা-ছোলা, কাটা-ছেঁড়া, ভাঙা-চোরা—শিল্পী এবং তার উপকরণ উভয়েরই, অথবা দুয়ে মিলে যে অদ্বৈত, তার। যেমন কবি নিজেও ভাঙেন, শব্দকেও ভাঙেন, ভাঙতে-ভাঙতেই গড়েন শব্দকে, নিজেকে, আশপাশের সমাজ-সংসার-জগৎকে। তাই অমরাবতীর রূপকার (artisans of immortality—শ্রীঅরবিন্দ) ঋভুদেরও কাজ হল ভাঙা-গড়া, ভেঙে গড়া। ভেঙে ভেঙে তাঁরা এই দেহ-পাত্রকে করেন চারখানা। যে পাত্র ছিল স্থূলরস-সম্ভোগের পেয়ালামাত্র, তাকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করতে করতে করে তোলেন দিব্যমদিরার পূর্ণপাত্র, পরমানন্দের অক্ষীয়মাণ শতধার উৎস। আমারে ভেঙে ভেঙে কর হে তোমার তরী······যা ছিল অনড় অচল অন্ধকারে বদ্ধমূল বৃক্ষ, তা হয়ে যায় আলোর তরণী।

৭॥ প্রথম ঋকে বলা হয়েছিল, এ প্রশস্তি আমাদের এনে দেবে রত্ন। সেই রত্নেরই সবিস্তর প্রার্থনা এই ঋকে। রত্নের সংখ্যা হল 'ত্রিঃ সাপ্তানি' অর্থাৎ তিন সাত্‌তে একুশ। ঋষি বলছেন, আমি **সুষ্বত্** দেহমনপ্রাণ নিঙ্‌ড়ে নিঙ্‌ড়ে আনন্দধারা ঢেলেছি তোমাদের উদ্দেশে, দিয়েছি **সুশস্তি** সুন্দর প্রশস্তি স্তবগান, এখন **একম্ একম্** একটি একটি করে **ত্রিঃ সাপ্তানি রত্নানি ধত্তন** একুশটি রত্ন আমাদের দাও, চেতনার তিনটি সপ্তকে রত্ন-দীপালি জেলে দাও।

৮॥ **ঋভুরা বহ্নয়ঃ** বহন করেছেন, **অধারয়ন্ত** ধারণ করেছেন। কী? ব্রত, সঙ্কল্প, সাধনা, জীবন-যজ্ঞ। **সুকৃত্যা** সুকর্ম। সেই সুকর্মবলে তাঁরা **দেবেষু** দেবতাদের মধ্যে দেবতা হয়ে **যজ্ঞিয়ম্ ভাগম্ অভজন্ত** যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেছেন।

১৬। অগস্ত্য-লোপামুদ্রা-সংবাদ

মৈত্রাবরুণি অগস্ত্যের পরিচয় দ্র. পৃ ৩২৩-২৪। লোপামুদ্রা তাঁর পত্নী। প্রথম চারটি ঋকে পতি-পত্নীর কথোপকথন ও শেষে দুটি ঋকে অগস্ত্য-শিষ্যের মন্তব্য—এই ছয় ঋক্ নিয়ে সূক্ত। নলিনীকান্ত গুপ্ত-র বেদমন্ত্র গ্রন্থে সূক্তটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা দ্র.।

১॥ লোপামুদ্রার উক্তি—

পূর্বীঃ শরদঃ বিগত অনেক বছর ধরে **দোষা বস্তোঃ** দিনে-রাতে **জরয়ন্তীঃ উষসঃ** জরা-আনা, জীর্ণ করে দেওয়া ভোরের পর ভোর **শশ্রমাণা অহম্** শ্রম করে চলেছি আমি। **জরিমা** জরা **তনূনাম্ শ্রিয়ম্** প্রতি অঙ্গের সৌন্দর্যকে **মিনাতি** ধ্বংস করে দিচ্ছে। **অপি উ নু** তাহলে এখন **বৃষণঃ** সমর্থ পুরুষেরা **পত্নীঃ** পত্নীদের সঙ্গে **জগম্যুঃ** মিলিত হোক।

২॥ **যে পূর্বে চিত্ হি** দেখ, যে-সব পূর্বপুরুষেরা **ঋত-সাপঃ** ঋত-নিষ্ঠ, ঋতের রসিক **আসন্** ছিলেন, **দেবেভিঃ সাকম্** দেবতাদের সঙ্গে **ঋতানি অবদন্** ঋত বলতেন, **তে চিত্ অবাসুঃ** তাঁরাও অব-অসন করেছিলেন, **অন্তম্ ন হি আপুঃ** অন্ত পান নি, সুতরাং **বৃষভিঃ** সমর্থ পতিদের সঙ্গে **পত্নীঃ** পত্নীরা **সম্ জগম্যুঃ** মিলিত হোক।

৩॥ অগস্ত্যের উক্তি—

শ্রান্তম্ ন মৃষা সে-শ্রম ব্যর্থ হয় নি, **যত্ দেবাঃ অবন্তি** যাকে দেবতারা রক্ষা করছেন। **বিশ্বাঃ স্পৃধঃ ইত্** সমস্ত স্পর্ধিত শক্তিকেই **অভি-অশ্নবাব** আমরা দুজনে পরাভিত করব। **তত্র শতনীথম্ আজিম্** এই শতমুখী সংগ্রাম **জয়াব ইত্** আমরা দুজনে জয় করবই, **যত্** যার দিকে **সম্যঞ্চা মিথুনৌ** একাত্ম হয়ে **অভি-অজাব** ধেয়ে চলেছি আমরা।

৪॥ **রুধতঃ নদস্য মা** নিরুদ্ধেন্দ্রিয়, নদন অর্থাৎ স্তবন-রত আমার কাছে **কামঃ আ-অগন্** কামনা এল। **ইতঃ আজাতঃ** এখানে জন্মাল? **অমুতঃ কুতশ্চিত্** না ওখানে, কোথায় কে জানে। **লোপামুদ্রা··· বৃষণম্** পতিতে **নিঃ রিণাতি** নিতরাং গচ্ছতি, দ্র. সায়ণ **অধীরা··· ধীরম্ শ্বসন্তম্** প্রশান্ত, শ্বাস-রত পতিকে **ধয়তি** পিবতি।

৫॥ শিষ্যের উক্তি—

হৃৎসু হৃদয়ে-স্থিত **ইমম্** এই **পীতম্ সোমম্ অন্তিতঃ** পীত সোমের কাছে **উপব্রুবে নু** প্রার্থনা করছি, **যৎ সীম্** যা-কিছু **আগঃ** অপরাধ, দোষ **চকৃম** করেছি **তৎ** তা **সু মৃলতু** যেন তিনি ক্ষমা করে দেন নিঃশেষে। **মর্ত্যং** মানুষ **হি** যে **পুলু-কামঃ** পুরু-কাম, বহু-কাম।

৬॥ **প্রজাম্ অপত্যম্** অবিচ্ছিন্ন সন্ততি **বলম্** বীর্য **ইচ্ছমানঃ** ইচ্ছা ক'রে **খনিত্রৈঃ** অনেক খন্তা দিয়ে **খনমানঃ** খুঁড়তে খুঁড়তে **উগ্রঃ ঋষিঃ অগস্ত্যঃ** তেজস্বী ঋষি অগস্ত্য **উভৌ বর্ণৌ** দুটি বর্ণকে **পুপোষ** পুষ্ট করেছেন, **দেবেষু** দেবতাদের মধ্যে **সত্যাঃ আশিষঃ** সত্য চাওয়ায় **জগাম** পৌঁছেছেন। অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যে পৌঁছে তাঁর সব চাওয়া সত্য হয়েছে।

১৭। পণি-সরমা-সংবাদ

ঋগ্বেদে কয়েকটি সংবাদ অর্থাৎ কথোপকথনমূলক সূক্ত আছে। পণি-সরমা সংবাদ তাদের অন্যতম। বেদে বহু-ব্যবহৃত একটি রূপকের নাট্যরূপ এই সূক্তটি।

বিপুল ধনরাশি, বিশেষ করে গোধন, লুকিয়ে রেখেছে পণিরা দুর্ভেদ্য পাহাড়ের গুহায়। তার চারিদিক ঘিরে থৈ থৈ করছে রসার দুর্লঙ্ঘ্য জলরাশি। সেই জল পেরিয়ে পণিদের কাছে এলেন ইন্দ্রের দূতী সরমা, বললেন, বার কর তোমাদের গুপ্তধন। পণিরা লোভ দেখালে, ভয় দেখালে, বোন পাতিয়ে আপন করার চেষ্টা করলে। সরমা কিছুতেই ভুললেন না। সূক্তের শেষে দেখি এক অপূর্ব চিত্র—পণিরা পরাভূত, দূরীকৃত। রুদ্ধকারার সামনে দাঁড়িয়ে বজ্ররবে মুক্তিমন্ত্র হাঁকছেন বৃহস্পতি, সঙ্গে তাঁর সোম, ঋষি, কবি প্রভৃতিদের একটি শাণিত উজ্জ্বল দল। রূপকের আড়াল ঠেলে দ্বার ভেঙে বেরিয়ে আসছে জ্যোতির্ময় গোযূথ, দিকে দিকে আনন্দধ্বনি জাগিয়ে চলেছে সূর্যাভিসারে ভুবন-ভরা একটি আলোর ফোয়ারা হয়ে।

এই সূক্তে নাট্যীকৃত এবং ঋগ্বেদে বহুত্র প্রযুক্ত এই রূপকটির আড়ালে কী আছে ?

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তা হল—

আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ আপনারি আবরণ।
খুলে দেখ্ দ্বার অন্তরে তার আনন্দনিকেতন। (পূজা ১৮৪)

গো মানে রশ্মি, আলো, জ্যোতি, প্রতিটি জীবে নিহিত অন্তঃকিরণ। এই আলোই হল তার আসল স্বরূপ যাকে সে ঢেকে রাখে স্বরচিত আবরণে, স্বখাত সলিলে। এই আবরণের সৃষ্টি হয় তার সঙ্কুচিত সঙ্কীর্ণ চিত্তের কার্পণ্য থেকে, হিসেবীবুদ্ধি থেকে, বণিকৃপণা থেকে। এই বণিকৃপণারই মূর্তি হচ্ছে পণিরা। √পণ্ ধাতুর অর্থ পণন, অর্থাৎ পণ্যের বেচাকেনা। উর্ধ্বতন সত্তার কাছে নিঃসর্ত আত্মসমর্পণে উন্মুখ যে উদারচিত্ত ঋজু মানুষ, তার ঠিক বিপরীত হল পণিরা। এই বৈপরীত্যটি দেখিয়ে ঋগ্বেদ অন্যত্র বলছেন,

উচ্ছন্তীর্ অদ্য চিতয়ন্ত ভোজান্
রাধোদেয়ায় উষসো মঘোনীঃ।
অচিত্রে অন্তঃ পণয়ঃ সসন্ত-
অবুধ্যমানাস্ তমসো বিমধ্যে (৪।৫১।৩)

সর্বসমর্পণের চেতনা
দাতার চিত্তে জাগিয়ে আজ
ফুটছে ফুটছে মহা-ঈশ্বরী উষারা।
গাঢ় অনালোক গভীর তিমিরে ঘুমোক
অপ্রবুদ্ধ পণিরা।

এই কৃপণ চিত্তের মধ্যে হঠাৎ এসে পৌঁছয় দেবতার অমোঘ বজ্রবাণী—দ্বার খোলো, তোমার আলোকধেনুদের আমাকে দাও। পণিরা চমকে উঠে।

ইন্দ্রের এই বাণী যিনি বয়ে নিয়ে আসেন, তাঁর নাম সরমা। তিনি দেবশুনী, Hound of Heaven। গভীর অন্ধকারে রসার উত্তাল জলরাশি পার হয়ে তিনি আসেন ভোরের প্রথম অরুণলেখার মতো। লড়াই সুরু হয়। আলোর সঙ্গে অন্ধকারের। অচেতনার সঙ্গে প্রচেতনার। চিত্তের যে-অংশ দেবতার

আহ্বানকে অস্বীকার করে উড়িয়ে দিয়ে 'স্বার্থনিমগন' হয়ে থাকতে চায় তার সঙ্গে চিত্তের সেই অংশের যে ডাক শুনে জেগে উঠেছে। এই পণি-সরমা সংবাদ আসলে নিজেরই সঙ্গে নিজের স্বগত সংলাপ, নিজের দৈবী সত্তার সঙ্গে অদৈবী সত্তার। শেষ পর্যন্ত জয় হয় আলোর।

যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
এই অরুণ-আলোর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দাও।
আমার পরাণবীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃতগান—
তার নাইকো বাণী, নাইকো ছন্দ, নাইকো তান।
তারে আনন্দের এই জাগরণী ছুঁইয়ে দাও। (পূজা ৯২)

এই আমার-মাঝে-ঘুমন্ত জনের জেগে ওঠা, এই অমৃতগানের আনন্দ-উৎসার দিয়ে শেষ হয়েছে পণি-সরমা সংবাদ।

১, ৩, ৫, ৭, ৯ পণিদের উক্তি। বাকিগুলি সরমার।

১॥ **কিম্ ইচ্ছন্তী** কী চেয়ে **সরমা**…**ইদম্ প্র আনট্** এই এতদূর এসেছ, √নশ্+লুঙ্ ২।১, **অধ্বা দূরে হি** পথ যে অনেক দূর, **পরাচৈঃ** পরাঙ্মুখ পুনরাবৃত্তিহীন গমনের দ্বারা **জগুরিঃ** চলেছে তো চলেছেই (√গম্, আত্-ঋ-গম-হন-জনঃ কি-কিনৌ লিট্ চ পা ৩।২।১৭১ দ্র. নি. ১১।২৫), অথবা দুর্গম দুঃসাধ্য (√গুর্—প্রয়াস)। **কা** কী **অস্মে-হিতিঃ** আমাদের মধ্যে নিহিত আছে? **কা পরিতক্ম্যা আসীত্** কেমন ছিল রাত? অথবা 'পরি' ঘুরে ঘুরে 'তক্ম্যা' গমন (√তক্—গমন) কেমন ছিল? **কথম্** কেমন করে **রসায়াঃ** রসা-নদীর **পয়াংসি** জলরাশি **অতরঃ** পেরোলে?

২॥ **পণয়ঃ** হে পণিগণ **ইন্দ্রস্য ইষিতা দূতীঃ** ইন্দ্রের প্রেরিতা দূতী আমি **বঃ** তোমাদের **মহঃ নিধীন্** মহা-নিধি, বিপুল গুপ্তধন **ইচ্ছন্তী** চেয়ে **চরামি** বিচরণ করছি। **অতিষ্কদঃ ভিয়সা** অতিষ্কন্দন, অতিক্রমের ভয়ে **তত্** সেই রসার জল **নঃ** আমাকে **আবত্** রক্ষা করেছে। **তথা** সেই ভাবেই **রসায়াঃ** রসার **পয়াংসি** জলরাশি **অতরম্** পেরিয়েছি।

৩॥ **সরমে** ওগো সরমা **ইন্দ্রঃ**…**কীদৃক্** কেমন? **কা দৃশীকা** কেমন দেখতে? **যস্য দূতীঃ** যার দূতী হয়ে **পরাকাত্** অতিদূর থেকে **ইদম্** এখানে, এই যে **অসরঃ** এসেছ? **আ গচ্ছাত্ চ** সে এখানে আসুক-না,

এনা<এন=এনম্, একে **মিত্রম্ আ দধাম** মিত্র করে রাখব। **অথ** এবং **সঃ** আমাদের **গবাম্** গরুদের **গো-পতিঃ** গো-পতি **ভবাতি** হবে সে। গচ্ছাত্ ও ভবাতি উভয়ত্র অনুরোধে লেট্।

৪॥ **যস্য দূতীঃ** যাঁর দূতী হয়ে **পরাকাত্ ইদম্ অসরম্** সুদূর থেকে এসেছি এখানে, **তম্ দভ্যম্ অহম্ ন বেদ** তাঁকে মারা যায় বলে আমি জানি না। **সঃ** তিনি **দভত্** মারতে সমর্থ অন্যদের (শক্যার্থে লেট্)। **স্রবতঃ গভীরাঃ** স্রোতস্বিনী নদীরা **তম্** তাঁকে **ন গূহন্তি** লুকিয়ে রাখতে পারে না। **ইন্দ্রেণ** সেই ইন্দ্রের দ্বারা **হতাঃ** নিহত হয়ে **পণয়ঃ** হে পণিগণ **শয়ধ্বে** তোমরা শুয়ে পড়বে।

৫॥ **সুভগে সরমে** ওগো সুন্দরী সরমা **দিবঃ অন্তান্** দ্যুলোকের সীমানা **পরি** ঘুরে এবং পেরিয়ে **পতন্তী** ছুটে ছুটে **ইমাঃ গাবঃ** এই যে গরু-গুলিকে **ঐচ্ছঃ** খুঁজছ **এনাঃ** এদের-কে **কঃ** কে **অ-যুধ্বী** যুদ্ধ না করেই (স্নাত্ব্যাদয়শ্চ পা ৭।১।৪৯) **তে** তোমাকে, তোমার উদ্দেশে **অব-সৃজাত্** মুক্ত করে দেবে? **অস্মাকম্ উত** আমাদেরও **তিগ্মা আয়ুধা** তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র **সন্তি** আছে।

৬॥ **পণয়ঃ** ওহে পণিরা **বঃ বচাংসি** তোমাদের কথাবার্তা **অসেন্যাঃ** সেনা-র যোগ্য নয়। **পাপীঃ তন্বঃ** তোমাদের পাপ-শরীর **অনিষব্যাঃ সন্তু** ইষু-নিক্ষেপের অযোগ্য হোক। **বঃ** তোমাদের **এতবৈ পন্থাঃ** যাওয়ার পথ **অধৃষ্টঃ** দুর্ভেদ্য, অগম্য **অস্তু** হোক। **বৃহস্পতিঃ**...**বঃ**...**উভয়া** দুদিকেই **ন মৃল়াত্** সুখ না দিন (√মৃড্+লেট্ ৩।১)

৭॥ **সরমে...গোভিঃ অশ্বেভিঃ বসুভিঃ** গো অশ্ব এবং বসু দিয়ে **নি-ঋষ্টঃ** অতিশয় পূর্ণ **অয়ম্ নিধিঃ** এই গুপ্তধন **অদ্রি-বুধ্নঃ** পাথরে পোঁতা। **যে সু-গোপাঃ** যারা রক্ষা করতে পটু **পণয়ঃ** সেই পণিরা **তম্ রক্ষন্তি** তাকে রক্ষা করছে। **রেকু** শব্দ-যুক্ত (√রেক্—শব্দ) **পদম্** স্থানে **অলকম্** মিছিমিছি, তু. অলীক **আ জগন্থ** এসেছ (√গম্+লিট্ ২।১)।

৮॥ **সোম-শিতাঃ** সোম-তীক্ষ্ণ **ঋষয়ঃ** ঋষিরা **ইহ** এখানে **আ গমন্** আসুন (লেট্ ৩।৩), **অয়াস্যঃ** তন্নামক ঋষি **নবগ্বাঃ অঙ্গিরসঃ** নয়টি গো বা আলো বা রশ্মিযুক্ত অঙ্গিরা ঋষিরা (দ্র. বেমী ৭৬৯/৯২৫) আসুন। **তে** তাঁরা **গোমাম্ এতম্ ঊর্বম্** এই গো-সমূহ **বি ভজন্ত** বিভাগ করবেন (সার্বকালিক

লুঙ্‌—সায়ণ)। **অথ** তখন **পণয়ঃ** ওহে পণিরা **এতত্‌ বচঃ** এই কথাটি **বমন্‌ ইত্‌** উগরে ফেলতেই হবে (লেট্‌ ৩।৩)।

৯॥ **সরমে⋯দৈব্যেন সহসা** দেবতার শক্তিতে **প্রবাধিতা** বাধ্য হয়ে **ত্বম্‌** তুমি **এবা**=এবম্‌, এইভাবে **চ আ জগন্থ** এখানে এসেছ, **পুনঃ মা গাঃ** আর ফিরে যেও না। সায়ণের অর্থ চ=চেত্‌, যখন এসেইছ তখন⋯। **ত্বা স্বসারম্‌ কৃণবৈ** তোমাকে বোন করতে চাই। **সুভগে** সুন্দরী **তে** তোমাকে **গবাম্‌** গরুদের **অপ ভজাম** ভাগ দেব।

১০॥ **অহম্‌ ভ্রাতৃত্বম্‌ স্বসৃত্বম্‌ ন বেদ** আমি ভ্রাতৃত্ব ভগিনীত্ব জানি না। **ইন্দ্রঃ ঘোরাঃ অঙ্গিরসঃ চ বিদুঃ** ইন্দ্র এবং ঘোর অঙ্গিরা ঋষিরা জানেন। **গো-কামাঃ মে অচ্ছদয়ন্‌** গো-কাম তাঁরা আমার কাছে প্রীতির পাত্র হয়েছিলেন (√ছন্দ্‌—ভাল লাগা), **যদ্‌** যে জন্য **আয়ম্‌** আমি এসেছি। **পণয়ঃ⋯ অতঃ** এখান থেকে **বরীয়ঃ** উরু-তর, আরো দূর দেশে **অপ-ইত** চলে যাও।

১১॥ **পণয়ঃ⋯দূরম্‌ বরীয়ঃ** দূরে আরো দূরে **ইত** চলে যাও। **গাবঃ** গাভীরা **উত্‌ যন্তু** উঠে আসুক, উর্ধ্বগমন করুক **মিনতীঃ** শ্লিষ্ট, (১) √মী—ধ্বংস করা>ধ্বংস করতে করতে (২) যারা ধ্বংস হতে বসেছিল, ব্যত্যয়েন কর্মণি শতৃ—সায়ণ (৩) √মা—হাম্বাধ্বনি করা > বিকরণ ব্যত্যয়, হাম্বাধ্বনি করতে করতে **ঋতেন** ঋতের দ্বারা, আর্তনাদকে ঋত-নাদে পরিণত করতে করতে। **যাঃ নিগূঢ়াঃ** লুকোন যে গাভীদের **বৃহস্পতিঃ⋯সোমঃ⋯গ্রাবাণঃ** যজ্ঞ-পাষাণেরা **বিপ্রাঃ ঋষয়ঃ চ** এবং কবি ঋষিরা **অবিন্দন্‌** খুঁজে পেয়েছেন। যজ্ঞ-পাষাণ এখানে যজ্ঞের প্রতীক। যজ্ঞও আসলে 'গবেষণা' অর্থাৎ আলো-খোঁজাই। তু. তম্‌ এতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন⋯ (বৃহ ৪।৪।২২), এই আত্মাকে ব্রাহ্মণেরা জানতে চেষ্টা করেন বেদ-পাঠ করে, যজ্ঞ করে, দান করে⋯।

১৮। ব্রহ্মচর্য

অথর্ববেদের একাদশ কাণ্ডের অনুপম সূক্ত—ব্রহ্মচর্যম্। ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ যে অধ্যয়ন করে এবং আনুষঙ্গিক সংযমাদি নিয়মগুলি পালন করে সে হল ব্রহ্মচারী অর্থাৎ ছাত্র। তার ব্রত হল ব্রহ্মচর্য।

ব্যাপক অর্থে ব্রহ্মচর্য হল ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহতের মধ্যে বিচরণ করা। অসীমের, বিরাটের উপলব্ধি এবং জীবনে তার রূপায়ণই যথার্থ ব্রহ্মচর্য। অর্থাৎ ব্রহ্মচারী বা ছাত্রের কর্তব্য শুধু বেদাধ্যয়ন বা অধ্যয়ন নয়, তার লক্ষ্য হবে সেই বৃহৎকে অনুভব করা, যার ছায়া হল বেদ ; সেই 'মহা-ভূত' বা বিপুল অস্তিত্বকে স্পর্শ করা—যার নিঃশ্বাস এই সৃষ্টি আর এই সৃষ্টির যত কিছু বিদ্যা।

এই ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচর্যের মহিমা গান করেছেন অথর্ববেদের ঋষি ব্রহ্মচর্য-সূক্তের ছাব্বিশটি ঋকে।

১॥ ছন্দ পুরোঽতিজাগতা বিরাড্‌গর্ভা ত্রিষ্টুপ্। **উভে রোদসী** দ্যুলোক-ভূলোক দুটিকেই **ইষ্ণন্** নাড়া দিয়ে, জাগিয়ে (ক্র্যাদি √ইষ্) **ব্রহ্মচারী** ছাত্র **চরতি** চলে। **দেবাঃ** দেবতারা **তস্মিন্** তার মধ্যে **সংমনসঃ** সমান-মনা, একমত **ভবন্তি** হয়। **সঃ** সেই ব্রহ্মচারী **পৃথিবীম্ দিবম্ চ** পৃথিবী এবং দ্যুলোককে **দাধার** দধার, ধারণ করে আছে। **সঃ**···**তপসা** তপস্যা দিয়ে **আচার্যম্** আচার্যকে **পিপর্তি** পরিপূর্ণ করে।

২॥ ছন্দ পঞ্চপদা বৃহতীগর্ভা শক্বরী। **পিতরঃ** পিতৃগণ **দেবজনাঃ** দেবযোনি-রা **দেবাঃ** দেবতারা **সর্বে** সকলে **পৃথক্** প্রত্যেকে **ব্রহ্মচারিণম্ অনু-সম্-যন্তি** ব্রহ্মচারীর সঙ্গে মিলিত হয়ে চলেছেন। **গন্ধর্বাঃ** গন্ধর্বেরা **এনম্ অনু-আয়ন্** এর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। **ত্রয়ঃ-ত্রিংশত্ ত্রি-শতাঃ ষট্-সহস্রাঃ** ছ হাজার তিনশো তেত্রিশ—**সর্বান্ দেবান্** সব দেবতাদের **সঃ** সে **তপসা পিপর্তি** তপস্যা দিয়ে পরিপূর্ণ করে।

৩॥ ছন্দ উরোবৃহতী। **আচার্যঃ** গুরু **ব্রহ্মচারিণম্ উপনয়মানঃ** ব্রহ্মচারীকে যখন উপনীত করেন. তখন **অন্তঃ গর্ভম্ কৃণুতে** তাকে ভেতরে গর্ভের মতো গ্রহণ করেন। **তিস্রঃ রাত্রীঃ** তিন রাত **তম্ উদরে বিভর্তি**

তাকে উদরে ধারণ করেন। **জাতম্ তম্ দেবাঃ দ্রষ্টুম্ অভি-সম্-যন্তি** সে জাত হলে দেবতারা সকলে মিলে তাকে দেখতে আসেন।

এই ঋক্‌টি যেন 'দ্বিজ' শব্দটির ব্যাখ্যা। উপনয়ন অর্থাৎ বেদশিক্ষার সুরু হল ব্রহ্মচারীর পক্ষে নতুন জন্মলাভ। এই জন্মে আচার্যই হলেন তার জননী। তিন রাত্রি একান্তবাস হল গর্ভবাসের তুল্য। তারপর সে যখন 'ভূমিষ্ঠ' হয় নতুন একটি চেতনা নিয়ে, তখন দেবতারা তাকে দেখতে আসেন, কেননা দেবতারা তখন তার আত্মীয়। আলোকলোকের সঙ্গে, দিব্যচেতনার রাজ্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন হয় এই নবজন্মের মধ্যে দিয়ে।

৪॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। **ইয়ম্ পৃথিবী** এই পৃথিবী **সমিত্** একটি সমিধ্। **দ্যৌঃ দ্বিতীয়া** দ্যুলোক দ্বিতীয় সমিধ্। **উত** আবার **অন্তরিক্ষম্ সমিধা পৃণাতি** অন্তরিক্ষকে সে সমিধ্ দিয়ে পূর্ণ করে (√পৃ ক্র্যাদি—পূর্ণ করা)। **সমিধা** সমিধ্ দিয়ে **মেখলয়া** মেখলা অর্থাৎ মুঞ্জ ঘাসের তৈরী কোমরবন্ধ—ব্রহ্মচারীর uniform-এর যা অঙ্গ—তাই দিয়ে **শ্রমেণ** শ্রম দিয়ে **তপসা** তপস্যা দিয়ে **ব্রহ্মচারী**···**লোকান্ পিপর্তি** লোকসমূহকে পরিপূর্ণ করে (√পৃ হ্বাদি—পূর্ণ করা)।

৫॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। **ব্রহ্মণঃ পূর্বঃ জাতঃ** ব্রহ্মের পূর্বে জন্মেছে **ব্রহ্মচারী**···। **ঘর্মম্ বসানঃ** সূর্যতেজের বসন পরে **তপসা** তপস্যাবলে **উদ্-অতিষ্ঠত্** উত্থিত হয়েছে। **তস্মাত্ জাতম্** তার থেকে জন্মেছে **ব্রাহ্মণম্** ব্রাহ্মণ, **জ্যেষ্ঠং ব্রহ্ম** সবার ওপরে যে ব্রহ্ম সে, **অমৃতেন সাকম্ দেবাঃ চ** এবং অমৃত-সহ দেবতাবৃন্দ।

৬॥ ছন্দ শাক্করগর্ভা জগতী। **দীক্ষিতঃ** ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত **দীর্ঘশ্মশ্রুঃ** লম্বা-দাড়ি, অর্থব্যয় সময়ের অপচয় ও সৌন্দর্যচর্চার প্রতিরোধে ছাত্রের কামানো নিষিদ্ধ ছিল, **কার্ষ্ণম্ বসানঃ** কৃষ্ণমৃগের চর্ম পরিহিত, এ-ও ব্রহ্মচারীর uniform এর অঙ্গ, **সমিধা সমিদ্ধঃ** সমিধ্-আহুতির দ্বারা সম্যক্‌রূপে প্রদীপ্ত **ব্রহ্মচারী**···**এতি** চলেছে। **সঃ** সে **পূর্বস্মাত্ উত্তরম্ সমুদ্রম্** পূর্ব থেকে উত্তর সমুদ্রে **সদ্যঃ এতি** নিমেষে চলে যায়। **লোকান্ সংগৃভ্য** লোকসমূহকে একসঙ্গে সম্যক্‌রূপে গ্রহণ ক'রে **মুহুঃ** মুহূর্তে **আ-চরিক্রত্** 'আ' আপনার পানে 'চরিক্রত্' করে নেয় অত্যন্ত বেশী ক'রে (√কৃ+যঙ্‌লুক)।

৭॥ ছন্দ বিরাড্‌গর্ভা ত্রিষ্টুপ্‌। **ব্রহ্ম আপো লোকম্‌ প্রজাপতিম পরমেষ্ঠিনম্‌ বিরাজম্‌ জনয়ন্‌** ব্রহ্ম, জল যা প্রাণের প্রতীক, লোকসমূহ, পরমে স্থিত প্রজাপতি এবং বিরাট্‌কে জন্ম দিয়ে **ব্রহ্মচারী··· অমৃতস্য যোনৌ গর্ভঃ ভূত্বা** অমৃতের যোনিতে গর্ভ হয়ে **ইন্দ্রঃ হ ভূত্বা** ইন্দ্র হয়ে **অসুরান্‌ ততর্হ** অসুরদের হানে।

ব্রহ্মচর্যের মহিমা বোঝাতে গিয়ে ব্রহ্মচারীর স্তুতি করা হচ্ছে উপরোক্ত ঋক্‌গুলিতে। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে এগুলি অতিশয়োক্তি। আবার, সত্যিকার ব্রহ্মচারী ব্রহ্মীভূত হয়ে নিজেকে সৃষ্টিধর, সর্বকারণ, লোকেশ্বর, দেবেশ্বর, অশুভঘাতক, অসুরহন্তা রূপে দর্শন করেন, একথাও সত্যি। তখন শ্যামা 'মা' হয়ে যান রামপ্রসাদের 'মেয়ে'।

৮॥ ছন্দ পুরোঽতিজাগতা ত্রিষ্টুপ্‌। **আচার্যঃ · উভে ইমে** এই দুটি **নভসী উর্বী গম্ভীরে** তিনটিই দ্যাবাপৃথিবীর প্রতিশব্দ, দ্র. দ্যাবাপৃথিবী-সূক্ত-ভাষ্য **পৃথিবীম্‌ দিবম্‌ চ** পৃথিবীকে ও দ্যুলোককে **ততক্ষ** তক্ষণ করেছেন, করেন। **ব্রহ্মচারী তপসা** তপ দিয়ে **তে** সে-দুটিকে **রক্ষতি** রক্ষা করে। **তস্মিন্‌** তাতে **দেবাঃ** দেবতারা **সংমনসঃ ভবন্তি** এক-মন হয়ে মেলে।

এখানে বস্তু রূপ ভৌতিক রূপের কথা বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে ভাব-রূপ রহস্য-রূপ প্রাণ-রূপ চিদ্রূপের কথা। সাধারণের কাছে যা সামান্য কাদা-মাটি-পাথর, তন্ময় শিল্পী তারি মধ্যে দেখেন তাঁর প্রতিমার রূপের কুয়াশা, সেই কাদা-মাটি-পাথর থেকেই একটু একটু করে তিনি গড়ে তোলেন তাঁর ভাব-প্রতিমা। ব্রহ্মজ্ঞ আচার্যও ঠিক তেমনি করে এই কাদামাটির পৃথিবীর মধ্যে দেখেন স্বর্গের আলোর চালচিত্তির দেওয়া এক চিন্ময়ী রূপ। সেই রূপকে তিনি একটু একটু করে ফুটিয়ে তোলেন ভেতর-বা'র-একাকার-করা অফুরন্ত রূপ-সায়র তোলপাড় করে। তাঁর গভীর ভাবদৃষ্টি দিয়ে সৃষ্টি করেন স্বপ্নের ভুবন। সৃষ্টি করে তুলে দেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরসাধকের হাতে। উত্তরসাধক ব্রহ্মচারী তাঁর তপস্যা দিয়ে লালন করে চলেন আচার্যের গড়ে তোলা এই কল্পলোক। শিষ্যপরম্পরায় লালিত হতে হতে হয়ত একদিন এই স্বপ্ন একটি সর্বজনগ্রাহ্য স্থূলরূপ ধারণ করে, হয়ত করে না, সৃষ্টির তেজস্ক্রিয় রেণু হয়ে মিশে যায় আকাশে, বাতাসে, চিত্তলোকে। এমন বহু ভাঙা স্বপ্নভুবনের বহু পরমাণু দিয়ে হয়ত কোনদিন গড়ে উঠবে সজ্জনের বাসযোগ্য এক মধুর পৃথিবী।

৯॥ ছন্দ বৃহতীগর্ভা ত্রিষ্টুপ্। **ব্রহ্মচারী প্রথমঃ** প্রথম **ইমাম্ পৃথিবীম্ ভূমিম্ দিবম্ চ** এই প্রথিতা পৃথিবী-ভূমিকে ও দ্যুলোককে **ভিক্ষাম্ আ জভার** ভিক্ষারূপে আহরণ করে। **তে সমিধৌ কৃত্বা** এই দুটিকে সমিধ্ করে **উপাস্তে** সে উপাসনা করে। **তয়োঃ বিশ্বা ভুবনানি আর্পিতা** অর্পিতা (সংহিতায় দীর্ঘ), এই দুটিতেই বিধৃত আছে সমস্ত সৃষ্টি।

নিষ্কিঞ্চন ব্রহ্মচারীর ভিক্ষাপাত্র তার চির-উৎসুক চির-জিজ্ঞাসু চির-গ্রহিষ্ণু মন। কোন কৃপণ ধনীর সঙ্কীর্ণ মুষ্টিভিক্ষার জন্য সে লালায়িত নয়। তার আশ্চর্য ভিক্ষাপাত্র ভ'রে সে পেয়েছে দেবতার আশ্চর্য দান—এই বিরাট্ অপরূপা ফুল্লকুসুমরঞ্জিতা গিরিঅরণ্যগম্ভীরা বহুশ্রেয়সী পৃথিবী আর ঐ সুদূর আলোক-কজ্জল-লিপ্ত-নয়ন অনিমেষ মহাকাশ। ব্রহ্মচারী দেখছে, এ দুটি যেন মহা-সৃষ্টিযজ্ঞের দুটি সমিধ্—দাউ দাউ করে জ্বলছে আর মুহূর্তে মুহূর্তে সৃষ্টি করে চলেছে নব নব রূপ। ব্রহ্মচারী প্রাণে পেয়েছে সেই আগুনের পরশমণির ছোঁয়া। দেবতা তার জীবন পুণ্য করেছেন দহন দানে।

১০॥ ছন্দ ভুরিক্ ত্রিষ্টুপ্। **ব্রাহ্মণস্য** ব্রাহ্মণের **নিধী** দুটি নিধি, গুপ্তধন **গুহা** গুহাতে, গোপনস্থানে **নিহিতৌ** নিহিত আছে। **অন্যঃ অর্বাক্** একটি এখানে, **অন্যঃ দিবস্পৃষ্ঠাত্ পরঃ** একটি দ্যুলোক পেরিয়ে। **ব্রহ্মচারী… তপসা** তপস্যা দিয়ে **তৌ রক্ষতি** সেই দুটি রক্ষা করে। **ব্রহ্ম বিদ্বান্** ব্রহ্মকে জেনে, পেয়ে **তত্ তাকে কেবলম্ কৃণুতে** একান্ত নিজস্ব করে।

সায়ণের মতে গুপ্তধন দুটি হল এই পৃথিবীতে বেদ এবং ঐ দ্যুলোকে সে-বেদের পরম অর্থ—দেবতা। এখানে বেদ লুকিয়ে আছে বেদজ্ঞ আচার্যের হৃদয়-গুহায়। নিরুক্তে একটি প্রাচীন শ্লোক আছে—

> বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণম্ আজগাম
> গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহম্ অস্মি।
> অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায়
> ন মা ব্রূয়া বীর্যবতী যথা স্যাম্॥

অর্থাৎ

> বিদ্যা এসে ব্রাহ্মণকে কন—
> আমি তোমার নিধি, আমায় রাখ।
> অসংযমী হিংসুটে আর বাঁকা লোকের কাছে

আমায় বোলো না কো।
শক্তি আমার থাকবে তবেই অটুট অনিষ্ফল।

তাই বেদবিদ্যাকে গুপ্তধনের মতোই লুকিয়ে রাখেন বেদবিদ্ অনধিকারীর দৃষ্টির আড়ালে।

বেদের যা অর্থ, যা প্রতিপাদ্য, তা হল দেবতা, বিশ্বব্যাপী চিৎ-তরঙ্গ, স্রষ্টার চিত্ত-রঙ্গ, আলোক-আনন্দ-রস-প্রেম-পারাবার। সেই দেবতা লুকিয়ে আছেন ঐ দ্যুলোকে, হিরণ্ময় পাত্রের আবরণে, লুকোচুরি খেলছেন।

ব্রহ্মচারী তার অধ্যয়ন-রূপ তপস্যা দিয়ে রক্ষা করে বেদের শব্দ-শরীর—সংহিতা-পাঠ, পদ-পাঠ, ক্রম-পাঠ ইত্যাদি বিবিধ পাঠের শৃঙ্খলে বেঁধে। আর তার শ্রদ্ধা-ভক্তি-একনিষ্ঠা-ধীযোগ ইত্যাদি তপস্যা দিয়ে রক্ষা করে সে বেদের জ্যোতির্ময় অর্থ-শরীর অর্থাৎ দেবতাকে। তারপর এই বেদ-দেব—এই পরমগোপ্য পরমগুহ্য নিধি দুটি হয়ে যায় তার নিজের একান্ত আপন ধন, যখন সে ব্রহ্মকে বৃহৎকে অনন্তকে জানে, পায়। রক্ষক থেকে সে হয়ে যায় স্বামী, রাখাল থেকে মালিক। কেননা ব্রহ্মকে জানা মানেই বেদের পরম শব্দার্থকে জানা— সে-শব্দ সমস্ত সৃষ্টির সম্মিলিত নাদধ্বনি ওঙ্কার এবং তাকেও পেরিয়ে এক মহানিস্তব্ধতা, আর সে-অর্থ শব্দেরই অঙ্গাঙ্গ সহচর এই অন্তরতম সুদূরতম অণুতম মহত্তম স্থিরচঞ্চল চিররহস্য। সে রহস্যের সায়রে ব্রহ্মচারী হয়

সাঁতারু, ডুবুরী, মীন, কূর্ম, সূর্য, ভোর।
পাগল, মাতাল, রাজা, কাঙালিনী, চোর॥

১১॥ ছন্দ জগতী। **অন্যঃ অর্বাক্** একটি নিচের দিকে **অন্যঃ ইতঃ পৃথিব্যাঃ** আর একটি এই পৃথিবী থেকে—**অগ্নী** দুটি আগুন **ইমে নভসী-অন্তরা** এই দ্যুলোক-ভূলোকের মাঝখানে **সম্-আ-ইতঃ** সমবেত হয়। **তয়োঃ দৃঢ়াঃ রশ্ময়ঃ** তাদের সুদৃঢ় রশ্মিজাল **তয়োঃ অধি শ্রয়ন্তে** দ্যুলোকে-ভূলোকে অধিশ্রিত হয়। **ব্রহ্মচারী…তপসা…তান্ আ তিষ্ঠতি** তাদের মধ্যে আস্থিত হয়।

একটি আগুন নামছে দ্যুলোক থেকে পৃথিবীর দিকে—সূর্য-আগুন, বিশ্বদেবতার প্রসাদবহ্নিবর্ষা। বেদের ঋষি একে বলেছেন দ্যুলোকের বৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আলোকের এই ঝরণাধারা, ত্রিভুবনেশ্বরের নেমে-আসা প্রেম। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন Descent of Divine Grace.

আর একটি আগুন উঠছে এই পৃথিবীর বুক থেকে স্বর্গের পানে—বৈশ্বানর অগ্নি, বিশ্বনরের যজ্ঞাঙ্গুলিশিখা। বেদের ঋষি তাকে বলেছেন সহস্রিণী ইষ্—অনন্তধার এষণা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা প্রভু তোমার পানে তোমার পানে তোমার পানে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন Fire of Human Aspiration.

'নভসী অন্তরা' দ্যুলোক-ভূলোকের সঙ্গমে মিলছে তারা, লক্ষস্ফুলিঙ্গদীপ্তপক্ষ উড়ন্ত জ্বলন্ত দুটি উর্ধ্বমুখ অধোমুখ প্রেমাগ্নিবিহঙ্গ, মানুষের জন্য দেবতার প্রেম আর দেবতার জন্য মানুষের প্রেম, পরস্পরকে আলিঙ্গন করে একীভূত হচ্ছে, উভয়ালিঙ্গনে উভলিঙ্গ হচ্ছে, বজ্রসত্ত্ব হচ্ছে। সেই অনন্তরশ্মিবিচ্ছুরণ-দীর্ণবিদীর্ণান্ধকার আলোক-বজ্রমণির মালা গলায় পরে দেবতা আর মানুষের মাঝখানে বিপুল মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে ব্রহ্মচারী অভ্রংলিহ তুষারমৌলি মহাগিরির মতো, তাকে ঘিরে আলোকের অনন্ত আষাঢ়।

দেবতার আর মানুষের এই পরস্পরকে চাওয়াই হল বেদের ঋষির 'দিব্যং পার্থিবং বসু', দ্যুলোকের আর পৃথিবীর ধন। যাস্ক বলছেন, এই যাচ্ঞাই যজ্ঞ।

সার্থকনামা ঋষি সোমাহুতির একটি অগ্নিমন্ত্রে ফুটে উঠেছে এই কথাটি—

স নো বৃষ্টিং দিবস্পরি
স নো বাজম্ অনর্বাণম্।
স নঃ সহস্রিণীর্ ইষঃ (২।৬।৫)

দিন আমাদের তিনি দ্যুলোকের সব-ছাওয়া বর্ষণ
দিন আমাদের তিনি অফুরান বজ্রবীর্যধন
দিন আমাদের তিনি অনন্ত-চাওয়া
হাজার হাজার আলোর তীরের মতো তাঁর পানে ধাওয়া।

১২। ছন্দ শাক্বরগর্ভা বিরাট্ অতিজগতী। **অভিক্রন্দন্** ডাক দিতে দিতে **স্তনয়ন্** গর্জন করতে করতে **অরুণঃ শিতিঙ্গঃ বৃহচ্-ছেপঃ** রাঙা সাদা-কালো বিপুল-প্রজনন দেবতা **ভূমৌ অনুজভার** ভূমিতে অনুপ্রবিষ্ট। **পৃথিব্যাম্ সানৌ** পৃথিবীর সানুতে **ব্রহ্মচারী রেতঃ সিঞ্চতি** প্রাণধারা সিঞ্চন করে। **তেন** তাইতে **চতস্রঃ প্রদিশঃ** চারদিক **জীবন্তি** বাঁচে।

'দেবা বৈ পরোক্ষপ্রিয়া ভবন্তি' অর্থাৎ দেবতারা লুকোচুরি বা ঘুরিয়ে-বলা

বা আড়াল ভালবাসেন। এখানে পর্জন্যের নাম নেই, ঋষি যেন ভদ্রা বধূর মতোই (ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্ নিহিতা অধি বাচি !) সেই 'ভাস্বর' দেবতার নাম করেন নি, কিন্তু বিশেষণের ঘনঘটা থেকে বুঝতে আর বাকি থাকে না যে এই আলোর-আড়ালটি কোন দেবতার ! বৃষ্টিসূক্তের ষষ্ঠ ঋকে একই রকম ভাষায় পর্জন্যের বর্ণনা করা হয়েছে—

অভি ক্রন্দ স্তনয় গর্দয়োদধিং
ভূমিং পর্জন্য পয়সা সম্ অঙ্ ধি।

মেঘবরণ মেঘবসন পর্জন্য। সে মেঘের নানান রং। কখনো অরুণ—রাঙা। কখনো শিতিঙ্গ—'শিতি' সাদা বা কালো। তার কাছাকাছি যায় যা তা হল শিতিঙ্গ। কালচে, সাদাটে বা উভয়ের মিশ্রণে ছাই-ছাই। এই বিচিত্রবসন-পরা অন্তরিক্ষচারী বাউলদরবেশ তার গাবগুবাগুব বাজাতে বাজাতে পৃথিবীর প্রেমে নেমে আসে, পৃথিবীর সর্বাঙ্গ ভরে ঢালে তার প্রবলপ্রচুর বিপুলপ্রচণ্ড বর্ষণ। সে দিব্যমিলনের সাক্ষী হয় ব্রহ্মচারী তার তপোলব্ধ দিব্যদৃষ্টিবলে। সে দেখতে পায়, এই আকাশ-ছাওয়া পৃথিবী-ভাসানো বৃষ্টি—এ শুধু প্রকৃতির খেলা নয়, এ প্রকৃতি-পুরুষের প্রেমের লীলা। তখন তার মন হয় দিব্যপক্ষ পক্ষীরাজ। মেঘের সঙ্গী হয়ে সে উড়ে চলে দিক্-দিগন্তে, সেই তেজোগর্ভ প্রেমগর্ভ বহ্নিপতঙ্গ-সম সৃষ্টিবীজ জলকণাগুলি অনুগত কৃষকের মতো ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেয় শিখরে শিখরে, অজগরী ধারা হয়ে তারা নেমে আসে, প্রবেশ করে পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে, জন্ম নেয় লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা—দুটি পাতা-ডানা মেলা লক্ষ লক্ষ জীবাঙ্কুর।

ব্রহ্মচারী যেহেতু ব্রহ্ম-চারী, অনন্ত-বিহারী, অর্থাৎ অনন্তের সঙ্গে তার জানাশোনা, আলাপ, হৃদ্যতা আছে, তাই অনন্তের রহস্যলীলার সে-ও অংশীদার। অনন্ত ক্ষণে ক্ষণে তার আশ্চর্যকুঠুরীর আশ্চর্য ঝাঁপিটি খুলে খুলে দেখায় তার প্রাণবন্ধু ব্রহ্মচারীকে। ব্রহ্মচারীর শরীর-মন-প্রাণের অণুপরমাণুর সঙ্গে অনন্তের অণুপরমাণু সূক্ষ্ম সুতোয় নাড়ীর বাঁধনে বাঁধা। তাই ব্রহ্মচারী যেখানে থাকে, সেখানে অনন্ত অভদ্রতা কৃপণতা করতেই পারে না, বৃষ্টি সেখানে হয়ই। এমন কি অনাবৃষ্টির দেশে ব্রহ্মচারী গেলে তার টানে সেখানে বৃষ্টি নেমে আসবে—এ-ও এই ঋকের অর্থকলাপের মধ্যে একটি। রামায়ণে দশরথের বন্ধু লোমপাদ রাজার দেশে ঋষ্যশৃঙ্গের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে বারো বচ্ছরের রুদ্ধবৃষ্টি একসঙ্গে নেমে এসেছিল—এই কাহিনীর মধ্যে এরই অনুবৃত্তি পাই।

১৩॥ ছন্দ জগতী। **অগ্নৌ সূর্যে চন্দ্রমসি মাতরিশ্বন্ অপ্সু** অগ্নিতে সূর্যে চন্দ্রে মাতরিশ্বায় জলে **ব্রহ্মচারী সমিধম্ আ দধাতি** সমিধ্ আধান করে। **তাসাম্ অর্চীংষি** তাদের শিখাগুলি **পৃথক্** প্রত্যেকে **অভ্রে চরন্তি** মেঘে বিচরণ করে। **তাসাম্** তাদের থেকে হয় **বর্ষম্ আপঃ** বর্ষণ, জল **পুরুষঃ** মানুষ **আজ্যম্** ঘৃত।

অগ্নিতে সমিদাধান ব্রহ্মচারীর নিত্যকর্ম। সে শুধু একটি বিশেষ আগুনে কয়েকটি বিশেষ কাষ্ঠখণ্ড নিক্ষেপ করা নয়। সে আগুন তার কাছে বিশ্বজোড়া আগুনের নখপরিমাণ দর্পণ। সেই নখদর্পণে সে দেখতে পায় 'সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ' স্থাবরজঙ্গমের প্রাণপুরুষ সূর্যকে, নিখিলের আনন্দহৃদয় অমৃত-জ্যোতি চন্দ্রকে, বিশ্বের প্রথম প্রাণ মাতরিশ্বাকে, আর তাঁর 'অন্তবিহীন অগ্নিধারা' এই সপ্তভুবনময়ী সপ্তস্বরা অনন্তপ্রবাহিণী নিত্যকল্লোলিনী আকাশগঙ্গা সৃষ্টিকে, বেদে যার পরিভাষিক নাম হল অপ্। অগ্নিতে দত্ত তার সরল প্রাণের সহজ আহুতি গিয়ে পৌঁছয় এই সর্বত্রই, যেমন পুকুরের মধ্যে ফেলা একটি ঢিলের আঘাত ঢেউ তুলে তুলে পৌঁছে যায় একেবারে তার প্রান্ত পর্যন্ত, যেমন নির্জন মাঠে বটের ছায়ায় একলা বাঁশির জয়জয়ন্তী সুর কাঁপতে কাঁপতে চলে যায় দশ-কুশী সব গ্রাম পেরিয়ে, তেপান্তরের মাঠ ছাড়িয়ে বনের ধারে একলা কুঁড়েয় এলোচুল কালোমেয়ের একেবারে বুকের মাঝখানটিতে।

অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর নিত্য সমিদ্-হোমের অগ্নিটিই হল সেই উজ্জ্বল চলন্ত সেতু যা তাকে প্রতিনিয়ত নিয়ে চলেছে এই প্রাকৃত পৃথিবীর, প্রাকৃত দৃষ্টির ওপারে সেই বিরাট্-রাজার রাজ্যে যেখানকার রহস্য দেখতে দেখতে কখনো জলজল কখনো ছলছল করছে তার অনিমেষ তৃতীয় নয়ন। এই অগ্নিই তার দেবযান-পথ। ব্রহ্মচারী দেখছে তারই চেতনার রঙে রঙীন পান্না-সবুজ, চুনী-রাঙা, মরকত-নীল, প্রবাল-লাল, পুষ্পরাগ-পীত হোমশিখাগুলি কেমন ঐ দেবযান-পথ ধরে ধরে উঠে যাচ্ছে আকাশে, মেঘের গায় ইন্দ্রধনুর মতো সংশ্লিষ্ট অথচ বিশ্লিষ্ট হয়ে ফুটে ফুটে উঠছে, তারপর বৃষ্টি হয়ে ঝুপ্ ঝুপ্ করে নেমে আসছে, চারিদিক জলে ভাসিয়ে আনছে প্রাণ, আনছে ধান। কালো গরুর দুধ উপচে পড়ছে, ভরে উঠছে গৃহস্থের ঘৃতকুম্ভ, যাজ্ঞিকের আজ্যস্থালী, ভরে উঠছে জনপদ শিশুর কলহাস্যে, যুবার কর্মচঞ্চল প্রদীপ্ত পদক্ষেপে। নদীতে পুকুরে দীঘিতে কুয়োয় টলটল করছে অসীম আকাশের ছায়া-পড়া কাকচক্ষু জল।

এই ঋক্‌টির প্রতিধ্বনি শুনি গীতায়, মনুসংহিতায়। গীতা বলছেন, 'দেবতা ও মানুষের পরস্পরসম্ভাবন থেকেই আসে পরম মঙ্গল। মানুষ দেয় দেবতাকে আহুতি, আর যজ্ঞতুষ্ট দেবতারা মানুষকে দেন তার বাঞ্ছিত ভোগ্য-সম্ভার। অন্ন থেকে হয় জীব, পর্জন্য বা বৃষ্টি অন্নের কারণ, যজ্ঞ থেকেই হয় বৃষ্টি, যজ্ঞের জন্ম কর্ম থেকে, কর্মের উৎস বেদ, বেদের উৎস অক্ষর পরব্রহ্ম। এই যে ঘুরে ঘুরে চলেছে চক্রটি, এটি যে না বোঝে, এবং অনুসরণ না করে, সে শুধু ইন্দ্রিয়ের আরাম নিয়েই থাকল, মলিন তার আয়ু, বৃথা তার জন্ম।' (দ্র. গীতা ৩।১১-১৬)

মনুসংহিতা বলছেন গৃহস্থের নিত্যহোম-প্রসঙ্গে—

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগ্‌ আদিত্যম্‌ উপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥ (মনু ৩।৭৬)

অগ্নিতে দত্ত সম্যক্‌ আহুতি আদিত্যে পৌঁছয়। আদিত্য থেকে জন্মায় বৃষ্টি। বৃষ্টি থেকে অন্ন হয়, তার থেকে প্রজা।

অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি সমস্বরে বলতে চাইছেন, আহুতি তথা যজ্ঞ হল সৃষ্টি তথা স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের ভাবসম্মিলন। সব শিল্পের মতো যজ্ঞও একটি শিল্প—বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সাধনা। এই একাত্মতা, এই ভাবসম্মিলন যদি যথার্থভাবে ঘটে, তাহলে হোতার তেজস্ক্রিয় ভাব-পরমাণুরা প্রকৃতির সৃষ্টিক্রিয়ার সহচর এমন কি নিয়ামক হয়, যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখি মহাপুরুষদের সাধনক্ষেত্রে, সিদ্ধপীঠে, তপোবনে, তীর্থে। অর্থাৎ যথার্থ নিঃশ্রেয়সের সাধনাতেই আসতে পারে যথার্থ অভ্যুদয় বা পার্থিব সমৃদ্ধি—এবং মহর্ষি কণাদ বলেন, এই উভয়ের মিলনই হল ধর্ম। প্রকৃতিকে আঁচড়ে-কামড়ে উড়িয়ে-পুড়িয়ে উৎখাত করে নিঃশেষ করে দানবসভ্যতার বিকট উদ্‌ঘাতিনী (=এবড়োখেবড়ো, আবার 'ঘা 'উত্‌' অর্থাৎ উঁচুতে তুলে আঘাত করে, চরম শিখরে তুলে নিয়ে ফেলে দেয় সর্বনাশের গহ্বরে'—এই অর্থও হয়) সমৃদ্ধি নয়, আনো প্রকৃতির সুরে সুর মিলিয়ে দেবসভ্যতার শান্ত, সুষম, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় simply rich সমৃদ্ধি। এক-একটি মানুষ নিত্যস্তোত্র বনস্পতির মতো ঊর্ধ্বে তুলে ধরুক স্তবাঞ্জলিশিখা। প্রসন্না বৎসলা ভুবনেশ্বরী ঝরান তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত শুভ্রধারাবর্ষণ, শ্যামশষ্পাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে। অলস রোমন্থে চরুক গাভীরা, দুগ্ধে-ঘৃতে-অন্নে পরিপুষ্ট পরিতৃপ্ত নারীপুরুষ আপন আপন কর্মে শান্ত সমাহিত ব্যাপৃত থাকুক বিশ্বমায়ের বিপুল স্নেহবটচ্ছায়ায়।

১৪॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্‌। **আচার্যঃ** আচার্য হলেন **মৃত্যুঃ বরুণঃ সোমঃ ওষধয়ঃ পয়ঃ**…। **জীমুতাঃ** মেঘেরা **সত্বানঃ** তাঁর সেনা, অনুচর, অনুগামী। **তৈঃ** তাদের দ্বারা **ইদম্‌ স্বঃ** এই আলো, আলোকলোক, শব্দ-রূপ-ময় জ্যোতির্লোক **আভৃতম্‌** সর্বতোভাবে ভৃত।

ব্রহ্মচারীর মহিমা-বর্ণনা এবং সেই সঙ্গে তার বিপুল দায়িত্ব সম্পর্কে পরোক্ষ ইঙ্গিতদানের পর এবার আচার্যের মহিমাখ্যাপন। এ-ও আসলে ব্রহ্মচর্যেরই স্তুতি। আবার আচার্যকে কতখানি সম্মান, সমীহ এবং শ্রদ্ধা করা উচিত, সে সম্পর্কে ব্রহ্মচারীকে অবহিত করাও এর উদ্দেশ্য।

আচার্য স্বয়ং মৃত্যু অর্থাৎ কিনা যম। সায়ণ বলছেন 'অপরাধাচরণাদ্ রুষ্টস্ তস্য জীবনম্ অপহরতি' শিষ্য দোষ করলে রুষ্ট হয়ে তার প্রাণ হরণ করেন। অতখানি না হলেও আচার্যের এই রূপটির সঙ্গে অল্পবিস্তর সবাই পরিচিত! কেননা প্রায় সব পাঠ-শালাতেই এক-আধজন যম থাকেন!

আচার্য বরুণ। সায়ণ বলছেন 'পরিচর্যাপরং ব্রহ্মচারিণং পাপান্নিবারয়তি' সেবাপরায়ণ শিষ্যকে পাপ থেকে নিবারণ করেন বলে তিনি বরুণ।

আচার্য সোম অর্থাৎ চন্দ্র। অর্থাৎ চাঁদের মতোই আহ্লাদক। রুষ্ট হলে যিনি যম, তুষ্ট হলে তিনিই সোম!

এই আপাত-অর্থের পেছনে রয়েছে নিগূঢ় অর্থ।

যম আচার্য হয়ে নচিকেতাকে মৃত্যুবিজ্ঞান তথা আত্মবিজ্ঞানের উপদেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং মৃত্যুঞ্জয় আত্মার গূঢ় রহস্য যিনি জানেন, তিনিই আচার্য হবার যোগ্য।

বরুণ হলেন অব্যক্তের দেবতা—সুদূর, বিপুল সুদূর, মহা অজানা। সেই মহা অজানায় ডুব দিয়ে যিনি 'ন-বেদা' হয়েছেন, অর্থাৎ জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে—যেখানে জানা নেই, শুধু হওয়া আছে—সেই রাজ্যে পৌঁছেছেন, তিনিই আচার্য হবার যোগ্য। তাঁর বিশ্বসাৎ সত্তার সংস্পর্শমাত্রই শিষ্যের রূপান্তর ঘটে, 'প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাত্‌' যেন দীপ থেকে জলে ওঠে দীপ।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আচার্য বরুণ তাঁর পুত্র ভৃগুকে তপস্যা করিয়ে করিয়ে আনন্দ-ব্রহ্মের উপলব্ধিতে নিয়ে গেছেন—এটিও স্মরণযোগ্য।

অর্থাৎ জীবন-মরণ, জানা-অজানা, সুখ-দুঃখ পেরিয়ে যে আনন্দঘন প্রেমঘন উজ্জ্বল সর্বময় সর্বসংশ্লিষ্ট সর্বপ্লাবী সর্বাবগাহী অথচ সর্বোত্তীর্ণ সর্বাতিশায়ী

অস্তিত্ব, সেই 'অস্তি ভাতি প্রিয়ং চ'-এর সন্ধান যাঁর জানা আছে তিনিই আচার্য।

উপনিষদে যিনি আনন্দ-ব্রহ্ম, সংহিতায় তিনিই সোম। আচার্য সেই সোম। সেই সোম-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি শিষ্যকে সস্নেহে সম্বোধন করেন 'সোম্য' বলে। সোম্য অর্থাৎ সোমকে পাবার যোগ্য। অর্থাৎ আমি যে-আনন্দে আছি, তুমিও সেই আনন্দে থাক—প্রতিটি সম্বোধনের মধ্যে দিয়ে এই চূড়ান্ত আশীর্বাদ তিনি ঢেলে দেন শুশ্রূষু শিষ্যের মধ্যে। চূড়ান্ত, কেননা এই সোম্য আনন্দ-লাভের যোগ্যতা অর্জনেই কঠিন ব্রহ্মচর্য-ব্রতের সার্থকতা। এই বিশ্বমৌচাকের মধু-র জন্যেই নিজের মধ্যে আগুন জ্বালানো—

অগ্নিম্ ঈলে. পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্ (১।১।১)

জ্বল্ জ্বল্ জ্বল্ জ্বলো হে আগুন,
হে মম জীবন-যজ্ঞ-নায়ক,
দেব-ঋত্বিক্, হোতা, ডাক দাও
দেবতা জাগুন।
দাও উজ্জ্বল সোম্য চেতনা
দাও, কোনদিন ম্লান যা হবে না।

আবার অন্যভাবেও অর্থ হয়। আচার্য মৃত্যু, আচার্য বরুণ, আচার্য সোম, অর্থাৎ আচার্য সর্বদেবময়। সমস্ত দেবতার শক্তি তাঁর মধ্যে এসে মিলিত হয় তাঁর ব্রহ্মচর্য-বলে, তবে তিনি আচার্য হতে পারেন। 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ'—ইত্যাদির বৈদিক মূল এইখানে। মনুসংহিতায় রাজাকেও বলা হয়েছে সর্বদেবময়, অর্থাৎ যিনি রাজা হবেন, তাঁর মধ্যে সমস্ত দেবতার কিছু কিছু শক্তি এসে মেলা চাই।

'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' যিনি ব্রহ্মকে অর্থাৎ সবকে জানেন তিনি সব-ই হন—এই ন্যায়ানুসারে ব্রহ্মবিদ্ আচার্য যেমন সর্বদেবতাত্মা, তেমনি সর্বভূতাত্মা-ও। তাঁর সর্বানুভূতি-বলে তিনি ওষধি-স্বরূপ অর্থাৎ বৃক্ষলতাশস্যময়; তাঁর ব্রহ্মদেহ নিয়ে তিনি আছেন অনল-অনিলে চিরনভোনীলে ভূধরে সলিলে

গহনে, বিটপিলতায় জলদের গায় শশীতারকায় তপনে। সেই দেবতার সঙ্গে তিনি এক 'য ওষধীষু যো বনস্পতিষু'।

আবার তিনি পয়ঃস্বরূপ। পয়ঃ মানে দুধ, পয়ঃ মানে জল। দুধ খাদ্যের সার। আচার্য অন্নাদ অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে যেমন এক, তেমনি এক অন্নের সঙ্গেও। জড়-চেতন-নির্বিশেষে তিনি বিশ্বব্যাপ্ত বিশ্বলীন ওতপ্রোত একাকার অখণ্ডৈকরসপ্রত্যয়ী। 'জীমূত' অর্থাৎ মেঘেরা তাঁর 'সত্বন্' অর্থাৎ যোদ্ধা-অনুচর। অন্তরিক্ষের যুদ্ধভূমি থেকে যেন তাঁরই নির্দেশে তারা বর্ষণ করে তাদের পয়োধারা বসুধারা যা দিয়ে 'আভৃত' হয়, বেঁচে থাকে, প্রাণ পায়, লালিত পালিত পুষ্ট সমৃদ্ধ হয় এই 'স্বর্' এই আলোকোজ্জ্বল লোক।

'স্বর্' স্বরলোক—জ্যোতির্লোক। স্বরতরঙ্গ আর আলোতরঙ্গ—শব্দ আর রূপ যেখানে একাকার, চেতনার সেই ভূমির নাম স্বর্। এ ঋষির চোখে নেমে এসেছে সেই স্বরাত্মিকা বিদ্যুন্ময়ী সর্বংলিহ-রসনাময়ী রসময়ী রূপসী বাক্। স্বর্গমর্ত্য একাকার করে বসুধাতল থেকে বসুধার গভীর সুধার অতল থেকে ঝলসে উঠেছে সেই প্রভাতরল জ্যোতিঃ, সেই আলোর মায়া-কাজল পরে ঋষি গানের ভিতর দিয়ে দেখছেন ভুবনখানি, দেখছেন এই সবই তো সেই স্বঃ—

এই যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ
এই তো তোমার প্রেম ওগো হৃদয়-হরণ।

আলো আমার আলো ওগো আলো ভুবন-ভরা
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার আলো হৃদয়-হরা ॥

১৫॥ এটিকে বলতে পারি ব্রহ্মচর্য-সূক্তের গুরুদক্ষিণা-ঋক্।

'অমা ঘৃতং কৃণুতে কেবলম্'—দশাক্ষরা বিরাট্ ছন্দের এই একটি চরণ ফেলে নেমেছে চতুষ্পদা অনুষ্টুপ্। সব মিলে ছন্দ হল বিরাড্‌গর্ভা পঙ্‌ক্তি।

'অমা ঘৃতং কৃণুতে কেবলম্'—এ যেন আগের ঋকের 'ইদং স্বঃ'-এর অনুভূতির বিস্ময়ে-জাগা একটি গানের চরণ—মূল ঋকের সঙ্গে এর কোন ব্যাকরণগত সম্পর্ক নেই! বিপুল আলোর ধাক্কায় দ্বার-ভাঙা বাঁধ-ভাঙা একটি সর্বান্বিত অথচ অনন্বিত উচ্চারণ। খানিকটা ঋগ্বেদের ঋষি অত্রির (৫।৪২।১৭) 'উরৌ দেবা অনিবাধে স্যাম'—'অবাধ বিপুলে র'ব ওগো দেবতারা'-র মতো।

√ঘৃ ধাতুর অর্থ একই সঙ্গে ক্ষরণ এবং দীপ্তি। তাই থেকে বেদে ঘৃত

শব্দের অর্থ উজ্জ্বল নিস্যন্দ, গলিত আলোর ধারা, আলোর ঝরণা, জ্যোতিঃ-প্রস্রবণ। 'অমা' মানে একসঙ্গে। 'ক্লুতে'-র কর্তা প্রচ্ছন্ন, কর্মকর্তৃবাচ্যের মতো। সব মিলে অর্থ দাঁড়ায়—

যা কিছু দেখছি, সবই শুধু আলো, সব মিলে আলো,
সব চুঁয়ে চুঁয়ে কে যেন আলো ঝরায়।
আকাশ পৃথিবী তুমি আমি সবই
আলো-সমুদ্রে ঢেউ হয়ে ভেসে যায়।

বিরাট্ ছন্দে বিরাট অনুভূতি ব্যক্ত করে আবার প্রস্তুত বিষয়ে পুনরাবর্তন।

আচার্যকে শিষ্য দেয় গুরুদক্ষিণা। সে দক্ষিণা কী হবে, কেমন হবে—তার আদর্শ রূপটি ফুটিয়ে তুললেন দিব্য পটভূমিকায়। বরুণ আচার্য, মিত্র ব্রহ্মচারী। **আচার্যঃ ভূত্বা** আচার্য হয়ে **বরুণঃ**··· **প্রজাপতৌ** প্রজাপতির কাছে **যত্ যত্ ঐচ্ছত্** যা কিছু ইচ্ছা করলেন, চাইতে হল না, ব্রহ্মচারী মিত্র তা বুঝে নিয়ে **স্বাত্ আত্মনঃ অধি** তাঁর নিজের ভেতর থেকে আহরণ করে নিয়ে তাঁকে **প্রাযচ্ছত্** দিলেন। অর্থাৎ গুরুর ইচ্ছা বুঝে নিয়ে নিজের সমস্ত সাধ্য দিয়ে সে-ইচ্ছা পূর্ণ করা—এই হল যথার্থ গুরুদক্ষিণা।

বরুণের সে ইচ্ছাটি, ইচ্ছাগুলি কী?

মিত্র-বরুণ বেদের প্রসিদ্ধ যুগ্ম-দেবতা। বরুণ অব্যক্তের কালো, মিত্র অভিব্যক্তির আলো। বরুণ পুরাণ, মিত্র নূতন। বরুণ সত্যের ধ্রুবপদ, মিত্র ঋতচ্ছন্দা বিশ্বতান। বরুণ চান মিত্রের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠতে, তাঁর বুকভরা অনন্ত রাত্রির রস নিঙড়ে নিঙড়ে ফুটে উঠতে একটি আলোর শতদল হয়ে। মিত্র তাই করছেন। মিত্র সেই আলোর শতদল হয়ে ফুটছেন অব্যক্ত···কালো ·· কালীর অঙ্গে অঙ্গে, কালো আকাশের বুকে সোনার গরুড়—সূর্য—হাঁস হয়ে, নীলং পয়ঃকৃষ্ণম্-এর তনুভা হয়ে, কৃষ্ণের রাধা হয়ে। মিত্র-বরুণ দুয়ে একাকার—সৃষ্টির সীমার মধ্যে ব্যক্ত অসীমের চির-বিস্ময়! মহাকালীর বুকে নটরাজ! মহাকালপুরুষের জটালীনা তড়িৎকলা হৈমবতী! অর্ধনারীশ্বর!

গুরু ঐ বরুণের মতোই চান শিষ্যের মধ্যে দিয়ে নতুন হয়ে নতুন করে ফুটে উঠতে। নিজের মধ্যে গুরুকে নবজন্মদান—এই হল যথার্থ গুরুদক্ষিণা।

প্রজাপতি শব্দের লক্ষ্য এখানে, মনে হয়, মিত্রই। শুধু আত্মসৃষ্টি নয়, প্রজা-সৃষ্টি এবং প্রজা-পালনও মিত্র তথা শিষ্যের কাছে আকাঙ্ক্ষিত। শুধু

দুয়ের খেলা নয়, বহুর মেলা। গুরুর উত্তরাধিকারকে শিষ্য সম্ভৃত করে নিয়ে চলবে বিদ্যাবংশ-যোনিবংশের মধ্যে দিয়ে শিষ্য-প্রশিষ্য-পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে নব নব রূপে, এই হল তাৎপর্য।

১৬॥ অনুষ্টুপ্ ছন্দ। **আচার্যঃ ব্রহ্মচারী** আচার্যই হয়ে যান ব্রহ্মচারী। যোগ্য শিষ্য আচার্যকে পরিপূর্ণরূপে আত্মসাৎ করে, আচার্যও তার মধ্যে বিলীন হয়ে নবজন্ম লাভ করেন, যেমন পিতা নতুন করে প্রজাত হন, নতুন জীবন-যৌবন পান উপযুক্ত পুত্রের মধ্যে।

ব্রহ্মচারী হয় **প্রজাপতিঃ**। পূর্বঋকের প্রজাপতির অর্থ এখানে স্পষ্টভাবেই সমর্থিত হল। ব্রহ্মচারী হয়ে যায় প্রজাপতি, স্রষ্টা—বেদ যাকে বলেছেন হিরণ্যগর্ভ —অর্থাৎ স্রষ্টার সঙ্গে এক। সে তখন ঋষি ত্রসদস্যুর মতো বলতে পারে—

ধরে আছি রোদসীকে
জেনে স্রষ্টার মতো চালনা করছি নিখিল এ সৃষ্টিকে।

(দ্র. বাতসূক্তের ভূমিকা)

ব্রহ্ম বা বৃহতের অনুভূতির শেষ নেই, কেননা √বৃহ ধাতুর অর্থ ই হল বেড়ে-চলা। ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মানুভূতি বেড়ে চলে, সে হয়ে যায় বিরাট অর্থাৎ স্রষ্টারও স্রষ্টা। 'বিরাট্' এই বিশেষ্যটিকে ভেঙে এখানে **বি রাজতি** এই ক্রিয়া-রূপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রক্রিয়াটিকে আরো প্রত্যক্ষ, আরো জীবন্ত করে দেখানোর জন্য। সৃষ্টির মহাযোনিকে স্পর্শ করে তন্ময় হয়ে যায় ব্রহ্মচারী, হয় সর্বাধার-মূলাধার-মহাপ্রকৃতি।

আরো এগিয়ে চলে সে, তার অনুভূতি। সে **অভবত্** হয়ে যায় **বশী ইন্দ্রঃ** —স্বতন্ত্র স্বাধীন সর্বনিয়ন্তা পরমদেবতা—মহান্ পুরুষ।

কথ্যভাষায় হেঁয়ালি করে বলা যায়, ব্রহ্মচারী হয় তার বাবা, ঠাকুমা এবং ঠাকুর্দা! দেবীসূক্তে ঋষিকা বাক্ বলেছেন 'অহং সুবে পিতরম্'···আমিই বাবাকে প্রসব করেছি, অর্থাৎ আমিই আমার ঠাকুমা। এই সৃষ্টির আমি পিতামহী, আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ী।

আগের দুটি ঋকে আচার্যের মহিমা-খ্যাপন করে এই ঋকে আচার্য ও ব্রহ্মচারীকে এক করে দেবত্বের ক্রমোচ্চ পদবীতে স্থাপন করছেন ঋষি। যেন মিত্র বরুণের মতোই যুগনদ্ধ হয়ে গুরুশিষ্য চলেছেন একটি আলোর উৎসর্পণী বেয়ে মহামহিমার অভিমুখে। খৃষ্টের Ascension এর ছবি মনে

পড়ে। উত্তরায়ণ এরি নাম। উৎ উত্তর উত্তম আলোর দিকে চলা জ্যোতির্ময় হতে হতে, এক একটি জ্যোতির্জরায়ু ভেদ করে আরো আরো নির্মলতর শুভ্রতর জ্যোতিঃশরীর লাভ করতে করতে অনন্ত সর্বপ্রসূ সর্বজ্যোতি সব-ছাওয়া আ-কাশ (সর্বত্র-প্রকাশ) হয়ে অস্পন্দ স্পন্দে ব্যাপ্ত হয়ে কাঁপতে থাকা 'তদেজতি তন্নৈজতি'-র সঙ্গমালিঙ্গনে।

১৭-১৯॥ দেবতা থেকে আরম্ভ করে পশু পর্যন্ত—ব্রহ্মচর্যের বিশ্বরূপ দর্শন। রাষ্ট্র-রক্ষার গুরুদায়িত্ব রাজা পালন করেন ব্রহ্মচর্য-রূপ তপস্যার শক্তিতে। অব্রহ্মচারী রাজার রাজ্য ছারেখারে যায়। আচার্যের শিষ্যকামনা সার্থক হয় ব্রহ্মচর্য থাকলে তবেই, নয়তো শিষ্যরা চলে যায় অন্য গুরুর কাছে। কুমারী কন্যা তার ব্রহ্মচর্যের শক্তিবলেই লাভ করে যুবক পতি—নয়তো তার কপালে জোটে বুড়ো বর। এমন কি শকটবাহী ষাঁড়ের শকটবহনসামর্থ্য এবং ষাঁড়-ঘোড়া ইত্যাদি তৃণভোজী পশুর 'চরা'র সামর্থ্যও আসে ব্রহ্মচর্য থেকেই। 'ঘাসং জিগীর্ষতি' ঘাস গিলতে ইচ্ছে করে>ঘাস-খিদে পায়>ঘাস সন্ধান করে>চরে।

মৃত্যু দেবতাদের কাছে ঘেঁষতে পারেনি। কেননা দেবতারা ব্রহ্মচর্য-বলে বলীয়ান্। ব্রহ্মচর্যের শক্তি তাঁদের করেছে মৃত্যুঞ্জয়। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র হলেন প্রধান। কেননা তিনিই প্রথম পেয়েছিলেন এবং দেবতাদের কাছে এনে দিয়েছিলেন সেই 'স্বর্'—সেই উরু (বিশাল) অভয় বৃহৎ ব্রহ্ম-জ্যোতির সন্ধান, যাতে মাখামাখি হয়ে আছে এই সব-কিছু। ইন্দ্রের সেই আলো-দেখা এবং আলো-আনাও ব্রহ্মচর্যের বলেই। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রই প্রথম ব্রহ্মকে চিনেছিলেন, জেনেছিলেন—একথার সমর্থন পাই কেনোপনিষদের যক্ষ-হৈমবতী উপাখ্যানে।

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য এমন একটি শক্তি যার বলে ঘাস-খাওয়া থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্ম-পাওয়া পর্যন্ত সবই সম্ভব! কে ঘোড়া হয়ে চরছে, কে ইন্দ্র হয়ে ব্রহ্ম পাচ্ছে—তাতে কিছু এসে যায় না। সমদর্শী ঋষি বলছেন, শুধু দেখ, এ-জগতে ও-জগতে ব্রহ্মচর্যের কি অপার মহিমা। ব্রহ্মচর্য না থাকলে তুমি না পারবে তাগড়াই ষাঁড়-ঘোড়া হতে, না পারবে নাম-করা অধ্যাপক হতে,

না পাবে জোয়ান বর, না হবে রাজ্যেশ্বর,

মরবে, হবে না দেবতা,

ইন্দ্রের মতো আলো পেয়ে দেবরাজ হওয়া তো দূরের কথা।

২০-২১॥ অনুষ্টুপ্ ছন্দ। **ওষধয়ঃ বনস্পতিঃ** গাছ-পালা **ভূত-ভব্যম্** অতীত-ভবিষ্যৎ **অহোরাত্রে** দিন-রাত **ঋতুভিঃ সহ সংবৎসরঃ** ঋতুগুলি এবং সেই সঙ্গে বৎসর—**তে ব্রহ্মচারিণঃ জাতাঃ** তারা ব্রহ্মচারীর থেকে জন্মেছে। **পার্থিবাঃ দিব্যাঃ** পার্থিব ও দিব্য **আরণ্যাঃ গ্রাম্যাঃ চ যে পশবঃ** বুনো এবং পোষা যে-সব পশু **অ-পক্ষাঃ পক্ষিণঃ চ যে** যাদের পাখা নেই, আর যাদের পাখা আছে **তে ব্রহ্মচারিণঃ জাতাঃ**…।

ব্রহ্মচর্যের বিশ্বরূপ-দর্শনের পর এবার ব্রহ্মচারীর প্রজাপতি-রূপ দর্শন। ব্রহ্মচারীই স্রষ্টা, প্রজাপতি, অর্থাৎ স্রষ্টার সঙ্গে এক।

ওষধি এবং বনস্পতি অর্থাৎ গাছপালা নিয়ে যে উদ্ভিদ-জগৎ, বুনো পশু, গ্রাম্য অর্থাৎ গৃহপালিত পশু, পাখাওলা পাখিরা আর পাখা নেই যাদের এমন সব প্রাণীরা—সব মিলে যে পশু-জগৎ, দিন-রাত-ঋতু-বছরের মধ্যে দিয়ে সংবর্তিত যে কাল—এক কথায় যা কিছু 'ভূত' অর্থাৎ হয়েছে, আর যা 'ভব্য' অর্থাৎ হবে, সেই সমস্ত অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান, যা-কিছু 'পার্থিব' অর্থাৎ এ-লৌকিক, আর যা-কিছু 'দিব্য' অর্থাৎ ও-লৌকিক, অলৌকিক, লোকোত্তর—সব কিছুকে ব্রহ্মচারী দর্শন করে তার হাতে-গড়া পুতুলটির মতো। সর্বাত্ম-বোধের সঙ্গে গায়ে গায়ে লেগে থাকে সর্বস্রষ্টৃত্ব-বোধ। তার মনে হয়—

আমি সব, আমি সর্বস্রষ্টা, আমি মহান্ বিশাল
আমি কাল, মহাকাল।
বনস্পতির শিকড়ে শিকড়ে আমি দি' রস যোগান
আমি আকাশ পাতাল উথালপাথাল ঝঙ্কার মহাগান।
সিংহ-বাঘের শরীরে শরীরে ভরে দিই হিংস্রতা
আমি মহা-লোলুপতা।
পাখির পাখায় ক্ষিপ্র গতি দি', গরুর চোখে আরাম
আমি নিখিলের প্রাণারাম।
দিন না, রাত না— মহাকল্পনা দিয়ে এঁকে চলি ছবি
আমি বিশ্বমিত্র বিশ্বামিত্র, সৃষ্টির মহাকবি।
আমি সব, আমি সর্বস্রষ্টা, শ্রেম, প্রেম, ভয়াল
মহাকালী মহাকাল।

২২॥ অনুষ্টুপ্ ছন্দ। **সর্বে প্রাজাপত্যাঃ** সমস্ত প্রাণী **পৃথক্** প্রত্যেকে

আত্মসু প্রাণান্ বিভ্রতি নিজের দেহে প্রাণকে ধারণ করছে। **তান্ সর্বান্** তাদের সবাইকে **ব্রহ্মচারিণি আভৃতম্ ব্রহ্ম** ব্রহ্মচারীতে সঞ্চিত ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মচেতনা **রক্ষতি** রক্ষা করছে।

ব্রহ্মচারী শুধু প্রজাপতি নয়, সে রক্ষকও বটে। বেদের ভাষায় সে শুধু জনিতা নয়, গোপাও। পুরাণের ভাষায়—শুধু ব্রহ্মা নয়, বিষ্ণুও।

অসীমের যে উপলব্ধি তাকে স্রষ্টার সঙ্গে একাসনে বসায়, তা-ই তাকে বসায় পাতার সঙ্গেও একাসনে। ব্রহ্মচারী অনুভব করে, সমস্ত 'প্রাজাপত্য' অর্থাৎ প্রজাপতির সন্তান অর্থাৎ এই সৃষ্টির যত প্রাণীর সে যেন অভিভাবক। প্রতিটি প্রাণী তার 'আত্মায়' অর্থাৎ দেহে যে প্রাণকে ধারণ করে আছে, সেই প্রাণের এবং প্রাণীর রক্ষক তার অন্তর্নিহিত 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ বৃহতের চেতনা, অনুভব, শক্তি। দীর্ঘদিনের তপস্যায় তার মধ্যে 'আভৃত' সঞ্চিত হয়েছে এই ব্রহ্ম-ধন, এই মহানিধি, এই আলোকবিত্ত, এই বসু। বসুন্ধর ব্রহ্মচারী এই বৃহতের একটুকু ছোঁয়া দিয়ে রক্ষা করে চলেছে সবাইকে সবার অজান্তে—তুচ্ছতা থেকে, হীনতা থেকে, পঙ্কিল স্বার্থের কলুষ থেকে। তার উজ্জ্বল অস্তিত্বের পরিকীর্ণ অদৃশ্য বজ্ররশ্মি সমাজশরীরের সর্বব্যাধির রক্তবীজকে অনবরত বিদ্ধ করে করে, দগ্ধ করে করে চলেছে।

২৩॥ ছন্দ পুরোবার্হতা অতিজাগতগর্ভা ত্রিষ্টুপ্।

কে আগে? বীজ না বনস্পতি?

লৌকিক আপেক্ষিক চোখে এটি হেঁয়ালি।

মনীষীরা বলবেন, পরমের চোখে আগে-পরে কিছু নেই, সবই সর্বকালীন।

সর্বদা বর্ততে সর্বং স্থূলসূক্ষ্মরূপাশ্রয়াত্।
ভূতং ভাবি ভবচ্চেত্যাদ্যসর্বদর্শিকল্পনা॥
জন্যজনকব্যত্যাসং তথাহি পশ্য ঋগ্বেদে।
অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্ উ অদিতিঃ পরি॥

হয় স্থূল, নয় সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্মরূপে,
হয় তারস্বরে, নয় সঙ্গোপনে, চুপে
রয়েছে সর্বদা সব বিরাটের কোলে—
যাবার জায়গা কোথা এ ব্রহ্মাণ্ড ফেলে?

তারায় জোনাকি, জোনাকিতে তারা ভাসে,
নিবে গিয়ে ঘুম যায় মহাকালাকাশে।
এটা আছে, সেটা হবে, ওটা তো ছিল না—
একদেশ-দর্শনেরই কেবল কল্পনা।
ঋগ্বেদেতে উল্টোপাল্টা দেখ মায়ে-পোয়ে—
অদিতি হলেন দক্ষের মা, আবার মেয়ে!

জন্ম মানে জন্ম নয়, শুধু আবির্ভাব,
যা ছিল মনেতে তারই খাতায় হিসাব!
হয়নি যখন খোকা, তখনও সে ছিল,
'মনের মাঝারে মা'র ইচ্ছা হয়ে ছিল।'
যেমন এ সৃষ্টি ছিল চুপ-কুঁড়ি-ঘুম—
মা'র বুকে একগুচ্ছ ইচ্ছার কুসুম।
এখনো তাইতো আছে, ফোটে নি কো পুরো,
চিরকাল ফুটে যাবে, কে কুড়োবি কুড়ো।

চণ্ডীতে দেখি, সবদেবতার তেজ পুঞ্জীভূত হয়ে জন্ম নিচ্ছেন দেবী। এই জন্ম তাঁর বিশেষ আবির্ভাব মাত্র, অ-সত্তা থেকে সত্তায় আসা নয়। অথর্ববেদের ঋষিও তেমনি প্রত্যক্ষ করছেন **দেবানাম্ পরিষূতম্**, সব দেবতার মধ্যে থেকে এক তিলোত্তম পুঞ্জজ্যোতির আবির্ভাব, পরি-সূ (প্রসব)—যে জ্যোতি আবার সব দেবতার এমন কি ব্রহ্মেরও জনক! অতি দুর্নিরীক্ষ্য সে জ্যোতি, **রোচমানম্** ঝলমল ঝলমল করছে, **চরতি**—স্থির থেকেও স্পন্দিত হচ্ছে বিশ্বভুবন জুড়ে। কারো সাধ্য নেই 'অভ্যারোহণ' করে, চ'ড়ে বসে, নাগাল পায় সেই উত্তম উত্তুঙ্গ জ্যোতির। তদ্ দূরে—দূর বহুদূর সে চির-সুদূর। অথচ তদ্ অন্তিকে—সে রয়েছে কাছে আনাচে কানাচে। তাই একবার বলছেন **এতদ্**—এই যে, একবার বলছেন **তস্মাদ্**—সেই তার থেকে। 'এই' থেকে 'সেই'-এ বিদ্যুদ্গতিতে আনাগোনা করছে তাঁর অনুভব, 'হেথা' থেকে 'অন্য কোন্‌খানে'। এতদ্বৈ তত্—বলছেন উপনিষদ্। এব স্থঃ—বলছেন ঋগ্বেদ। ভূলোক থেকে দ্যুলোক পর্যন্ত টানা দেওয়া সুতোর বুনুনিতে বোনা দুটি শব্দ—এ আর সে।

এই জ্যোতিঃপুঞ্জই হল ব্রহ্ম-বনস্পতির বীজ—যে ব্রহ্ম **জ্যেষ্ঠম্**—সবার চেয়ে বড়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বৃহত্তম, মহত্তম, গরিষ্ঠ সত্তা। এই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মের অপূর্ব বর্ণনা আছে অথর্ববেদের দশম কাণ্ডের অষ্টম সূক্তে ৪৪টি ঋক্ জুড়ে।

ব্রহ্ম বা বৃহতের যে সন্তান-সন্ততি (=continuity) অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ, অভিব্যক্তি—তা-ই হল **ব্রাহ্মণম্** তারও জন্ম ঐ বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ থেকেই। আর দেবতারা এবং যা তাঁদের দেবতা করেছে সেই অমৃত—মৃত্যুঞ্জয় মহানন্দসুধা—সবই জন্মেছে ঐ জ্যোতির্বীজাণু থেকেই। অর্থাৎ একটি কোটিবজ্রঘন সর্বগর্ভ বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গই যেন বিদ্যোতিত বিস্ফোরিত বিস্ফারিত হয়ে অভিব্যক্ত করে চলেছে সেই বিপুল বিরাট বৃহৎ সর্বমহত্তম ব্রহ্মকে, সেই ব্রহ্মের বিকাশ-পরম্পরাকে, দেবগণকে এবং সৃষ্টির রভসকম্প্র রহস্য আনন্দকে।

এই সর্বদেব-পরিবৃত রোচমান বস্তুটি কী বল তো?—ত্রিষ্টুপ্-ছন্দের একাদশাক্ষর পাদের দুটি অক্ষর ফাঁকা রেখে ঋষি রহস্য করে জিগ্যেস করছেন।

উত্তরটি আগেই বলে দেওয়া আছে পঞ্চম ঋকে (বর্তমান ও পঞ্চম ঋকের শেষার্ধ হুবহু এক), আছে সপ্তম ঋকেও। ব্রহ্মচারী। এই হল তার পরম স্বরূপ, চূড়ান্ত পরিচয়। সে জ্যোতির্লিঙ্গং ব্রহ্মজনকং সর্বদেবাত্মভূতম্। সারা জীবন ধরে নিজেকে প্রশ্নে প্রশ্নে জ্বালিয়ে তুলতে তুলতে সে এগিয়ে চলেছে এই মহা-উত্তরের দিকে—

এই তার উত্তরায়ণ।

২৪॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। **প্রাণাপানৌ** প্রাণ ও অপানকে **আত্** অনন্তর **ব্যানম্** ব্যানকে **বাচম্ মনঃ হৃদয়ম্ ব্রহ্ম মেধাম্**···**জনয়ন্** জন্ম দিয়ে। **ব্রহ্মচারী**···**ভ্রাজত্ ব্রহ্ম** প্রদীপ্ত ব্রহ্মকে **বিভর্তি** ধারণ করে আছে। **তস্মিন্ অধি** তার মধ্যে **বিশ্বে দেবাঃ** সমস্ত দেবতা **সম্-ওতাঃ** ওত-প্রোত হয়ে আছে (√বে—বয়ন করা)।

সব দেবতার পুঞ্জপ্রসব চিরচঞ্চল যে জ্যোতিকে আগের ঋকে ব্রহ্মচারী বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেই জ্যোতি যেহেতু ব্রহ্মচারীর স্বরূপ, সেহেতু ব্রহ্মচারী তার ধারকও বটে। ব্রহ্মচারী সর্বদেবময় এ-ও আগে বলা হয়েছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকও বলছেন, 'যাবতীর্ বৈ দেবতাস্ তাঃ সর্বা বেদবিদি ব্রাহ্মণে বসন্তি' (২।১৫) অর্থাৎ যত আছেন দেবতা তাঁরা সবাই বাস করেন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের মধ্যে।

দ্বিতীয়ার্ধে বলা হচ্ছে মন্ত্রোৎপত্তির রহস্য। প্রাণ-অপান-ব্যান হল প্রাণেরই বৃত্তি, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ও এই উভয়ের সন্ধি। এই তিনে মিলে যে প্রাণ, তার সঙ্গে বাক্য মন মেধা ও হৃদয় মিললে জন্ম নেয় ব্রহ্ম অর্থাৎ মন্ত্র।

২৫॥ ছন্দ একাবসানা আর্চী উষ্ণিক্। আপাতদৃষ্টিতে যে-মন্ত্রের কোন দেবতা নেই, সে-মন্ত্রের দেবতা হলেন প্রজাপতি। সুতরাং এই প্রার্থনাটি প্রজাপতির উদ্দেশে উচ্চারিত, অথবা যে-ব্রহ্মচারী সর্বদেবময় ব্রহ্মীভূত, তারই উদ্দেশে। স্তুতি এবং আশীঃ (প্রার্থনা) সূক্তের মধ্যে মিলে-মিশে থাকে। স্তুতিপ্রধান এই মহা-সূক্তে এইটিই একমাত্র ক্ষুদ্র 'আশীঃ'।

প্রকৃতি-প্রত্যয় মিলিয়ে যে অর্থ, তা বিশেষ্যপদের মধ্যে গুটিয়ে-সুটিয়ে গুপ্ত হয়ে থাকে। অনুবাদে সেই অর্থগুলিকে মেলে দেওয়া হয়েছে। √চক্ষ্ মানে দেখা। **চক্ষুঃ** হল সেই ইন্দ্রিয়, যার সাহায্যে আমরা দ্রষ্টব্য বস্তু দেখি। **রেতঃ**-শব্দের মধ্যে যে √রী ধাতু আছে, তার মানে বয়ে চলা, জলস্রোতের মতো ছুটে চলা। তেমনি **যশঃ**-শব্দের মধ্যে আছে √ঈশ্ ধাতু, যার মানে প্রভুত্ব করা। **অস্মাসু ধেহি** আমাদের মধ্যে নিহিত কর।

সর্বতোভাবে সুস্থ সবল সমৃদ্ধ একটি শরীর এবং তদুপযুক্ত অন্নের প্রার্থনা করছেন ঋষি, আর চাইছেন যশ। এরই পরিবর্ধিত রূপ হল উপনিষদের শান্তিপাঠগুলি—

(১) আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রম্ অথো বলম্ ইন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি।

আমার শরীর বাক্ প্রাণ চক্ষু কর্ণ বল ও সর্বেন্দ্রিয়
আপ্যায়িত হোক।

(২) ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ—

(মন্ত্রটি সংহিতা থেকে নেওয়া, ১।৮৯।৮)

চোখ দিয়ে যেন শুধু ভাল দেখি
ওগো দেবতারা শুধু ভাল শুনি কানে।—ইত্যাদি।

২৬॥ ছন্দ—শ্রীসাতবলেকরের মতে মধ্যেজ্যোতিঃ উষ্ণিগ্-গর্ভা ত্রিষ্টুপ্। **সমুদ্রে সলিলস্য পৃষ্ঠে** সমুদ্রে জলের মধ্যে **ব্রহ্মচারী**…**তপ্যমানঃ** তপস্যা

করতে করতে **ভানি কল্পত্** অনেক কিছু, সেগুলি রূপায়িত করতে করতে **তপঃ অতিষ্ঠত্** তপোঽনুষ্ঠান করে চলে। **সঃ** সে **স্নাতঃ** স্নান ক'রে **বভ্রুঃ পিঙ্গলঃ** বভ্রুবর্ণ পিঙ্গলবর্ণ হয়ে **পৃথিব্যাম্** পৃথিবীতে **বহু রোচতে** অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে শোভা পায়।

ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য যেন এক নিরন্তর সুকঠিন উদবাস-তপস্যা। সমুদ্র হল সৃষ্টির উথাল-পাথাল সলিল—মনঃসমুদ্র, প্রাণসমুদ্র। সেই সমুদ্র মন্থন করে করে ব্রহ্মচারী একে একে 'কল্পনা' করে, রূপ দিয়ে চলে মানুষের প্রার্থিত কাঙ্ক্ষিত অভীষ্ট বস্তুগুলিকে—আগের ঋকে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর তপস্যা মানুষের অপার্থিব-পার্থিব সমস্ত চাহিদা মেটায়। তপস্যান্তে সে যখন সমাবর্তন স্নান করে সমাজে ফিরে আসে তখন তার উজ্জ্বল পিঙ্গল (বভ্রু মানেও পিঙ্গল, দুটি পিঙ্গল মিলে প্রগাঢ় উজ্জ্বল পিঙ্গল) দীপ্তিতে পৃথিবী একটি নতুন দীপ্তি পায়। সে যেন তার আলো দিয়ে ব্রহ্মবর্চস দিয়ে রাঙিয়ে তোলে সবার জীবনধারা। গতানুগতিক ধারণা সংস্কার প্রত্যয় রীতিনীতি চালচলন সেই আলোয় নড়ে-চড়ে বসে, উল্টে যায়, পাল্টে যায়।

সমাবৃত্ত ব্রহ্মচারী যেন সারথি হয়ে ধারণ করে জগন্নাথের রথের রশ্মি। ব্রহ্মচারীর পর ব্রহ্মচারী—যেন এক উজ্জ্বল পিঙ্গল আলোর মিছিল। এই মিছিলেরই পটহ-পতাকা-শঙ্খ-কাহল-মৃদঙ্গ-ঝল্লরী-ঝঙ্কার ওঙ্কার হল ব্রহ্মচর্য-সূক্ত।

১৯। বিবাহ

বিবাহ একটি যজ্ঞ। সব যজ্ঞের মতোই এ যজ্ঞেরও লক্ষ্য হল আত্মদানের মধ্য দিয়ে সত্যিকার আনন্দকে পাওয়া। বৈদিক যুগে আনন্দ-দেবতার নাম ছিল সোম। সূর্যা হলেন সূর্যকন্যা প্রজ্ঞা, তথা পৃথিবী। সোমের সঙ্গে সূর্যার বিবাহ কল্পনা করে একটি সুদীর্ঘ সূক্ত (১০।৮৫) রচনা করেছিলেন সূর্যা নামে একজন নারী-ঋষি হয়ত নিজেরই বিবাহ উপলক্ষে। এই সূক্তটির মধ্যেই আমাদের বিবাহের আদর্শ রূপটি ধরা আছে।

এই সংক্ষিপ্ত বিবাহ-পদ্ধতিটির সংকলয়িত্রী শ্রীমৎ অনির্বাণ।

১॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। **অঘোর-চক্ষুঃ** স্নিগ্ধদৃষ্টিসম্পন্না, **অ-পতি-ঘ্নী** অ-বিধবা, **পশুভ্যঃ শিবা** পশুদের কল্যাণকরী, **সু-মনাঃ** সুহৃদয়া, **সু-বর্চাঃ** সুরূপা, উজ্জ্বলা, **বীর-সূঃ** বীরপ্রসবিনী, **দেব-কামা** দেবভক্তিপরায়ণা **স্যোনা** কোমলা, সুভদ্রা **এধি** হও। **নঃ দ্বিপদে** আমাদের লোকজনের প্রতি **শম্ ভব** শান্তিদায়িনী হও, **চতুষ্পদে শম্** আমাদের পশুদের প্রতি শান্তিদায়িনী হও। (১০।৮৫।৪৪)।

২॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্। **ভূমিঃ** পৃথিবী **সত্যেন** সত্যের দ্বারা **উত্তভিতা** উৎ-স্তম্ভিতা, ঊর্ধ্বে ধৃতা। **দ্যৌঃ** দ্যুলোক **সূর্যেণ** সূর্যের দ্বারা **উত্তভিতা**…। **আদিত্যাঃ** আদিত্যগণ, অদিতি-পুত্র দেবতারা **ঋতেন তিষ্ঠন্তি** ঋতের বলে দাঁড়িয়ে আছেন। **সোমঃ** সোম **দিবি অধিশ্রিতঃ** দ্যুলোকে আশ্রিত। (ঐ ১)

৩॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্। **সোমেন** সোমের দ্বারা **আদিত্যাঃ…বলিনঃ** বলবান্। **সোমেন… পৃথিবী… মহী** মহতী। **অথো** এবং **এষাম্ নক্ষত্রাণাম্ উপস্থে** এই নক্ষত্রদের কাছে **সোমঃ আহিতঃ** সোম আহিত আছেন। (ঐ ২)

৪॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্। **যত্ ওষধিম্ সম্-পিংষন্তি** সোমলতা-রূপ ওষধিকে লোকে যে পেষণ করে (রুধাদি √পিষ্, ৩।১ পিনষ্টি), তাইতে **মন্যতে** মনে করে **সোমম্ পপিবান্** সোম পান করেছে। **যম্ সোমম্** যে সোমকে **ব্রহ্মাণঃ** ব্রাহ্মণেরা **বিদুঃ** জানেন **ন কশ্চন তস্য অশ্নাতি** কেউ তাকে খায় না। (ঐ ৩)

৫॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্। **সোমঃ…বধূয়ুঃ** বধূ-কাম **অভবত্** হলেন। **উভা অশ্বিনা** অশ্বিদ্বয় **বরা আস্তাম্** বরণকারী হলেন। **যত্** যখন **পত্যে শংসন্তীম্ সূর্যাম্** পতিকামা সূর্যাকে **সবিতা মনসা অদদাত্** সবিতা মনে মনে সম্প্রদান করলেন। (ঐ ৯)

৬॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্। **যত্ সূর্যা পতিম্ অগাত্** যখন সূর্যা পতির কাছে গেলেন, **দ্যৌঃ ভূমিঃ** আকাশ এবং পৃথিবী **কোশঃ** গাড়ির ভেতরের অংশ **আসীত্** হয়েছিল **চিত্তিঃ** চেতনা (দ্র. বেমী ৩৩৯/১৯১) **উপবর্হণম্** হেলান দেবার উপাধান cushion **আঃ=আসীত্**, হয়েছিল, **চক্ষুঃ** দৃষ্টি **অভ্যঞ্জনম্** অঞ্জন **আঃ**… । (ঐ ৭)

৭॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্। **যত্ সূর্যা গৃহম্ অযাত্** সূর্যা যখন পতিগৃহে গেলেন, তখন **মনঃ** মন **অস্যাঃ** এঁর **অনঃ** শকট, রথ—সায়ণ **আসীত্** হয়েছিল, **উত** এবং **দ্যৌঃ** আকাশ **ছদিঃ** আচ্ছাদন, ছাদ **আসীত্** হয়েছিল, **শুক্রৌ** দুটি উজ্জল জ্যোতিষ্ক **অনড্বাহৌ** বাহন **আস্তাম্** হয়েছিল। (ঐ ১০)

অর্থাৎ সূর্যা—অন্য কোন উপকরণ বা প্রসাধন নয়—শুধু তাঁর প্রেমে ভরা মনটি নিয়ে বিশ্বাসে নির্ভর করে উজ্জল আকাশের তলা দিয়ে হেঁটে হেঁটে স্বামীর কাছে গিয়েছিলেন।

৮॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্। **সূর্যে** হে সূর্যা **তে দ্বে ঋতুথা চক্রে** তোমার দুটি কালিক চক্র—সূর্য এবং চাঁদ—কে **ব্রহ্মাণঃ** ব্রাহ্মণেরা **বিদুঃ** জানেন। **অথ একম্ চক্রম্ যত্ গুহা** কিন্তু একটি চক্র যা গোপন, কালাতীত **তত্** সেটি **অদ্ধাতয়ঃ ইত্** কবি-মনীষীরাই **বিদুঃ** জানেন। (ঐ ১৬)

৯॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্। **যে ভূতস্য প্র-চেতসঃ** যাঁরা প্রাণীর প্র-চেতয়িতা, তু. মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্র চেতয়তি কেতুনা (১।৩।১২), **তেভ্যঃ সূর্যায়ৈ দেবেভ্যঃ মিত্রায় বরুণায় চ** সেই সূর্যা মিত্র বরুণ এবং সব দেবতার উদ্দেশে **ইদম্ নমঃ অকরম্** এই প্রণাম করলাম। (ঐ ১৭)

১০॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্। **সোমঃ প্রথমঃ বিবিদে** সোম প্রথম পেয়েছিলেন। **গন্ধর্বঃ উত্তরঃ বিবিদে** তারপর গন্ধর্ব পেয়েছিলেন। **অগ্নিঃ তে তৃতীয়ঃ পতিঃ** স্পষ্ট। **মনুষ্যজাঃ তে তুরীয়ঃ** মানুষের সন্তান তোমার চতুর্থ পতি। (ঐ ৪০)

১১॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। **অগ্নে শর্ধ** হে অগ্নি বীর্যপ্রকাশ কর, **তব উত্তমানি দ্যুম্নানি** তোমার উত্-তম জ্যোতিরা **মহতে সৌভগায় সন্তু** এনে দিক বিপুল আনন্দ প্রেম সৌভাগ্য। **জাম্পত্যম্** দাম্পত্যকে **সুযমম্** সুসংযত **সম্** সম্যক্ **আকৃণুষ্ব** আকার দাও, কর। **শত্রূয়তাম্** যারা শত্রুতা করছে তাদের **মহাংসি অভি তিষ্ঠ** শক্তির মোকাবিলা কর। (৫।২৮।৩)

১২॥ ছন্দ ত্রি-অবসানা ষট্পদা ককুম্মতী শক্বরী (দ্র. ভূমিসূক্ত ৪১)। **দ্যৌঃ** দ্যুলোক **তে পৃষ্ঠম্ রক্ষতু** তোমার পৃষ্ঠকে রক্ষা করুন। **বায়ু অশ্বিনৌ চ** বায়ু এবং অশ্বিদ্বয় **উরূ** তোমার উরুদ্বয়কে রক্ষা করুন। **তে স্তনন্ধয়ান্ পুত্রান্** তোমার স্তন্যপানকারী পুত্রদের **সবিতা অভিরক্ষতু**…।

আ বাসসঃ পরিধানাত্‌ বস্ত্র পরিধানের আগে পর্যন্ত **বৃহস্পতিঃ**…। **পশ্চাত্‌** পরে **বিশ্বে দেবাঃ অভিরক্ষন্তু**…। (সামমন্ত্রব্রাহ্মণ ১।১।১২)

১৩॥ ছন্দ চতুষ্পদা গায়ত্রী। **মৃত্যুঃ…পরা-এতু** দূরে যাক, **অমৃতম্‌ মে আগাত্‌** অমৃত আমার কাছে আসুক। **বৈবস্বতঃ** বিবস্বানের পুত্র **যম নঃ অভয়ম্‌ কৃণোতু** আমাদের অভয় দিন। (ঐ ১।১।১৫)

১৪॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্‌। **পূষা…হস্তগৃহ্য** হাত ধরে **ত্বা** তোমাকে **ইতঃ নয়তু** এখান থেকে নিয়ে চলুন। **অশ্বিনা** অশ্বিদ্বয় **ত্বা…রথেন প্র বহতাম্‌** রথে বহন করুন। **গৃহান্‌ গচ্ছ** গৃহে চল, **যথা ত্বম্‌ গৃহপত্নী অসঃ** যাতে তুমি গৃহস্বামিনী হও (√অস্‌+লেট্‌ ২।১); **বশিনী** কর্ত্রী হয়ে **বিদথম্‌ আ বদাসি** আজ্ঞা দাও। (১০।৮৫।২৬)

১৫॥ ছন্দ ত্রিষ্টুপ্‌। **সৌভগত্বায়** সৌভাগ্যের জন্য **তে হস্তম্‌ গৃভ্ণামি** তোমার হস্ত গ্রহণ করছি, **যথা** যাতে **ময়া পত্যা** পতি-আমার সঙ্গে **জরত্‌-অষ্টিঃ অসঃ** বার্ধক্যে পৌঁছও (√অশ্‌—পৌঁছন>অষ্টি) **ভগঃ অর্যমা সবিতা পুরন্ধিঃ দেবাঃ** ঐ দেবতারা **গার্হপত্যায়** গৃহপতি হবার জন্যে **মহ্যম্‌ ত্বা অদুঃ** তোমাকে আমায় দিয়েছেন। (ঐ ৩৬)

১৬॥ ছন্দ গায়ত্রী। **মে পতিঃ** আমার স্বামী **দীর্ঘায়ুঃ অস্তু** দীর্ঘজীবী হোন, **শতম্‌ বর্ষাণি জীবতু** একশ বছর বাঁচুন। **মম জ্ঞাতয়ঃ** আমার জ্ঞাতিরা **এধন্তাম্‌** সমৃদ্ধ হোন। (সামমন্ত্রব্রাহ্মণ ১।২।২)

১৭॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্‌। **কন্যা** এই মেয়ে অর্থাৎ আমি কন্যা অবস্থায় **অর্যমণম্‌ দেবম্‌ অগ্নিম্‌ নু** অর্যমা দেবতা এবং অগ্নিকে **অযক্ষত নু** সত্যি যজন করেছিল। **সঃ অর্যমা দেবঃ** সেই অর্যমা দেব **মাম্‌** আমাকে **ইতঃ প্রমুঞ্চাতু** এখান থেকে প্রমুক্ত করুন, **মা** আমাকে **অমুতঃ** ওখান থেকে প্রমুক্ত করুন। (ঐ ১।২।৩)

১৮॥ ছন্দ মহাপঙ্‌ক্তি জগতী (দ্র. ভূমিসূক্ত ৩৮)। **পিতৃভ্যঃ পতি-লোকম্‌ যতী** বাপ-মা ছেড়ে পতিকুলে যে চলেছে **ইয়ম্‌ কন্যলা** সেই এই আদরিণী মেয়ে **অপদীক্ষাম্‌ অযষ্ট** দীক্ষা ছাড়াই যজ্ঞ করেছে। অর্থাৎ যজ্ঞের মতোই কৃচ্ছ্রসাধন, আত্মোৎসর্গ করেছে। **কন্যা** হে কন্যা **বয়ম্‌ উত** আমরাও **ত্বয়া** তোমার সাহায্যে **উদন্যাঃ ধারাঃ ইব দ্বিষঃ** জলধারার মতো শত্রুদের **অতিগাহেমহি** অতিগাহন করতে চাই, পার হতে চাই। (ঐ ১।২।৫)

১৯-২৫॥ যজুর্মন্ত্র। অর্থ স্পষ্ট।

২৬॥ ছন্দ জগতী। **ইহ** এখানে **তে প্রিয়ম্** তোমার প্রিয় বস্তু **প্রজয়া** এবং প্রজা অর্থাৎ সন্তান **সম্-ঋধ্যতাম্** সমৃদ্ধ হোক। **অস্মিন্ গৃহে** এই গৃহে **গার্হপত্যায় জাগৃহি** অতন্দ্র হয়ে গৃহপতিত্ব কর। **এনা পত্যা** এই পতির সঙ্গে **তন্বম্ সম্ স্পৃশস্ব** তনু-সংসর্গ কর। **অধ** অতঃপর **জিব্রী** জীর্ণ, বৃদ্ধ হয়ে দুজনে **বিদথম্ আ বদাথঃ** প্রভুত্ব কর, বিদ্যানুশাসন কর, জ্ঞানকে ঘোষণা কর (দ্র. বেমী ৭২১ পৃ), যজ্ঞকে প্রচার কর। (১০।৮৫।২৭)

২৭॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্। **বাম্ হৃদয়ানি** তোমাদের হৃদয়কে **বিশ্বে দেবাঃ** সমস্ত দেবতারা **সম্ অঞ্জন্তু** সম্মিলিত করুন। **বাম্** তোমাদের **মাতরিশ্বা** …**সম্ দধাতু** সন্ধি করুন অর্থাৎ একসঙ্গে জুড়ে দিন। **ধাতা সম্ উ দেষ্ট্রী সম্** ধাতা এবং দেষ্ট্রীও…। (ঐ ৪৭)

২৮॥ ছন্দ অতিশক্বরী। স্পষ্ট। (সামমন্ত্র ব্রাহ্মণ ১।২।২১ দ্র.)

২৯॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্। **ইহ এব স্তম্** এখানেই থাক, **মা বি যৌষ্টম্** বিযুক্ত হোয়ো না। **স্বে গৃহে** আপন ঘরে **পুত্রৈঃ নপ্তৃভিঃ ক্রীড়ন্তৌ** পুত্র-কন্যা ও নাতি-নাতনীদের সঙ্গে খেলতে খেলতে **মোদমানৌ** আনন্দ করতে করতে **বিশ্বম্ আয়ুঃ** সমস্ত আয়ু **বি-অশ্নুতম্** ভোগ কর। (১০।৮৫।৪২)

৩০॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্। স্পষ্ট। (ঐ ৪৬)

৩১॥ ছন্দ অনুষ্টুপ্। **ইয়ম্ বধূঃ সুমঙ্গলীঃ**…; সুমঙ্গলী বৈদিক স্ত্রীলিঙ্গ (পা ৪।১।৩০) দ্র. উষা ১১। **সম্ আ ইত** আপনারা সকলে এখানে আসুন, **ইমাম্ পশ্যত** একে দেখুন। **অস্যৈ** একে **সৌভাগ্যম্** …**দত্তায়** দিয়ে (ক্ত্বো যক্ পা ৭।১।৪৭) **অথ** তারপর **বি অস্তম্** যে যার বাড়িতে **পরা-ইতন** প্রত্যাবর্তন করুন। (ঐ ৩৩)

২০। রম্য গৃহ

সুখী গৃহস্থ তার বাড়িটিকে ভালবাসে। তার মধু-ভরা মায়া-ঘেরা সুখনীড় এই গৃহ। তার আশ্রয়, তার আরাম, তার ধর্মভূমি, তার কর্মকেন্দ্র, তার জীবনসাধনার দুর্ভেদ্য দুর্গ।

সুন্দর জায়গায় সুন্দর করে সাজানো-গোছানো একটি ছবির মতো বা ড়ি—এ স্বপ্ন বেদের ঋষিকবিরাও দেখেছেন। ঋগ্বেদের ধনান্নদানসূক্তের ঋষি ভিক্ষু আঙ্গিরস বলছেন—

ভোজস্যেদং পুষ্করিণীব বেশ্ম
পরিষ্কৃতং দেবমানেব চিত্রম্ (১০।১০৭।১০)

উদার দাতার বাড়িটি কেমন ?
পদ্মিনী-সরোবর।
সাজানো গোছানো দেবগৃহ যেন
অদ্ভুত সুন্দর।

নষ্টনীড় হতভাগ্য জুয়াড়ীর মনপ্রাণ কি যে তৃষাতুর একটি শান্তসুন্দর শ্রীময় গৃহকোণের জন্যে, তার চিত্র পাই ঋষি কবষ ঐলূষের রচনায়—

স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বায় কিতবং ততাপ
অন্যেষাং জায়াং সুকৃতং চ যোনিম্ (১০।৩৪।১১)

জুয়াড়ীর পোড়ে প্রাণ
দেখে অন্যের বৌ আর বাড়ি—সুন্দর ছিমছাম।

ছেলেপুলে নাতিপুতিতে ভরভরন্ত জমজমাট একটি আনন্দভবনের কল্পনা দেখি নারী-ঋষি সূর্যার বিবাহ-সূক্তে (দ্র. বিবাহ ২৯)।

অথর্ববেদের ঋষি প্রমোচন চান একটি বাগান-পুকুর-ফোয়ারা-ওলা প্রকৃতির-কোল-ঘেঁষা বাড়ি—

আয়নে তে পরায়ণে
দূর্বা রোহন্তু পুষ্পিণীঃ।

উত্‌সো বা তত্র জায়তাং
হ্রদো বা পুণ্ডরীকবান্ (অ ৬।১০৬।১)

আসা-যাওয়ার পথে তোমার
ফুলন্ত হোক দূর্বাদল,
একটি থাকুক পদ্মদীঘি,
এক ফোয়ারা ছাড়ুক জল।

এই মায়াময় মধুকুঞ্জ ছেড়ে গৃহস্থকে নানান কর্মোপলক্ষে যেতে হয় প্রবাসে। ঘর ছেড়ে যাওয়ার এই বেদনাকে মধুর করে তুলেছেন ঋগ্বেদের ঋষি বিমদ (বা বসুকৃত্)—

মধুমন্-মে পরায়ণং মধুমত্ পুনরায়নম্।
তা নো দেবা দেবতয়া যুবং মধুমতস্ কৃতম্
(১০।২৪।৬)

মধুময় হোক এ-যাওয়া আমার
মধু হোক ফিরে-আসা।
সব ভ'রে, প্রভু, দাও আমাদের
মধুময় ভালোবাসা॥

বর্তমান সূক্তে পাই প্রবাসীর ঘরে-ফেরার একটি অপরূপ ছবি। দীর্ঘদিন পরে অনেক কিছু অর্জন করে ঘরে ফিরছে প্রবাসী—বুকভরা তার আনন্দ, সোহাগ, আশা আর সেই সঙ্গে একটু আশঙ্কাও—বাড়িতে সাদর অভ্যর্থনা পাব তো? সেই যে তিল তিল করে গড়ে উঠেছিল সবার সঙ্গে প্রেমের, প্রয়োজনের, মমতার দুশ্ছেদ্য বন্ধন—এতদিনের অনুপস্থিতিতে তা শিথিল হয়ে যায় নি তো?

আশা-আশঙ্কায় কম্পমান পথিক-চিত্তের ছন্দে দুলছে কবিতাটি। আর, সব ছাপিয়ে ঝলমল করছে তার সুগভীর গৃহপ্রেম—গৃহই যেন তার গৃহিণী, গৃহিণীই গৃহ। গৃহের প্রতিটি অধিবাসী—মানুষ, পশু, গরু, ভেড়া, ছাগল; প্রতিটি উপকরণ-সামগ্রী—ধন, অন্ন, পান; প্রতিটি ভাব—হাসি, গান, আনন্দ, সমস্তটির ওপর স্নেহের দৃষ্টি বুলিয়ে দিচ্ছে সে, নাম ধরে ধরে কাছে ডাকছে সবাইকে। তার হৃদয়মনপ্রাণ উপচে পড়ছে ঘরে ফেরার আনন্দে।

১॥ **উর্জম্ বিভ্রত্** তেজ ধারণ করে, শক্তিমান হয়ে **বসু-বনিঃ** ধন জয়, অর্জন করে **সু-মেধাঃ** মেধাবী **সু-মনাঃ** প্রসন্ন চিত্তে **মিত্রিয়েণ অঘোরেণ চক্ষুষা** অ-নিষ্ঠুর স্নিগ্ধ বন্ধুর দৃষ্টি নিয়ে **বন্দমানঃ** বন্দনা করতে করতে **গৃহান্ আ-এমি** গৃহে আসছি আমি। **রমধ্বম্** আনন্দ কর, **মত্ মা বিভীত** আমাকে ভয় কোরো না।

২॥ **ইমে গৃহাঃ** এই গৃহ **ময়োভুবঃ** সুখদায়ক **উর্জস্-বন্তঃ** তেজ-যুক্ত **পয়স্-বন্তঃ** দুধে ভরা **বামেন পূর্ণাঃ** প্রিয় ধন দিয়ে পরিপূর্ণ **তিষ্ঠন্তঃ** স্থিতিশীল। **তে** তারা অর্থাৎ সেই গৃহ **আয়তঃ নঃ** আগমনকারী আমাকে **জানন্তু** জানুক।

৩॥ **প্রবসন্** প্রবাসী **যেষাম্ অধ্যেতি** যে-গৃহের কথা স্মরণ করে, **যেষু** যে-গৃহে **বহুঃ সৌমনসঃ** প্রচুর দাক্ষিণ্য, আনন্দ, সুখ, ভালবাসা **গৃহান্ উপহ্বয়ামহে** সেই গৃহকে কাছে-ডাকি, আহ্বান করি। পূর্ববৎ।

৪॥ **উপহূতাঃ** সম্বোধিত, আহূত **ভূরি-ধনাঃ** প্রচুর ধন-যুক্ত **স্বাদু-সম্মুদঃ** স্বাদু-আনন্দযুক্ত অথবা সুস্বাদু খাদ্যের আনন্দে ভরা। স্বাদুসম্মুদঃ—পূর্বপদ-প্রকৃতিস্বর অর্থাৎ বহুব্রীহি। তাই প্রথম অর্থটিই বেশী সঙ্গত মনে হয়। **সখায়ঃ** বন্ধু **গৃহাঃ** হে গৃহ, **অক্ষুধ্যাঃ অতৃষ্যাঃ স্ত** ক্ষুধাহীন, তৃষ্ণাহীন হও। **অস্মত্ মা বিভীতন** আমাকে ভয় পেয়ো না।

৫॥ **ইহ নঃ গৃহেষু** এই আমার গৃহে **গাবঃ উপহূতাঃ** গাভীরা উপহূত হল, অর্থাৎ সম্ভাষণ করছি গাভীদের, **অজ-অবয়ঃ** ছাগল ও ভেড়ারা **উপহূতাঃ** ·· **অথো** এবং **অন্নস্য কীলালঃ** অন্নের মধ্যে কীলাল **উপহূতঃ**···। কীলাল —সুমধুর অমৃতসগোত্র পানীয়বিশেষ।

৬॥ **সূনৃতা-বন্তঃ** আনন্দ-ভরা **সুভগাঃ** সুন্দর, সৌভাগ্যযুক্ত **ইরা-বন্তঃ** অন্ন-যুক্ত **হসামুদাঃ** হাসিতে আনন্দে পরিপূর্ণ **গৃহাঃ** হে গৃহ **অস্মত্ মা বিভীতন**···।

৭॥ **ইহ এব** এখানেই **স্ত** থাকো। **মা অনু গাত** আমার অনুগমন কোরো না। **বিশ্বা রূপাণি পুষ্যত** সর্বতোভাবে পুষ্ট হও। **ভদ্রেণ সহ** সমৃদ্ধি নিয়ে **আ-এষ্যামি** আসব। **ময়া** আমার সঙ্গে **ভূয়াংসঃ ভব** বর্ধিত হও।

২১। রাষ্ট্রসভা

অথর্ববেদের একটি নাম হল ক্ষাত্রবেদ। কেননা এতে রাজা, রাষ্ট্র ও রাজনীতি-সংক্রান্ত সূক্তের সংখ্যা প্রচুর। বর্তমান সূক্তটি তাদেরই একটি।

১। **প্রজাপতেঃ দুহিতরৌ** প্রজাপতির দুটি কন্যা **সভা চ সমিতিঃ চ** সভা এবং সমিতি **সংবিদানে** একমত হয়ে, মিলিত হয়ে **মা অবতাম্** আমাকে রক্ষা করুক। **যেন সংগচ্ছৈ** যার সঙ্গে মিলিত হব বন্ধুভাবে বা শত্রুভাবে **মা উপ** আমার কাছে **সঃ শিক্ষাত্** সে যেন শেখে। **পিতরঃ** হে পিতৃগণ, **সঙ্গতেষু** সমাবেশে **চারু বদানি** যেন ভাল বলতে পারি।

২। **সভে** হে সভা **তে নাম বিদ্ম** তোমার নাম জানি, **নরিষ্টা নাম বৈ আস** তোমার নাম হল আড্ডা, **যে কে চ সভাসদঃ** যত আছে সভাসদ্ **তে মে স-বাচসঃ সন্তু** তারা আমার কথায় সায় দিক।

৩-৪। **এষাম্ সমাসীনানাম্** এই যাঁরা সমাসীন, তাঁদের **বর্চঃ বিজ্ঞানম্** তেজ ও বুদ্ধি **অহম্ আ দদে** আমি গ্রহণ করছি। **ইন্দ্রঃ…মাম্** আমাকে **অস্যাঃ সর্বস্যাঃ সংসদঃ** এই সমস্ত সংসদের মধ্যে **ভগিনম্** ভাগ্যবান **কৃণু** কর। **বঃ যত্ মনঃ** তোমাদের যে মন **পরা-গতম্** দূরে চলে গেছে, **যত্** যে মন **ইহ বা ইহ বা বদ্ধম্** এখানে বা ওখানে বদ্ধ হয়ে আছে, **বঃ তত্** তোমাদের সেই মনকে **আ বর্তয়ামসি** এদিকে, আমার দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি, **ময়ি** আমাতে **বঃ মনঃ** তোমাদের মন **রমতাম্** আনন্দ পাক।

২২। সর্বাপ্রিয়ত্ব

পুলুকামো হি মর্ত্যঃ, মানুষের অনেক যে কামনা—বলেছেন মহর্ষি অগস্ত্যের এক ভূয়োদর্শী শিষ্য, দ্র. পৃ ২০১। তাঁর এই বীজ-মন্তব্যটিরই যেন পল্লবিত পুষ্পিত বিশাল মহীরুহ অথর্ববেদ, যার মধ্যে আশ্রয় পেয়েছে মানুষের ক্ষুদ্রতম পিপীলিকা-কামনা থেকে সুরু করে মহত্তম বিপুল গরুড়-কামনা পর্যন্ত।

অথর্ববেদে অনেকগুলি একর্চ (এক-ঋক্‌-বিশিষ্ট) সূক্ত আছে। বর্তমান সূক্তটি তাদের অন্যতম। এই সূক্ত-মন্ত্রটিতে রয়েছে মানুষের তিনটি এষণা বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা ও লোকৈষণার শেষটি অর্থাৎ লোকৈষণার উচ্চারণ। দেবতা থেকে আরম্ভ করে শূদ্র পর্যন্ত সবার প্রিয় হবার আকাঙ্ক্ষা।

অর্থ অনুবাদেই স্পষ্ট। 'সর্বস্য পশ্যতঃ প্রিয়ম্ কৃণু'—বাক্যটি অদ্ভুতভাবে শ্লিষ্ট। (১) যারা দেখছে তাদের সবার প্রিয় কর (২) অনাদরে বা ভাবে ষষ্ঠী—সবাই দেখুক, আমি সবার প্রিয়।

২৩। মন-আবর্তন

ঋগ্বেদের অনেক সূক্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক এক টুকরো ইতিহাস, কিংবদন্তী, গল্প। দশম মণ্ডলের প্রসিদ্ধ মন-আবর্তন সূক্তটি এইরকম একটি ইতিহাসবিজড়িত সূক্ত। মৃত প্রিয়জনের যে মন ছড়িয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে, মিশে গেছে জলে স্থলে অন্তরিক্ষে, সূর্যের জ্যোতিতে, ভোরের আলোয়, ধরণীর ধূলায়, মহা অজানায়, তাকে আবার দেহের কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনার জন্যে রচিত হয়েছিল এই 'মন-আবর্তন' অর্থাৎ মন-ফেরানোর সূক্তটি। বৃহদ্দেবতাকার শৌনক, সর্বানুক্রমণীকার কাত্যায়ন এবং তাঁদের প্রতিধ্বনি করে সায়ণ বলেছেন এই সূক্তের ইতিহাস—

ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা অসমাতির পুরোহিত ছিলেন ঋষি অগস্ত্যের চার ভাগিনেয়—বন্ধু সুবন্ধু শ্রুতবন্ধু আর বিপ্রবন্ধু। রাজা তাঁদের ত্যাগ করে অন্য দুজন যাদুকর পুরোহিতকে নিয়োগ করলেন, তাঁরা শ্রেষ্ঠতর এই বিবেচনায়। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে বন্ধু প্রভৃতি চার ভাই রাজার বিরুদ্ধে অভিচার করলে রাজার যাদুকর পুরোহিতরা প্রত্যভিচার করে সুবন্ধুকে মেরে ফেল্লেন। তখন সুবন্ধুর ভাইয়েরা পরপর চারটি সূক্ত জপ করে অগ্নির প্রসাদে সুবন্ধুকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। বর্তমান সূক্তটি হল এই চারটি সূক্তের মধ্যে দ্বিতীয়। ইতিহাসে সত্যতা থাক বা না থাক, প্রাণোপাসক বৈদিকরা যে নানানভাবে মৃত্যুজয়ের সাধনা করেছিলেন, তার অন্যতম প্রমাণ এই সূক্তগুলি।

১। যত্ তে মনঃ তোমার যে-মন দূরকম্ বহুদূরে বৈবস্বতম্ যমম্ জগাম বৈবস্বত যমের কাছে চলে গেছে, তে তত্ তোমার সে মনটিকে আ বর্তয়ামসি আমরা আবর্তিত করছি, ফিরিয়ে আনছি ইহ এখানে, এই পৃথিবীতে ক্ষয়ায় থাকবার জন্যে (√ক্ষি—নিবাস), জীবসে বাঁচবার জন্যে। বাকি ঋক্‌গুলিতে প্রথমটি ছাড়া আর সব চরণই পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। প্রথমটিরও গঠন একই রকম। অর্থ অনুবাদেই স্পষ্ট।

অনুবাদ-বিকল্প—তোমার যে-মন দূরে চলে গেছে

... ...

এখানে থাকতে, এখানেই বেঁচে থাকতে।

২৪। সাংমনস্য

বৈদিক সাম্যবাদ মনসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ঘরে ঘরে শান্তি থাকলে তবেই সে-শান্তি সমাজে শৃঙ্খলা আনতে পারে। সে-শান্তির প্রতিষ্ঠা প্রেমে, পরস্পরের প্রতি আনুগত্যে, পারস্পরিক স্নেহবন্ধনের সানন্দ স্বীকৃতিতে, বিদ্বেষহীন কলহহীন মধুর ভাষণে। শুধু কথায় নয়, কাজেও। এই অকৃত্রিম মন-সাম্যের ফলিত রূপ হবে, ঋষি অথর্বা বলছেন, একান্নবর্তিতা। ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।

এ-কথা বৈদিক কবির কণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত হয়েছে বারবার সমস্ত বৈদিক সাহিত্য জুড়ে। সমস্ত গরমিলকে বিপুল পৌরুষে পরাভূত, অভিভূত, আত্মসাৎ করে সেই এক বড়-মিলে, মহা-মিলে পৌছন, জপসূত্রের ঋষির ভাষায় 'অরিচ্ছন্দ'কে অপাস্ত, পরাস্ত, রূপান্তরিত করে 'মিত্রচ্ছন্দে' পৌছন, বিশ্বা-মিত্র হওয়া, এই তো বৈদিক—শুধু বৈদিক কেন, যে-কোন—সাহিত্যেরই চরম লক্ষ্য। বেদ-সংকলয়িতা মহর্ষি ব্যাস তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন ঋষি সংবনন আঙ্গিরসের সংজ্ঞান-সূক্তটিকে ঋগ্বেদের একেবারে শেষে স্থান দিয়ে।

সংবনন হলেন এক মহাপ্রেমিক ঋষি যিনি সবাইকে ভালবাসায় এক করতে চান (√বন্—ভালবাসা) কেননা পরমদেবতাকে তিনি জেনেছেন পেয়েছেন

প্রেমস্বরূপ বলে (দ্র. কেনোপনিষদ্, ৪র্থ খণ্ড)। এই ঐক্যই হল চরম জ্ঞান, তাই তার নাম সংজ্ঞান, সম্যক্ জ্ঞান, সকলকে এক করে জানা। এই সংজ্ঞানের বাণী বহন করছে অথর্ববেদের অনেকগুলি সূক্ত, তাদের নাম হল 'সাংমনস্য' অর্থাৎ একমন হওয়া যায় যার সাহায্যে।

অনূদিত মন্ত্রগুলি ঋষি অথর্বার একটি সাংমনস্যসূক্ত (অ. ৩।৩০) থেকে নেওয়া।

১॥ **সহৃদয়ম্ সাংমনস্যম্** হৃদয় মনের একতা **অ-বিদ্বেষম্** বিদ্বেষ-হীনতা **বঃ কৃণোমি** তোমাদের জন্য করছি। **জাতম্ বৎসম্** সদ্যোজাত বাছুরকে **অঘ্ন্যা ইব** অহননীয়া অর্থাৎ গাভী যেমন, তেমনি করে **অন্যো অন্যম্** তোমরা একে অন্যকে **অভি হর্যত** ভালবাসো (√হর্য—পছন্দ করা, ভালোবাসা, হেদোন)।

২॥ **পুত্রঃ পিতুঃ···অনুব্রতঃ** পিতার অনুগামী, অনুরক্ত **মাত্রা সং-মনাঃ** এবং মায়ের সঙ্গে একমন **ভবতু** হোক। **জায়া···পত্যে** পতিকে **মধুমতীম্ শন্তি-বাম্ বাচম্** মধুর শান্তি-যুক্ত কথা **বদতু** বলুক।

৩॥ **ভ্রাতা ভ্রাতরম্** ভাই ভাইকে **মা দ্বিক্ষত্** দ্বেষ না করুক **উত** এবং **স্বসা স্বসারম্** বোন বোনকে **মা** দ্বেষ না করুক। **সম্যঞ্চঃ** সম্মিলিত, এক **সব্রতাঃ** এক-ব্রত **ভূত্বা** হয়ে **ভদ্রয়া** সানন্দে **বাচম্ বদত** কথা বল।

৪॥ **বঃ** তোমাদের **প্রপা** পানীয়জলের সঞ্চয়, জলপান-স্থান, কুয়ে **সমানী** এক, সাধারণ হোক, **বঃ অন্নভাগঃ** তোমাদের অন্নের ভাগ **সহ** একসঙ্গে হোক। **সমানে যোক্তে** এক বাঁধনে **সহ** একসঙ্গে **বঃ যুনজ্মি** তোমাদের যুক্ত করছি। **নাভিম্ অভিতঃ অরাঃ ইব** চক্র-কেন্দ্রের চতুর্দিকে শলাকার মতো **সম্যঞ্চঃ** এক হয়ে **অগ্নিম্ সপর্যত** অগ্নির পরিচর্যা কর

২৫। শান্তি

সূক্তের অন্বয় ও অর্থ দুই-ই সরল ও স্পষ্ট।

দ্বিতীয় ঋকে পূর্বরূপ শব্দের অর্থ পূর্বাভাস, এক্ষেত্রে অমঙ্গলের

চতুর্থ ঋকে ক্লীবলিঙ্গের প্রথমার একবচনে 'পরমেষ্ঠিনম্' পদটি ব্যাকরণের দিক থেকে বিচিত্র।

অষ্টম ঋকে লোহিতক্ষীরা গাভী মানে লাল-দুধ গাভী। গোরু রক্তের মতো লাল দুধ দিলে তা অমঙ্গলের সূচক।

যে-মন ছেড়েছে ভয়ঙ্করকে সে-ই আমাদের আনুক শান্তি।

The same mind that let Frankanstein loose

Bring peace for all.

এ প্রার্থনা এযুগেরও। প্রার্থনা না ভবিষ্যদ্বাণী?

কেননা, সে মন হল পরমেষ্ঠী—পরমে প্রতিষ্ঠিত। তার ডালপালা যেখানেই থাক, শিকড়টি ঠিক ছুঁয়ে আছে যা মহত্তম, যা সুন্দরতম, যা বাঞ্ছিততম, তাকে।

———

মন্ত্র-সূচী

নির্ঘণ্ট

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	শুদ্ধ
অন্তণ-কন্যা	২২	অন্তৃণ-কন্যা
জায়ের	৪৭	জায়েব
উক্‌থের	৬৫	উক্‌থের
শ্রেণীর	৬৬	শ্রেণীর
মিহিত	৭৭	নিহিত
পতত্তোর্	৮২	পতয়োর
স্বত্তো অগ্নে কাব্যানি	৮৬	স্বদ্-অগ্নে কাব্যা
বহ্মাণো	১২৪	ব্রহ্মাণো
বর্ম্মা	১২৮	বর্ম্ম
প্রতচীনায়	১৬২	প্রতীচীনায়
বহ্মণো	২১২	ব্রহ্মণো
পূর্বশ্লকের পুনরাবৃত্তি	৩৩০	পূর্বশ্লকের প্রায় পুনরাবৃত্তি
উৎপাতয়	৩৩১	উৎপাতয়াৎ